ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা ।

৮ম বর্ষ, } বৈশাখ । { ১ম সংখ্যা ।

উদ্দীপনা ।*

(১)

জাগরে জাগরে জাগরে সবে,
মোহ নিদ্রায় কত ঘুমিয়ে রবে,
ভ্রান্ত হয়ে কেন ভ্রম এই ভবে,
উঠি প্রাপ্য বর লভিবে কবে ?
অমৃত সন্তান তোমরা সকলে,
মায়া মোহ ছলে গিয়েছরে ভুলে,
ছিলে নিত্যমুক্ত এবে বদ্ধ হলে,
এ বন্ধন হায় ঘুচাবে কবে !!

(২)

বিবেক বৈরাগ্যে ডুবায়ে অতলে,
অমূল্য জনম বৃথা কাটাইলে,
অনিত্য সম্পদে কেন বা মজিলে,
আপন স্বরূপে জাগিবে কবে ;—
প্রবৃত্তির স্রোতে দিয়েছ গা ঢেলে,
যেই দিকে টানে যাও কুতূহলে,
কিসের কুহকে মজিয়ে হায় রে,
ষড়রিপুদাস হইলে সবে ।

(৩)

অনন্ত সাগরে বুদ্বুদেরি প্রায়,
কত জীব ভাসে পুন ডুবে যায়,
কোথা হতে আসে কেন চলে যায়,
কিবা তার তত্ত্ব দেখছ কি ভেবে ;—
কি কাজ সাধিতে ভবে এসেছিলে,
কি কাজ করে বা দিন কাটাইলে,
অন্তিমে কি কাজে কোথা যাবে চলে,
বারেক ভাবনা চরমে কি হবে ?

(৪)

অতুল সম্পদ রাজ-ছত্রধারী,
কিম্বা একমুষ্টি অন্নের ভিখারী,
নাহি কোন ভেদ দেখ চিন্তা করি,
দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরাবে,
কোথা রবে গৃহ দারা সুত সবে,
যাবে পরিহরি বিষয় বিভবে,
প্রাণপ্রিয় দেহ তাও পড়ে রবে,
একা এসেছিলে একা যেতে হবে ॥

* এই গীতটী "অহং" রাগিণীতে একতালা তালে গাইতে পারা যায়—লেখক

(৫)

বাসনার বশে জনম মরণ,
জন্ম হলে মৃত্যু হয় সংঘটন,
কেশে ধরে আছে দুরন্ত শমন,
বিধির বিধান অন্যথা না হবে;—
দেখে শুনে হায় না হলো চেতন,
মত্ত পশুপ্রায় কর বিচরণ,
করহে সকলে বাসনা বর্জ্জন,
জন্ম মৃত্যু দায় যদি বা এড়াবে ॥

(৬)

সুখ আশে দুঃখে কর আলিঙ্গন,
অনল হেরিয়ে পতঙ্গ যেমন,
ত্রিতাপ জ্বালায় দহে অনুক্ষণ,
মরীচিকায় জল খুঁজিলে কি হবে;—
কস্তুরী সৌরভে কুরঙ্গ যেমন,
বৃথা ঘুরে ফিরে হারায় জীবন,
পথভ্রান্ত জীব ভ্রমিছ তেমন,
বাহিরে খুঁজিলে কোথা সুখ পাবে ॥

(৭)

মত্ত বাসনাতে মন উশৃঙ্খল,
ইন্দ্রিয়ের পথে ছুটেছে কেবল;
রূপ রসাদিতে হইয়ে বিহ্বল,
অজ্ঞান তিমিরে রয়েছ ডুবে;—
সুখে দুঃখে হায় সতত চঞ্চল,
ভাবিয়ে দেখ না সকলি বিফল,
অসার সম্পদে মজে কিবা ফল,
অনিত্যোতে নিত্য সুখ কোথা পাবে ॥

(৮)

ধিক্ [illegible] ধিক্ রে সকলে,
বিষ্ঠা কৃমিসম বিষয়ে মজিলে,
সুধা দিলেও হায় ফেলে দাও ঠেলে,
নিজ কর্ম্ম দোষে কতই মজিবে
আপন গৌরব ডুবায়ে অতলে,
ধর্ম্মে কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলে,
কর উপহাস নিবৃত্তি দেখিলে,
হেন দশা হায় কবে দূর হবে ॥

(৯)

ভেবে দেখ সেই আর্য্যঋষিগণ,
অনিত্য বাসনা করি বিসর্জ্জন,
সত্য লাভ তরে করি দৃঢ় পণ,
কঠোর সাধনা করিল যবে;—
সে সাধনলব্ধ মুক্তির সোপান
উন্মুক্ত সম্মুখে, হও আগুয়ান,
কেন ম্রিয়মান? হে আর্য্যসন্তান!
অমৃত ফল খেলে অমর হবে!!

(১০)

হিমাদ্রি টলিত গভীর ওঁকারে,
জলধি নাচিত সামের ঝঙ্কারে,
যমুনা উজাতো শুনে যেই স্বরে
কেন সেই বীণা রয়েছে নীরবে?
বারেক জাগিয়ে উঠাও সে তান
আর্য ঋষিগণ গাইত যে গান
মাতিয়ে উঠুক বিশ্বের পরাণ
সফল সাধনা হইবে তবে ॥

(১১)

আর্য্যরক্ত বহে ধমনীতে যার,
হেন হীনতাব সাজে কি গো তার,
উঠ সুপ্ত সিংহ জেগে একবার,
সনাতন পথে চলরে সবে;—
আত্মজ্ঞান লাভে করি দৃঢ় পণ,
এখনও জাগিলে মিলিবে রতন,
গুরু পদে সবে লহরে শরণ,
নিত্য নিরঞ্জনে তবে ত পাবে ॥

(১২)

ভাতিছে বিশ্ব নবীন আলোকে,
নবীন প্রভাতে হাসিছে পুলকে,
এসময়ে জেগে জাগাও সবাকে,
সার্থক জনম তবে ত হবে ;—

যোগেন্দ্রের সাথ জাগিয়ে সকলে
আপন কল্যাণ সাধ কুতুহলে
ভুলিওনা আর মায়া, মোহ ছলে
অমৃত সন্তান উঠরে সবে !!

দীন—যোগানন্দ।

—:0:—

দান ও তপস্যা

সংসারে দেখিতে পাই সকলেই অধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করতঃ সঞ্চয় করিতেছে। আপনি মরিয়া গেলে স্ত্রী পুত্রাদি অর্থের জন্য কষ্ট পাইবে না ; সুখে থাকিবে এই আশায় অর্থ সংগ্রহ ও ভোগ বিলাস করিতেই জীবন কাটাইয়া দিতেছে। কিন্তু তুমি যখন সেই অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যাইবে, তখন রাহাখরচ বলিয়াও একটী পয়সা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেনা। স্ত্রীপুত্রাদি কেহই তো সঙ্গে যাইবে না। সঙ্গে যাইবে কেবল তোমার কর্ম্ম—আর সেখানে ভোগ করিবে তুমি কর্ম্মানুরূপ ফল। এখানে যে স্ত্রীপুত্রকে সুখী করিবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কতই গর্হিতাচরণ করিয়াছ, তাহার জন্য যখন শাস্তি ভোগ করিবে, তখন সেই স্ত্রী পুত্র, ধন জন, সিপাই, শান্ত্রী কাহারও দ্বারা কোন উপকার পাইবে না। নিজেই কেবল যন্ত্রনাভোগ করিয়া চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইবে। এইযে অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, পরের অনিষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছ ; তখন ঐ অর্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। প্রত্যুত, অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে অধর্ম্ম করিয়াছ তাহার জন্য তীব্র যাতনা ভোগ করিতে হইবে। হায় এমন সাধের অর্থ তাহার এক কপর্দ্দকও সঙ্গে যাইবেনা। এই জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন ;—

"বরং দারিদ্র্যং মন্যায় প্রভবাদি বিভবাদপি।
ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা নতু রোগজা।"

বরং দরিদ্র হইয়া দুঃখে থাকা ভাল, তথাপি অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নয়। কারণ সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া মোটা হওয়া ভাল নহে।

শাস্ত্রে আরও বলিয়াছেন যে, ধনই বল আর জীবনই বল, তৃণপত্রগামী জল-বিন্দুর ন্যায় সকলই চঞ্চল ; অতএব ধর্ম্মাচরণ কর। শ্রুতি স্মৃতিতে যে বিহিতধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, মনুষ্য যদি তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাহাহইলে ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে অনন্ত সুখলাভে অধিকারী হয়। এই অনিশ্চয়, অথচ সুদুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জন না করিল, তাহার জীবন বৃথা এবং সে ব্যক্তি ইহ-পরকালে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যথাঃ—

যস্ত ত্রিবর্গ শূন্যস্য দিনান্যায়াস্তি যান্তি চ।
স লোহকার ভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥

মহাভারত।

ধর্ম্মোপার্জ্জনাদি না করিয়া যে ব্যক্তির দিন আসিতেছে ও যাইতেছে, কর্ম্মকারের ভস্ত্রা (জাঁতা) যেমন বৃথা নিঃশ্বাস্ প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে, সে ব্যক্তি তদ্রূপ বৃথা জীবিত।

মানুষ্যং যঃ সমাসাদ্য স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়কম্।
দ্বয়োর্ন সাধয়ত্যেকং স মৃতস্তপ্যতে চিরম্॥

আদিত্যপুরাণ।

স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদায়ক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি দুয়ের একটীকেও সাধনা না করিল, সে মৃত্যুর পর দারুণ অনুতাপ-গ্রস্ত হয়। ধন, মান, বিষয়, আশয়, স্ত্রী পুত্র, প্রিয়জন সকলই শরীরের সহিত নষ্ট হইয়া যায়! ধর্ম্মই কেবল একমাত্র সুহৃদ কেননা, তিনি মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে গমন করেন। আবার বিদ্যা, বিত্ত, দেহ, শৌর্য্য, শ্রেষ্ঠ কুলে জন্ম, দেহ অরুগ্ন থাকা ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সকলই ধর্ম্ম হইতে প্রসূত হয়। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলে ইহপরকালে সুখ হয় এবং অধার্ম্মিক লোক দুঃখ ভোগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ যদি না করিতে হইত, তাহা হইলে এ সংসারে ধর্ম্ম ও পুণ্যের লেশও বিদ্যমান থাকিত না। সকলেই পাসব আচরণে ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ ও অসৎ লালসা পূর্ণ করিত।

এখন কথা হইতেছে যে, এই ধর্ম্ম কিসে হয়? কলিযুগে গৃহস্থের পক্ষে দান একমাত্র ধর্ম্ম। ন্যায়ানুমোদিত উপার্জ্জিত অর্থের কিছু অংশ দান করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার যেমন আর্থিক অবস্থা তিনি তদনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিবেন। তা বলিয়া তুমি ধর্ম্মের মস্তকে বজ্রাঘাত ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে, কিম্বা চাকুরী করিতে গিয়া মানবের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়া কিঞ্চিৎ দান করিলে, অথবা দশ জন লোক খাওয়াইলে;—অর্থাৎ তোমার নিমকহারামী ও অধর্ম্মপ্রণোদিত ন্যায় ও ভদ্রতা বিগর্হিত অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দানাদি করিলে, তোমার কোনই উপকার হইবে না। ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায়ানুমোদিত অর্থ স্বার্থক, তাহার কিছু অংশ দান করিতে হইবে।

যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের কৃত্রিম আবরণে আবৃত, ভিতরে নিত্য অধর্ম্মের পৈশাচিক নৃত্য, এরূপ তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন এমন অনেক লোক দেখিয়াছি যে, তাহারা অন্ধ, পঙ্গু ও ব্যাধি-গ্রস্থ দুর্দ্দশাপন্ন বিপন্ন ব্যক্তিকে দান করে না। তাহারা বলিয়া থাকে, "উহরা পাপী।" ঈশ্বর যখন উহাদিগকে দণ্ড দিতেছেন, তখন আমরা সাহায্য করি কেন? উহাদিগকে দান কিম্বা কোন প্রকারে সাহায্য করিলে ভগবানের বিধির বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করা হয়।" ইহা কিন্তু হালফ্যাসানের বিবেক-বাদিগণের 'বিবেক-বুদ্ধি সম্মত'! এই নজিরে অনেকেই মুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া বাজে খরচের হাত এড়াইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বিবেকবাদিগণ স্বীয় বিকৃত বুদ্ধিকেই 'বিবেক' জ্ঞানে বিষম অনর্থোৎপাদন করিতেছেন। তাঁহারা বিবেকের দোহাই দিয়া

জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, তপঃপরায়ণ ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র অবিশ্বাস করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে শাস্ত্র আশ্রয় এবং শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য গতি নাই। যাহারা ধর্ম্মে কর্ম্মে স্বেচ্ছাচার বশবর্ত্তী হইয়া স্বকপোল-কল্পিত মত স্থাপনে প্রয়াসী, যাহারা বিদেশীয় আমদানী "বিবেক বুদ্ধি" ধার করিয়া এবং বিজাতীয় শিক্ষার বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া, স্বজাতীয় শাস্ত্রে অবিশ্বাসী যাহারা শাস্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া, বিষয়-বিষ-বিগলিতচিত্তে বিচক্ষণ বুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি প্রাপ্ত হয় না। যাহারা বিবেকের দোহাই দিয়া নিজের মতলব মত কার্য্যাকার্য্য বিচার করে, তাহাদিগের বিবেক শব্দের কোন অর্থজ্ঞানই নাই। জীবের বুদ্ধি নিজের সংস্কারানুরূপ গঠিত সুতরাং তাহার কার্য্যাকার্য্য বিচারের শক্তি কোথায়? যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দোহাই দিয়া অধর্ম্ম প্রচার করে, তাহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন;—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, সে ব্যক্তি কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; তাহার ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি লাভ হয় না। অর্থাৎ—তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

অতএব যাহারা স্বকপোল কল্পিত ধর্ম্ম-মতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহ্য পূর্ব্বক অহম্মুখ-ভাবে দান করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাদের শ্রীভগবানের এই মহদ্বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দয়াতেই ধর্ম্মের অবস্থিতি। লোকের কষ্ট ও দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি তোমার মনে দয়ার সঞ্চার না হয় এবং দান ও সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তবে তোমার ধর্ম্ম কোথায়? জীবে দয়া না করিলে তুমি ভগবানের দয়া কিরূপে লাভ করিবে? জীবের এই মহদ্বৃত্তি বিকাশের জন্যই বুঝি দীন দুঃখীর সৃষ্টি। অতএব যাহার দয়া নাই, তাহার ধর্ম্ম নাই। মানুষের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত; সুতরাং তাহার কার্য্যাকার্য্য বিচারে শক্তি কোথায়? একারণ সর্ব্ব সংস্কার-বর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্র বাক্যানুসারে রুগ্ন, ভগ্ন, দীন, দুঃখীকে দান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপফল ভোগ করিতেছে, সে-তো কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিবেই; তোমার তাহা বিচারের আবশ্যক কি? যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে তেমনি ফলভোগ করিবে;—এ কথাতো পড়িয়াই আছে, তুমি অপরের দোষ গুণ,—কর্ম্মফল বিচার না করিয়া তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। কলি-যুগে যখন দানই গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম, তখন তোমার অবস্থানুরূপ দান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬ অঃ. শ্লো।

অর্থাৎ—কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যুগ বিশেষে লোকের মতি-গতি ও দেহানুরূপ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আর সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলিতেছেন কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম। যথাঃ—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥

মনুসংহিতা।

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপর যুগে যাগযজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিযুগের মনুষ্য স্বল্পায়ু স্বল্পজ্ঞানী; অতএব তাঁহাদের দানই একমাত্র ধর্ম্ম। বৃহস্পতি বলিয়াছেন;—

"তপো ধর্ম্মঃ কৃতে যুগে, জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্মৃতম্।
দ্বাপরে চাধ্বরাঃ প্রোক্তাঃ কলৌ দানং দয়া দম॥"

তপস্যা সত্যযুগের ধর্ম্ম; ত্রেতাযুগে জ্ঞান ধর্ম্ম; দ্বাপরের ধর্ম্ম যজ্ঞ; কলিতে দান, দয়া ও দমই ধর্ম্ম। যম বলিয়াছেনঃ—

"যতীনান্তু শমোধর্ম্মস্ত্বনাহারো বনৌকসাং।
দানমেব গৃহস্থানাং শুশ্রুষা ব্রহ্মচারিণাং॥"

শম যতীদিগের ধর্ম্ম, অনাহার বনৌকদের ধর্ম্ম, গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, আর দান গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন;—

"দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতন্তু শক্তিতঃ॥"

প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূত চিত্তে যাচককে দান করিবে। কারণ—

কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কলিযুগে একমাত্র দান সমুদয় সিদ্ধির কারণ। যত অমঙ্গল আছে সকলই দানে নষ্ট হয়। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে,—"যাচককে আমি 'গুরু' বলিয়া মান্য করি, কারণ যাচক কর্ত্তৃক মনোমল পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে। আর যে অর্থে ধর্ম্ম নাই, কীর্ত্তি নাই যাহা পরিত্যাগ করিয়া ইহ সংসার হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক—দান ব্যতীত সে অর্থের প্রয়োজন কি? প্রাণ হইতে প্রিয়তর অর্থের সদ্গতি একমাত্র দান দ্বারাই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দীন দুঃখীকে অর্থদান করে, সে ব্যক্তি আপনারই পারলৌকিক সংস্থান করিয়া রাখে।"

ধর্ম্মের নানা লক্ষণ ও পন্থা শাস্ত্রে ব্যক্ত থাকিলেও কলিযুগে গৃহস্থদিগের দানই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং স্বর্গ ও মোক্ষের নিদান তাহাতে সন্দেহ নাই। যথাঃ—

ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ে।
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ শ্রীর্দ্দানে নৈব লভ্যতে।
দানেন শত্রূন্ জয়তি ব্যাধি র্দ্দানেন নশ্যতি।
দানেন লভ্যতে বিদ্যা * * *
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাং সাধনং পরমন্ত্বতম্॥

সৌর পুরাণ

ত্রিজগতে দানের অধিক আর কিছুই নাই। দানে স্বর্গ ও শ্রীলাভ হয়; দানধর্ম্মের দ্বারা শত্রু জয় করা যায় এবং দানধর্ম্মের দ্বারা ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। দান দ্বারা বিদ্যালাভ হয়; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধন একমাত্র দানের দ্বারা হইয়া থাকে। কলিযুগে দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও সর্ব্বার্থ সাধক বলিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্মোপরি।
(ওমা) বিনা দানে মথুরাপারে যাননি ব্রজেশ্বরী॥'

বাস্তবিক দানই পরম ধর্ম্ম। দানের কোন ফল কামনা করিয়া ভগবদাজ্ঞা পালন ও ভগবানের তুষ্ট্যর্থ যথাসাধ্য দান করা

কর্ত্তব্য । স্বর্গাদি ফল কামনায়, অথবা প্রত্যুপকারে প্রত্যাশায় যে দান করা যায়, তাহা রাজসিক । যে দান অনুপযুক্ত দেশে অপাত্রে এবং সংকারবর্জ্জিত ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামস দান । আর প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ-কাল-পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধী যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান । যথা ঃ—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অঃ শ্লোঃ

অতএব সকলেরই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য । এইতো গেল প্রথম উপায় । দ্বিতীয় উপায়—তপস্যা

দান যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তপস্যাও তেমন অবশ্য করিতে হইবে । যাহার দান করিবার শক্তি আদৌ নাই, অর্থাৎ—দীন দরিদ্র--নিতান্ত গরীব—এরূপব্যক্তি প্রকৃত তপস্যা করিলে, দানধর্ম্ম ব্যতীত সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারিবে' যাহার যে রূপ অবস্থা এবং অবস্থানুরূপ যে পরিমানে দান করিবার শক্তি আছে তাহার যথাসাধ্য অন্ন বস্ত্র অর্থাদি—দানযোগ্য বস্তু দান ও শাস্ত্রসম্মত তপস্যা করা কর্ত্তব্য ফলকথা দান ও তপস্যা দুইই আবশ্যক ।

এখন, কথা হইতেছে যে, তপস্যা কাহাকে বলে ? অনেকেই হয়তো তপস্যার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে আর বলিবে ওঃ— বাবা ! সত্য যুগে অনাহারে মাত্র বায়ু-ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিত, এখন কলিযুগে কি তাহা হইতে পারে ? এ কথা প্রায়ই লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় । তপস্যার নাম শুনিলে লোকে যেমন ভয় করে, বাস্তবিক তপস্যা তেমন একটা ভয়ানক জিনিস নহে । যাহারা অর্থকেই প্রাণতোষক ও সুখরোচক জ্ঞান করিয়া, তদাশায় পাপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কত প্রকার মন্দ কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের নিকট তপস্যা ভয়ানক অরুচিকর ও অতৃপ্তিজনক । কিন্তু তপস্যা দ্বারা অর্থ ও সুখাদি সমস্তই লাভ করা যায়, তাহা আদৌ বুঝে না । আমাদের বেদ, স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্র, সমুদয় শাস্ত্রই তপস্যার মহিমায় পরিপূরিত । আদিমানব মহামতি মনু বলিয়াছেন,—দেব এবং মানবের যে কিছু সুখ সম্পত্তি লাভ হয়, সে সকলের মূল তপস্যা । স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, যে কোন স্থানে অবস্থিতি বল, নিরোগী হওয়া বল, যে কোন বিদ্যা বল তপস্যাবলে সকলই সাধিত হয় । পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে তপস্যা করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হইয়া চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন । পাতক, মহাপাতক, উপপাতকাদি যত গুরুতর হউক না কেন সুতপ্ত তপস্যা কর্ত্তৃক সকলই বিনষ্ট হইয়া যায় । সংসারে যাহা কিছু দুস্তর ও দুষ্কর এবং দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হউক না তপোবলে সাধিত না হয়, এমন কিছুই নাই । দেবতা ও মানব প্রভৃতি জীব জন্তু গনের সমুদয় দৃষ্টাদৃষ্ট তপোবলে সাধিত হইতেছে দেখিয়া দেবতারা জগৎকে তপোমূলে বলিয়াছেন ।

তপস্যা আর কিছুই নহে, উপাসনার উপযোগী চিত্তের অবস্থালাভের পন্থা মাত্র । উপাসনা করিতে হইলে, চিত্তের একাগ্রতা চাই । শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "উপাসনানি ?— চিত্তৈকাগ্রং ।" চিত্তের একাগ্রতা লাভ করাই সমুদয় উপাসনার, সমুদয় তপস্যার প্রয়োজন । একাগ্র চিত্ত হইলে মানুষের

অসাধ্য কিছুই থাকেনা—একচিত্ত হইলে মনুষ্য মনুষ্যত্বের চরমসীমায় উপনীত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত চঞ্চল মন ভগবানের প্রতি একচিত্ত ও একনিষ্ট হইলেই যোগ ও তপস্যার পূর্ণ ফল লাভ হয়। চিত্ত অনুসারে দেবযোনি প্রেতযোনি, তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি মানব প্রাপ্ত হয়। এই চিত্ত মায়ায় আবৃত হইয়া লোকে অনন্ত কাল সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান। এই চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন জন্য হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে সাধনা করিলে চিত্তের একগ্রতা লাভ হইয়া থাকে, আর একমাত্র শ্রীভগবানের আরাধনায় তাহা সম্পাদিত হয়।

অবশ্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ডে মুক্তি হয়না। শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিলে ভাল বা মন্দ ফল ভোগ করিয়া থাকে। অশুভ কর্ম্ম করিলে প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে। আর শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুখ ভোগ করে; কিন্তু ফলাসক্তচিত্ত হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ঐ কর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বারম্বার আসা যাওয়া ও গর্ভযন্ত্রণা ভোগ নিবৃত্তি হয় না। লৌহময় শৃঙ্খল হউক, কিম্বা স্বর্ণময় শৃঙ্খল হউক, উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারা যেমন বদ্ধ হয়, সেইরূপ জীব পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্য জ্ঞানীরা ফলকামনা না করিয়া সমুদয় সৎকার্য্য করেন, তাহাতে বন্ধনের কারণ হয়না এবং জন্ম-মৃত্যু রূপ যাতনাও বারম্বার সহ্য করিতে হয়না। এইরূপে 'কর্ম্ম করিতে' অর্জ্জুনকেও শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন;—

> "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যত্তপসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং
> শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
> সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥"
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮ অঃ শ্লোঃ

ইহার ভাবার্থ এই যে,—তুমি হোমকর, বা দান কর; বা তপস্যাকর, কিংবা যাহা কিছু কার্য্য কর,—তৎ সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ কর। এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিলে, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। একারণ ফলকামনা না করিয়া দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য। ফলকামনা না করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য করিলে জীবের কদাচ বন্ধন হয় না, বরং ব্রহ্ম জ্ঞান হইয়া থাকে। যথাঃ—

> "সন্ধ্যামুপাসতে যেতু সততং সংশ্রিতব্রতাঃ।
> বিধুত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

ফল কামনা না করিয়াও যখন ফল প্রাপ্তি নিশ্চয়, তখন ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া সংসারপাশে চির বদ্ধ হইয়া অশেষ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করি কেন? অতএব ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া পরদার, পরদ্রব্যে লোভ, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, পরপীড়নাদি না করিয়া; সত্য, দয়া, শান্তি, ক্ষমাদি সাধু ইচ্ছার বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পরোপকার করিবে এবং দেবতা ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি ও সেবা করিবে। কিন্তু

পণ্ডিতগণ সমুদায় শাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরের অপকারই পাপ; উপকার করাই পুণ্য। যথাঃ—

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রানি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যঞ্চ পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে।"

অপরের অনিষ্ট জনক কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া সাধ্যানুসারে পরের উপকার করাই ধর্ম্ম। অতএব অর্থের দ্বারা, কিম্বা শরীরের দ্বারা, অথবা বাক্যের দ্বারা—যে কোন প্রকারেই হউক—আত্মপর, শত্রু মিত্র অবিচারিত চিত্তে সকলের উপকার করাই কর্ত্তব্য। অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, অর্থাভাব নিবন্ধন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পরোপকার ও সাধন ভজন করিতে পারেন না। কিন্তু একথা একটা ওজর মাত্র। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি হইলে অর্থ ব্যতীত অন্যান্য প্রকারে অনেক করা যায়। সাধন ভজন করিতে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা থাকিলে অনায়াসে হয়। অর্থের দ্বারা রাজসিক তামসিক ভাবে ধর্ম্মের ও সাধনার নামে নিজের নাম জাহির করা যায় এবং লোকের নিকট বাহবা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত সাধন-ভজনের জন্য অর্থাভাব নিবন্ধন কোন প্রতিবন্ধক হয় না। প্রকৃত সাধন তো মনে। অতএব গুরূপদিষ্ট ইষ্ট মূর্ত্তির প্রতি ও গুরূপদিষ্ট মন্ত্রে ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা ইষ্টদেবের আরাধনা করিবে এবং তদ্‌গতচিত্ত হইয়া সতত তাঁহার ধ্যানপরায়ণ হইতে হইবে। আপন ইষ্টদেবের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করিলে, তিনি বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন; তাহাতে সাধক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। যথাঃ—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—যাঁহারা আমাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি; তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হন। বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত পুরুষগণ জন্ম-মরণ রূপ বন্ধন এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করেন। যথাঃ—

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

বুদ্ধিযোগ পরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারবান হয়েন এবং জন্মবন্ধ বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। আহারের সময়, বিহারের সময়, শয়নের সময়, ভ্রমণের সময়, কার্য্যের সময় চিন্তার সময়,—সকল সময় ও কার্য্যে জীব যখন আপনার কাম ক্রোধ লোভ মোহাদিকে লইয়া আপন ইষ্টদেবে মন প্রাণ সহিত আত্ম সমর্পণ করিতে শিখে; যখন ইষ্টদেব হইতে আপনাকে আর ভিন্ন বোধ করিতে পারে না, তখন তপস্যার [illegible] লাভ হয়। সমুদয় সিদ্ধিই তখন আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এইরূপ নিয়মে ধ্যান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, জন, না ভাবিয়া ইষ্টদেবের প্রতি

মন সমর্পণ করিবে। মরণ কালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃত্যুকালীন সংসারের কোন বিষয়ে চিত্ত আসক্ত থাকিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। আর ভগবানের প্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়া মরিতে পারিলে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয়না। যথাঃ—

> অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
> যঃ প্রয়াতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়॥
>
> শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৮ম অঃ, শ্লো।

ইহার ভাবার্থ এই—যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবানের চিন্তা করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনন্য-চিত্ত হইয়া ভগবানের চিন্তা করিলে জীব তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেন স্মরণ থাকে, ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

> "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥"
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ম অঃ, শ্লোঃ।

নিতান্ত দুরাচারী ব্যক্তিও একাগ্রচিত্তে ভগবানের ভজনা করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিতে পারে। অন্যত্রে উক্ত হইয়াছে—

> 'অতি পাপ প্রসক্তোপি ধ্যায়ন্নিমিষচ্যুতং।
> ভূয়স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবন পাবনঃ।
> প্রায়শ্চিত্তান্ত শেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মিকানিবৈ।
> যানিতে যাম শেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং॥

অত্যাধিক পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি একাগ্র চিত্তে নিমেষ মাত্রও ভগবানের ধ্যান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া তপস্বী তুল্য হয়। এরূপ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে লোক সকল কৃতার্থ হয় এবং তিনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলে মানবগণ পবিত্র হয়। ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিলে প্রায়শ্চিত্তাহ' সর্ব্ব-পাপ বিনষ্ট হইয়া পরম সুখের কারণ হয়।

বস্, আর কি চাও? ভাই! জীবনের মধ্যে সুজ্ঞান হয় নাই, মরিতে হইবে ভাব নাই এবং মৃত্যুর পরে কি দুর্গতি হইবে, তাহা মনে কর নাই। কেবল অর্থ—স্বার্থ লইয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও জীবন কলুষিত করিয়াছ। এখন যে শেষের সেদিন নিকট বর্ত্তী—অদ্য বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ—ইহা বুঝিয়া সঞ্চিত অর্থের কিছু দান কর এবং একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান ও স্মরণ কর, তাহা হইলে সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে।

বৃদ্ধির ক্ষয় আছে, উচ্চের পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ আছে, তদ্রূপ জীবিতেরও মরণ আছে। মেদিনী, সমুদ্র, নদ, হ্রদ, পর্ব্বত, দেবতা—সকলেই কালে নাশ পায়। জল বুদ্বুদ্সন্নিভ কদলীস্তম্ববৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ স্বকর্ম্মবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; আবার সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। চৌরাশী লক্ষ যোনি সে বিষয়ে বিদ্যমান। মনুষ্য ধর্ম্মরাজ যমকে এবং বিধাতাকে বৃথা দোষারোপ করে। মানুষের কোন কর্ম্ম অসাধ্য নাই, যত্ন করিলে সকলই করিতে পারে। কেবল যে অযত্নে সকল নষ্ট করে, সে সকল তত্ত্ব সকলে জানে না। শাস্ত্রে আছে, সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাধনা করিলে, ঈশ্বরের কৃপাতে আত্ম-

জ্ঞানী হইয়া মোক্ষ হয়। অর্থাৎ আর গর্ভযন্ত্রণা এবং নানা কায়া ধারণ করিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না;—মৃত-জাত সংসার প্রবাহ হইতে অমৃত-অজাত সুখপ্রবাহে ভাসমান হয়। যথাঃ—

ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানশুঃ।"

মৃত্যু না থাকিলে ত্যাগ করায় দোষ ছিল; কিন্তু মৃত্যু বিদ্যমানে-"ত্যাগোঽপি পরম শ্রেয়ঃ" ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ অতএব অহঙ্কারাবধি সর্ব্বাশা ত্যাগ করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে হয় না; অনায়াসে ত্রিতাপ মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যায়। আপনাকে মারিতে তারিতে আপনিই কর্ত্তা। কেন না, বাসনাই সকল বিষয়-বিষরীর কর্ত্তা। তুমি মনে মনে বাসনা ত্যাগ করিয়া দেখ, তোমাকেও দেখিতে পাইবেনা। বাসনাকে ত্যাগ করিতে পারিলে আর সাধারণের মত শরীর ধারণ না হইয়া, সর্ব্বাধার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি আপনাকে ও জগতের সমস্ত পদার্থ ইষ্টদেব হইতে অভিন্ন ভাবে এবং তাঁহাকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপ বিবেচনা করে; যমদূত ও যমযন্ত্রণা তাহার নিকটেও যায় না। ধর্ম্মরাজ যম নিজ দূতকে আপন অধিকার বহির্ভূত সাধুগণের পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছিলেন যে,—"আমি ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ-সমস্তই বাসুদেবস্বরূপ এবং সেই পরম পুরুষ অদ্বিতীয়, এইরূপ নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে অচলাভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটে কদাচ গমন করিও না।" যথাঃ—

সকল মিদ মহঞ্চ বাসুদেব—
পরম পুমান্ পরমেশ্বর স একঃ
ইতি মতি রচলা ভবত্যনন্তে—
হৃদয় গতে ব্রজতান্ বিহায় দূরাৎ।

স্বামী কালিকানন্দ।

———:0:———

অসীমের পথিক।

কেহে তুমি যাচ্ছ চলে,
অসীম পথের যাত্রী?
সম্মুখে কি, দেখছ না হে,
ভীষণ ভয়ের রাত্রি।
ধ্যান ধারণা কোন্ শক্তিতে,
হ'য়ে বলবান?
পেছন দিকে লক্ষ নাই,
হচ্ছ আগুয়ান।
কা'কে ছেড়ে, কোথা যাচ্ছ,
করতে ইষ্ট সিদ্ধি;
জগত জুড়ে তুমিই আছ,
নাই কি ঘটে বুদ্ধি?
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,
কীট পতঙ্গ প্রভৃতি।
সকলি তুমি, ভেবে দেখ মনে
হ'বে প্রতীতি।
এক ছেড়ে দুই, কভু কি হয়,
দেখ ভেবে মনে,
এক এক কোরে লক্ষ কোটি
গণিতজ্ঞ জানে।

বিন্দুর পর, বিন্দু দিয়ে, রেখার উৎপত্তি ;
বিন্দু মহা, বিন্দু লঘু, বিন্দুই জগৎ ভিত্তি।
ঘটে ঘটে সেই বিন্দু চেতন রূপেই আছে।
আপন হৃদে, দেখ তাহা, যাচ্ছ কাহার কাছে ?
হৃদয়ে দেখে আপন বিন্দু, অসীমেতে মিলাও,
সকল ভেঙ্গে এক কোরে, একেই মিশে যাও।
তবে তুমি হ'তে পার, অসীম পথের যাত্রী ;
মুক্ত হবে রাত্রি হ'তে—ভীষণ জন্মের ধাত্রী।

শ্রীপ্রমথ—

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ

(১)

উত্তম কথা। পৃথিবী ইত্যাদি চারিটী ভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এইরূপ অল্পাধিক গুণবিশিষ্ট এবং স্থুল সূক্ষ্ম তারতম্যযুক্ত দেখা যায় ; যেহেতু ইহারা সাবয়ব বা সাকার। ইহারা আকাশের ন্যায় নিরবয়ব বা নিরাকার হইলে, "ত আকাশে ন বিদ্যন্তে" শ্লোকের অর্থানুসারে ইহাদের গুণের লক্ষণ উপচিত হইত না বা অনুভবে আসিত না। অতএব সাকার ব্যতীত গুণের জ্ঞান, উপচয়, উপলব্ধি, অনুভব বা বোধ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের জ্ঞান বা অনুভব না থাকিলে 'বুদ্ধিবৃত্তি' যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইতে হয় বা 'নিশ্চয়াত্মক চিত্তবৃত্তি' অথবা অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ অনুমানও থাকিতে পারে না। পাড়াগ্রামের লোকেরাও সহজে বুঝিতে পারে যে, আমাদের আকার না থাকিলে অর্থাৎ জন্ম না হইলে, আমি তুমি, দাদা, খুড়া, কলিকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, কটু, তিক্ত, মধুর, সুবাস, কুবাস, নরম, গরম, স্পর্শ, শব্দ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দ, গুণ, বা প্রমাণ কোন কালেই উপলব্ধি হইত না ; (বৈদিক—প্রসঙ্গ লেখাও চলিত না,) হেতু সাধ্য ও কার্য্য কারণ লইয়া অনুমান ত দূরের কথা। অতএব আকার বা মূর্ত্তি ব্যতীত গুণের উপচয় অসম্ভব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে চরম অবয়বী পরমাণু নিরবয়ব বা নিরাকার, অংশ-বিভাগ-শূন্য ; সুতরাং তাহাতে উল্লিখিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি গুণের কল্পনা চলিতে পারে না। আর পরমাণুতে গুণের অভাব হইলে অর্থাৎ পরমাণু গুণহীন হইলে দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু, চতুরণুক, পঞ্চমণুক ইত্যাদি (উ'পাচ [illegible]) অণু দ্বারা ভূতাদি সৃষ্টি হইলেও তাহারা গুণহীন হইবে। যেহেতু কারণ ভাবাৎ কার্য্যভাবঃ অর্থাৎ কারণে যাহা থাকে কার্য্যে তাহা বর্ত্তিয়া থাকে এরূপ হইলে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, গুণ থাকিতে পারে না অথবা গুণের উপাধি দেওয়া চলে না।

অন্যথায় "ক্রিয়াবত্ত্বাদ্ গুণবত্ত্বাচ্চ" এই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের পার্থিব গুণ রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শাদি দেখিয়া, মূলীভূত পরমাণুতে গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণীভূত পরমাণুতে গুণ ও ক্রিয়া না থাকিলে, বৃহৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু (যাহাকে কারণের কার্য্য বলা হয়) নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইত (অর্থাৎ গুণ ও ক্রিয়া থাকিত না) বলিতে হইবে; সুতরাং পরমাণুতে গুণ ও ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে, স্বীকার করিতে হইল। এরূপ হইলে পরমাণুকে সাবয়ব বা সাকার হইতে হইবে। যেহেতু জায়মানভূতে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের গুণ ও ক্রিয়ার সঙ্গে আকার বা মূর্ত্তির উপচয় সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, এবং উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ গোচর গুণ নহে, ধর্ম্ম; সুতরাং মহৎ পরিমাণ উদ্ভূত রূপ, উদ্ভূত স্পর্শ, রূপ সংস্কার, অনভিভূত রূপ সম্বন্ধ না হইলে পরমাণুর রূপ ও গুণ প্রত্যক্ষ গোচর হইবে না, এরূপ বলিলেও ইহা সৃষ্টির পরে, পূর্ব্বের কথা নহে। যেহেতু জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে চরম অবয়বী পরমাণু নিরাকার বিধায়ে সেখানের অগনিত পরমাণু নিরবয়ব বা নিরাকার। সেখানে নিরাকার ব্যতীত অন্যের অবস্থিতি সম্ভব নহে। সুতরাং তথায় নির্ণয়ক কেহ ছিল না, যাহা দ্বারা পরমাণু শ্বেত কি পীত, নীল কি লোহিত, নির্ণয় হইতে পারে। সেখানে যে যাইবে, সেই পার্থিব নাম রূপ হারাইয়া নিরাকার বা নিরবয়ব "পরমাণু" উপাধি পাইবে। অতএব পরমাণুতে রূপের বা গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই মূর্ত্তির উপচয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পরমাণুকে সাবয়ব বা সাকার হইতে হইবে। আবার সাকার হইলেই, অনিত্যের আপত্তি আসিল। যেহেতু সাকার মাত্রেই অনিত্য। অনিত্য পরমাণু কদাচ নিজের নিত্যতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব পারমাণবিক নিত্যতা ও অংশ-বিভাগ-বিহীন (নিরবয়ব) পরমাণুর নিরবয়বতাভঙ্গের বিরোধ উপস্থিত হইল। বিরোধ স্থলে পরমাণুর স্থিতি অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে; প্রতীতিভঙ্গ দোষ অবশ্যম্ভাবী হয়।

অন্যপক্ষে গুণের তারতম্যতায় পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, ও বায়বীয় পরমাণু, স্থূল, সূক্ষ্ম, বৃহৎ, মহৎ, ইত্যাদি পদবাচ্য হয়। সাধারণতঃ জানাযায়, যাহা অধিক গুণযুক্ত তাহাই স্থূল বা বৃহৎ, যাহা অল্প গুণযুক্ত তাহাই সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র। এই নিয়মানুসারে পার্থিব পরমাণু স্থূল ও বৃহৎ হওয়ায়, ইহা পরমাণু পদবাচ্য হইবে না। যেহেতু পরমাণু বলিতে পরম+অণুকেই বুঝায়; ইহা বৃহৎ হইলে অণু হইবে কি প্রকারে? বৃহৎ সাকার হইলে নিত্য ও নিরবয়ব হইবে কি প্রকারে? যেমন গমন আর অবস্থিতি এক ব্যক্তিতে সম্ভবে না; তদ্রূপ অণু আর বৃহৎ একাধারে হইতে পারে না। অর্থাৎ যে পরম+অণু কিনা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, কণা মাত্র সে বৃহৎ+পরম+অণু কিনা প্রকাণ্ড অতি সূক্ষ্ম বা প্রকাণ্ড কণা মাত্র। ইহা ষড়ভুজ ত্রিকোণ, চতুর্মুখ পঞ্চানন, চতুষ্কোণ গোলক ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় স্ববিরোধী বাক্য মাত্র। আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি শব্দগুলি

ঔপচারিক বা কাল্পনিক বলিলে, কল্পনীয় বাক্য মিথ্যা হয়। অতএব পরমাণুর সূক্ষ্ম অংশটা নিত্য, আর স্থূল অংশটা অনিত্য এই বাক্যও মিথ্যা হইয়া পড়ে। গুণের তারতম্যতায় স্থূল, সূক্ষ্ম, বৃহৎ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা এবম্বিধ বিরোধে প্রতীতিভঙ্গের আশঙ্কায় গুণের তারতম্য অস্বীকার করা হইলে; সমস্ত পরমাণুতে গুণের একতা মানিতে হইবে, নাহয় পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু চারি জাতি পরমাণু প্রত্যেক জাতিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ চারিটী গুণ আছে স্বীকার করিতে হইবে। গুণের একতা স্বীকার করিলে, পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ চারিটী জলে রূপ, রস স্পর্শ তিনটী; তেজে রূপ ও স্পর্শ দুইটী, বায়ুতে স্পর্শ একটী ইত্যাদি বাক্যের প্রতীতি ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর প্রত্যেক জাতি পরমাণুতে চারিটী গুণ স্বীকার করিলে, জলে গন্ধ; তেজে রস ও গন্ধ; বায়ুতে রূপ, রস, গন্ধ গুণ প্রকাশিত হইবে, এবং সাধারণে তাহা উপলব্ধি করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষতঃ তাহা দেখা যায় না।

অতএব পরমাণুতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে (১) নিমিত্ত কারণের অভাবে পরমাণুতে আদ্যক্রিয়া অর্থাৎ স্পন্দনের অভাব, স্পন্দনাভাবে জগতের অনুৎপত্তি (২) সর্ব্বাত্মিক সংযোগে বিশ্ববিস্তার অসম্ভব; (৩) আংশিক সংযোগে অংশ কল্পনায় অংশ বিভাগ বিহীন পরমাণুর অবয়ব হানি; (৪) রূপাদি গুণের অভাবে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয় গুণহীন; (৫) রূপের অস্তিত্ব স্বীকারে রূপাদি বিশিষ্ট পরমাণু বলিলে নিরবয়বতা ও নিত্যতায় বিরোধ এবং রূপাদি আকার কল্পনায় পরমাণুর অনিত্যতা; (৬) গুণের তারতম্য দেখাইলে বৃহৎ, মহৎ, সূক্ষ্ম ইত্যাদিতে পরমাণুর নাম লোপ; (৭) তারতম্য অস্বীকারে গুণের একতা মানিলে পূর্ব্বাপর প্রতীতিভঙ্গ;—(৮) চারি জাতি পরমাণুর প্রত্যেক জাতিতে গুণ চতুষ্টয় স্বীকার করিলে স্বভাব ভঙ্গ;—(৯) অনুমান দ্বারা গুণ ক্রিয়ার অস্তিত্ব মানিলে, ইহা সৃষ্টির পরে, পূর্ব্বে নহে জানিয়া আশাভঙ্গ;—(১০) জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ কল্পনায় পূর্ব্বকথিত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থাপনে গোলযোগ; (১১) ওরে নিধিরাম দ্বারা প্রভেদ দেখাইলে দ্বৈতত্বাপত্তি (১২) শেষে পারমাণবিক নিত্যতায় এবম্বিধ বিরোধ মূলের লোপ; (১৩) কপিল, গৌতম কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের উদ্দেশ্য কি? শ্লোক ও সূত্রের সার ভাব কি? পৌনঃপুনিক আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া, বেদবিরোধী নূতন শাস্ত্র লইয়া ধর্ম্মপ্রচারক সাজিলে নবম হ্রাগের মত আশাভঙ্গ; (১৪) তবে উপায় কি?

পরমাণুকে সর্ব্বশক্তিমান করা, ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, জ্ঞানের তৃপ্তি ও সংশয়ের নিবৃত্তিতে অতুল আনন্দ ভোগ করতঃ জগত অতিক্রম করা; অর্থাৎ মনোবাণীর অতীত স্থলে মিলিত হওয়া—এরূপ হইলে সকল পক্ষের আপত্তি নিবারণ অবশ্যম্ভাবী হয়। অন্যথায় কেহ বলিবেন বেদ পৌরুষেয়, সুতরাং ভ্রমপূর্ণ; অতএব পরমাণুকে তন্ত্র শাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। অন্য কেহ বলিবেন তন্ত্রশাস্ত্রে নেশার আধিক্য, "বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্"; অতএব ন্যায় ও বৈশেষিক দৃষ্টিতে 'পরমাণুকে' দেখিতে হইবে। আকাশ

কেহ বলিবেন, ন্যায় ও বৈশেষিক শুষ্ক তর্ক মাত্র, মনঃকল্পিত তর্ক, স্বতঃপ্রমাণ নহে, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ", নৈষা তর্কেণ মতিরাপণেয়া, নির্ম্মল তর্কে তত্ত্বজ্ঞান লোপ করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব সাংখ্য দৃষ্টিতে পরমাণুকে দেখিতে হইবে। অপর কেহ বলিবেন, সাংখ্যে মূল প্রকৃতি যাহা অব্যক্ত কারণ, কার্য্য নহে, তিনি যাহার সহবাসে চৈতন্যময়ী, সেই চৈতন্য আখণ্ড পুরুষ, ভূমাবস্থায় ব্রহ্ম (মন্দ যুক্তি নহে) ইত্যাদিতে দু পঁচিটী ঈশ্বর; দু চারিটী অনাদি, কতকগুলি অব্যক্ত বীজ, ইহা সন্দিগ্ধ স্বরূপচারঃ। শূন্য হইতে অঙ্কের আকার (জগৎ) হয় না; ষোলটী খাঁটী, পঁচিশটী খাঁটীর বিশেষণে পূর্ণব্রহ্মের খণ্ড হয় না; পাটীগণিত, শুভঙ্করী, বীজগণিত সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না; শ্রুতি বাক্য রদ হয় না; দু একটী শ্রুতির উদাহরণ বহু শ্রুতির মিশ্রণে একার্থ ভিন্ন ষার্থে আসে না; কাজেই জীবে শয়োমাথিকয়ো বুথৈব কলহং যযুঃ অনুশোচাম এবাস্তান (ইত্যলম + অতি); অতএব পতঞ্জলী মতে পরমাণুকে দেখিতে হইবে। হয়ত আবার কেহ বলিবেন, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব লইয়াই এত গোলমাল, পতঞ্জলে আবার পঁচিশ ও ঈশ্বর ছাব্বিশ; পুরুষের অতিরিক্ত ঈশ্বরত্বের উপপত্তি প্রমাণ বিরুদ্ধ; অধিকন্তু উহা যোগশাস্ত্র, বৃথা শারীরিক পরিশ্রম মাত্র; বিচারস্য সম্ভবে যোগ ঈরিতঃ,—বিচারের জ্ঞান অসম্ভবে যোগের ব্যবস্থা; সার বস্তুর বিচার ছাড়িয়া যোগী হইলে "করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ" হাতের গ্রাস রাখিয়া হস্তলেহন সার হয়; অতএব বেদান্ত মতে পরমাণুকে দেখিতে হইবে। ইহাতেও অপর কেহ বলিবেন বেদান্ত এক ঘেয়ে বা এক ঢেকুরে, তালে তালে ঘা দিতে হইবে; দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইতি তস্মাদ্ জ্ঞানিনাং মতম্, যাঁরা দ্বৈত নাই বলেন তাঁরা অজ্ঞানী; অতএব পরমাণুকে মীমাংসায় আনিতে হইবে। ইহাতেও আবার অন্য কেহ বলিবেন মীমাংসায় ধর্ম্মাধর্ম্মকে আত্মা বলেন, বিধি বাক্য পালনই ধর্ম্ম, অপালনে অধর্ম্ম; কিন্তু দেশ কাল ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিপ্রতিপত্তি থাকায় অর্থাৎ এক দেশে যাহা ধর্ম্ম অন্য দেশে তাহা অধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হওয়ায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ প্রচলিত আছে; অনিশ্চিতত্ত্ব সংবেব দুর্লভমিতি সব্যভিচারত্বাৎ; ব্যাঘাতাপাতাৎ; সুতরাং "বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিধীয়তে অর্থাৎ জ্ঞানালোচনার অভাবে, সার বস্তুর ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, স্বরূপ উপলব্ধিতে আসে না; অতএব পরমাণুকে প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টিতে সুবিচারে আনিতে হইবে।

আবার ইহাতেও আজ কাল কেহ বলিবেন যে, মীমাংসা টীমাংসা সে কালের বুড়দের ভাবা বা বয়ান; বর্ত্তমান 'ডিসাইটে'(dicide) উহা অবজেকশনাবল (objectionable,) ! এইরূপ ক্রম পরম্পরায় কেহ রামায়ণ, মহাভারত ভাগবত, গীতা; কেহ উপপুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা; কেহ কাব্য, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ পানিনী; কেহ বৈষ্ণবী, জয়দেবী, দোঁহাবলী, পদাবলী, কেহ কর্ত্তাভজা, নেড়বাউল, রসিকভজন, পঞ্চনামী; কেহ দণ্ডী, গিরি, পুরী, ভারতী; কেহ ব্রহ্মচারী, স্বামীজী, পরমহংস, সন্ন্যাসী; কেহ গৌর, নিতাই, মহাপ্রভু, অবধৌত, শ্রীগৌরাঙ্গ, চৈতন্যচরিতামৃত; কেহ শৈব, গাণপত্য, রামাত রামানুজ, সঙ্করা-

চার্য্য, আইত, রসেশ্বর; কেহ কবীর নানক হরিদাস সাধু, দয়ানন্দ ভাস্করানন্দ; কেহ চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, রাধাস্বামী দয়াল; নেড়া হরিদাস, বাইবেল ও কোরাণ ইত্যাদি নানা জনের নানা সাস্ত্র ও নানামতে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে; প্রত্যেকে এইরূপ কহিয়া নিজ নিজ শাস্ত্র ও মতকে সত্য, অভ্রান্ত ও ঈশ্বর বাক্য ব্যাখ্যা করিবেন। আপনাপন পক্ষ সমর্থনার্থে শব্দার্থ লইয়া তর্ক বিতর্ক দ্বারা অন্যান্য শাস্ত্র কল্পিত, ভ্রম পূর্ণ; সুতরাং মিথ্যা প্রকাশ করতঃ পরস্পরের মধ্যে মত ভেদ ঘটাই কেন। আর ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে নানা স্থলে নানা জনের সংশয়, বেদে অভক্তি; বেদের ঐশ্বরিকতায় সন্দেহ সনাতন বেদের উপদেশে অবিশ্বাস জন্মিয়া জগতের অমঙ্গল, নিজেরা ভ্রষ্ট ও অন্যান্য সকলের সত্য ধর্ম্মচ্যুতির কারণ উপস্থিত হইবে। কেহই স্বার্থত্যাগে বিচার করিয়া দেখিবেন না যে, যদ্যপি সকল শাস্ত্রে ও সকল সম্প্রদায়ের মত ঈশ্বর বাক্য হইত তাহাহইলে কদাচ এবম্ভুত মতভেদ দেখা যাইত না। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের মত মানব নহেন যে, স্বার্থের আশায় এখানে এক কথা ওখানে আর এক কথা, সেখানে আর এক কথা ইত্যাদিতে বাক্যের ইতর বিশেষ বা কথার খেলাপ করিবেন। তিনি চঞ্চল চিত্ত লৌকায়তিক নহেন যে, 'আমাদের মত' বয়সের সহিত জ্ঞানের, আর জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নভেদ ঘটিবে। তিনি পূর্ণজ্ঞানময় তাঁহার জ্ঞান বা বাক্য বা ঈশ্বর বাক্য কদাচ দুই দুই নহে। অতএব সকল শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের মত যদ্যপি ঈশ্বর বক্য বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বলা হয়; তাহাহইলে সমস্তই এক হইবে, কদাচ দুই দুই হইয়া মতভেদ ঘটিবেনা। পরন্তু উপনিষদ মিথ্যা গীতা মিথ্যা, বেদ পৌরুষেয় এ শাস্ত্র-ভ্রম কল্পিত—ও শাস্ত্র বৃথা; এ মতে পুতুল পূজা ইত্যাদি কলরব হিন্দুধর্ম্মের নানা বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের মুখে শুনিতে হয় না। হিন্দু-ধর্ম্ম অধঃপতন দৃশ্যের শেষ যবনিকা হইতে মুক্তিলাভ করতঃ নব জীবন লাভ করে।

অন্যথায় মুখের কথায় নিজ নিজ সম্প্রদায়স্থ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে ঈশ্বর বাক্য বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রকাশ করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দায় মতভেদ ঘটাইলে, বিচারের দ্বারা সারভাব গ্রহণের স্থলে শুষ্ক তর্কে সংশয় জন্মাইলে, সেই শাস্ত্র ও তদীয় ধর্ম্ম কদাচ ঐশ্বরিক নহে; পরন্তু তাহা অনাপ্ত অজ্ঞানীর খামখেয়ালী বুঝিতে হইবে। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে তাহা "তৃণবৎ ত্যাজ্যম"। বেদ পুস্তক নহে—জ্ঞান। জ্ঞান কল্পিত, পৌরুষেয় বা মিথ্যা কদাচ হইতে পারে না। যেহেতু জ্ঞানময় ঈশ্বরও মিথ্যা হইয়া পড়েন; ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যে ঈশ্বর আনুকূল্যে নিষ্কাম ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহার অবস্থিতি কোথায়? উপায় নির্ণয়ে তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির অভেদে জ্ঞানের তৃপ্তি ও সংশয়ের নিবৃত্তি করিতে হইলে; "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে আর কোন লাভই তাহা অপেক্ষা অধিক বোধ হয় না, সেই বস্তু লাভ করিতে হইলে; পরমাত্মাকে "সর্ব্বশক্তিমান" করিতে হইবে। সম্ভব, অসম্ভব, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সকল বিষয়ে "সর্ব্বশক্তি-

মান" করিতে হইবে। নাম রূপ উভয় ছাড়িতে হইবে।

লোক মধ্যে প্রচলিত আছে যে, কোন এক বলীয়ান পুরুষ কোন রাজ্য অধিকার করিলে তাহাকে না সরাইয়া অর্থাৎ স্থানান্তরিত না করিয়া অন্য পুরুষের তথায় আধিপত্য সম্ভবে না। যেমন এই আকাশকে না সরাইলে অন্য কোন আকাশ এখানে স্থান পায় না, তদ্রূপ পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু চারিটী মূল পরমাণুর মধ্যে, পৃথিবীর পরমাণুকে (ভৌম পরমাণুকে) সর্ব্বশক্তিমান করা হইলে, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু অর্থাৎ জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণু তথায় সর্ব্বশক্তিমানের অধিকার পাইবে না। পরন্তু সর্ব্বশক্তিমান পৃথিবীর পরমাণু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া বিনশ্বর হইয়া পড়িবে। এইরূপ জলীয় পরমাণুকে সর্ব্বশক্তিমান করা হইলে, পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগুলি তদপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া বিনাশশীল হইবে। অগ্নি বা বায়ুর পরমাণুকে সর্ব্বশক্তিমান করিলেও অন্যান্য তিনটীর অবস্থা তথৈবচঃ হইবে। এরূপ অবস্থায় কে সর্ব্বশক্তিমান হইবে, আর কেই বা অনিত্য হইবে, নির্ণয় উপলক্ষে পরমাণু চতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিরোধ স্থলে অধিকার অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। মহর্ষিদের যোগশাস্ত্রের বিধান মতে প্রাণের সিদ্ধাসিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ "সিদ্ধাসিদ্ধিভ্যাং ব্যাঘাতাৎ।" সুতরাং পরমাণু বিরোধ নিষ্পত্তির প্রত্যাশা সুদূরপরাহত; সর্ব্বশক্তিমানত্ব কা কথা। অতএব পরমাণু সর্ব্বশক্তিমান হইল না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, নিমিত্ত কারণের অভাবে পরমাণুতে আদ্য-ক্রিয়া অর্থাৎ স্পন্দনের অভাব, স্পন্দনাভাবে দ্ব্যণুকাদিতে বিশ্ব বিস্তার অসম্ভব। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক আপত্তি নিবারণার্থে পরমাণুকে সর্ব্বশক্তিমান উপাধি প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হইলেও, বিচার কাহার মুখাপেক্ষী হয় না; মনগড়া কথা বলিলেও শুনে না। অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ বিচার অবশ্য প্রতিপাদ্য। তাই বলিয়া পরমাণু কদাচ "সর্ব্বশক্তিমান" হইতে পারে না। নিমিত্ত কারণের অভাবে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে না পারায়, পরমাণুগুলি পূর্ব্বে যেরূপ জড়াবস্থায় ছিল, বর্ত্তমানে আবার সেই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল।

"আকাশ" সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত মতে দ্রব্যত্ব নিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিত নহে বলিয়া বায়ুর সূক্ষ্মাংশ যেরূপ নিত্যবস্তু, আকাশও একটী দ্রব্য এবং দ্রব্যাশ্রিত নহে বলিয়া তদ্রূপ নিত্য পদার্থ। অতএব পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের সহিত আকাশ সমবায় সম্বন্ধে সমান বস্তু। সুতরাং 'আকাশ' সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না। যেহেতু উল্লিখিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে "ক্ষণভঙ্গের" আশ্রয়ে পরমাণুগুলির সংযোগ বা মিলনের চেষ্টা করিলে, আপত্তি আছে কিনা দেখিতে হইবে। তাহাদের মতে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুসকল একত্রিত হইয়া পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু প্রস্তুত করে (আকাশ তাহারা মানে না)। সেই পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়াদি শরীর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়াদি

শরীরোৎপন্নের পর, সেই ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া, যে আমি, তুমি, জ্ঞান হয়; তাহাই জ্ঞান পদ বাচ্য। ইহাকে আত্মাও বলা যায়। ইহা ভিন্ন পৃথক কোন জ্ঞানময় বস্তু বা আত্মার অস্তিত্ব নাই। ইহা দ্বারা আরও বুঝিতে হইবে যে, যাহা এইক্ষণে আছে, তাহা কোন কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়। যে নষ্ট হইল, অমনই তৎক্ষণাৎ আর একটী বস্তু উৎপন্ন হইল। আবার সেইটী নষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ আর একটী বস্তু দেখা দিল। এইরূপ প্রতিক্ষণেই "অহেতুক উৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশের দ্বারা" জগতের কার্য্য চলিতেছে? বস্তু সকল ক্ষণিক সত্বেও আমরা ভ্রম বশতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী মনে করি। ইহাই ক্ষণভঙ্গের সার মর্ম্ম। এই "মহাশূন্য" মর্ম্মের ফলেই ভঙ্গ মহাশয়, ঈশ্বর, আত্মা ও জ্ঞান (নিত্য বস্তুর) এবং আকাশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেন। আর বর্ত্তমান হিন্দু সন্তান, এইরূপ মহোপদেশের ফলেই পূর্ব্বাপর বিচার শূন্য হইয়া, হিতাহিত জ্ঞান দূরে নিক্ষেপ করতঃ ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া বসেন। সনাতন বেদে অভক্তি, ধর্ম্মকার্য্যে অমতি, দুরাচারে প্রবৃত্তি ইত্যাদিতে হিন্দু ধর্ম্মের কীর্ত্তি, যশঃ ও সম্মান চিরন্তরে লোপ করিতেছেন। একবার ভাবেন না যে, মহাদ্যুতি প্রভুর (ব্রহ্মার) তপস্যা সাধনে তাঁহার মুখ বাহু, উরু ও পদ হইতে যাহাদের জন্ম, স্বর্গবাসী দেবগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্য সর্ব্বদা ভোজন করিতেন, পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্ন যাঁহাদের মুখে গ্রহণ করিতেন, যাঁহারা পৃথিবীর একমাত্র সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান অর্থাৎ "উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী;" যাঁহারা ধর্ম্ম সমূহকে রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মার্থে উৎপন্ন হইয়া, সর্ব্ব জীবের লৌকিক জ্ঞান, বৈদিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপদেশ দিবার জন্য এক প্রকার ঈশ্বরত্বে ব্রতী হইতেন; সেই বৈদিক প্রধান সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পূজক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী অন্যান্য হিন্দুগণের বংশ পরম্পরাক্রম হইতে আমরা আসিয়াছি। আমরা পরের কথা শুনিয়া নিজেদের ধর্ম্ম হারাইব কেন? নানাবেশধারী অনাত্ম-জ্ঞানীর উপদেশে আত্মহারা হইব কেন? কালী, কলম, কাগজ থাকিলেই লেখক, উপাধি থাকিলেই ধর্ম্ম প্রচারক, সীসের অক্ষর থাকিলেই ছাপা কাগজ; সুতরাং বিচার দ্বারা সারভাব গ্রহণ স্থলে, যে যাহা বলিবে শুনিব কেন? আমাদের বেদবেদান্ত, গীতা ভাগবত, দর্শন পুরাণ, শ্রুতি স্মৃতি, তন্ত্র সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র আছে। শাস্ত্রের সারভাব লইয়া আমরা বলিব যে;—

ক্ষণিকতা প্রযুক্ত "ক্ষণভঙ্গের" পরমাণু-গুলি মিলিত হইতে পারে না। সমস্ত ক্ষণিক বিধায়ে একটীর সহিত অন্য পরমাণুর সংযোগের অভিযোগে দুইটী নষ্ট হইয়া যায়। অত-এব যতই পরমাণু একত্রিও হউক না,—ক্ষণে ক্ষণে রাশি রাশি উৎপত্তি হউক না,—মিলনের অভিযোগে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে; কদাচ মিলিত হইবে না। মিলন বা সংযোগের অভাবে জগতের অভ্যুৎপত্তি আবার প্রথম ক্ষণের বস্তু নষ্ট হইলেই, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়

ক্ষণের বস্তু জন্মে। এই দ্বিতীয় ক্ষণজ বস্তুর কারণ প্রথম ক্ষণ হইতে পারে না। যেহেতু ক্ষণিকতা নিবন্ধন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তু বিনা কারণে জন্মিতেছে, স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় প্রথম ক্ষণ কারণ হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণের অপেক্ষা করিলে, এই "ক্ষণ" উপাধিটী বিলম্বিত হয়; অর্থাৎ প্রথম ক্ষণ হইতে দ্বিতীয় ক্ষণ, এই হইতে সম্পর্ক দ্বারা প্রথম ক্ষণটী দুই ক্ষণ স্থায়ী হইয়া পড়ে; কাজেই "ক্ষণ" উপাধিটী লম্বা হইয়া "ক্ষণভঙ্গ" উপাধিটী পরিত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু ক্ষণভঙ্গে কাল বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকারের নিয়ম নাই। যাহা ক্ষণিক মাত্র তাহাই তাহার ক্ষণ। অতএব সেই ক্ষণ "দুই ক্ষণ" পর্য্যন্ত থাকিলে ক্ষণভঙ্গ হইবে কেন? সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তু উৎপত্তির কোন কারণ না থাকায় অহেতুক উৎপত্তি স্বীকারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লোপ পায়; ক্ষণিক পরমাণু দ্বারা বিশ্ব বিস্তার অসম্ভব হয়।

পক্ষান্তরে উল্লিখিত মত স্বীকার করিলে লেখাপড়া, বাক্যকথন, হিসাবনিকাশ ও মামলামোকদ্দমা ইত্যাদি ব্যবহারিক কার্য্য উপপন্ন হইতে পারে না। গল্প ও উদাহরণ দ্বারা ইহার ভাব সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহা সহজে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবে না। আবার কতকগুলি বর্ণ প্রয়োগ করিলে, তাহাও অর্থ সমুদ্ভাবক হইবে না। অতএব মীমাংসা হইল পাড়াগ্রামের ভাষা (যাহার অধিক আমরা জানি না) ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। মনে করুন, আমি গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে 'হয়ত' বড় সাধ করিয়া এই প্রবন্ধটী "আর্য্য-দর্পণে" লিখিতেছি। ইহাতে দুইটী উদ্দেশ্য নিহিত আছে। প্রথম বেদাদি সকল শাস্ত্রের ও সকল মতের যতদূর সম্ভব (আমার জ্ঞানের গণ্ডীতে) পাড়াগ্রামের ভাষায় আলোচনা করা, দ্বিতীয়তঃ আমরা হিন্দু, ধর্ম্মালোচনা আমাদের জীবনেরব্রত-স্বরূপ, হৃদয়ের রক্ত-স্বরূপ এবং কর্ত্তব্য রূপ অঙ্গের মেরুদণ্ড-স্বরূপ; সে পক্ষেও কর্ত্তব্যের নিকট অঋণী হওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য নিষ্পত্তিকল্পে, প্রবন্ধ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অনুধাবন-শক্তি আমার থাকা উচিত। কিন্তু ক্ষণিকতা নিবন্ধন প্রথমে যে চিন্তার উদয় হইল, দ্বিতীয় ক্ষণে বা দ্বিতীয় চিন্তায় অর্থাৎ লিখিবার সময়, সে চিন্তা থাকিতে পারে না। যদিও উক্তমতে তৎক্ষণাৎ "তৎসদৃশ" নূতন চিন্তা দেখা দিল, তথাপি তাহা নূতন লইয়া পূর্ব্বক্ষণের চিন্তা বা জ্ঞান নষ্ট করিল; সুতরাং প্রবন্ধের আদিতে (জ্যৈষ্ঠ-মাসে) যাহা লিখিয়াছি অর্থাৎ "এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সারবস্তুর অপরিজ্ঞান বশতঃ ইত্যাদি এখানে লিখিতে হইবে মনে করিতে হইল (নূতন জ্ঞান কি না;)। এইরূপ মনে করিয়া যখন কাগজ কলমে আবার লিখিতে বসিব, তখন তাহাও আর মনে থাকিতে পারে না। কাজেই "তৎসদৃশ" নূতন জ্ঞান লইয়া আবার সেই গোড়ার কথা "এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের" ইত্যাদি লিখিতে হইবে মনে করিতে হইল। এইরূপ অনন্তকাল কাগজ কলম লইয়া চিন্তা করি আর অনন্ত কাল ধরিয়া সেই গোড়ার কথা,— "নূতন জ্ঞান কিম্বা পরিদৃশ্যমান বিশ্ব" ইত্যাদি ব্যতীত আর কোন কথা বাহির হইতে পারে না। যেহেতু ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ ও

ক্ষণে ক্ষণে নূতন উৎপত্তি। কি যে লিখিব, কোথায় যে শেষ, তাহার ঠিক নাই। অথচ পূর্ব্ব কথিত বাক্যের সহিত একতা ভঙ্গ হইলে অসংবদ্ধ প্রলাপেন পাগলবং কিং নোপপন্নতে? অর্থাৎ অসংলগ্ন বাক্য দ্বারা যেই পাগল সেই পাগলের উপাধি অবশ্য-ভাবী। অতএব মীমাংসা হইল, লেখার কর্ম্মটা আর কাহার চলিবে না। পড়া বিষয়েও তদ্রূপ, কেননা পাঠকগণ যেমন আগের ছত্র বা অক্ষর পড়িবেন, তৎক্ষণাৎ পশ্চাতের ছত্র বা অক্ষরের জ্ঞান অথবা তদ্বো-ধক শব্দ আর মনে থাকিতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণেই নূতন, সুতরাং এক ছত্র পড়িতে বা তাহার ভাবটা মনে রাখিতে অনন্ত জীবন কাটিবে। অতএব পড়া, আর "জল পড়া" সমান কথা। তথাপি তাহা দ্বারা ধৈর্য্য-চ্যুতির আশঙ্কা নাই। যেহেতু একটা বিষয় দীর্ঘ দিবস ধরিয়া পড়িলে ধৈর্য্য-চ্যুতি অবশ্য ভাবী হয়। কিন্তু ক্ষণিকতা নিবন্ধন ক্ষণে ক্ষণে অক্ষর নূতন হইবে, ছত্র নূতন হইবে। অতএব প্রাচীন রীতি অনুসারে যাহা "দীর্ঘ" হয়; এখানে সেই 'দীর্ঘ' জ্ঞান থাকিতে পারে না। কেননা ক্ষণের বৈপরীত্য হইলেই বৈজাত্য সম্বন্ধে ক্ষণভঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যতীর্থ, ভট্টা তীর্থ, বি—এ, এম—এ, এ সকল পরীক্ষা উল্লিখিত ইস্তাহারে আর কাহাকেও দিতে হইবে না। যেহেতু বিজ্ঞ পরীক্ষকগণ, যে যে লেখায় ভুলিবেন কেন? সার কথায় প্রশ্নের উত্তর না লিখিলে, বা প্রশ্নের ভাব হৃদয়ঙ্গম না করিলে কেহই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না, সেখানে আর ঈশ্বর বিরোধী বাক্য টিকিবে না।

"বাক্যকথন বিষয়েও" তদ্রূপ, যদ্যপি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়ের নিবাস কোথায়? আমার আর উত্তর দেওয়া চলিবে না। যেহেতু প্রশ্ন-শ্রবণজনিত জ্ঞান, দ্বিতীয় ক্ষণে অর্থাৎ উত্তর দিবার সময় নষ্ট হইবে, কাজেই প্রশ্নকর্ত্তার বাক্য "শূন্যেন বিলীয়তে"। আবার কোন উপায় অবলম্বনে যদ্যপি প্রশ্নকর্ত্তার কথায় উত্তর দেওয়া হয় যে, আমার নিবাস সন্তোষপুর, মহকুমা আরামবাগ, জেলা হুগলী; তিনি তাহা আর বুঝিতে পারিবেন না। কেননা ক্ষণিকতায় প্রতিক্ষণেই পূর্ব্ব জ্ঞান নষ্ট হইয়া নূতন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে; সুতরাং তিনি যে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে বিষয় তাঁহার মনেই থাকিতে পারে না। আবার সময় একটু বাড়াইয়া জ্ঞানটীকে ধরিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষণত্ব ধ্বংস হইবে; ক্ষণভঙ্গ দূরে পলাইবে। অতএব মীমাংসা হইল পরস্পর বাক্যকথন আর কদাচ কেহ করিবেন না। (ক্রমশঃ।)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—:0:—

শুদ্ধাভক্তি।

(১)

লভিয়া জনম, পর্ব্বত শিখরে,
ধায় তরঙ্গিনী সাগর পানে,
কানন কান্তার, উপত্যকা আর,
ভাসাইয়া ছুটে আপনে মনে।

(২)

বাধা বিঘ্ন আদি, যা' পড়ে সমুখে,
কিছু নাহি মানে সদাই ধায়,
আমার আমিত্ব সাগরে মিশায়ে
শান্তি সুখে সে ত আত্মসমর্পয়।

(৩)

তেমতি যে ভক্তি, শত বাধা হেলি,
ধাইছে সতত শ্রীহরির পানে,
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কিছু নাহি ডরি
মিশে যায় শেষে তাঁহারি চরণে।

(৪)

শুদ্ধাভক্তি সবে তাহাকেই বলে
গোপিকার প্রাণে যাহার উদয়,
সেই ভাগ্যবান পায় হেন ধনে,
যাহারে সদয় হরি দয়াময় ॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

———:0:———

আহ্বান।

এস এস জগতের এস কোটি কোটি প্রাণ।
মহান কর্ত্তব্যে মোরা দেই আত্ম বলিদান ॥
দূর কর দলাদলি, হিংসা দ্বেষ যাও ভূলে।
(জাননা কি,) একই মায়ের সন্তান আমরা সকলে ?
তাঁহার সাধের সৃষ্টি আমরা মানব সবে।
কর্ত্তব্য সাধিতে কেন রহিব নীরবে এবে ?
মহাশক্তি মা মোদের আমরা সন্তান সবে।
দুর্ব্বলের মত কেন নতশিরে থাকি ভবে ?
সেবাধর্ম্ম মহাব্রত করিবারে উদ্‌যাপন।
ছুটে এস জগতের যত নরনারিগণ ॥
ধৈর্য্যেতে অচল সম, ক্ষমায় পৃথিবী তুল।
বিনয়েতে পরাজিত হবে যত তৃণদল ॥
বজ্রাদপি দৃঢ় হব কর্ত্তব্যে অটল প্রাণ।
করুণায় সুকোমল, হব কুসুম সমান ॥
সাধিব কর্ত্তব্য মোরা ত্যজি মান অভিমান।
সকল কার্য্যেতে লক্ষ্য রবে সেই ভগবান।

কুমারী শৈলবালা।

———:0:———

ধ্যান-যোগ।

যোগের আবশ্যকতা।

যোগের নাম শুনিলেই এই বিংশ শতাব্দির শিক্ষাভিমানী বুধগণ ও তাঁহাদিগের অনুসরণকারিগণের মাথা ঘুরিয়া যায়। তাঁহারা যোগের নামে চমকিয়া উঠেন, মনে করেন

যোগ সাধনায় বৃথা সময় নষ্ট হয়। দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। সাধনায় সিদ্ধি ও শক্তিলাভ ত দূরের কথা, অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের পক্ষে সাধনপ্রয়াস ঘোর বিঘ্ন-জনক ও বিপদসঙ্কুল। অতএব যোগসাধনার কোন আবশ্যকতা নাই; এমনি আহারে বিহারে, দুঃখে সুখে, আশায় নিরাশায় জীবনের দিন কয়েকটা চলিয়া যাউক। ইচ্ছা করিয়া আবার কে কবে বিপদ ডাকিয়া আনে? যদি কাহারও সন্তানের প্রাণে জন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যের বলে, যোগ সাধনার একটু বাসনা জাগিয়া উঠে, অমনি তদ্দর্শনে তাহার পিতা-মাতা সন্তানের অকাল মৃত্যুভয়ে বা এত আদরের সন্তান সংসারের কোন কার্য্যের উপযোগী হইল না ভাবিয়া একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এইরূপ ব্যাকুলতার মূলে অবশ্যই কোন না কোন কারণ বর্ত্তমান আছে, তাহা না থাকিলে সাধারণের "ভূতের ভয়ের" মত একটা যোগভীতি দেখা যাইত না।

যোগ কোনরূপ অদ্ভুত পদার্থ নহে। ইহা মানবের স্বভাবগত নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যপ্রণালীর প্রয়োচক ভাব বিশেষ। এই ভাবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বহিঃপ্রকৃতির আক্রমন হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য যোগের আবশ্যক*। যোগাভ্যাসে চিন্তা-শক্তি (স্থূল দেহ নিয়মিত হওয়া ব্যতীত) নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রভূত বলশালিনী হয় ও অতীব গভীর ও গবেষণাপূর্ণ বিষয় আলোচনা দ্বারা অতি সহজে মিমাংসা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই শক্তি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধন-বলে কেহ কেহ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সহজাত যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জগতে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই যোগের ফল, রেলগাড়ী, ষ্টিমার, টেলিগ্রাফ, ফনোগ্রাফ্। এই যোগের ফল,—গণিত, জ্যোতিষ ও রসায়ণশাস্ত্র। এই যোগের ফল,—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণও তন্ত্র। এই যোগের ফল,—বিশ্বের স্বনামধন্য অমর ঋষিগণ। আর আকাশ আদি পঞ্চভূত—যাহার যোগের ফল মানবের এই ভোগায়তন দেহ এই মহাযোগ বিশ্ব সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার প্রয়োচক কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান। তাই তাঁহার নাম যোগেশ্বর।

যোগহীন অবস্থায় আমরা একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। এই যোগাবস্থা যাহার যত অধিক, স্বভাবিক বা স্বভাবানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত, তাহার প্রতিষ্ঠা জগতে তত বেশী। যোগের অভাবে সংসারে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা অর্জ্জুনের নিকট যোগতত্ত্বের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া, তাঁহাকে যোগী হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যথা:—

তপস্বিভ্যোধিক যোগী
জ্ঞানিভ্যোপিমতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥
গীতা ৬।৪৬

ভগবান বলিয়াছেন, আমার মতে যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অত-

* এতদ্ব্যতীত যোগাভ্যাসে চিত্তস্থির হয় ও অন্যান্য বহু শক্তি লাভ হয়। তাহা ক্রমে বর্ণিত হইবে। দেহ সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই সাধন হয় না, তাই দেহকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। ইহাতেই কর্ম্মজীবনে যোগের কতদূর আবশ্যকতা আছে, সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে রুদ্ধ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদনই মানবের পুরুষার্থ। জগতে অনিয়ন্ত্রিত বা উশৃঙ্খলের স্থান নাই। অনিয়মে আহার বিহার যাহাই করা যায়, তাহাতেই স্বাস্থ্যহানি হয় ও চিত্তের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয়; কিন্তু সুনিয়মে যাহা আচরণ করা যায় তাহাতেই দেহে বল ও চিত্তে আনন্দ আনয়ন করে। এই ভবসংসারে, দুইদিনের জন্ম ক্রীড়া করিতে আসিয়া সুস্থ ও সবল দেহ, বিমলানন্দে পূর্ণ মন, সুতীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি লাভ ও পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রেমধারায় অভিষিঞ্চিত হওয়া ব্যতীত মানবজীবনে আমাদের আর কি প্রার্থনার বা আকাঙ্ক্ষার বিষয় থাকিতে পারে? অতএব যোগের নাম নাম শুনিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া না উঠিয়া ইহার তত্ত্বটী একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন,—ইহাতে কত আনন্দ, কত সুখ কত প্রাণ ভরা তৃপ্তি। এই যোগের সাধনায় সংসার হইতে নিরানন্দ চলিয়া যাইবে, রোগ শোক আদি দূরে পলায়ন করিবে, সুখ, দুঃখময় সংসারে সেই পরমানন্দময়ের প্রেমপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইবে। যোগবলে চরম তত্ত্বের পরম জ্ঞান লাভ হইবে। মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

কর্ম্মজীবনে যোগ।

আমাদের চিত্তের বৃত্তিগুলির উত্তেজনায় মন আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জগতে অগণ্য বিষয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। মনের শক্তি মূলতঃ অনন্ত হইতে উদ্ভূত—তাই অনন্ত; কিন্তু বহু ভাগে বহু বস্তুতে সংযোগ থাকায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যরশ্মি শরীরে মৃদু উত্তাপ বর্ষণ করে; কিন্তু Magnifying Glass সহযোগে কেন্দ্রী-ভূত করিলে অগ্নি-উৎপাদন করে। আমাদের মনোবৃত্তিগুলিও তদ্রূপ যোগ সাধনরূপ Magnifying Glass দ্বারা কেন্দ্রিভূত করিলে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হয়।

একাগ্রমন দ্বারা জগতে সর্ব্ববিধ মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। সামান্য পাঠশালার বালক হইতে বৈজ্ঞানিক বা রসায়ন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অথবা ত্রিকালজ্ঞ দেবতুল্য ঋষি—সকলকেই মনের একাগ্রতা—চিত্তের ইতস্ততঃ ধাবমান বৃত্তিগুলিকে এক কেন্দ্রে স্থির করিবার প্রয়াসী দেখিতে পাওয়া যায়। মনোবৃত্তি স্থির না হইলে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না। এমন কি রাস্তায় যদি অন্যমনস্ক হইয়া চলা যায়, তবে ভূমিতে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। বিদ্যালয়ের যে বালক যত মনোযোগী—অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থিরভাবে যত অধিক সময় মনঃসংযোগ করিতে পারে, সে তত মেধাবী বলিয়া পরিচিত, শিক্ষায় সে তত অধিক উন্নত, বিদ্যালয়ে সে তত ভাল ছেলে বলিয়া সুখ্যাত। প্রত্যেক বালকেই অবশ্য সমান গুণসম্পন্ন বা স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে না; কিন্তু একইরূপ শক্তি প্রত্যেকের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে; কেবল বিকাশের তারতম্য। যোগবলে সকলেরই এই অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

জীবনে উন্নতি করিতে হইলে,—জগতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে (যাহা বাল্যকাল হইতে সকলেই আশা করিয়া থাকেন) যোগবল দ্বারা, মূলতঃ যে সকল বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা প্রাণপণে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে বালক দশ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে অক্ষম হয়, সাত বার এক শ্রেণীতেই পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হয়, পরীক্ষাকে ভয়াবহ অকূল প্রান্তরবৎ দর্শন করে, জীবনসমস্যাকে ঘোর বিপদ-সঙ্কুল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ মনে করে,—সেও এই যোগ অভ্যাস দ্বারা সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার শক্তি লাভ করিতে পারে, সংসারে প্রকৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিও সহজেই বুঝিয়া লইতে পারে, আর এই সুখ দুঃখময় সংসারে জীবনকে দুর্ব্বিসহ মনে না করিয়া নিজকে অনন্ত উন্নতি পথের পথিক বলিয়া জানিতে পারে। তখন সে কোন কার্য্যে বিফলমনোরথ হয় না। তাহার প্রত্যেক উদ্যম, প্রত্যেক কার্য্য জগত-হিতকারী সুফল প্রসব করে।

আমাদের জীবনের প্রথম ভাগটী অর্থাৎ শিক্ষার সময় যে ভাবে অতিবাহিত করা যায়, এবং জীবনের অভ্যাসগুলি যে ভাবে গঠিত করা যায়, পরবর্ত্তী সমস্ত জীবন প্রায় একরূপ সেইভাবেই কাটিয়া যায়। জীবনের প্রারম্ভে যে ভাবে মানসিক ও দৈহিক গঠন হয়, তাহা আশ্রয় করিয়াই আমাদের শেষ জীবন সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সময়ে (বাল্যে) সংসারের কোনরূপ চিন্তা থাকে না—স্ত্রীপুত্র কন্যার "হা অন্ন, "হা অন্ন" হাহাকার থাকে না;—বিষয় বাসনায় মন মুগ্ধ থাকে না,—কাম কামনায় চিত্ত কলুষিত থাকে না। শুদ্ধ পবিত্র চিত্ত, বিষয়-বিষ-অস্পৃশ্য থাকিয়া সদানন্দে মত্ত থাকে। কাজেই এই সময়ই মানব জীবনের ভিত্তিভূমি। এই সময়ে সময় থাকিতে জীবন সৎপথে সরল ভাবে পরিচালিত করিতে শিক্ষা না করিলে, পরে, সময় চলিয়া গেলে, অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিগুলিকে আর স্ববশে আনয়ন করা যায় না; বরং ক্রমে তাহাদেরই বশীভূত হইয়া পড়িতে হয়। যদিও চিদানন্দময় মুক্তাবস্থাই আমাদের স্বাভাবিক, কিন্তু অভ্যাসের বলে,—সংস্কারের গুণে ধন-দৌলত-বিষয়-বিত্তবকে 'আমার', 'আমার' করিয়া, আমি দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি চিন্তা দ্বারা ক্রমে আমাদের বদ্ধাবস্থা আসিয়া পড়ে। তাই Smles সাহেব বলিয়াছেন,—Habit is the second Nature,—"অভ্যাসই স্বভাবকে গঠন করিয়া থাকে"। অতএব সময় থাকিতে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। দিন চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আইসে না। সুবিধা, সুযোগ ও সদিচ্ছা জীবনে একাধিকবার উপস্থিত হয় না। জীবনের একটী মুহূর্ত্তও যেন বিফলে অতিবাহিত না হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন ভাব আমাদের চিত্তে স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং আমাদিগকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিয়া থাকে। আমরা বা আমাদের কার্য্যসমষ্টি ভাবের বিকাশ মাত্র। আমরা ভাব দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকি। সদ্ভাবে, সচ্চিন্তা ও সৎ কার্য্য করিয়া সময় মত মনকে স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথায় অসময়ে

শত চেষ্টা করিলেও আর সে সুবর্ণ সুযোগ বা অমূল্য সময় ফিরিয়া আসিবে না; অনন্ত যন্ত্রনায় হাহাকার করিয়া দিন কাটাইতে হইবে ।

বৃক্ষ যখন কোমল থাকে তখন তাহাকে ইচ্ছা মত সোজা কি বাঁকা যে কোন ভাবে রাখিয়া দিলে সে ঠিক সেইভাবেই বাড়িয়া উঠে । আমাদের মানবজীবনও ঠিক তদ্রূপ । বাল্যে যে ভাবে চিত্ত গঠিত হয়, চিরজীবন সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই চলিতে হয় । কাজেই মন কোমল থাকিতে, চিত্ত সরস থাকিতে যোগ সাধন দ্বারা নিজের,—নিজ পরিবারের, দেশের,-দশের হিত সাধনোপযোগী করিয়া জীবন গঠন করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব । ব্যাধিমন্দির দেহখানি লইয়া,—ক্রিয়াহীন মস্তিষ্ক লইয়া, পরপিণ্ডোপজীবির জীবনযাপন মনুষ্যত্ব নয়, উহা পশুত্বেরই অবস্থান্তর মাত্র । অতএব, সময় থাকিতে সাবধান হও । মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিশান তোমাদের পথপ্রদর্শক হইবে । জগতে মানুষ নামে অভিহিত হইতে পারিবে । ভারতবর্ষ চিরদিন জগতের ধর্ম্মগুরুরূপে অবস্থান করিয়াছে ও করিবে । তোমরা জগন্মাতার আদরের সন্তান । নিজের সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কর, মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর । যোগী হও; যোগী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর । আদর্শ গৃহী হইবে । তোমাদিগকে দেখিয়া দশ জনে শিক্ষা করিবে । ব্যভিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন দূরে পলায়ন করিবে । শান্তিময় রামরাজ্য কথার কথা না হইয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে ।

দীন—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত ।

:0:

ভক্ত-কথামৃত ।

[সাধনসিদ্ধ প্রেম-পাগল মহা-পুরুষের উক্তি সংগ্রহ ।]

(১)

"দুহুঁক মিলনে মধত পাঁচ বাণ"—ইহা কোন গুপ্ত কথা নহে; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়, ইহাই পাঁচ বাণ; ইহাদের স্বাভাবিকী গতি বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া গুরুমূর্ত্তিতে স্থির রাখাই "মিলন" ।

(২)

নিত্য ধামে, নিত্য দেহ, নিত্য লীলা: বিরহ নাই; কিন্তু এই জড়, নশ্বর দেহ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ বিরহ যাতনা অনুভব করিতে হইবে; বাহিরে বিরহ যন্ত্রণা যত বর্দ্ধিত হইবে, অন্তরে তত আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ইহাই রাসলীলা ; বিরহ অনুমান হইলেই অন্তরে নিত্য মিলন হয় । মায়ামুগ্ধ জীবের দেহেন্দ্রিয়সুখে কৃষ্ণস্মৃতি ভ্রংশ হয়, এ সুখ-ঘুচিলেই বিরহ স্মরণ হয় এবং নিত্যধাম ও নিত্যদেহ প্রাপ্তি হয় । জড় দেহ, সুখ ভোগের বস্তু নহে; ত্রিতাপ ভোগের জন্য; বিরহ ক্রন্দন ব্যতীত নিত্য সুখ অনুমান হয় না ।

(৩)

ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের নিত্য সংযোগ; গৌণ ও মুখ্য দুই প্রকার ধর্ম্ম; গৌণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-মুলক; মুখ্য ধর্ম্ম-নিবৃত্তি মুলক; নিবৃত্তি মার্গীয় নিষ্কামদিগকে, প্রবৃত্তিমার্গীয়গণের ভিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৪)

প্রত্যেক জীব, মনুষ্য মাত্রেরই এক আত্মা, সকলের সহ সকলের সম্বন্ধ আছে; দরিদ্র বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা বা লজ্জা করিলে প্রেম হয় না; প্রেম—কাঙ্গালের ধন; কাঙ্গালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইলে অগ্রে ভিক্ষার প্রয়োজন।

(৫)

প্রেমরাজ্য সকাম পুরুষের অগোচর, নিষ্কাম হইলে তাবের গোচর হয়।

(৬)

বর্ত্তমান মনুষ্য ভিন্ন প্রেম প্রচারের উপায় বেদে নাই। প্রেম-অচিন্ত্য ভেদাভেদ, তর্কের অগোচর; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পঞ্চম বেদ—নিগমতন্ত্র, জীব রাজ্যের অগোচর, শিব রাজ্যের গোচরে আছে।

(৭)

গৌরহরি নির্গুণ, জগতের প্রতি করুণা জন্য সগুণ আবির্ভাব; আবির্ভাব তিরোভাব নাম মাত্র; তিনি, নিত্য, নির্গুণ।

(৮)

কৃষ্ণ-বিরহ, দুঃখ নহে, পরমানন্দ ভোগের আভাস, উহা ও নির্গুণ, সদা আনন্দ ভোগ—

"দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥"

মূর্খলোকে, মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার ভাবকে দুঃখ বোধ করিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক উহা পরমানন্দ ভোগ,—রাসলীলার অবস্থা। অতীন্দ্রিয় আনন্দ ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখ জ্ঞান থাকিতে অনুভব হয় না।

(৯)

সগুণ, নির্গুণ হইতে পারেন না, কিন্তু নির্গুণ সগুণ হইতে পারেন। সগুণ দেহ, নির্গুণ আত্মা। আত্মায় রমণকারী সগুণ দেহ সত্ত্বেও জগৎ হইতে পৃথক, সগুণ নির্গুণের দাস; দাস-প্রভু সম্বন্ধ জন্য—সেবার জন্য পৃথক্।

(১০)

প্রেম নিরুপাধি; জ্ঞান উহার অন্তরায়। ঐশ্বর্য্য দেখিলে ভক্তি হয় না। ভক্তি ভিন্ন কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। অজ্ঞান দুর্ব্বল পণ্ডিতেরই শীঘ্র প্রেম হয়। ব্রজ-গোপিগণ অবলা, স্ত্রীলোক, বেদ বা অন্য শাস্ত্রপাঠ করেন নাই, প্রীতি দ্বারাই তাঁহাদের প্রেম হইয়াছিল। গাভী, মৃগ, বৃক্ষ, পক্ষীরও প্রেম ছিল।

(১১)

তন্ত্র বেদের অব্যক্ত, পঞ্চম বেদ, উহা নিগম শাস্ত্র, অতি গোপনীয়, সত্য যুগের ধর্ম্ম, শিবলোকে প্রকাশ, সাধুসঙ্গ ভিন্ন জানা যায় না; বেদ গুহ্য—নিবৃত্তিমার্গ পরা ধর্ম্ম॥ প্রবৃত্তিমার্গ আগম শাস্ত্র, উহাতে আসা যাওয়া আছে, ইহা পৃথিবীতে

ব্যক্ত। নিগম, তদ্বিপরীত। মূর্খগণ, প্রকৃত তান্ত্রিককে উপেক্ষা করিয়াই ভারতের দুর্গতি আনিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি সমুদায় বৈষ্ণবশাস্ত্র পঞ্চম বেদ—তন্ত্র,—নিবৃত্তিমার্গমূলক। জয়-দেব গোস্বামীকে উপেক্ষা করায় সেনবংশ ধ্বংস এবং রামপ্রসাদ সেনকে অবজ্ঞা করায় মুসলমান রাজ্য নষ্ট হইয়াছে।

(১২)

মাধুর্য্যভাবে ঐশ্বর্য্য গোপন করিতে হয়; ঐশ্বর্য্য দেখিলে ভয়ে প্রেম সংকোচ হয়। হৃদয়ে মনে মেল হয় না—ভালবাসা আসে না। যেমন,—একজন ইংরাজ পুরুষে আর বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে বিবাহ হইলে প্রেম বা ভালবাসা হয় না, ভয়ে স্ত্রীলোকটী মরিয়া যায়।

(১৩)

এই কলিকালে ঐশ্বর্য্য সেবার কোনই জাতির অধিকার নাই; আবার স্ত্রী, শূদ্র, পতিত ব্রাহ্মণ বেদ-অধিকার শূন্য; জীবি-কার্থে বেদপাঠ করায় বেদে অপরাধ, তদুপরি নামাপরাধ হইতেছে; এতদ্ব্যতীত সেবাপরাধও ঘটিতেছে, ত্রিতাপে ঘেরিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি?

নিরপরাধ হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম গ্রহণ; ইহাতে রুচি না হইলে অগ্রে জাতীয় অহঙ্কার ত্যাগ ব্যতীত ভারতবাসীর নিস্তারের উপায় নাই। অদ্বৈত জাতিভেদ জ্ঞান ত্যাগ,—পরে অপরাধবর্জ্জন, তৎপরে নামা-ভাস; বাহ্য জগৎ এই পর্য্যন্ত শান্ত করিবে। সিদ্ধের কথা জীবের আলোচনা করিবার অধিকার নাই; রসশাস্ত্রের অবাধ আলোচনায় উপধর্ম্মের সৃষ্টি, অপরাধ বৃদ্ধি, জীবের দুর্গতি হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমান যুগে, বাহ্য জগতে নিরপরাধ নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত নিস্তারের দ্বিতীয় উপায় নাই,—নাই, নাই। অন্তরঙ্গসহ রস আস্বাদন হইবে, উহা অতি গোপ্য-ভাব, সাধু-সঙ্গ লভ্য। (ক্রমশঃ)

দান—শ্রীরসিকলাল দে

সোনামুখী, গরীব-ভাণ্ডার।

অনুভূতি।

থেকে থেকে আজকে কেন
পড়্‌ছে শুধু তোমায় মনে?
মনে হচ্ছে তুমি যেন
চেয়ে আছ আমার পানে।
কত কথা ক'চ্ছ তুমি
ফোটে না সে আমার কাণে;
তুমি যেন মুচ্‌কে হাস্‌ছ
দাঁড়িয়ে আমার হৃদয়কোণে।

সোহাগভরে ডাক্‌ছ আমায়
মিশ্‌তে গিয়ে তোমার সনে,
ছুট্‌তে চাই পার্‌ছি না গো
কে যেন আমায় রাখছে টেনে।
তুমি আমার কাছে আছ,
বুঝ্‌ছি আমি প্রাণে প্রাণে,
হাত বাড়ালে ধর্‌তে নারি
ঠেক্‌ছে কিবা মাঝখানে।

কি যেন এক মধুর গীতি
গাচ্ছ তুমি মধুর তানে,
তাঁরি তানে মিশতে চাচ্ছে
আজকে আমার হৃদয় বীণে।
কিন্তু হায়, দুঃখের কথা
বলব কাকে কেবা শুনে,
হৃদয় তন্ত্রী ছিঁড়ে যাচ্ছে
মিশ্ছে না গো তোমার তানে।
তুমি ত গো উধাও হয়ে
চলে যাচ্ছ কোন গগনে,
আমি ত আর পার্ছি না গো
ছুটে যেতে তোমার সনে।
তুমি আবার যেতে যেতে
দাঁড়িয়ে চাচ্ছ পাছের পানে,
কি যেন এক স্নেহের জ্যোতি
ফুট্ছে তোমার নয়ন কোণে।
তাই দেখে মোর ভরসা হচ্ছে
তুমি আমায় নিবে টেনে,
কাছে কিম্বা দূরে থাকি
ঠাঁই পাব তোমার ঐ চরণে।
তুমি আমার হৃদয় রতন
বুঝ্ছি আমি প্রাণে প্রাণে।
মিশ্ব আমি তোমার সনে
জীবনে না হয় মরণে।

দীন—স্বরূপানন্দ।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী।

জয়জয়ন্তী (৫) একতালা।

জগত কারণ নিত্য নিরঞ্জন
লহরে শরণ তাঁহার চরণে।
কুচিন্তা মগন কেন ভ্রান্তমন
স্মর অনুক্ষণ সত্য সনাতনে॥
যাহার প্রসাদে লভিলে এমন,
সৃষ্টির চরম মানব জনম,
বিফলে কাটালে অমূল্য জীবন,
হেলাতে হারালে সেই নিত্যধনে॥
শিশুর অধরে যেবা দিল হাসি,
কুসুমেতে ঢেলে দিল রূপরাশি,
তরু ফলভরে নমিছে যাঁহারে,
তাঁহারে ভুলিয়ে রয়েছ কেমনে;—
তাঁরি জ্যোতি লয়ে তপন ভাতিছে,
তাঁরি সুধা মেখে চন্দ্রমা হাসিছে,
চপলা চমকে তাঁরি আভা পেয়ে,
সুবাস ছড়ায় মলয় পবনে॥

তাঁরি গুণ গানে বিহগ কুজিছে,
গুণ গুণ স্বরে ভ্রমর গুঞ্জিছে,
কুলু কুলু রবে তটিনী গাইছে,
তাঁরি প্রেমে ছুটে সাগর সঙ্গমে ;—
তাঁরি কৃপাবশে মেঘ ঢালে বারি
সাগর উথলে তাঁরি প্রেম স্মরি,
ইন্দ্রধনু হাসে রূপকণা পেয়ে
তাঁহারি মহিমা প্রকাশে ভূবনে ॥
মাতৃস্তনে যেবা যোগাইল সুধা,
তাঁহারি করুণা বিতরে বসুধা
গভীর ওঁকারে সামের ঝঙ্কারে
সতত মগন তাঁরি জয় গানে ;—
যোগেন বলিছে ডাকরে কাতরে,
সেই বিশ্বেশ্বরে নম ভক্তিভরে,
চিন্ত সদা মনে সে পরম ধনে,
হওরে মগন তাঁরি নাম গানে ॥

———:0:———

শান্তি-গীতা।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবান কহিলেন,—হে সখে অর্জ্জুন! সারতত্ত্ব কহিতেছি শ্রবণ কর। অতি গুহ্য এবং মহাপুণ্যজনক সেই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥১॥

পূর্ণ, সৎস্বরূপ, এক চৈতন্য মাত্র আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। মায়া, ঈশ্বর, জীব, দেশ, কাল, চরাচর কিছুই নাই। তুমি, আমি, পৃথিবী, ভূবাদি লোকও নাই। অধিক কি কোন বস্তুর লেশমাত্র নাই, ইহা নিশ্চয় জানিও ॥২-৩॥

কেবল এক সদ্রূপ ব্রহ্মমাত্র আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, ইহা অবধারণ কর। সেই ব্রহ্ম চৈতন্য বিবর্ত্তরূপ এই দৃশ্য সংসার স্বপ্নতুল্য দেখিতেছ ॥৪॥

দেশ কালাদি বিষয়, ভোক্তা, জ্ঞাতা, ক্রিয়াদি সমস্তই স্বপ্নবৎ মিথ্যা প্রতিভাত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে উহারা কিছুই নহে ॥৫॥

যাহা সতত নির্ম্মল, প্রকাশ স্বরূপ তাহাই সৎ। ধারাবাহিক সংসার অসৎ। যেমন তরঙ্গ, ফেন, জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদের একই সত্ত্বা, সেইরূপ বিশ্বের সত্ত্বা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়া-কল্পিত সমস্ত দৃশ্য পদার্থ মিথ্যা স্বপ্নকল্পিত পদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। একমাত্র সদ্রূপ ব্রহ্ম চৈতন্যই বিচিত্র মায়াশক্তির প্রভাবে বিবিধ

বিষয়াকারে প্রতিভাত হইতেছে ॥৬॥

দৃশ্যমান এই নিখিল বিশ্ব অসত্য ও মায়াবিলাসের সামগ্রী। আত্মার অজ্ঞানতাই ইহার একমাত্র কারণ। যেমন রজ্জুতে মিথ্যা সর্পভ্রম হওয়ায় তাহা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মার অজ্ঞানতা বশতঃ এই নাম রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ায় দুঃখের কারণ হয়। বিচার দ্বারা যেমন সর্পভ্রম দূর হইয়া রজ্জু জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিচার দ্বারা মায়া-কল্পিত মিথ্যা জগদ্ভ্রম দূর হইলে একমাত্র সৎ স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব দুঃখের আবাস স্বরূপ মিথ্যা সংসারে আস্থা পরিত্যাগ কর ॥৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! পরম-ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে, আমাকে বলুন ॥৮॥

শ্রীভগবান কহিলেন, সৃষ্টি, জগৎ, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি কিছুই নাই। সমস্ত পদার্থ মায়াদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে ও ব্রহ্মসত্ত্বাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯ ॥

যেরূপ নিস্তব্ধ গম্ভীর জলরাশিপূর্ণ মহা সমুদ্রে সমীরণ সংযোগে তরঙ্গমালা উত্থিত হয়; কিন্তু তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ পূর্ণচৈতন্যে মায়া কর্ত্তৃক জগৎ দৃষ্ট হইতেছে; বস্তুতঃ তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর অপর বস্তু নয়, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥১১॥

যেমন নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় যে কর্ম্ম করা যায় তাহা সত্য নহে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না নিদ্রাভঙ্গ হয়, ততক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় দৃষ্ট এই মায়িক জগৎ কিছুমাত্র সত্য না হইলেও যে পর্য্যন্ত না অজ্ঞানের নাশ হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। মিথ্যা মায়াতে কর্ত্তৃত্ব নাই এবং সেই মিথ্যা মায়া উপাধিবিশিষ্ট মায়াবী জীবও অনুমাত্র কিছুই করে না। লোকসকল ইন্দ্রজালের ন্যায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সকল বস্তু সত্যের ন্যায় দেখে ॥১২-১৩॥

হে কুন্তিনন্দন! অজ্ঞান বালকের প্রীতি উৎপাদনার্থ ধাত্রী যেমন কল্পিত গল্প বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ অজ্ঞান জনগণকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রুতিতে জগৎ সৃষ্টির আখ্যায়িকা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥১৪॥

বিমল পূর্ণ চৈতন্যের কোন এক অংশে চৈতন্যের সত্তা স্ফূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া অণুমাত্র অজ্ঞান উদিত হয়। সেই অজ্ঞান নিজ শক্তিভেদে মায়া ও অবিদ্যা দ্বিধা বিভক্ত হয়। সত্ত্ব প্রধান মায়ায় যে চিদাভাস বিভাসিত হয়, সেই চিদাভাসে চৈতন্যের অধ্যাস হওয়াতে নিজের মায়ায় ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন ॥১৫-১৭

সেই মায়া উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর মায়া-বৃত্তি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাদি সকল কর্ত্তৃত্বগুণ বিশিষ্ট হয়েন। তখন তিনি স্ব ইচ্ছায় সঙ্কল্পবান হওয়ায় "আমি বহু হইব" এইরূপ সঙ্কল্প তাহাতে উদয় হয়। মায়ার দ্বারা যে কালের উৎপত্তি হয় তাহাকে মহাকাল বলে। মহাকালের শক্তি মহাকালী, তিনি প্রথমে উৎপন্না হয়েন। কালে সমস্ত উৎপন্ন হয়, কালে অবস্থান করে এবং কালেই

সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সকলেই কালের বশ ॥১৮-২১

সেই মহাকাল সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার এবং নিরাময়। সেই কাল উপাধিযোগে নানা-ভাবে ভাসিত হয় ॥২২

নিমেষাদি, যুগ, কল্প সমস্তই সেই কালে কল্পনা করা হয়। কাল হইতে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় ॥২৩

সেই অহঙ্কার সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। ২৪ ॥

এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বিকৃত হইয়া পঞ্চস্থূল ভূত হইয়াছে। সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমান্বয়ে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমস্ত সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশ হইতে এক অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইয়াছে ॥২৫॥

প্রত্যেক পঞ্চভূতের রজ অংশ হইতে এক একটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমস্ত পঞ্চভূতের রজ অংশ হইতে এক প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে ॥২৬॥

পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের তামসাংশ হইতে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। স্থূলভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড শরীর ইত্যাদি স্থূল সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥২৭॥

চৈতন্য মায়োপাধিক হইয়া ঈশ্বর হন, অবিদ্যা উপাধিক জীব হন। মায়া শুদ্ধ, সত্ত্বগুণ প্রধানা, আর অবিদ্যা তমোময়ী। অবিদ্যা মলিন সত্ত্বগুণ প্রধানা এবং আবরণাত্মিকা। তাহাতে চিদাভাসপ্রযুক্ত জীব স্বল্পজ্ঞ এবং তাহার বশ। জলে বুদ্‌বুদের ন্যায় চৈতন্যে সমস্ত কল্পিত হইয়াছে ॥২৮-২৯॥

যেমন সরোবরের জলে এক বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে নানারূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহা জলভাব প্রাপ্ত হয় না; সেই প্রকার অনন্ত পূর্ণ চৈতন্যের কোন অংশে মহামায়া বিজৃম্ভিত হইয়া নানা প্রকার নামরূপে বিস্তৃত হয় ॥৩০-৩১॥

সে মায়া ব্রহ্মে কিছুমাত্র আতিশয্য আনিতে পারে না অর্থাৎ বিকার জন্মাইতে পারে না। চৈতন্যে নিজের শক্তিতে নানা প্রকার দেখাইয়া থাকেন। নির্ম্মল অধিষ্ঠান স্বরূপ চৈতন্য এই সংসার স্বপ্নবৎ বিবর্ত্তমাত্র। আকাশে যেমন ধুম বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ মায়ার কার্য্য সকল চৈতন্যে বিস্তৃত হয়। যেমন সেই ধুমের সংস্পর্শে আকাশ মলিন হয় না, সেই প্রকার এই মায়ার সংস্পর্শে চৈতন্য বিকৃত হয় না।৩২-৩৩

যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি কার্য্যের দ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি মায়াও তৎকার্য্য দৃষ্টে অনুমিত হয়। পণ্ডিতগণ জগৎ দেখিয়া তাহার কারণ মায়ার অনুমান করিয়া থাকেন ॥৩৪॥

নির্ম্মল চৈতন্যে মায়ার লেশমাত্র নাই। সূর্য্যকিরণে অন্ধকারও নাই। নিশাচর প্রাণিগণ দিবালোকে অন্ধকার দেখায় সূর্য্যকিরণে ঘোর নিশান্ধকার কল্পনা করে, সে কল্পনা তাহাদের বুদ্ধির বিষয় মাত্র; প্রকৃতপক্ষে তাহা মিথ্যা; তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তিরা নির্ম্মল ব্রহ্মচৈতন্যে বুদ্ধির দ্বারা মায়ার কল্পনা করিয়া থাকে ॥৩৫

যাহার সত্ত্বা নাই, তাহার যেমন অস্তিত্ব

নাই, তদ্রূপ অনাত্মা, জড়রূপা মায়ারও অস্তিত্ব নাই, ইহা নিশ্চয় জানিও ॥৩৬

মায়া নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্ম আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই স্বপ্নকল্পিত বিষয়ের ন্যায় কল্পনা মাত্র ॥৩৭॥

তিনি যখন এক বলিবার যোগ্য নহেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় কিরূপে হইতে পারে এক বলিলে সংখ্যাবদ্ধ হয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাহা শোভা পায় না ॥৩৮॥

ব্রহ্মে দ্বৈতের লেশমাত্র নাই. শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বৈত সহ্য করিতে পারে না। ব্রহ্ম শব্দ, মন ও বাক্যের অতীত, সদা অমলরূপ। তিনি উপমা ভাববিহীন হওয়ায় তাঁহাকে ঈদৃশ বা তাদৃশ বলা যায় না ॥৩৯॥

কর্ণ তাঁহাকে শ্রবণ করে না, ত্বক্ তাঁহাকে স্পর্শানুভব করে না, চক্ষু দর্শন করে না, রসনা আস্বাদন করে না, নাসিকা তাঁহাকে আঘ্রাণ করে না, বাক্য তাহাকে বর্ণনা করে না ॥৪০॥

তিনি অবিনাশী সুতরাং সদ্রূপ, প্রকাশ স্বরূপ বলিয়া চিদাত্মক, প্রিয়রূপ বলিয়া আনন্দ স্বরূপ, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই ॥৪১॥

ইনি ব্যাপক ও দেহের আশ্রয় হেতু আত্মা শব্দে কথিত হয়েন। ইনি শরীর বর্দ্ধনের কারণ ও বৃহৎ, এই জন্য শ্রুতি ইঁহাকে ব্রহ্ম কহিয়া থাকেন ॥৪২॥

হে সখে,! যেকালে আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া তাহাতে বিশ্রান্তি লাভ করিবে, সেকালে ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়া জীবন্মুক্ত হইবে ॥৪৩॥

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ইহাকে মোক্ষ বলিয়াছেন; যেমন কণ্ঠস্থিত হার পশ্চাদ্দিকে লম্বমান থাকিলে, বা বস্ত্রাবৃত হইলে তাহার অভাব বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু ভ্রম দূর হইবামাত্র যেমন তাহা পুনরায় প্রাপ্তবৎ বোধ হয়, তদ্রূপ স্বরূপ জ্ঞান মাত্র মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥৪৪॥

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অখণ্ডবোধ উদিত হইলে মায়া বা তৎকার্য্য সত্য বলিয়া বোধ হয় না! যেমন সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার বা তৎকার্য্য কিছুই দেখা যায় না।

অতএব শুদ্ধ পরমব্রহ্মে জগৎ অনুমাত্রও নাই, এই সকল কল্পিত নাম রূপ মিথ্যামাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্প ও মৃত্তিকাতে, কুম্ভ, ভাণ্ড ইত্যাদি কল্পনা মিথ্যামাত্র ॥৪৫

ইতি। শান্তিগীতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

—————:0:—————

আশ্রম-সংবাদ।

বার্ষিক-উৎসব— আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩রা তারিখ সোমবার অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি আশ্রমের ৮ম বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আবাহন ও অর্চনা, ৪ঠা শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্ম্মালোচনা এবং ৫ই তারিখ পঞ্চমী তিথিতে জগদ্গুরু শ্রীমৎ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে, সারস্বতমঠে তদীয় আসনে তাহার পূজা, আরত্রিক, হোম ও বেদপাঠাদি হইবে; সমস্ত দিন ব্রহ্মনামযজ্ঞ এবং দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা পূজা হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাধুসন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রন করিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

শান্তি-গীতা।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—স্বীয় আত্মরূপে লক্ষ্য কোন বস্তু ? যাঁহাকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম কহিয়া থাকেন এবং যাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারি তাহা আমাকে বলুন ॥১

শ্রীভগবান কহিলেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যিনি হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে আত্মা বলে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হও ॥২

হে অর্জ্জুন ! হৃদয়-কমল অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান। সেই হৃদয়কমলে বংশ-পর্ব্ব মধ্যবর্ত্তী আকাশের ন্যায় যিনি দেদীপ্যমান, তাঁহাকেই শ্রুতি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কহিয়া থাকেন ॥৩

যেমন মহাকাশে ঘট উৎপন্ন হইলে ঘটের মধ্যে আকাশ থাকে এবং সেই আকাশকে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ (ঘটাকাশ) কহিয়া থাকে, তদ্রূপ অখণ্ড ব্রহ্মে কল্পিত কূটস্থ চৈতন্য অর্থাৎ জীব চৈতন্য বুদ্ধিগম্য হয়, অতএব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই ব্রহ্ম-চৈতন্য ॥৪-৫

সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন জীব চৈতন্যকে বেদ-শাস্ত্র-বিশারদগণ প্রজ্ঞান শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আনন্দ ও ব্রহ্ম শব্দদ্বয় তাঁহার বিশেষণ মাত্র। যিনি শ্রবণ করেন, জ্ঞাত হয়েন, দর্শন করেন, আঘ্রাণ করেন, আস্বাদ গ্রহণ করেন এবং শীতোষ্ণাদি উপভোগ করেন, সেই প্রজ্ঞান-চৈতন্য জ্ঞানরূপ, সকল জ্ঞানের আশ্রয়, অলক্ষ্য এবং শুদ্ধ। শ্রুতি তাঁহাকে কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ॥৬-৮

সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য যখন বৃত্তিতে আরূঢ় হয়েন অর্থাৎ বৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন, তখন তিনি জ্ঞান শব্দে কথিত হয়েন,

তাহা দ্বারাই চৈতন্য বোধ হয়। বুদ্ধির সহিত একীভাবপ্রাপ্ত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস যখন কামক্রোধাদি বৃত্তির অনুসারে তদাকারে পরিণত হইয়া বৃত্তি সমূহের অবভাসক হয়, তখন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য সেই সেই বৃত্তি-জ্ঞানের উৎপাদক হয়েন বলিয়া জ্ঞানশব্দে কথিত হয়েন। সেই বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-শব্দবাচ্য একমাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। তিনিই কূটস্থ হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম চৈতন্য। সেই চৈতন্যের বোধের নিমিত্ত তিনি জ্ঞানশব্দে কথিত হইয়াছেন।॥৯-১১

যাহা শ্রবণ করিতেছ, যাহা অবলোকন করিতেছ, তৎসমস্তই এক সংবিতে অনুস্যূত থাকিয়া সেই সেই বিষয়-জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে। সেই সংবিৎকে কূটস্থ চৈতন্যরূপ আত্মা অবধারণ কর। যাহা কিছু দর্শন করিতেছ, তৎসমস্তই আমি জানিতেছি, এই প্রকার জ্ঞান কর। এই জ্ঞান সেই সংবিত প্রভাবেই হইয়া থাকে, সেই সংবিৎই আত্মরূপে বিজ্ঞেয়॥ ১২-১৩

দৃশ্য সকল বস্তু অনাত্মা ও জড়ভাবে নিরাশ করিয়া তদবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ স্বীয় আত্মাকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা অবধারণ কর। যাহা সংবিৎ, তাহাই আত্মা, তিনিই চৈতন্য এবং তিনিই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চিত জানিও তিনিই ত্বং পদের লক্ষ্য, গুরুর উপদেশে তাহাই জ্ঞাতব্য। ঘটাকাশ এবং মহাকাশ যেমন অভিন্ন, সেইরূপ ত্বং পদবাচ্য কূটস্থ চৈতন্য ও তৎপদ বাচ্য ব্রহ্ম-চৈতন্য অভেদ, ইহা জানিয়া ব্রহ্মময় হও। ঘটাকাশ ও মহাকাশ যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন, তদ্রূপ আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞানে পূর্ণ হও। যেমন একমাত্র আকাশ নানা আধারে পূর্ণরূপে বিভাসিত হয়, সেইরূপ নানা উপাধিতে একই আত্মা পূর্ণভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন, কিছুমাত্র দ্বৈতভাব নাই। যেমন সহস্র সহস্র দীপাধারে একই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, সেইরূপ একই আত্মা বিরাজমান আছেন॥১৪-১৫

যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর দুগ্ধ ও ঘৃত এক এবং ভেদরহিত, নানা অরণি প্রস্তরে একই অগ্নি ভেদবিবর্জ্জিত, নানা জলাশয়ে একই জল, নানাবর্ণ পুষ্পে একই মধুররস মধু, অসংখ্য ইক্ষুদণ্ডে একই ঐক্ষব রস ভেদ-বিবর্জ্জিত, সেইরূপ নানাভাবে একই অদ্বয় চৈতন্য পূর্ণভাবে রহিয়াছেন॥২০-২২

অদ্বয় পূর্ণ চৈতন্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়া কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, এই সকল অধিষ্ঠান নানারূপে অভিভাষিত হইলেও মিথ্যা॥২৩

দ্বৈতলেশবিবর্জ্জিত অখণ্ড বিমল, পূর্ণ ব্রহ্মে অপর কিছুই নাই, একমাত্র সৎবস্তু নানাভাবে বিরাজিত রহিয়াছে॥২৪

যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা, সে সকল চৈতন্য, বিবর্ত্তাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ ব্রহ্মমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাকে শ্রুতি-সচ্চিদানন্দ শব্দে লক্ষ্য করিয়াছেন; তিনি অবিনাশী এবং অক্ষরাতীত, শব্দাতীত, নিরঞ্জন, তোমার স্বরূপ তাহাই ইহা জ্ঞাত হইয়া আত্মাভিমান পরিত্যাগ কর; কারণ অভিমানই প্রকৃত আবরণ, তাহাতেই স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে। অহঙ্কারই পঞ্চকোষে কর্ত্তৃভাবে বিরাজ করিতেছে॥২৫-২৭

বিজ্ঞানময় কোষে ব্রহ্মবিম্ব অর্থাৎ আমি

ব্রহ্মবিৎ বলিয়া যে অভিমান, তাহা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, তাহাতেই নির্ম্মল আত্মস্বরূপ আচ্ছাদিত হয়। অতএব সেইভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বরূপে অবস্থানই তত্ত্বদর্শী যোগিগণ তত্ত্বজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন ॥২৮-২৯

যেমন অন্ধকার গৃহে লেপ-কাঁথাদি দ্বারা আবৃত ব্যক্তি শয়ান থাকিয়া লেপ-কাঁথা বা শরীরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে না, কেবল স্বয়ং সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান আছি এইরূপ জ্ঞান হয়; তদ্রূপ দেহাদি কিছুই নাই, কেবল সৎ-স্বরূপে স্বয়ং সাক্ষিরূপে আছি, এইরূপ চিন্তা কর। এইরূপ চিন্তা করিলে তখন আর কিছুই দেখিবে না, কেবল সাক্ষিস্বরূপ সন্মাত্র আপনাকে উপলব্ধি করিবে। তখন কেবল সাক্ষিরূপে স্বয়ং আছি এই প্রকার অন্তরে স্ফূর্ত্তি পাইবে। ৩০-৩১ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদির সমষ্টিকে সংঘাত কহে। এই সংঘাত নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইলে কেবল স্বয়ং শব্দবাচ্যরূপই অবশিষ্ঠ থাকে। আছে ও নাই, এ উভয়ই বুদ্ধিধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিবে। আমি আছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি. এ অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মরূপ হও ॥ ৩২—৩৩ ॥

তুমি জাগ্রৎ থাকিয়াও সুষুপ্তিস্থ, সুতরাং জাগ্রৎধর্ম্মবিবর্জ্জিত। সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞানবিলীন হইলে কেবল স্বয়ং চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকে ॥ ৩৪ ॥

সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে যে ভাববর্জ্জিত অবস্থা প্রকাশ পায়, প্রজ্ঞাদ্বারা তাহাই আত্মভাবে জানিয়া প্রজ্ঞাহীন হও ॥৩৫

তথায় শব্দশ্রবণ বা রূপদর্শন নাই, ভাবাভাবও কিছুমাত্র নাই, কেবল মাত্র সৎ বিদ্যমান রহিয়াছে।

সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা সেই সদ্রূপ চৈতন্য মাত্রকেই নিজরূপ জান। বৃত্তিজ্ঞানের সহিত বুদ্ধি বিলীন হইলে যাহা অবশিষ্ঠ থাকে তাহাকেই আপনার আত্মা বালিয়া লক্ষ্য কর এবং স্বয়ং অভিন্ন ব্রহ্ম স্বরূপ ইহা জ্ঞাত হও ॥ ৩৭ ॥

হে শুভাশয়! এই সারভূত তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম, শোক মোহাদি তোমাতে নাই, তুমি নিত্যশুদ্ধরূপ এবং নিষ্কল ইহা অবধারণ কর। ৩৮ ॥

শাস্তব্রত কহিলেন,—পার্থ বাসুদেবের ঈদৃশ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া অসত্যস্বরূপ মায়িক বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার শোক-সন্তাপ-জাল হইতে মুক্ত হইয়া ও সারভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন ॥৩৯

তারপর পার্থ,—বিমল, প্রসন্নবদন, হৃদিস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বিনীতভাবে ধ্যান ও প্রণাম করিয়া নম্রভাবে কৃতাঞ্জলিভরে ভক্তি-পূর্ণবাক্যে এই কথা বলিলেন:—

হে কৃষ্ণ! তুমি আদি এবং পুরাণ পুরুষ, বেদও তোমার সারতত্ত্ব অবগত নহে। আমি কি বলিয়া তোমার স্তব করিব জানি না। তুমি সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ ॥৪১

তুমি সৎ-স্বরূপ বিশ্বের উৎপত্তির কারণ, তোমাকে আশ্রয় করিয়া জগত অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। তুমি অনন্তমূর্ত্তি, বরদাতা এবং কৃপাপরায়ণ, তুমি

সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি ॥৪২

তোমার বিশেষ তত্ত্ব আমি কি বলিব? তোমার গূঢ় মর্ম্ম কিছুই জানি না। তুমি সৃষ্টি, স্থিতি এবং নাশকর্ত্তা; সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত; তোমাকে প্রণাম করি ॥৪৩

তোমার বিশ্বরূপ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি; (এ বিষয় গীতায় বর্ণিত আছে।) তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। তুমি সকলকে মোহিত করিয়া এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছ। সকলে জানে তুমি বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত হরি এবং পাণ্ডবগণের সখা, তোমার তত্ত্ব আমি কি বলিব, দেবতারাও তোমার তত্ত্ব অবগত নহেন ॥৪৪-৪৫

শ্রীভগবান কহিলেন,—হে সখে পার্থ! যদি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাক, মৌনাবলম্বন কর। তুমি আমার বিশ্বরূপ যাহা দেখিয়াছ তাহা মায়ামাত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি তাহাতে ভ্রান্ত হইয়াছ, নিজের স্বরূপ চিন্তা কর। মূঢ়ব্যক্তিগণ মায়া কর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়াবিবর্জ্জিত ॥৪৬-৪৭

এই শান্তিদায়িনী শান্তিগীতা আমাকর্ত্তৃক কথিতা হইল। এই শান্তিগীতা যিনি পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তিনি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন। সে আমার মায়ায় কখনই মোহিত হইবে না। এই গীতা প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ শোকশান্তি করিবে। ॥৪৮-৪৯ ॥

শান্তব্রত কহিলেন,—এই বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লবদনে অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

এই শান্তিগীতা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। তোমার প্রতি স্নেহ-পরায়ণ হইয়া গুরুদত্ত এই গীতা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহা মূঢ়, শঠ, নাস্তিক, কুতার্কিক, মূর্খ, নির্দ্দয় ও উন্মার্গগামী ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না ॥৫১

ইহা বিরক্ত, প্রসন্ন, মুমুক্ষু, গুরু ও দেবতায় ভক্তিপরায়ণ, শান্ত, সরল, শ্রদ্ধাবান, বিনয়ী, দয়াশীল, সাধু, বিদ্বেষক্রোধহীন ব্যক্তিগণকে যত্নের সহিত দানকরিবে ॥৫৩-৫৪

শোকশান্তিকরী দিব্য জ্ঞানদীপ-প্রদীপনী গোপনীয় শান্তিগীতা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥৫৫

অর্জ্জুনের শোক প্রশান্তির নিমিত্ত ভগবান মধুসূদন এই শান্তি নাম্নি গীতা কহিয়াছিলেন, ইহা পাঠ করিলে পাপতাপ বিদূরীত হয়। ইহা সারভূত এবং গুহ্য হইতেও অতি গুহ্য। এই শান্তি প্রদায়িনী, শান্তস্বভাবা, সত্ত্বগুণে প্রকাশরূপিনী, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশকারিণী শান্তিগীতা স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে গুরুকৃপায় পদ্যবন্ধে আবির্ভূ্তা হইয়াছেন ॥৫৬ ॥

ইতি শান্তিগীতা সমাপ্ত।

——:0:——

ব্যর্থ।

সাধের জীবন মোর ব্যর্থ হয়ে গেল,
কত আশা ছিল মনে কিছু না পূরিল ॥
উঁচু শির কভু মোর নত না হইল।
তোমার চরণে নাথ কভু না লুটা'ল।
কুরূপ দেখিয়ে মোর নয়ন মজিল।
ভুলেও তোমার পানে ফিরে না চাহিল ॥
কুকথা শুনিয়ে মোর শ্রবণ ভুলিল।
সুধামাখা তব নামে রুচি না হইল ॥
পূতিগন্ধ সেবি নাসা বিকল হইল ॥
তোমার অঙ্গের গন্ধ কভু না লইল ॥
কুকথা উচ্চারি দিন রসনা কাটা'ল।
স্বপনেও তব নাম মুখে না আনিল ॥
কুকাজ করিয়ে কর দিন কাটাইল।
তোমার চরণ সেবা কভু না করিল।
কুস্থানে ভ্রমিয়ে পদ বিকল হইল।
নেহারিতে তব রূপ তীর্থে নাহি গেল ॥
সকল হারা'ল মন কুভাবনা করে।
না করিল তব চিন্তা তিলেকের তরে ॥
দিন ত বিফলে যায় সন্ধ্যা হয়ে এল।
পশ্চিম আকাশে দেখ মেঘ দেখা দিল ॥
না দেখি উপায় আর কিবা করি বল।
সাধের জীবন মোর ব্যর্থ হয়ে গেল ॥
একমাত্র তুমি নাথ ভরসা আমার।
অগতির গতি তুমি প্রেম-পারাবার ॥

দীন স্বরূপানন্দ

—:0:—

"পাগল মানুষ"।*

"দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
চরিতামৃত।
প্রেমের পাগল ও যে, নহে বাজীকর।
অলৌকিক ঘটনার কি কর প্রত্যাশা ?
প্রেমই তার প্রয়োজন, প্রেমেতে নির্ভর।
প্রাণের সামগ্রী, প্রেম, নহে ত ব্যবসা।
সে ত নহে চিকিৎসক, ঔষধ বিতরি'।
ভাল করিবেক রোগ বিবিধ প্রকার।
জানে না ভৌতিক্ বিদ্যা, যাহে বন্ধ্যানারী
পুত্রলাভ করি' দিবে, রত্ন উপহার।
মন্ত্রদানে গুরুগিরি না করে পাগল ;
তথাপি মঙ্গল তরে করে শিক্ষাদান ;
মহাত্মের এইরূপ স্বভাব নির্ম্মল।
পরার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগে যত্নবান্।
দেহারামী নহে সে ত, ঠিক্ আত্মারামী।
প্রেমের পাগল নহে ভক্তি-মুক্তি-কামী ॥

শ্রীরসিকলাল দে—
সোনামুখী,—গরীব-ভাণ্ডার।

*"আর্য্য দর্পণের" অনুরাগী পাঠকগণ শীঘ্রই এই মহাবাউল পাগল মানুষের বিশেষ পরিচয় পাইবেন।
দীন—লেখক।

—:0:—

ধ্যানযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোগবিভূতি।

যোগসাধন দ্বারা বহুবিধ আশ্চর্য্য ও অসাধারণ শক্তি লাভ হয়। কিছুদিন স্থির-ভাবে বিশ্বাসের সহিত অভ্যাস করিতে থাকিলে ইহাতে এত আনন্দ উপভোগ হয় এবং এত অদ্ভুত বিষয়,—যাহা প্রকৃতির অন্তরালে মানবের স্বাভাবিক জ্ঞান-শক্তির বহির্দ্দেশে রহিয়াছে,—জানিতে পারা যায় যে, একবার সাধন আরম্ভ করিলে আর অন্যের অনুরোধ উপরোধের আবশ্যকতা হয় না। যোগ তাহার নিজের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ করিয়া যোগীকে তাঁহার শক্তি-ভাণ্ডার প্রদর্শন করেন। প্রকৃতি দেবী তখন তাঁহার দুর্ভেদ্য আবরণী শক্তি লইয়া দূরে সরিয়া দাড়ান। যোগী জগদীশ্বরের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও লীলা-মাধুরী দেখিয়া মানব জনম সফল করেন। যোগসাধন দ্বারা বহুবিধ শক্তি লাভ হয়। তন্মধ্যে দুই চারটী শক্তির বিষয় নিম্নে লিপি-বদ্ধ করা হইল;—

১। ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় যোগীর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। ইহাতে জন্মান্তরাদি সমস্ত রহস্যই স্বকীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম এবং পরজন্মেই বা কি হইব তাহা জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমান জীবনে কিভাবে চলিতে হইবে এবং কিরূপে চলিলে সিদ্ধমনোরথ হওয়া যাইবে তাহাও স্থির হইয়া যায়। এরূপ জ্ঞান যে কেবল নিজের সম্বন্ধেই লাভ হয় তাহা নহে, ইচ্ছা করিলে অপরের বিষয়েও জানিতে পারা যায়। এই জন্মান্তর-রহস্য মানবজীবনে একটী অতীব আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

২। দূর দূরান্তরের ঘটনাদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ বাসস্থানে থাকি-য়াই দেশান্তরে আত্মীয় বন্ধুগণ কিভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা জানিতে পারা যায়।

৩। নিজ মনের ভাব মুখে ব্যক্ত না করিয়া অন্যকে জানাইয়া দেওয়া যায়। একত্র বা বহুদূরে অবস্থানকালে এরূপে মনোভাব সঞ্চালিত করা যায়।

৪। অপরের মনের ভাব বা কোন প্রশ্ন সে না বলিতেই জানিতে পারা যায়।

৫। অপরকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরি-চালিত করিতে পারা যায়।

৬। পরলোকগত আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপনাদি করিতে পারা যায়।

৭। নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ আশ্রয় করতঃ নিজ মনোমত কার্য্যাদি করিতে পারা যায়।

৮। নিজের ইচ্ছানুসারে প্রাকৃতিক কার্য্যাদি হইতে থাকে। রৌদ্রের উত্তাপ খুব প্রখর হইলে যোগী যদি ছায়ার বাঞ্ছা

করেন তবে তৎক্ষণাৎ মেঘ আসিয়া সূর্য্য-রশ্মি ঢাকিয়া ফেলে।

৯। যোগী যোগবলে বাকসিদ্ধ হয়। যাহাকে যাহা বলিবে, তাহার তাহাই হইবে। মুমূর্ষু রোগীর অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অনেক যোগীকেও রোগ দূর করিতে দেখা গিয়াছে। যোগী "ব্যাধি নাই" বলিলে আর তথায় ব্যাধির অবস্থিতি সম্ভব হইবে না।

১০। বহুকাল পর্য্যন্ত অনাহারে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ করিয়া, এমন কি ভূগর্ভেও থাকিতে পারা যায়।

এতদ্ব্যতীত অণিমা লঘিমাদি আরও অনেক প্রকারের যোগবিভূতি আছে। ঠিকভাবে দীর্ঘকাল যোগাভ্যাস না করিলে সকলগুলি বিভূতি প্রকাশ পায় না।

এইরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া হয়তঃ অনেকে ইহাকে আষাঢ়ে গল্প মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইহা তদ্রূপ ভিত্তিহীন অলীক নয়, বরং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। একটু পরিশ্রম করিলেই ইহার অলৌকিক শক্তিগুলি সহজেই অনুভব করা যায়; তখন সাধনাদ্বারা সমস্ত সত্য তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠে।

যোগ-বিভূতি লাভ হইলে যদি ঐ সকল শক্তি সংসারক্লিষ্ট জীবগণের দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যবহার হয়, তবে উহা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে; কিন্তু কোনরূপ কু-অভিসান্ধিতে কুকার্য্যে প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর বিভূতি-গুলি নষ্ট হইয়া যায়। তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না। সারা জীবনের সাধনফল এক দিনের অবিমৃষ্যকারিতায় নষ্ট হইয়া যায়।

যোগের আধ্যাত্মিকতা।

এতাবতা যোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় কথিত হইল, তাহা যোগের গৌণ ফল মাত্র। যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মায় পরমাত্মায় মিলন, ভক্তে ভগবানে মিলন; তৎ এবং ত্বং এর একত্ব সম্পাদন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

> সংযোগ যোগ ইত্যুক্ত
> জীবাত্মা পরমাত্মনো।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়ের সংযোগের নাম যোগ। এই যোগ বহু ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তি-যোগই শ্রেষ্ঠ। অন্নগত-প্রাণ কলির জীবের পক্ষে আবার ভক্তিযোগই অবলম্বনীয়।

ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক সম্পত্তি। ভগবানের প্রতি জীবের যে আত্যন্তিক ভালবাসা—তাহারই নাম ভক্তি। এই ভক্তি-ভাব বা ভালবাসার ভাব আমাদের জীবনে অতি বাল্যকাল হইতে ফুটিতে থাকে। পিতা-মাতা ভ্রাতাভগ্নী ও আত্মীয় বন্ধুগণ লইয়া একত্রে বাস করায় গুরুজনের প্রতি দাস্য, বন্ধুগণের প্রতি সখ্য, সন্তানাদির প্রতি বাৎসল্য, ও পত্নীর প্রতি মধুর ভাবে * জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভক্তি আমাদের প্রাণে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। কিন্তু এই ভক্তি ভগবন্মুখী না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে তৃপ্ত করিতে পারে না। জীব যাহাই "আমার অতি আদরের নিস্বার্থ ভালবাসার সামগ্রী" বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে

---

* দাম্পত্য-জীবনে সৌখ্যভাবের ক্ষরণই সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। সম্পাদক।

যায়, তাহাতেই স্বার্থের জীবন্ত ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া,—অপূর্ণ লালসা লইয়া ফিরিয়া আইসে। যখন সংসারের কেহই তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না, আত্মীয় বন্ধুগণ যখন আর তাহার প্রাণে শান্তি-বারি ঢালিয়া দিতে পারে না, তখন সে তাহার প্রাণভরা অতৃপ্ত ভালবাসা লইয়া সকল ভালবাসার আধার শ্রীভগবানের প্রতি ধাবিত হয় এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র ভক্তি-সরিৎ ভক্তির-সাগরে মিশাইয়া জীবনে স্বর্গসুখ উপভোগ করে। তখন সে বুঝিতে পারে "আমি কে, জগৎ কি, জীব কি, আর ভগবান কি?" তখন সে যে কার্য্যই করে তাহাতে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি থাকে না। সংসার-মায়ামুগ্ধ জীবগণ এমন মহাপুরুষের চরণছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হয়। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান সদা বিরাজ করেন; কাজেই ভক্তের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই ভগবৎ কৃপার অধিকারী হওয়া যায়।

যোগসাধন করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে হইলে ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ভক্তিহীন হইয়া যোগাচরণ করিলে তাহাতে সুফল লাভের সম্ভাবনা খুব কম। এই যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধ মহাপুরুষ গুরুরূপে লাভ করা দরকার। অন্যথায় অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া অমৃতফল-প্রসবকারী যোগের বিষময় ফল দর্শনে ব্যথিত চিত্তে ফিরিতে হইবে। প্রাণে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে গুরুর অভাব হয় না, স্বয়ং শ্রীভগবানই তখন গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

গুরু-উপদেশ ভিন্ন যোগ সাধনে রত হইলে ফল দুঃখদায়ক হইয়া থাকে, যথা:—

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা
গুরুবক্ত্রু সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যাৎ
নির্ব্বির্য্যাপ্যতি দুঃখদা।
শিব-সংহিতা।

গুরুর উপদেশ অনুসারে যোগবিদ্যা অভ্যাস করিলে সেই বিদ্যা বীর্য্যবতী হয়, অন্যথায় উহা বীর্য্যহীনা ও দুঃখদায়িকা হইয়া থাকে।

অতএব কোন পুস্তকে কোনরূপ যোগ-সাধনের বিষয় পাঠ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে যাওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে। গুরু ব্যতীত "ক" অক্ষরটী পর্য্যন্ত যখন শিক্ষা করিতে পারা যায় না, তখন এই গুহ্যাতি-গুহ্য যোগ বিদ্যা "হাতে কলমে" দেখাইয়া না দিলে কখনই শিক্ষা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা নিজে নিজে principle খাটাইয়া ওস্তাদি করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারাই সাধনে অকৃতকার্য্য হন এবং অবশেষে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া লোকের প্রাণে যোগভীতির উদাহরণ স্বরূপ হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যে কেবল নিজের অপকারই করেন, তাহা নহে, ইহাঁদের অবস্থা দেখিয়া সাধারণে যোগ-সাধনার নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। ভক্তিশ্রদ্ধা না থাকিলে যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সুকঠিন। কারণ মনোযোগের মূল কারণই ভক্তি ও শ্রদ্ধা;—তাহাদের অভাবে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। যথা:—

শ্রদ্ধাযুক্তানাং পুংসাং
সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা ।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ,
তস্মাৎ যত্নেন সাধয়েৎ ॥
শিব-সংহিতা ।

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ হয়, অপরের হয় না । অতএব যত্নের সহিত সাধনা করিবে ।

যোগ-বিঘ্নকর বহু বিষয় বর্ত্তমান আছে । তন্মধ্যে যে কয়েকটী অতীব প্রবল তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করা গেল । এই সকল দোষ বর্ত্তমান থাকিতে যোগে সিদ্ধিলাভ করা সহজসাধ্য নয় । একান্ত চেষ্টা দ্বারা দোষগুলি অপসারিত করিতে পারিলে, সহজেই ফল লাভ হইবে, সন্দেহ নাই ।

যোগাচার ।

ন ভবেৎ সঙ্গ যুক্তানাং তথা
বিশ্বাসিনামপি ।
গুরুপূজা বিহীনানাং তথা চ
বহু সঙ্গিনাং ।
মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা
নিষ্ঠুর ভাষিণাং ।
গুরু-সন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধি
স্যাৎ কদাচন ।
শিব সংহিতা ।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অবিশ্বাসী, গুরুপূজাবিহীন, বহুসঙ্গী, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুরভাষী ও যাহার প্রতি গুরু সন্তুষ্ট নন, এরূপ ব্যক্তির কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না । এই সকল দোষ-দুষ্ট মানবের কেন সিদ্ধিলাভ হয় না এবং দোষগুলি কিরূপে পরিহার করিতে হয় ও কিরূপে ও কেন উহারা যোগে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাহা ক্রমে বিস্তারিতরূপে বর্ণনার চেষ্টা করা যাউক ।

১ । ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির যোগ-সিদ্ধি লাভ হয় না । কারণ সে সর্ব্বদা কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর বশীভূত থাকায় তাহার চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে । চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তির যোগ-ফল লাভ অসম্ভব । চিত্তের এই চঞ্চলতা দূর করিয়া, বৃত্তিগুলিকে একমুখী না স্থির করাই যোগের উদ্দেশ্য বা যোগ-সাধন । যথা—

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ । পাতঞ্জল দর্শন ।

চিত্তের চঞ্চল অবস্থায় যে সকল ভাবের উদয় হয়, উহাই চিত্তের বৃত্তি;—চিত্তের বৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা বা ইতস্ততঃ ধাবন দূর করিয়া এক কেন্দ্রে স্থির করাই যোগ ।

২ । বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তির যোগে সিদ্ধি-লাভ হয় না । প্রাণে বল ও বিশ্বাস থাকা চাই—যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে অবশ্যই ফল লাভ হইবে । যেহেতু জগৎ-জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই যোগ-সাধনের মধুময় ফল লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদিগকে তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের উপদেশাবলী রক্ষা করিয়াছেন । যে গুরুর উপদেশানুযায়ী সাধন করা যায় তাঁহার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই । অন্যথায় অবিশ্বাসে চিত্তের স্থিরতা নষ্ট হইয়া চঞ্চলতা উপস্থিত হইবে । অতএব অবিশ্বাস যোগ-বিঘ্নকর ।

৩ । গুরুসেবায় শ্রদ্ধাহীন সাধকের যোগ সিদ্ধি হয় না । কারণ যিনি শিক্ষাদান করিতেছেন, যাঁহার শক্তি বলে সিদ্ধিলাভ হইবে, তাঁহার প্রতি ভক্তি কি শ্রদ্ধা না

থাকিলে তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট যোগসাধন-প্রণালীতে সাধকের বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক। কাজেই শ্রদ্ধাহীন মানব বিশ্বাসহীন হইবে এবং বিশ্বাস না থাকিলেই চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইবে না।

৪। যে ব্যক্তি বহু লোকের সহিত সর্ব্বদা গল্প গুজব করিয়া সময় ক্ষেপণ করে তাহার যোগসিদ্ধি হয় না। কারণ বিভিন্ন প্রকৃতির বহুলোকের সহিত মিলিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা ও ভাব তাহার চিত্তে স্থান লাভ করে এবং চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটাইয়া যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব যোগী কখনই বহু লোকের সহিত মিশিবে না।

৫। মিথ্যাবাদী লোকের যোগসিদ্ধি হয় না। কারণ একটী মিথ্যাকথা বলিয়া তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য আরও দশটী মিথ্যার প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু শত চেষ্টা করিলেও মিথ্যা কখনও গোপন থাকে না। একদিন না একদিন উহা প্রকাশ হইয়া থাকে। মিথ্যা আচার বা মিথ্যা কথা প্রকাশ হইলে মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না, সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কাজেই মিথ্যাবাদী চিত্তের স্থিরতা নষ্ট করিয়া ফেলে।

৬। নিষ্ঠুর ভাষা অর্থাৎ যাহারা কটু বাক্যের দ্বারা অন্যের প্রাণে কষ্ট প্রদান করে, তাহাদের যোগসাধন বিফল হয়। প্রত্যেক আঘাতের এক একটী প্রতিঘাত আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কাজেই অন্যের প্রতি যে নিষ্ঠুর ভাষা প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে নিজের প্রাণেও যথেষ্ট কষ্টের সৃষ্টি হয় এবং চিত্তের স্থিরতা নষ্ট করিয়া ফেলে। কারণ, একই নিত্য, সত্য, সনাতন বস্তু সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন—সকলেই সেই এক সত্তায় সত্তাবান। যে "আমি" "আমি" করিয়া মানব পাগল, বিভুরূপে সেই "আমি" সর্ব্বভূতে বিরাজিত। কাজেই আমরা যাহাকে "পর" বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের "পর" নহে; 'আমার'ই ভিন্ন আকারে অভিব্যক্তি মাত্র। এইজন্যই অপরের একটু উপকার কি সাহায্য করিতে পারিলে প্রাণে কত আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু অন্যের অপকার করিলে বা অপকার দ্বারা নিজের উপকার সাধিত হইলে বরং অন্তর্দ্দাহই উপস্থিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে পর বলিয়া কাহারও প্রাণে বেদনা প্রদান করিলে, নিজেরই বেদনার বৃদ্ধি হয়। কাজেই অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত করিলে তাহার প্রতিঘাত আপন প্রাণে অনুভূত হইবে এবং চিত্তের স্থিরতা নষ্ট করিয়া দিবে।

৭। উপরোক্ত দোষগুলিতে যিনি দুষ্ট, গুরু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, এবং গুরু প্রসন্ন না থাকিলে শিষ্যের চিত্ত স্থির থাকা অসম্ভব। যেহেতু গুরুর শক্তি তখন তাহার হৃদয়ে ক্রিয়াশীল থাকে।

অতএব যোগ-সাধনে সিদ্ধিকামী ব্যক্তির উল্লিখিত দোষগুলি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সাধক নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও পরিত্যাগ করিবেন:—

অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং
সর্ষপং কটুং।
বহুল ভ্রমনং প্রাতস্নানং
তৈল বিদাহকং।
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষাঞ্চাহঙ্কার
মনার্জ্জবং।
উপবাসামসত্যাঞ্চামোক্ষঞ্চ
প্রাণী-পীড়নং।
স্ত্রীসঙ্গমগ্নি সেবাঞ্চ বহ্বালাপং
প্রিয়াপ্রিয়ং।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি
লক্ষণম্।
শিব-সংহিতা।

সাধকগণ যোগাভ্যাস সময়ে অম্ল, রুক্ষ, ঝাল, লবণ, ও সর্ষপ ভক্ষণ করিবে না। বহু ভ্রমন, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য অঙ্গে ব্যবহার করিবে না। অপহরণ, প্রাণী-হিংসা, জনদ্বেষ, অহঙ্কার ও কুটীলতা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। উপবাস, মিথ্যাকথা বলা, অমুক্তিচিন্তা, প্রাণীপীড়ন, স্ত্রী-সঙ্গম, অগ্নিসেবন, বহু আলাপন, প্রিয়াপ্রিয়-জ্ঞান ও অতিভোজন ত্যাগ করিবে।

এই নিয়ম সংযমাদি যথাযথরূপে প্রতি-পালন করিয়া যোগমার্গে অগ্রসর হইলে সাধকের ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সদ্‌গুরু লাভ হইলে তাঁহার উপদিষ্ট নিয়মাদি পালন করিলেও কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও সংযমের সহিত কায়মনোবাক্যে সাধন রত হইতে পারিলে সিদ্ধি করতলগত হয়।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

———:0:———

গোরা।

(১)

বল দেখি কে ধরায় এলো, নাম ফুটিয়ে জীবের মুখে—
জন্মে যাহার নদে' বাসীর প্রেমের নদী বইলো চোখে—
পেয়ে' যারে পুলকভরে টলমলিয়ে উঠ্‌ল ধরা?
শচীমায়ের নিমাই সে যে—— সে যে আমার পাগল গোরা!

শৈশবেই কার রূপের রাশি লজ্জা দিত কুসুমদামে—
কাঁদ্‌লে পরে কোন সে শিশু শান্ত হ'ত হরির নামে—
চেয়ে' কাহার মুখের পানে, মিশ্রের আঁখি পলক হারা?
শচীমায়ের নিমাই সে যে —— সে যে আমার পাগল গোরা!

কৈশোরে কার চঞ্চলতা —— দুষ্টু হাসি আঁখির কোণে—
নৈবেদ্য কে কেড়ে' খেতো —— ঠাকুর হ'ত সিংহাসনে—

মিষ্টি কাহার নষ্টামীতে সশঙ্কিত পড়্‌শী পাড়া ?
শচীমায়ের নিমাই সে যে —— সে যে আমার পাগল গোরা !

লুব্ধা গুণে যৌবনে কার বাণী হ'লেন স্বয়ম্বরা—
একটী শুধু মুখের কথায় দিগ্বিজয়ী দিশেহারা—
শিশুর মত চপল কে সে অধ্যাপকের শ্রেষ্ঠ সেরা ?
শচী-মায়ের নিমাই সে যে——সে যে আমার পাগল গোরা !

অশ্রুতে কার বিষ্ণুপদে বইল আবার সুরধুনী—
পুরী গোঁসাইর মন্ত্র জপে' কাঁপ্‌'ত কাহার ঠোঁট দু'খানি—
কানুর বেণুর মধুর তানে ঝর'তো প্রাণে পীযূষধারা ?
শচী মায়ের নিমাই সে যে——সে যে আমার পাগল গোরা !

দেখ্‌'ত নৃত্য নিত্য কাহার শ্রীবাস ঠাকুর আঙ্গিনাতে—
অদ্বৈতেরই তুলসীপাতা আন'ল কারে গোলোক হ'তে—
নিতাই হয়ে কাহার কাছে বিশ্বরূপ সে দিল ধরা ?
শচী-মায়ের নিমাই সে যে——সে যে আমার পাগল গোরা।

কুসুমপেলব অঙ্গ কাহার লুট্‌'ত ধরায় সঙ্কীর্ত্তনে—
রক্ত হ'ত পট্টবস্ত্র— ফির'ত দৃষ্টি শূন্যপানে—
অরুণ বরণ অপাঙ্গে কার শ্রাবণেরই বইত ধারা ?
শচী মায়ের নিমাই সে যে— সে যে আমার পাগল গোরা !

নিতাই কাহার, নাম বিলা'ল— অঙ্গে নিল কলসী কানা—
ব'ল্ল হেসে, "মেরেছিস্ ভাই, তা ব'লে' কি প্রেম নিবি না ?—
অকূল কাহার রূপ সায়রে ডুব্‌'ল নদে' আকুল-পারা ?
শচী-মায়ের নিমাই সে যে— সে যে আমার পাগল গোরা !

(২)

বল্ দেখি কে নদে' ছেড়ে, ছুটে' এল তোদের মাঝে—
তোদের বুকে শান্তি দিতে কন্থা নিল দীনের সাজে—
তোদের লাগি গৃহ-ত্যাগী বইল তোদের পাপের ভরা ?
শচী মায়ের নিমাই ও যে— ও যে তোদের পাগল গোরা !

কার অভাবে চূর্ণ হ'ল শচী মায়ের পরাণ খানি—
শুষ্ক হৃদয় বিষ্ণু-প্রিয়ার— ফোটে না তার করুণ ধ্বনি—

স্পন্দহীন আজ ভক্তদেহ— জ্যোতিঃহীন তার আঁখির তারা?
শচী মায়ের নিমাই ও যে— আজ যে তোদের পাগল গোরা!

* * * *

নীলাচলে সাগর-কোল, ছুটল কাহার প্রেমের নদী?—
সিন্ধু তাহার জগদ্বন্ধু— তীরে তাহার নিরবধি
নীপের মূলে লহর তুলে বাজতো শ্যামের সপ্তস্বরা—
শচী মায়ের নিমাই সে যে— সে যে তোদের পাগল গোরা!

"রায়ের" মুখে রাইয়ের কথায় লুটত কেবা ভূমির' পরে—
পদ্ম-পায়ে রুদ্ররাজা বিকিয়ে' গেল নিখিল তরে—
সার্ব্বভৌমের মানস ভূমে মূর্ত্তি কাহার হৃদয়-জোড়া?
শচী মায়ের নিমাই সে যে— সে যে তোদের পাগল গোরা!

আঁকা কাহার পায়ের চিহ্ন দাক্ষিণাত্যের পুণ্য বুকে—
আজও সেথা ফোটে ওঠে স্মৃতি কাহার ভক্ত-মুখে—
আহ্বানে কার তুকারামের হৃদয়-পুরে পড়লো সাড়া?
শচী মায়ের নিমাই সে যে— সে যে তোদের পাগল গোরা!

কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দারণ্যে বৃন্দাদেবীর মর্ম্মব্যথা
কে ঘুচা'ল— কে শোনা'ল পুরাতন যে প্রীতির গাথা—
লুট'ল "প্রকাশ" কাহার পায়ে?— রইল না তার দণ্ডকরা—
শচী মায়ের নিমাই সে যে— সে যে তোদের পাগল গোরা!

তত্ত্ব যাহা ব্যক্ত নহে, আস্বাদি' তা রায়ের সাথে,
ব্রজের ভাবে বিভোর কেবা— আত্মহারা গম্ভীরাতে—
কাহার চোখে চাঁদের আলোয় উঠত ফুটে গোপিকারা?
শচী মায়ের নিমাই সে যে— সে যে তোদের পাগল গোরা।

বল দেখি আজ, নিজকে যেজন বিলিয়ে, দিল তোদের তরে
তোদের মুখে দেখতে হাসি কাঁদ'ল যেজন দ্বারে দ্বারে—
নামের বেশে, এসেছে সে;— মুখ ফিরিয়ে' রইবি তোরা?
একা শচীর নিমাই নয় সে— সে যে তোদের পাগল গোরা!

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রচন্দ্র।

—:o:—

ভক্ত কাঞ্চনদাস।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আসামপ্রদেশ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আইসে। এই সময় গোয়ালপাড়ায় রাজকর্ম্মচারীগণের প্রধান আড্ডা ছিল। বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী গোয়ালপাড়ায় অবস্থিতি করিতেন। সেই সময় বাঙ্গালীতে গোয়ালপাড়া ভরিয়া গিয়াছিল। উকীল, মোক্তার, ডেপুটী, মুন্সেফ, শিক্ষক, কেরাণী কর্ম্মচারী সবই বঙ্গালার লোক—যেন একটী বাঙ্গালী উপনিবেশ। সমগ্র আসামের মধ্যে একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলাতেই বঙ্গদেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। গোয়ালপাড়ায় ইংরাজ বাঙ্গালীতে বেশ সদ্ভাব-সম্প্রীতিতে বাস করিতেন। বড় বড় সাহেব-কর্ম্মচারী প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। সেকালে যাহারা চাকরী করিত, উৎকোচ গ্রহণের জন্ত তাহাদিগের হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত থাকিত। তাই সেকালে রংপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে চাকরী করিয়া কত বাঙ্গালী লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে,—কত ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছে। উৎকোচ-গ্রহণ ব্যতীত সেকালের চাকুরীয়াদিগের দুশ্চরিত্রতাও আর একটী প্রধান দোষ ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী কাঞ্চনদাস গোয়ালপাড়ায় অবস্থিতি করিয়া সেই সময়ের স্বার্থপর বাঙ্গালী মধ্যে ত্যাগের মহান আদর্শরূপে বিরাজিত ছিলেন। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহার পবিত্র জীবনের কথঞ্চিত আলোচনা করিব।

সে সময়ে শ্রীযুক্ত কর্ণেল এগ্নিউ সাহেব গোয়ালপাড়ায় ডেপুটী কমিসনার ছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে কাঞ্চনদাস গোয়ালপাড়া আসিয়া উপস্থিত হন। প্রথমতঃ সকলেই তাহাকে পাগল মনে করিত, কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই লোকের পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অনেকেই বুঝিতে পারিল কাঞ্চনদাস একজন মহাপুরুষ। সাধনায় গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাই সাধারণে তাঁহার কার্য্যকলাপ গুণময়ী বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সাধারণ সাধুর সহিত তাঁহার কোন বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই, গৃহস্থের ন্যায় তিনি নিয়ম-নিষেধেরও বিধিপালন করিতেন না। কাজেই সাধারণ হিন্দু এই প্রকার হিন্দুকে উন্মত্ত ব্যতীত আর কি বলিবে? কিন্তু ক্রমশঃ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হিন্দু বুঝিতে পারিলেন যে, কাঞ্চনদাস প্রকৃত পাগল নহেন—তিনি ভগবৎ প্রেমোন্মাদ। তাহার কোন কোন কার্য্যে বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরও সহানুভূতি ছিল। এমন কি বড় সাহেব কর্ণেল এগ্নিউ পর্য্যন্ত কাঞ্চনদাসের অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কাঞ্চন দাসের কোথায়—কবে জন্ম হইয়াছিল, তিনি কোন কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। পাগলের মুখে ভ্রমক্রমেও সে কথা কোন দিন বাহির হয় নাই। তিনি কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধু ছিলেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতেন না। তবে ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন—জাপক ও ভক্তিপথের

সাধক ছিলেন। ভক্তিতেই তিনি ভগবানকে আপনার হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ভগবানের প্রেমে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন—তাঁহার প্রেমরসার্ণবে চির-দিনের তরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন।

গোয়ালপাড়ার কাছারীর সম্মুখে একটী বৃক্ষতলে কাঞ্চনদাস অবস্থিতি করিতেন। ভীষণ বর্ষা বা দারুণ শীতে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে তিনি সমভাবে বসিয়া থাকিতেন। আপন মনে হাসিতেন, গাহিতেন, কাঁদিতেন নাচিতেন— কখন বা যেন কাহারও সহিত আপন মনে কথা বলিতেন। সাধারণের সহিত খুব অল্প কথা বলিতেন, তাহাও অসংলগ্ন ও পাগলামীপূর্ণ। আবার সময়ে দু একটী অধ্যাত্ম-উপদেশ পূর্ণ বাক্যও বলিয়া ফেলি-তেন। তবে কথাগুলি এতই প্রহেলিকাপূর্ণ ছিল যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্মরহস্য সাধরণের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। মন্ত্র বা নামজপ ব্যতীত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহাকেও তিনি অন্য কোন উপদেশ কখনই দেন নাই। তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া কোন দিন নিজের আহারীয় সংগ্রহ করেন নাই। যে যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিয়া যাইত, তদ্দারা উদর পূর্ণ করিয়া আনন্দে বসিয়া থাকিতেন। আহার সম্বন্ধে জাতি-বিচার ছিল না—যে যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন, তাহাই বালকের ন্যায় আনন্দে ভক্ষণ করিতেন।

পাগল কাঞ্চনদাসের এই সব পাগলা অভিনয়ের মধ্যে দৈনন্দিন একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান ছিল, সেটী সেবাব্রত। প্রত্যহ বেলা আট, নয়টার সময় তিনি ভিক্ষাকরিতে বাহির হইতেন। ভিক্ষা করিয়া যে দু' চারিটী পয়সা পাইতেন, তদ্দারা চাউল কিনিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ঠিক কাছারির সাম্‌নে এক গাছতলায় তাহা রন্ধন করিতেন। পরে অন্ধ, আতুর বৃদ্ধ ও বালকগণকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে ব্রহ্মপুত্রে বেশকরিয়া স্নান করা-ইতেন, পরে সেই ভাত ও দৈ শাল পাতায় করিয়া খাইতে দিতেন। কিন্তু সেই দৈভাত নিজে কখন খাইতেন না—তাহা সাধারণের স্বেচ্ছাদানে সম্পাদিত হইত; নিজের জন্য তাঁহার কোনই চেষ্টা ছিল না। যখন সকলে খাইতে বসিত, তখন তিনি দূরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেন, আর মৃহু মৃহু হাস্য করিতেন। কোন দিন বা নাচিয়া নাচিয়া ভোজন আরতি গাহিয়া বেড়াইতেন। তিনি যে কিভাবে এইসব অনাথ-নারায়ণের সেবা করিতেন তাহা অন্যে কি বুঝিবে? কিন্তু বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে সেবা যে দেখিত সেই মোহিত হইয়া যাইত—স্বকার্য্য ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া লোকে তাহা দেখিত। কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। আহা-রান্তে কাঞ্চনদাস নিজেই সেস্থান পরিষ্কার করিতেন—উচ্ছিষ্ট পত্রাদি ব্রহ্মপুত্রে ভাসাইয়া দিতেন। এইগুণে সাহেবেরাও কাঞ্চনদাসের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার পাগলামীর অত্যাচার হাস্যমুখে সহ্য করিতেন।

কাঞ্চন দাসের তিনটী ভাব দেখা যাইত। আনন্দ, ক্রন্দন ও ক্রোধ। আনন্দ—সে যে আনন্দ, তা যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান যায় না। বাবাজী আনন্দে উন্মত্ত; চোখ মুখদিয়া যেন সে আনন্দ ফুটিয়া বাহির হই-তেছে। প্রতি রোমকূপ দিয়া যেন ছুটি-তেছে,—সে যেন আনন্দের একখানা জীবন্ত

ফটো। হাড়, মাস গলিয়া যেন আনন্দ জমাট বাধিয়া গিয়াছে; আর বালকের মত মুখের দুই কস দিয়া লালা পড়িতেছে। আবার কখন পথে পথে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন, যেন তাঁহার কি ভয়ানক ইষ্টনাশ হইয়াছে। সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের কারণ কেহ না জানিলেও যে দেখিত, তাহারই হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। প্রাণের মধ্যে কোন করুণ রাগিনী বাজিয়া উঠিত। তাহাদেরও কাঁদিতে ইচ্ছা করিত, বাবাজীর নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,—তিনি প্রাণ উঘারিয়া সন্তানহারা জননীর ন্যায়, পতিহারা সতীর ন্যায় আকুল ক্রন্দনে দিগন্ত আকুলিত করিয়া তুলিতেন। তাহা আবার অল্প সময় নহে, একবার ক্রন্দন আরম্ভ হইলে তিন, চারি ঘণ্টার মধ্যে তাহার আর নিবৃত্তি হইত না। আবার তাঁহার রাগ সেও আশ্চর্য্য। আছেন, আছেন আর লাফাইয়া উঠিতেছেন। যেন আকাশ কি বাতাসের সহিত বিবাদ করিতেছেন। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ—হস্তে হস্তে নিষ্পেষণ করিতেছেন, রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছেন। চোখ, মুখ, কাণ, বুক প্রভৃতি জবাফুলের ন্যায় লাল হইয়া উঠিত। সে রাগ আর পড়ে না; কিন্তু সবই অপার্থিব।

কাঞ্চনদাস সময় সময় সরকারী কাছারীর বারাণ্ডায় মাটীতে পড়িয়া থাকিতেন। কখন কখন আদালত গৃহাদি খোলা হইয়াছে, কিন্তু হাকিম আসেন নাই, কাঞ্চনদাস যাইয়া হাকিমের আসনে উপবেশন করিয়া বিচার করিতে বসিয়া যাইতেন। সে বিচারে কেবল কর্ম্মচারীগণের উপরেই দণ্ড প্রদত্ত হইত। কত [illegible] ভয় প্রদর্শন করিয়াও তাঁহাকে এজলাসের বাহির করিয়া দিতে পারিত না। বড় বড় সাহেবদিগের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করে দেখিয়া সাধারণে কিছু বলিতেও সাহস করিত না। একদা কাঞ্চনদাস বেলা দুইটার সময় জজআদালতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য পিটাঘড়ীতে অনবরত মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। জজসাহেব বিরক্ত হইয়া কারণ অনুসন্ধানে পাগলের কাণ্ড বুঝিতে পারিলেন। তিনি রহস্য দেখিবার জন্য কাঞ্চনদাসকে ডাকাইয়া ধমকাইলেন, এবং সরকারী ঘড়ী কেন পিটিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চনদাস নির্ভয়ে বলিল, "সাহেব! আমিও সরকারী লোক, ঘড়ী পিটিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই নিজের ঘড়ী বাজাইলাম।" সাহেব তাঁহাকে কয়েদ করিবার জন্য জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। কাঞ্চনদাস হাসিমুখে জেলে প্রবেশ করিয়া এদিকে ওদিকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একখানা ভীষণ ভীমরুলের চাক দেখিতে পাইলেন; অমনি বালকের ন্যায় উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহাতে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভীমরুলের দল চাক ছাড়িয়া ইতস্ততঃ উড়তে লাগিল, আর কয়েদী, পাহারাওলা প্রভৃতি যাহাকে পাইল তাহাকেই দংশন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে জেলখানার শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া গেল। প্রাণের দায়ে যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল, সেই অবকাশে কাঞ্চনদাসও বাহির হইয়া গেলেন। সাহেব শুনিয়া আপন নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অনুশোচনা করিলেন। পাগলের সহিত রহস্য করিতে

খাইয়া যে ভীষণ ফল হইল, তাহাতে গোয়ালপাড়ার অনেকরই বিশেষ শিক্ষালাভ হইয়াছিল

কাঞ্চনদাস কাহাকেও ভয় করিতেন না। মুখের উপর সাচ্চা কথা শুনাইয়া দিতেন। তিনি আদৌ তোষামোদ জানিতেন না। বড় বড় সাহেব তাঁহাকে খাতির করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কাহাকেও আমলে আনিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোয়ালপাড়ায় কর্ণেল এগ্নিউ তখন বড় সাহেব। বাবাজী কাছারীতে ঢুকিয়া এজলাসের দিকে তাকাইয়া বলিতেন; "মার বড়া সাহেবকো দশ জুতো।" সাহেব কিন্তু তাহাতে কিছু বলিতেন না। একে সাহেব, তাতে মিলিটারী, একজন দেশীয় লোক তাঁহাক গালি দেয়, অথচ তিনি কিছু বলেন না, ইহাতে লোক আশ্চর্য্য হইতে পারে, এজন্ত সাহেব এজলাসের লোকদিগকে জিজ্ঞাস করিতেন,—"দেখ কাঞ্চনদাস আমাকে গালি দেয়, অথচ আমি কিছু বলি না, তোমরা ইহাতে কি মনে কর।" কেহ কেহ বলিল, "হুজুর, ও সাধু পাগল।" সাহেব বলিতেন, "না, সে জন্ত না, দেখ এই পাগল ভিক্ষা করিয়া যাহা পায়, তাহা নিজে কিছু খায় না, গরীব দুঃখীকে খাওয়ায়—এত বেশ কাজ, তাই আমি উহাকে আন্তরিক ভালবাসি এবং উহার সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করি।" একবার সাহেবেরা যুক্তি করিয়া কাঞ্চনদাসকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া নৌকায় তুলিয়াছেন। বাবাজী আকাশভেদী চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। কাছারীর সব আমলা ব্যাপার কি দেখিতে গেল। গিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক। কাঞ্চনদাস বলিতেছেন, "সাহেব! আমাকে কোথায়—কি জন্ত লইয়া যাইবে।" সাহেব বলিলেন, "তোমাকে কলিকাতায় নিব। তুমি এমন ভাল মানুষ ছিলে হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছ, তাই চিকিৎসা করাইয়া তোমাকে ভাল করিবার জন্ত কলিকাতায় লইয়া যাইতেছি।"

কাঞ্চনদাস হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব তুমি কি পাগল! আমার এ পাগলামী কি সারে?"

সব লোকে হাসিয়া উঠিল। সাহেব কোন কথা না শুনিয়া বজরা খুলিতে আদেশ দিলেন। কাঞ্চনদাস ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তীরে নামাইয়া দিলেন। পাঠক! কথাটা বুঝিলেন কি! সাহেবদিগের দেশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে দান ধর্ম্ম (Charity) টা প্রচলিত আছে, তাই তাঁহারা কাঞ্চনদাসের সেটা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। বাবাজী গালিদিলেও সেইজন্তই সাহেবেরা কিছু বলিতেন না। কিন্তু ভগবৎ প্রেমোন্মাদ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের আদৌ ধারণা নাই। তাঁরা তা দেখেন নাই বা শুনেন নাই, বুঝিবেন কি করিয়া। তাই মহারাজা রামকৃষ্ণের সম্পত্তি নীলাম ও জয়কালীর ভোগের কথা শুনিয়া বলিতেন, "রাজাটা কি পাগল!" কোন জাতি যে আমাদিগকে চিনিতে পারে না, কেবল জলের উপর তেলের মত ভাসে, তার মূল সূত্র এই জায়গা। এইটাই ভারতের বিশেষত্ব!—গঙ্গা হিমালয়ের বিশেষত্ব!—বেদের বিশেষত্ব!!!

কাঞ্চনদাসের এইরূপ সাধুচরিত্র ব্যতীত তাঁহার সাধক জীবনের কিছুই জানিবার উপায়

নাই। বহু চেষ্টা করিয়া কাঞ্চনদাস সম্বন্ধে আর কোন বিষয়ই আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার জীবিতকালে অধিকাংশ লোকই তাহাকে পাগল বলিয়া জানিত। কাজেই কেহ তাঁহার প্রথম জীবনের কথা, সাধন-ভজনের কথা সে সময় জানিতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু কাঞ্চনদাসের মৃত্যুর পর সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। জীবিতকালে সাধুকে সাধু বলিয়া চিনিতে না পারা প্রকৃত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যাহাহউক, আমরা তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একদিন প্রাতে কাঞ্চনদাসকে কিছু অধিক প্রফুল্লবোধ হইল। তিনি যেন আজ অধিক ব্যস্ত। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর বলিতেছেন, "পাগল চলিল, তোমরা বিদায় দাও।" কেহ সে কথা বিশ্বাস করিল, কেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু বেলা দুই প্রহরের সময় কাছারীর সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের তীরে শত শত লোক সমবেত হইতে লাগিল। কাঞ্চনদাস যথারীতি প্রতিদিনের ন্যায় দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা সমাধা করিয়া ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে নামিয়া গেলেন। একগলা জলে নামিয়া উত্তরদিকে স্থিরভাবে মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময় নদের তীরে একদল রাজবংশী ৺হরিসংকীর্ত্তন করিতেছিল। হঠাৎ সকলে দেখিল নদীর স্রোতে কাঞ্চনদাসের দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। অমনি শত শত কণ্ঠে হরিধ্বনি উঠিল। দুই জন লোকে জলে নামিয়া প্রাণহীন দেহ নদের তীরে লইয়া আসিল। সকলে দেখিল কাঞ্চনদাস নিত্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মিলিয়া মৃত দেহের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ফুল-ফুলের মালায় শবদেহ ঢাকিয়া গেল। সাহেব-মেমেরাও কাঞ্চনদাসের পরিত্যক্ত দেহে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পুনরায় সেই পূতদেহ ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

দীন—চিদানন্দ।

———:0:———

যোগানন্দ-লহরী।

(৭)

(কীর্ত্তনের সুর)

আয়রে সবে প্রেমানন্দে জয় গুরু বলে।
(সবে) জয় গুরু জয় বলে নাচ দুবাহু তুলে॥
কর গুরু নাম সার,
প্রেম করুণা আধার,

এমন শান্তিদাতা মধুর নাম নাই যে কোথা ভূতলে ॥
(গুরু জয় বলরে)
এ নাম গাহ অবিরাম,
যদি যাবে মোক্ষ ধাম,
(ওরে) পাপ তাপ দূরে যাবে অভয় নামে মাতিলে ॥
(গুরু জয় বলরে)
দিন যায়রে বিফলে,
আছ কেমনে ভূলে,
(ভাইরে) মায়া মোহ কেটে যাবে গুরুনাম হিল্লোলে ॥
(গুরু জয় বলরে)
তারক ব্রহ্ম গুরু নাম,
করে প্রেমানন্দ দান,
(ও ভাই) আর কত কাল ঘুমে রবে জাগরে সবে মিলে ॥
(গুরু জয় বলরে)
যদি তরবিরে হেলে,
আয় না গুরু পদতলে
(এমন) পতিতপাবন অনাথশরণ কে আছে ভুমণ্ডলে ॥
(গুরু জয় বলরে)
ভবে ভাবনা কিরে আর
দয়াল গুরু কর্ণধার
(দীন) যোগেন বলে কুতুহলে ভবপারে যাবে চলে ॥
(গুরু জয় বলরে)

---:0:---

মৃত্যু ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রয়ান ব্যাপারটী বড়ই গুরুতর ; কেননা, জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিলেই যাতনাময় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে যে তাহার ভাগ্যে কি দাঁড়াইবে, তাহা কে জানে ! মানুষ মরিয়া যে মানুষই হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই

"কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কাম-ভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।" অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডক, ২য় খণ্ডের ২য় মন্ত্র; অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিমানবশতঃ কামনা করে, তাহার কামনা বলে বিশেষ বিশেষ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

"দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ।
মনু, ১২শ অঃ।

অর্থাৎ—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত, রাজস ব্যক্তিগণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত এবং তামস মনুষ্যগণ নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাহারা তামসিকপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহারা মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ, ভোগদেহ প্রভৃতির শেষে "নিকৃষ্ট যোনি" কিনা দংশ-মশক, শৃগাল-কুকুর, কাকাদি পক্ষী, সর্প-বৃশ্চিক প্রভৃতির দেহ প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণু-সংহিতার ৪৩শ অধ্যায়ে এই সব তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। শাস্ত্র বলেন "নিকৃষ্ট-যোনি" বলিতে ৮৪ লক্ষ প্রাণীদেহ বুঝিতে হইবে।

"চতুরশীতি লক্ষাণি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ। অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ। একবিংশতি লক্ষাণি অণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ, স্বেদজাশ্চ তথা প্রোক্তা, উদ্ভিজ্জাশ্চ ক্রমেন তু। জরায়ুজাস্তথা প্রোক্তা মনুষ্যাদ্যস্তথা পরে।"—গরুড় পুরাণ, ১৬শ অঃ

অর্থাৎ—৮৪ লক্ষ প্রাণী আছে। জরায়ুজ ২১, অণ্ডজ ২১, উদ্ভিজ্জ ২১, এবং স্বেদজ ২১ লক্ষ। তামসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি-দিগেরই এই ৮৪ লক্ষ যোনিতে অধোগতি হইয়া থাকে।

সুতরাং মৃত্যু তাহাদিগেরই ভয়ের বিষয়। কেন না মৃত্যু হইলেই তাহাদিগের দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সুখ ফুরাইল। তার পরেই তাহাদের দুঃখের দিন আগতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই হিসাবেই মৃত্যু ভয়ের জিনিষ; নচেৎ খাঁটী 'মৃত্যু' ব্যাপারটীতে ভয়ের বড় একটা কিছু নাই।

যাহারা রাজসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন তাহারা মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। জঠর-যাতনা অবশ্য তাহাদিগকেও ভুগিতে হয়। সুতরাং মানুষ হওয়া যে একটা বড় কিছু লাভ, তাহা নহে। নিকৃষ্ট-যোনি অপেক্ষা অবশ্য ইহা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। তবে মানুষ জন্মটাকে 'দুর্ল্লভ' জন্ম বলে কেন? উত্তর—এই জন্ম হইতে সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন দ্বারা দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্তি ঘটিতে পারে; এইজন্যই "দুর্ল্লভ"। এতদ্ব্যতীত ৮৪ লক্ষ যোনির দুঃসহ, অপরিসীম দুঃখের পর মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে। অতি দুঃখেই ইহার প্রাপ্তি ঘটে, এজন্যও ইহাকে দুর্ল্লভ বলা যাইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে, জঠর-যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে যদি প্রাণ আকুল ব্যাকুল হইয়া থাকে, যদি দেবত্ব লাভের স্বপ্নসুখ প্রাণের অন্তস্তলে স্ফুরিত হইয়া থাকে,—তবে অহোরাত্র কঠোর সাধনা দ্বারা সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইবার প্রয়োজন। সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট মৃত্যু বড়ই বাঞ্ছিত, বড়ই আকাঙ্ক্ষিত।

জীবাত্মার প্রয়াণ ব্যাপারটী মানবের প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। পুণ্যবানগণের প্রাণ-নির্গম ঊর্দ্ধরন্ধ্র, অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি

দ্বারা হয়, যোগিগণের ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণ-নির্গম হয়, আর পাপিষ্ঠগণের অধোমার্গে প্রাণ বহির্গত হয়।”—(ধর্ম্মসিদ্ধান্তঃ, ৪৯ পৃষ্ঠা)। স্থূল দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মার গতির জন্য দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। পুণ্যবানগণ যে পথে যায়, তাহাকে ‘দেবযান’ ও পাপাত্মাগণ যে পথে যায়, তাহাকে ‘পিতৃযান’ বলে।

“অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।—
গীতা, ৮।২৪।

অর্থ—যেস্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি দিন, শুক্লপক্ষ, ছয়মাস উত্তরায়ণ আদি স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযানমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষ সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

“উপাসক ব্যক্তি প্রথমতঃ অর্চ্চিরাভিমানিনী দেবতাকে, তৎপরে দিনাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর ছয়মাস উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে, তৎপশ্চাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, এতদনন্তর সূর্য্যকে, সূর্য্যের পর চন্দ্রকে, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হয়েন। সেইখানে অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।”—(শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর “গীতা-সন্দীপনী” ৩২৪ পৃষ্ঠা)।

“ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।—
গীতা, ৮।২৫।

অর্থ—যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ও ছয়মাস দক্ষিণায়ণ ইত্যাদি স্থিতি করিতেছে, সেইখানে গমন করিয়া কর্ম্মিপুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন, এবং কর্ম্মফল ভোগ করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন।

“চন্দ্রলোক পুণ্যভোগের স্থান। পুণ্য-ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। এ মার্গের নাম—পিতৃযান।”—গীতা সন্দীপনী, ৩২৫পৃষ্ঠা।

এখন কথা হইতেছে, আমাদিগের জীবন-যাপন প্রণালীটিই ভয়ের বিষয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদিগের মনটীকে যেমন গঠন করিয়া তুলিতেছি, আমাদিগের পারলৌকিক ভাগ্যও তদনুরূপ হইবে। অতএব আমাদিগের ভাবী শুভাশুভ আমাদিগের দৈনিক জীবনের কার্য্যগুলির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম আমাদিগের বর্ত্তমান জীবন বড়ই সমস্যার স্থল। এই জীবন পথটী বড়ই পিচ্ছিল! এখানে সাবধানে পাদ-বিক্ষেপ করিতে পারিলে পরিণামে দিব্য, দেহ লাভ করিয়া বিমল শান্তি উপভোগ করিতে পারা যায়; আবার যৎ-সামান্য পাদস্খলন হইলেই কুচিন্তার, কুবাসনার একটী অস্ফুট রেখাও চিত্ত-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইলে, অমনি ভীষণ “অরব”—“রৌরব”—কুম্ভীপাক রৌরবাদির গভীর গহ্বরে নিপতিত হইয়া জীবকে ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতে হয়। হয়তঃ অজ্ঞাতসারে সেই কুম্ভীপাকের পথই আমরা প্রশস্ত করিতেছি! তাই বলিতেছিলাম মৃত্যু অপেক্ষা জীবন-যাপনই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃত প্রস্তাবে, ‘মৃত্যু’ ব্যাপারটীতে কিছুমাত্র ভয় নাই। মৃত্যুর

নামে যে ভয়, সেটী অজ্ঞানতামূলক সংস্কার-জনিত অলীক। প্রকৃত তথ্য অবগত হইলে ঐ ভয়টুকু আর থাকে না—থাকা উচিতও নহে। তাই বলিতেছিলাম, কেবল মুখস্‌টাই কিম্ভূত-কিমাকার।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

[১২]

এইরূপে উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষণভঙ্গ স্বীকারে লৌকিক, ব্যবহারিক ইত্যাদিতে জাগতিক কোন কার্য্য উপপন্ন হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে সকল কর্ম্মের ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উপলব্ধি ও অনুস্মৃতি থাকায় ক্ষণভঙ্গ অলীক ও অপসিদ্ধান্ত। অনুভবের নামান্তর উপলব্ধি, তাহা দ্বারা উৎপাদ্যমান যে স্মরণ তাহারই অন্ত একটী নাম অনুস্মৃতি। আর এই অনুস্মৃতি, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপলব্ধি করেন, সেই ব্যক্তিতেই সম্ভব হয়। অন্যথায় আমি সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিলাম, আর অন্যে তাহা স্মরণ করিল, এরূপ নিয়ম দেখা যায় না। মনে করুন আমি বহুদিন পূর্ব্বে দিগম্বর বাবুকে দেখিয়াছি, সেই দেখায় তাঁহার চেহারার উপলব্ধি বা অনুভব-জনিত স্মরণ বা অনুস্মৃতি, যদ্যপি আমার অদ্যাবধি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে দিগম্বর বাবু আমার অপরিচিত ও নূতন লোক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কেমন ছিলেন? আপনার সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই ইত্যাদি। এরূপ স্থলে আমার পূর্ব্বে দেখাজনিত জ্ঞানের অনুস্মৃতি বা স্মরণের বিদ্যমানতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, দিগম্বর-বাবুকে দর্শন ও স্মরণ এই ক্রিয়া দুইটীর কর্ত্তা কে? পাড়াগ্রামের লোকেরাও বলিবে যে, সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা আমি, একব্যক্তি অর্থাৎ যে আমি পূর্ব্বে দিগম্বরবাবুকে দেখিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে সেই আমি দেখিতেছি, আলাপ করিতেছি, ও হাস্য কৌতুক করিতেছি ইত্যাদি।

অতএব দর্শন, স্মরণ, উপলব্ধি ও অনুভব ইত্যাদির কর্ত্তা সেই আমি এক ব্যক্তি। সারা জগতের সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকমাত্রেরই এইরূপ প্রতীতি প্রকাশমান আছে। অতএব ইহা সর্ব্বজন-বিদিত, কাহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্যথায় দর্শন, স্মরণ ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা যদ্যপি ভিন্ন ভিন্ন হইত, তাহা হইলে আমি দিগম্বরবাবুকে দেখিলাম, আর আমার স্মরণ ক্রিয়াটা কালীপুর হইতে উপেন্দ্র বাবু করিয়া দিতেন; অর্থাৎ দিগম্বরবাবুকে স্মরণ করা কাজটা আমার আর থাকিত না, কেবল দর্শন ক্রিয়াটা থাকিত। আবার

আবার দিগম্বর বাবুকে স্মরণ করা ক্রিয়াটা আমার থাকিলে, দর্শন ক্রিয়াটা বগলাবাবু ঔষধালয় হইতে করিয়া দিতেন। হয়তঃ আমার উপলব্ধিটা থাকিল, আর অনুমানটা হাজিপুর হইতে জানকীবাবু করিয়া দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দিগম্বরবাবুকে স্মরণ, দর্শন ও উপলব্ধি করণ ইত্যাদি, ক্রিয়া বা জ্ঞান আমার অভি উত্তমরূপ থাকায়, এই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা এক; সেই 'আমি' স্বীকার করিতে হইবে। আমি নিজের উপলব্ধি দ্বারা যেরূপ প্রতীতি করিতেছি, তদ্রূপ সারা জগতের লোককে স্বীয় অনুভব দ্বারা এইরূপ প্রতীতির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। অধিকন্তু ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। যেহেতু মানবের উপলব্ধিই স্বকীয় অনুভবনীয় সদ্ভাব দ্বারা ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ অর্থ-অনর্থ, সম্পদ-বিপদ ও সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ের অনুকুল ও প্রতিকূল বিচার শক্তির উদ্বোধক হইয়া, সকল বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। এইজন্য ইহার আর একটী নাম জ্ঞান, অনুমান, প্রাপ্তি, সঙ্গতি বিং ও উপলব্ধি। এই উপলব্ধির স্বধর্ম্মই উল্লিখিত প্রতীতি স্বীকারের একমাত্র মূলীভূত কারণ হইবে। সুতরাং মুখের কথায় অস্বীকার করিলে চলিবে কেন; অতএব যে ব্যক্তি কোন বস্তু উপলব্ধি করে, তাহার অনুস্মৃতি সেই ব্যক্তিতেই সম্ভব হয়। ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত এবং বিদ্বানবর্গের অনুমোদিত; কদাচ, ম্বদ করিবার উপায় নাই।

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহেন, তাঁহারা কি কোন বিষয়ের উপলব্ধি করেন না? আমি খাইতেছি, দেখিতেছি, হাসিতেছি, গত বৎসর ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়াছি; সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, হরেকান্ত আশী বৎসর জীবিত ছিল, ইত্যাদি বাক্য-কথন দ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ উক্তি প্রয়োগ করেন না? অথবা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অধ্যাপক প্রভৃতি গুরুজনের পীড়াতে রোগের পূর্ব্বাবস্থা কাহার নিকট প্রকাশ করে না? তাঁহাদের যে কোন উপলব্ধি দ্বারা অনুস্মৃতি ও পূর্ব্বানুভবের বিদ্যমানতা প্রতিপ্রাদিত হইবে। ক্ষণেভঙ্গ, ক্ষণেগঠন, বলিলে চলিবে না। অতএব অন্তরে একভাব, আর মুখে এক ভাব দ্বারা যাহারা বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নাশ করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মূল-চ্ছেদক ভণ্ড। আর তাঁহাদের বাক্য "পুতি-কুষ্মাণ্ডায়াতে" ইত্যাদিনা। অর্থাৎ পুতি কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অসার।

পক্ষান্তরে উল্লিখিত মতে পৃথিব্যাদি পরমাণু চতুষ্টয় হইতে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু প্রস্তুত হইয়া, ইন্দ্রিয়াদি শরীরোৎপত্তি ক্রিয়ার পর, ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি; তদ্বারা আমি, তুমি যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান; তদ্ভিন্ন পৃথক জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এই মহাজ্ঞানের পূর্ব্বে, পৃথিব্যাদি পরমাণু দ্বারা যে শরীরাদি উৎপত্তি ক্রিয়া হইতেছে এই ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? যিনি কর্ত্তা, তাঁহাতেই উপলব্ধি, অনুমান ও অনুস্মৃতি ইত্যাদি বস্তুর অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। তিনি অর্থাৎ কর্ত্তাই বলিতে পারেন যে, পরমাণু হইতে জ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে, ইন্দ্রিয়াদি শরীর দেখা দিতেছে, এরূপ হইলে ক্ষণভঙ্গকে, জ্ঞান সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ত্তার উপলব্ধি ও অনুস্মৃতির বিদ্যমানতা

বা অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষণভঙ্গ নিজের ক্ষণিকত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না; জ্ঞানের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সহজ বিচারে প্রতিপাদিত হইবে। অন্যথায় কর্ত্তা অস্বীকার করিলে, কোন বিদ্বান ব্যক্তি স্বীকার করিবেন যে, পরমাণু হইতে জ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে? অহেতুক উৎপত্তিতে পরমাণু মিলন সাধিত হইয়া বিশ্ববিস্তার ঘটিতেছে, বিশেষতঃ সেখানে কেহ সাক্ষী ছিল না, যাহা দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হইবে যে, পরমাণু দ্বারা জ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে, বা সেই বস্তুগুলির নাম পরমাণু; কি মহাপ্রভু, কি যশোবন্ত সিং, কি কেবলরাম তর্কবাগীশ, কিম্বা অলীক, অসার ও তুচ্ছ; যেমন,—যথা নাস্তি নভোবৃক্ষ, যথা নাস্তি মরৌজলম বা যথা বন্ধ্যা সুতোনাস্তি ইত্যাদিবৎ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপকারিদের আর একটী "মহোপদেশ" প্রচলিত আছে। যথা নদীর জল প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তথাপি লোকের মনে ধারণা থাকে যে, কাল যে নদীর যে জলে স্নান করিয়াছি; আজও সেই জলে স্নান করিতেছি। প্রদীপের বা মশালের শিখা সম্বন্ধেও এইরূপ। অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই তৈল হইতে নূতন শিখার উৎপত্তি হইতেছে, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, সেই এক শিখা প্রথমাবধি রহিয়াছে। ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তু ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস হইলেও, "তৎসদৃশ" বস্তু দ্বারা আমরা ক্ষণিককে স্থায়ী বা অক্ষণিক মনে করি। অন্যথায় দেখিতে গেলে সবই ক্ষণিক, জ্ঞান মৃথা; ঈশ্বর অকারণ মাত্র।

ভাল কথা। হিন্দুগণ এক কথায় উত্তর করিবে যে, প্রথমতঃ কারণের অভাবে কার্য্য নাই। কর্ত্তা, আত্মা অথবা জ্ঞান, অস্তিত্বশূন্য বস্তু হইলে, কে উপলব্ধি করিবে, "কল্য নদীতে স্নান করিলাম," অদ্য আবার স্নান করিলাম? আবার এই "কল্য" শব্দটী পূর্ব্বানুভবের বিজ্ঞাপক। সুতরাং ক্ষণভঙ্গের ভিত্তি নাই, অথচ নদীতে স্নান। স্রোতের জল "কল কল রবে" বিভিন্ন পথে দূরে যায়; পরিণামে মহাসাগরে মিশে। তখন নিজের, নদীর জল উপাধি থাকে না, কলকল রব হারায়; মহাসাগরের সহিত "মহাসাগর উপাধি লাভ করে। নষ্ট বা শূন্যে উড়িতে সচরাচর কেহ দেখে না। পরন্তু তথায় তাহার অবস্থিতি পাড়াগ্রামের লোকেরাও অনুমান করে। দেখিতে না পাইলে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বা তাহা অলীক, একথা কেহ মনে করে না। যেমন যে অন্ধ সে রূপ দেখিতে পায় না; যে বধির সে শব্দ শুনিতে পায় না; তাই বলিয়া তাহারা রূপ ও শব্দকে অলীক বলে না। অন্ধকার রাত্রে ঘরে প্রবেশ করিলে, কোন বস্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় না। চক্ষুতে কাজল মাখিলে তাহা দেখা যায় না। আকাশের অতি উচ্চদেশে পাখী উড়িলে তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না। অনন্ত পরমাণু আকাশে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। অধুনা কলেরার বীজাণু আবিষ্কৃত হইতেছে; সেগুলি প্রত্যক্ষের অগোচর। দিবাভাগে নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায় না। তালাবদ্ধ ঘরে বস্তু থাকিলে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মেঘের জল পুষ্করিণীতে পড়িলে, কোনটুকু

মেঘের; আর কোন টুকু পুকুরের জল প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিলে তৈল, পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে ঘৃত, পাষাণে স্বর্ণ আছে; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর তাই বলিয়া কি অন্ধকার রাত্রের বস্তু অলীক হইবে? নয়নাঞ্জনের অস্তিত্ব লোপ করিবে? উড্ডীয়মান পক্ষীর বিদ্যমানতা উড়াইবে? পরমাণু বলিয়া কোন পদার্থ নাই বলিবে? কলেরা ও ম্যালেরিয়ার বীজকে অলীক বলিবে? নিশাভূষণ নক্ষত্রের অস্তিত্ব পণ্ড হইবে? রুদ্ধদ্বার গৃহের বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিবে? মেঘের জল বিলুপ্ত হইবে? তৈল, গন্ধ, ঘৃত ও স্বর্ণের বিদ্যমানতা অস্বীকৃত হইবে? তদ্রূপ নদীর জল মহাসাগরের সহিত মিশিবে, নিজের বিদ্যমানতা হারাইবে কেন? অতএব দেখিতে না পাইলে ক্ষণে ক্ষণে নদীর জল ধ্বংস হয় না, বা একবারে নষ্ট হয় না। নদীর জলে একটী প্রবাহ দূরে গেল, তৎক্ষণাৎ অন্য প্রবাহ আসিয়াও তাহার স্থান পূরণ করিল। এমতে বহমানা নদীর কোন অংশে স্থিত জল ক্ষণিক অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন বা ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, আর কোন অংশের জলটা অক্ষণিক; ইহার নির্ণয় অথবা এরূপ কথা, কোন্ বিদ্বান ব্যক্তি স্বীকার করিবে? দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও বলিবে, জল একবারে নষ্ট হয় না; দূরে অতিদূরে মহাসাগরে মিলিত হয়। দীপশিখা বা মশালের শিখা সম্বন্ধেও তথৈবচঃ; অতএব নদীর জল, দীপশিখা ইত্যাদি উদাহরণে,—'ক্ষণিক' নিজের ক্ষণিকত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না। অনন্তকাল বুঝাইলেও হিন্দু তাহা শুনিবে না। এমন কি ঈশ্বর-বিরোধী বাক্য বিধায়ে, হিন্দুর পাঠশালার ছেলেরাও মানিবে না। স্থূল পার্থিব বস্তুর উদাহরণ, নিত্যবস্তু পূর্ণব্রহ্ম (যাঁহার অস্তিত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইয়া অকাট্য হইবে) নিরূপণের অনুকূল মাত্র। মুখ্য অর্থ হৃদয়ঙ্গমের সহায়কস্বরূপ। অন্যথায় সেখানে এসকল টিকে না; অর্থাৎ "নাস্তৎ কিঞ্চিদর্ত্ততে বস্তু সত্যম্।"

বিশেষতঃ উহা ঈশ্বরবিরোধী বাক্য শুষ্ক তর্ক মাত্র। সুতরাং—"ভ্রাম্বা এবাখিলাস্তেবাং ক মুক্তিঃ কেহ বা সুখম্"।

আবার উল্লিখিত মতে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আকাশ তাঁহাদের নিকট অপরিচিত। কিন্তু শব্দ গুণের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব বা বাস্তবিকতা অনুমান করা যাইতে পারে। যদিও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ, মানুষের প্রবেশ-নির্গম, এদিক-ওদিক গমনাগমন ইত্যাদিতে "অবকাশ বা আকাশ" দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন; তথাপি তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের জটীল ব্যাখ্যা হইতে যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় এইরূপ সারাংশ সংগ্রহ করিতে হয়। যথা—

বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীরের ব্যবধান থাকিলে বা কোন এক খানা ঘর অন্ধকূপ-হত্যার মত একবারে রুদ্ধ হইলে, তাহা ভেদ করিয়া কাহার প্রবেশ-নির্গম বা ভিতর-বাহির করা চলে না; বাহিরের বাতাসও খেলে না। কিন্তু প্রাচীরের ব্যবধান না থাকিলে বা ঘরের একদিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িলে, অনায়াসে সকলেই তাহা দ্বারা প্রবেশ-নির্গম, ভিতর-বাহির ইত্যাদি করিতেপারেন,

বাহিরের বাতাসও পাওয়া যায়। অতএব আমাদের ভিতর-বাহির বা প্রবেশ-নির্গমের এই যে অনুমান, অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমরা কোনটা ভিতর, কোনটা বাহির নির্ণয় করি, সেই অনুমান বা নির্ণয়ের প্রকাশক হইতেছে প্রাচীর বা দেওয়াল। কিন্তু এই প্রাচীর বা দেওয়াল না থাকিলে যে "অবকাশ বা আকাশ থাকে (পাড়াগ্রামে যাহাকে ফাক বলে) তাহাতেও আমাদের প্রবেশ-নির্গম বা কোনটা ভিতর, কোনটা বাহির নির্ণয়ের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। যেহেতু অনায়াসে ভিতর, বাহির করা চলে. অথচ কোনটা ভিতর, কোনটা বাহির সহজে অনুমান করা যায়। এখানে প্রাচীর নাই, অথচ ভিতর-বাহির নির্ণয় হইতেছে। এইজন্য অবকাশ বা আকাশকে,—এখানের প্রবেশ-নির্গম বা ভিতর-বাহির অনুমানের প্রকাশক বলা যায়। সুতরাং প্রবেশ-নির্গমাদি দেখিয়া "অনুমান প্রকাশের কর্ত্তা" আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় বা কর্ত্তার ক্রিয়া প্রবেশ নির্গম প্রভৃতি; অথবা প্রবেশ নির্গমাদি, আকাশের অনুমাপক।

নানা বেশধারী ধর্ম্ম-প্রচারকদের মধ্যে কেহ কেহ উল্লিখিত মতটী যেন তাঁহাদের স্বরচিত ও নিজস্ব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া "স্থানে স্থানে" নূতন শাস্ত্রের "আবিষ্কারক" হইবার আশা করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত হয় যে, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ এই বিশ্বরাজ্যে অনন্ত বেদাদি শাস্ত্রের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সমুদ্ররূপী হইয়া অনাদি অনন্ত কাল বিরাজমান আছে। নূতন আবিষ্কার ত দূরের কথা; তুমি আমি তিনি ইহার কণিকা মাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম কি না, তাহাও সন্দেহ। অতএব তুমি, আমি, সকলে অল্লাধিক সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক যে কোন কথার আলোচনা করিব, তাহা কোন না কোন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইবেই হইবে। যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী, তাহারাই বলিতে পারেন যে, আমাদের কথাগুলি শাস্ত্রের কোথায় কি ভাবে চিত্রিত আছে। তাহারাই জানেন ইহা শাস্ত্রানুমোদিত, কি শাস্ত্রাতীত। জগত্, বেদ (জ্ঞান) ছাড়া নহে। সুতরাং বেদাতীত জগত নয়, জগন্নাথ; যিনি ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান! অনন্ত বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহার অর্থ আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ; তাহার উপরআবার "নূতন আবিষ্কার! যাক সে কথা। নির্গম-প্রবেশ প্রভৃতি আকাশের অনুমাপক। ইহা মহর্ষি সাংখ্যকার স্থির করিয়া গিয়াছেন; অন্যের স্বরচিত নহে।

কিন্তু ইহাতে দুইটী আপত্তি হইতে পারে। প্রথম আকাশকে প্রবেশ নির্গমাদির নিমিত্ত কারণ হইতে হয়। দ্বিতীয়—অবকাশ ও আকাশ একবস্তু হইয়া পড়ে। আকাশ সর্ব্বত্রই আছে। ভিতর বাহির, উর্দ্ধ, অধঃ, সকল বস্তুতেই আকাশ আছে, কেহ বলিতে পারে না যে, এখানে আকাশ আছে, সেখানে নাই। শ্রুতি বাক্যের প্রমাণে ব্রহ্ম বস্তুকে সর্ব্বগতং বর্ণনা করিয়া, অনেক স্থলেই বলিয়াছেন "ব্যাপকমাকাশবৎ" অর্থাৎ পরমব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বস্তু। এই শ্রুতির প্রমাণেও আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্বধর্ম্ম বজায় থাকে। যজুর্ব্বেদের "সর্ব্বব্যাপী সোহচিন্ত্যোহবর্ণ্যশ্চ পুণ্যাত্যজ্জাত্ পূতানি" ইত্যাদি মন্ত্রে আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্বধর্ম্ম প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ

জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র আকাশের অবস্থিতি আছে বা সকল বস্তুই আকাশের কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতএব আকাশ কাহার ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব হইতে পারে না। কোন এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে অভাব, যেমন—আমার সখের ফটোগ্রাফে আমি নাই,—আমাতে ফটোগ্রাফ নাই, এইরূপ ভাবকে ইতরেতরাভাব বা অন্যোন্যাভাব বলে। আকাশ সকল স্থানে থাকায় আকাশ এরূপ নহে। অতএব ঘরের দেওয়াল (যাহা অন্ধকূপ বলা হইয়াছে) বা প্রাচীরের অভ্যন্তরেও আকাশ আছে স্বীকার করিতে হইবে। আকাশকে প্রবেশ-নির্গমের নিমিত্ত-কারণ বলিলে, প্রাচীরঘেরা বাড়ী বা অন্ধকূপ ঘরের দেওয়াল থাকা স্বত্বেও, আমাদের প্রবেশ-নির্গম চলে নাই কেন? এখানে আর দেওয়াল বা প্রাচীরের গণ্ডী মধ্যে আকাশ নাই বলিতে পার না। সকলকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, দেওয়াল বা প্রাচীর বেগের প্রতিবন্ধক বা প্রবেশ-নির্গমের প্রতিবন্ধক। আবার প্রতিবন্ধক বলিলে, বেগের অভাবে কর্ম্মের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ দেওয়াল বা প্রাচীর বেগের প্রতিবন্ধক হওয়ায়, ঘেড়াবেড়া গণ্ডীর মধ্যে আকাশ থাকা স্বত্বেও, আমাদের প্রবেশ-নির্গম বা ভিতর-বাহির কর্ম্ম চলিতে পারে না। সুতরাং আকাশ থাকিলেই, প্রবেশ-নির্গমাদি কর্ম্ম হইবে, বলা যায় না। অতএব আকাশকে প্রবেশ-নির্গম ইত্যাদির নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করা চলে না। অস্বীকার করিলে, সকলকেই পাকা গাঁথুনীর উচ্চ প্রাচীর বা অবরুদ্ধ গৃহের অভ্যন্তরস্থিত (গণ্ডীর মধ্যস্থ) আকাশ লইয়া ভিতর-বাহির করিতে হইবে। ইহা অসম্ভব; সুতরাং বেগের প্রতিবন্ধক অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব প্রবেশ-নির্গমাদির প্রতি আকাশ কোন প্রকার কারণ নহে। এরূপ হইলে অবকাশ ও আকাশ একবস্তু হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে প্রবেশ-নির্গমাদি কর্ম্ম এক এক দ্রব্যে অবস্থিতি; অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিতরে আসে, সেই বাহিরে যায়, যেমন আমি ভিতরে আসি, আবার আমিই বাহিরে যাই। অতএব প্রবেশ-নির্গমাদি কর্ম্ম 'আমি' এক ব্যক্তিতেই থাকে। আমার এই কর্ম্মের সহিত আকাশের "ব্যাপ্তি-নির্ব্বাহক" কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব প্রবেশ-নির্গম কর্ম্ম যাহাতে থাকে, তাহাই ঐ সকল কর্ম্মের সমবায়ী কারণ; আকাশ কর্ম্মের সমবায়ী কারণ নহে। আমি কে? নির্গম হইলেই সব ফাঁক হইবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম যেরূপ আছেন, অনাদি অনন্তকাল সেইরূপেই থাকিবেন আকাশ কদাচ কর্ম্মের সমবায়ী কারণ হইতে পারে না। আবার অসমবায়ী কারণও হইতে পারে না। যেহেতু সমবায় সম্বন্ধ সাহায্যে একাশ্রয়ে যে বস্তু অবস্থিত, সে যদ্যপি কারণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই কার্য্যের অসমবায়ী কারণ বলা যাইতে পারে। যেমন,—বর্ত্তমানে আমরা জ্ঞান ও কামনা-বাসনা রূপ অজ্ঞান লইয়া কাটাইতেছি। আমাদের সহিত বর্ত্তমানে জ্ঞান ও কামনা বাসনা একাশ্রয়ে অবস্থিত। এই জন্য বর্ত্তমান-কামনা-বাসনাকে অথবা কামনা-বাসনা দূরে নিক্ষেপকে, জ্ঞানের অসমবায়ি-কারণ বলা যায়। অর্থ উপলব্ধির জন্য এই উদাহরণ-

গুলি পার্থিব জ্ঞানের বা পার্থিব বিচারের অনুকূল, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কাহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ কাল লোমের রূপ, কাল কম্বল রূপের অসমবায়ী-কারণ; আর কম্বল রূপের সমবায়ী কারণ হইতেছে,—কম্বল। যেহেতু কাল কম্বলের কাল রূপ এবং কাল লোমের কালরূপ, উভয়ে সমবায় সম্বন্ধ সাহায্যে "একাশ্রয়" লোমে অবস্থিত আছে। কিন্তু আকাশ দ্রব্যাশ্রয়ী নহে; অতএব আকাশ কর্ম্মের বা প্রবেশ-নির্গমের অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না। আকাশ নিমিত্ত কারণ হইল না, সমবায়ী কারণ নহে, আবার অসমবায়ী কারণও হইতে পারে না। সুতরাং আকাশ থাকিলেই প্রবেশ-নির্গম হইবে, ভিতর-বাহির করা চলিবে, এই বাক্যের প্রতীতি ভঙ্গদোষ অসম্ভব নহে। অতএব প্রবেশ নির্গম প্রভৃতি, আকাশের প্রমাণ-সিদ্ধ অনুমাপক না হইলেও "ক্ষণেভঙ্গকে" আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করাইতে হইলে, অকাট্য যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। যথা—

শব্দ আকাশের অনুমাপক। অন্যথায় শব্দ কোন দ্রব্যের প্রাগ্‌ভাগ, প্রধ্বংসাভাব অথবা অত্যন্তাভাব হইতে পারে না। ইতরেতরা বা অন্যোন্যাভাব নহে; (উপরে বলা হইয়াছে।) উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তুর যে অভাব, উৎপন্ন হইলে যাহা থাকে না, তাহার নাম প্রাগ্‌ভাব। যাহার উৎপত্তি হয় তাহাকে প্রাগভাব-প্রতিযোগী বলা যায়; যেহেতু যাহার অভাব, সেই বস্তুই অভাবের প্রতিযোগী পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থ সমূহ এখন বর্ত্তমান আছে, সকলেই দেখিতেছে। পৃথিবী জল, অগ্নি ইত্যাদি জানি না, একথা কেহ বলে না। অতএব বর্ত্তমান সমস্ত জগতের লোক, আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে, এরোপ্লেন, মনোপ্লেন, জেপোলিন উড়িতেছে; কাক, চিল, বক, পাখী উড়িতেছে ইত্যাদিতে যাহার প্রতীতি রক্ষা করিতেছে; সেই আকাশ পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থের প্রাগ্‌ভাগ নহে। যেহেতু প্রতীতি-গোচর বস্তুকে অভাব পদার্থ বলা চলে না।

বস্তু বিনাশের পর তাহার যে অভাব তাহার নাম প্রধ্বংসাভাব। বর্ত্তমানে পৃথিব্যাদি পদার্থ উত্তম আকার লইয়া অর্থাৎ সশরীরে বর্ত্তমান। অতএব বর্ত্তমান প্রতীতি-গোচর আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির ধ্বংসাভাব নহে।

প্রাগ্‌ভাব, ধ্বংস ও অন্যোন্যাভাব হইতে ভিন্ন যে অভাব বা অসত্তা, তাহাই অত্যন্ত অসত্তা বা অত্যন্তাভাব। প্রাগভাব এবং ধ্বংস সাময়িক মাত্র। ভেদ রূপান্তরের অভাব, প্রতিযোগী সত্ত্বেও সেই অভাব থাকে। এই সকল হইতে বিভিন্ন যে অভাব, তাহাই ত্রৈকালিক অভাব। অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যাহা ছিল না, থাকিতেও পারে না, সম্ভাবনাও নাই, এবম্বিধ বস্তুর যে অভাব তাহার নাম অত্যন্তাভাব। বর্ত্তমান আকাশ সকলের প্রতীতি-গোচর হইতেছে। সুতরাং ভূতকালে কোথাও ছিল, আবার ভবিষ্যতে থাকাও অবশ্যম্ভাবী; হয়তঃ অতীতের অনন্ত গর্ব্ভে অতীতাতীতের অত্যন্ত কোন কিছুর অভাব হইলেও হইতে পারে; এরূপ ধারণা অসম্ভব নহে। অতএব আকাশ অত্যন্তাভাব নহে। এমতেও আকাশ অবশ্য স্বীকার্য্য।

অন্যথায় দেখিতে হইবে, শব্দ কোথায় থাকিতে পারে। পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যে যে বিশেষ গুণ আছে, তাহা তদীয় সমবায়ি-কারণের গুণ হইতে সম্ভূত। যেমন সাদা কাপড়ের সাদারূপ, সাদা সুতা হইতে উদ্ভূত; কিন্তু শব্দ পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের গুণ নহে। যেহেতু অবয়বের গুণ অবয়বীতে আর অবয়বীর গুণ অবয়বে থাকে; ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন সুতার রূপ কাপড়ে ইত্যাদি। "শব্দ" পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর গুণ হইলে, যে কোন অবয়ব অবয়বীতে থাকিত; পরন্তু তাহা নাই। যেমন ঢাকের শব্দ ঢাকের অবয়বে নাই, তানপুরার শব্দ তানপুরার অবয়বে নাই। অতএব শব্দ পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের গুণ নহে।

শব্দ, মনের গুণ নহে, যেহেতু মনের গুণ প্রত্যক্ষগম্য নহে। শব্দ আমার গুণ নহে; যেহেতু আমার গুণ হইলে যেমন সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হয়, তদ্রূপ "আমি শব্দবান" এইরূপ অনুভব হইত। শব্দ, কাল বা দিকের গুণ বলা যায় না। যেহেতু দিক ও কালের গুণ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং শব্দ আকাশের না হইয়া ভূত প্রেতের গুণ হইবে। শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, উপলভ্যমান বস্তু; অভাবাদি স্বরূপ নহে। অতএব এই শব্দ কোন না কোন স্থানে আছে নিশ্চয় করিতে হয়। কিন্তু সেই স্থানটী কোথায়!

আলোচনা দ্বারা দেখা গেল; পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, কাল, দিক মন ও আমি এই আটটী স্থান শব্দের নহে। ইহা ছাড়া মাত্র আকাশ আছে। অতএব আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধি শব্দ হইতেই হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য" অর্থাৎ পরিশেষাধীন শব্দ, আকাশের অনুমাপক। ইহা বৈনাশিককে স্বীকার করিতে হইবে। মুখের কথায় উড়াইলে চলিবে না।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনায়, দেখাগেল যে, ক্ষণভঙ্গের যুক্তি অপসিদ্ধান্ত, ঈশ্বরবিরোধী বাক্য মাত্র। উহার আশ্রয়ে পরমাণুগুলির ক্রিয়া অসম্ভব। ইহার উপর পূর্ব্বকথিত নিমিত্ত-কারণের আপত্তি সমভাবে বর্ত্তমান আছে। ক্ষণিক পরমাণুর আয়ু শেষ। সুতরাং পরমাণু পরঞ্জয় নহে, পরন্তু পরজিত; কদাচ সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না। পরমাণুর, তুলনায় জ্ঞান ও ভক্তিকে দুই দুই করা দূরের কথা। ক্রমশঃ।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

:0:

অপার্থিব দান।

তোমার সরস বাণী,—তোমার স্নেহের দান,—
তোমার সে আলিঙ্গন,—তোমার প্রেমের গান,
তোমার সে হাঁসিরাশি,—কোমল সরল প্রাণ
ফুটে না ফুটে না বুঝি এ মরতে হায়!

আধার যেমন, তাহে ধরে সেই টুক্,
আভাষে বুঝাও তা'য় দিয়ে সুখ দুঃখ,
ভাঙ্গাও মায়ার ঘোর বুঝায়ে সে টুক্
যে টুক্ লভিয়া সেই প্রাণে আশা পায়।

তোমার যা' কিছু, যদি স্ফুটিত হেথায়,
সাম্যভাব হ'য়ে যে'ত নিমেষে ধরায়;
না রহিত ছোটবড়—গুরুলঘু ভেদ,
সকল বৈষম্য ভাব হইত উচ্ছেদ;
কেবা কার পানে চায়,—কিবা প্রয়োজন!
সংসারের যাহা কিছু—বৃথা আয়োজন?
ধ্যানমগ্ন সদা যোগী যে যেখানে পড়ি,
নিষ্ক্রিয় নির্ব্বাক ভাবে যেত গড়াগড়ি;
জগতের এ দৃশ্য-রাজি হয়ে যেত লয়,
উঠিত সে সাম্যমন্ত্র—আসিত প্রলয়।
তোমার এ খেলা যা'তে হয় প্রভু? শেষ
তাহার কারণ হতে না চাও বিশেষ।

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—:0:—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

গৌরী-কুণ্ড।

২জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।—অদ্য প্রাতে আমরা পাণ্ডার সহিত ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রথমতঃ মার্জ্জন, তর্পণাদি করিয়া কুণ্ডের নিকটস্থ মন্দির মধ্যে গৌরী-শঙ্কর দর্শন করিতে গেলাম। দর্শন অন্তে তপ্তকুণ্ডে গিয়া পুনর্বার মার্জ্জন তর্পণাদি করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। অদ্য একাদশী। কাজেই আর পথচলা হইবে না। বিশেষতঃ রাস্তা চড়াইও শঙ্কটজনক এবং তদুপরি আবার বৃষ্টি পতিত হইতেছে। আমাদের এখানকার পাণ্ডা—শ্রীযুক্ত রামধন তেওয়ারী। তাঁহার ব্যবহার মন্দ নহে।

এ স্থানটী ঠিক মন্দাকিনীর উপর। মন্দাকিনীও গৌরীকুণ্ডের বহু নিম্নে নহে। যেন সমতলে অবস্থিত ও ঠিক পার্শ্বদেশ দিয়া গভীর কল্লোল কোলাহলে প্রবাহিতা। এই গৌরীকুণ্ড হইতেই কেদারনাথের পুরী আরম্ভ বলিয়া গণনা করা হয়। এখানে যাত্রীদিগের জন্য আশ্রয় স্থান যথেষ্ট। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশালাও আছে। দোকান অনেকগুলি। তাহাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব নাই। শ্রেণীবদ্ধ ঘরগুলি প্রায়ই দোতালা। সর্ব্বস্থানই যাত্রীতে পরিপূর্ণ দেখিলাম। কেদারনাথ গমনকালে ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে যাত্রীরা এখানে আশ্রয় লয় বলিয়া এখানে প্রায়ই যাত্রীর ভিড় হয়।

গৌরীকুণ্ডের নিকটেই প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে মন্দির এবং মন্দির মধ্যে গৌরী ও শঙ্করের মূর্ত্তি বিরাজিত; গৌরীকুণ্ডের জল সুশীতল। গৌরীকুণ্ডের পার্শ্বেই তপ্তকুণ্ড, ইহার জল বেশ উত্তপ্ত। তপ্তকুণ্ডের ঝরণার মুখ পিতলের 'গোমুখী দ্বারা বাঁধান। খুব জোরে গরম জল ঐ মুখ দিয়া পড়িতেছে। যাত্রীরা সঙ্কল্প পূর্ব্বক উভয় কুণ্ডেই স্নান করেন কুণ্ডদ্বয়ের নিম্নেই প্রখর প্রবাহে শীতল সলিলা মন্দাকিনী প্রবাহমানা।

অদ্য বৈকালে একটী বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, কেদারনাথের রাস্তা অত্যন্ত শঙ্কটা-

কীর্ণও ভয়াবহ। এইহেতু এক জন গুজরাটী বণিক ঐ রাস্তা সংস্কৃত ও সুগম করিবার জন্য ৪লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ রাস্তা মেরামত করিতে ২জন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে একটী মেম সাহেবও আসিয়াছেন। তাঁহারাই শিকারে বহির্গত হইয়াছেন এবং বন্দুকের আওয়াজ তাঁহারাই করিয়াছেন। তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কেদারনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ঐ মহানুভব গুজরাটী বণিকের এইরূপ সাত্ত্বিক দান দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।—অদ্য প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া উভয় কুণ্ডের জলে স্নান তর্পণাদি করিয়া দেবদর্শনান্তে "জয় কেদারনাথ কি জয়" বলিয়া কেদারনাথ রওনা হইলাম। অনবরত পথ হাটিয়া বেলা ১২টার সময় রামবাড়ী চটীতে উপনীত হইয়া একটী দোকানে আশ্রয় লইলাম। অদ্য অত্যন্ত বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বরফপাত হইতেছে। তজ্জন্য বাধ্য হইয়া আহারান্তে তথায়ই বিশ্রাম করিলাম।

এ চটীতে দোকান যথেষ্ট। যাত্রীদিগের জন্য স্থানও যথেষ্ট। কিন্তু গৌরিকুণ্ডে যেরূপ দোতালা দালান এখানে সেরূপ নাই। সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে একটী ঝরণা নামিয়া আসিয়া চটীর মধ্য দিয়া স্থূলধারায় বহিয়া যাইতেছে। তাহারই উভয় পার্শ্বে দোকান-শ্রেণী। এই দোকানশ্রেণীর শেষপ্রান্তেই মন্দাকিনী প্রবাহিতা। এই স্থানটী সমতল। ঘাটে নামিতে কষ্ট নাই। যাত্রীগণ যে দোকানে বাসা লয়, তাহাদিগকে সেই দোকানেই খাদ্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে হইবে; না করিলে সেখানে স্থান পাইবে না। এ নিমিত্ত যাত্রীর উপর অত্যাচারও হইয়া থাকে। তবে আমাদের আশ্রয়দাতা দোকানদার অনেকটা ভাল।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।—প্রভাতে উঠিয়া দেখি আকাশ মেঘনির্মুক্ত। বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। রাস্তাও পরিষ্কার, বরফ পরিবার সম্ভাবনা নাই। দেবতার কৃপায় প্রাণে অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চার হইল। দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল; সুতরাং আমরা আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম; কিন্তু পথে অগ্রসর হইয়া দেখি রাস্তা অতীব দুর্গম, চড়াই উৎরাই ত আছেই, অধিকন্তু বৃষ্টিপাতেও স্থানে স্থানে ঝরণার নিমিত্ত রাস্তার অনেক স্থান ধসিয়া গিয়াছে। পাহাড়ী লোকেরা ঐ সকল স্থানে বৃক্ষশাখা দিয়া ছাউনি করিয়া রাখিয়াছে; এবং উহার উপর দিয়া তাহাদের স্বভাবসুলভ দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল স্থানের উপর দিয়া গমন করিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল। প্রতিপদক্ষেপে পতনের আশঙ্কা। আমরা ত কোনক্রমে ঐ রাস্তা উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু মনে হইল কখন কোন হতভাগ্য ঐ রাস্তা চলিতে চলিতেপদস্খলিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে। আবার স্থানে স্থানে পথের পরিসরও নিতান্ত অল্প। মধ্যে মধ্যে বরফের উপর দিয়াও যাইতে হইতেছে। আমরা ভগবানের অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া চড়াই পাইলাম, দেবদর্শন আশায় আমাদের পথশ্রান্তি

মন্দীভূত হইতে লাগিল। অধিকন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে অন্তঃকরণ কেমন যেন প্রসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। আমরা প্রসন্নমনে চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মন্দাকিনীর উচ্চ তীরভূমির পথ দিয়া চলিয়াছি। স্থানে স্থানে মন্দাকিনী-প্রবাহ তুষারস্তূপ একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে। আমাদের গতিপথেও তুষার বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহা বিদলিত করিয়া চলিয়াছি। যাইতে যাইতে একটী গন্ধকের খনি ও একটী স্থূলাধার ঝরণা পাইলাম সেটী উচ্চস্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রবল-ধারে মন্দাকিনী অভিমুখে গড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা তাহা পার হইয়া চলিলাম। প্রায় দুই মাইল দূর হইতে কেদারনাথের মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যাত্রিগণ একযোগে "জয় কেদারনাথ মহারাজকী জয়" ধ্বনি মুহুর্মুহু করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া একটী প্রশস্ত প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তথায় নীলরঙ্গের ভুঁইচাঁপা ও অন্যান্য পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পবিত্র মুক্ত-বায়ুপ্রবাহ যেন ঘোষণা করিতেছিল যে, কৈলাসধাম নিকটবর্ত্তী। কৈলাস পর্ব্বতের তুষারশুভ্র স্বচ্ছ শৃঙ্গ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর আসিয়া সেতুর উপর দিয়া মন্দাকিনী পার হইলাম। সেতুর অদূরে সরস্বতী গঙ্গা আসিয়া মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অর্থাৎ কেদারনাথের অধিষ্ঠানভূমিকে মন্দাকিনী ও সরস্বতী বেষ্টন করিয়া আছে। কি পবিত্র স্থান! চতুর্দ্দিকে তুষারশুভ্র পর্ব্বতবেষ্টিত ও স্নিগ্ধ পবিত্রধার-নদীযুগলে আলিঙ্গিত কি পবিত্র ক্ষেত্র! এই দিব্যধামের বর্ণনা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে লেখনিমুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় বা ততোধিক।

বদরীনারায়ণ দর্শনের পূর্ব্বেই কেদারনাথ দর্শন করিতে হয়। আমরাও তাহাই করিলাম। কারণ শাস্ত্রবিধি এইরূপ। যথাঃ—

অকৃত্বা দর্শনং বৈশ্য কেদারস্যাঘনাশিনঃ।
যো গচ্ছেৎ বদরীং তস্য যাত্রা নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূর্ব্বং কেদার দর্শনং।
কার্য্যং পুণ্যেপ্সুনা শ্রেষ্ঠিন্ ন ভেদঃ শিবকৃষ্ণয়োঃ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

আশ্রম-সংবাদ।

প্রত্যাবর্ত্তন—গত মাসের ২৫শে তারিখে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীপরমহংসদেব মহারাজ সশিষ্যে হরিদ্বার হইতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ এই সময়ে মঠে আগমন করিলে দর্শন পাইতে পারেন।

—:0:—

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমরা পুলপার হইয়া ঘাটে নামিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাষাণখণ্ডের মধ্য হইতে উচ্ছ্বলিত মন্দাকিনীবারি স্পর্শ করিলাম। ঘাট হইতে উপরে উঠিয়া বাজারের উভয় পার্শ্বস্থিত দোকান ও ধর্ম্মশালার মধ্য দিয়া গিয়া পোষ্টাফিসের নিকটবর্ত্তী একটী দোতালা বাসা ভাড়া করিয়া তথায় আশ্রয় লইলাম।

শ্রীযুক্ত রামধন তেওয়ারি পাণ্ডাজীর উপদেশ অনুসারে মন্দাকিনী স্নানে চলিলাম। ঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নানকরা সঙ্কটজনক বোধ হইল। কারণ তখন দ্বিপ্রহর হইলেও সূর্য্যদেবের দর্শনলাভ অসম্ভব। জলে নামিয়া স্নান করিতে অক্ষম হইয়া কলসমুদ্রাযোগে সপ্তবার গঙ্গাজল মস্তকে অর্পণ করিয়া স্নানকার্য্য সমাধা করা গেল। শাস্ত্রে এরূপ স্নানের বিধি আছে। কাহার সাধ্য সেই তুষারশীতল জলে তিনবার মস্তক নিমজ্জন করে। কাজেই আমরা মুদ্রাস্নান করিলাম। স্নানান্তে গঙ্গার এই স্তবটী পাঠ করিলাম।

> জয় জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে।
>
> হরিপদ কমল, কমল কলদঙ্গে।
>
> টল টল চল টল, চল চল ছল ছল,
>
> কল কল তরল তরঙ্গে।
>
> পুটকিত শিবজট, বিঘটিত সুবিকট
>
> লট পট কমঠ ভুজঙ্গে।

তৎপরে গাঙ্গামাতাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। কেদারখণ্ডে এই গঙ্গা—ক্ষীরগঙ্গা বলিয়া উল্লিখিত। যথা:—

> ক্ষীর গঙ্গাতু যা ধারা মন্দাকিন্যান্ত সঙ্গমে।
> শিবপ্রদং মহাতীর্থং ক্রোশৈকস্থঃ প্রকৰ্ত্তিত।
> যত্র স্নাত্বা নরাশ্চৈহে কৈলাসো নিলয়ে বসেৎ।

স্নানান্তে যথাসাধ্য উপচার সংগ্রহ করিয়া আমরা পাণ্ডাসহ দিব্য সৌরভময় ধর্ম্মচুক্-

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবান কেদারনাথের অর্চনা করিলাম। পরে তাঁহার বিশাল পাষাণময় লিঙ্গ মূর্ত্তি ঘৃতাভাঙ্গ করা হইলে আমরা বক্ষস্থল পাতিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহা স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিলাম। কি সৌভাগ্য! কি আনন্দ! আজ আমাদের কতকালের বাঞ্ছিত আশা পূর্ণ হইল। সমস্ত ক্লেশভোগ সার্থক হইল। সংসারের শত অভাব-আকাঙ্ক্ষা, বিপত্তি-বিড়ম্বনা আজ কিছুই আর মনে নাই। দেবদ্বারে দিব্যধামে কি আর অন্য চিন্তা থাকিতে পারে? আমরা প্রণতি, প্রদক্ষিণ ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া মন্দিরের অন্য প্রকোষ্ঠে অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মীদেবী, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম।

ধনী, দরিদ্র, মধ্যমিত্ত, সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বসম্প্রদায়ের যাত্রী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সাধারণ ও বহুমূল্য উপচারে দেবদেবের অর্চনা করিল ও দানধ্যান করিল। দেবতার অবারিত দ্বারে সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যই সার্থক হইতেছে। পাণ্ডার নিকট শুনিলাম, শ্রাবণমাসে, সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন ঊর্দ্ধ ভাগে ভূরি ভূরি কমলদল প্রস্ফুটিত হয়। পাণ্ডাগণ সবিশেষ ক্লেশস্বীকার করিয়া রাশি রাশি ঐ সকল প্রফুল্ল কমল আহরণ করে। যেমন অন্যান্য দেবস্থানে কোন না কোন বিশেষ বন্দোবস্ত আছে,—যাহা না করিলে কিছুতেই চলিবে না, এখানেও তদ্রূপ একটী কি ততোধিক কমল বাবা কেদারনাথের মস্তকে দিতেই হইবে। এক একটী পদ্মফুলের মূল্য ১০৲ টাকা। যাহার যাহা সাধ্য তিনি সেইরূপই দিয়া থাকেন।

বাবার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অমৃতকুণ্ড আছে। অদ্যাপি তথায় কতক বরফ আছে। চরণামৃত বরফ-মিশ্রিত। আমরা তাহা লইয়া পান করিলাম। এই অমৃতকুণ্ডের সন্নিকটে হংসকুণ্ড ও রেতকুণ্ড নামে দুইটী কুণ্ড আছে, পাণ্ডার উপদেশানুসারে তাহার জলে আচমন করিলাম। বাবার বাড়ী প্রবেশ করিতেই সম্মুখে উদককুণ্ড নামে আর একটী কুণ্ড আছে। তাহার বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা শুনিলাম। ঐ কুণ্ডটী একটী মন্দির মধ্যে অবস্থিত। পাণ্ডার উপদেশানুসারে ঐ কুণ্ডেও আচমন করিতে হইল। এখানে আচমনের ব্যবহার কিছু পার্থক্য দৃষ্টি হইল। প্রথমতঃ বামহস্তের দ্বারা কুণ্ডের জল তুলিয়া আমি "ব্রহ্মা" এই বাক্য বলিয়া জলপান করিলাম, দ্বিতীয় বারে আমি "বিষ্ণু" ও তৃতীয় বারে আমি "শিব" এই বলিয়া জলপান করিলাম। পুনর্বার ঐরূপ দক্ষিণ হস্তে তিনবার ঐ তিনবাক্য উচ্চারণ করতঃ আচমন করিতে হইল। ঐইরূপ ভাবে আচমন করার কারণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, ঐরূপ আচমন করিলে জীবদেহ আর থাকে না, দেবদেহ হইয়া যায়। আমরা আচমনাদি করিয়া পাণ্ডাকে কিছু দক্ষিনাদি দিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। তথায় পাক করিবার সাধ্য নাই, কারণ পাহাড়ের সহিত অগ্নি-সংযোগ হইলেই জল উঠিয়াই অগ্নি-নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। আমার সঙ্গীয় একজন যাত্রী অসুস্থ ছিলেন, তাহার জন্য অন্ন পাকের ব্যবস্থা করিয়া এইরূপে বিফলপ্রযত্ন হইতে হইল। অগত্যা তথাকার লুচী-কচুরী, মোহনভোগ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া

ঐ পীড়িত ব্যক্তি ও আমাদের আহার সমাপ্তি করিতে হইল।

কেদারনাথের মন্দির পাষাণময়। মন্দিরটী অতি বৃহৎ ও প্রাচীন। মন্দিরের সংলগ্ন অনেকস্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেদার-মোহন্ত রাওল সাহেব ঐ ভগ্ন স্থানগুলির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে একটী পাষাণময় বৃহৎ বৃষমূর্ত্তি আছে। কেদারনাথের স্নপন, পূজন, স্পর্শন মার্জ্জন ও আলিঙ্গন সকল কার্য্যেই যাত্রীদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। কেবল পশুপতিনাথে ও সেতুবন্ধে তাহার ব্যতিক্রম আছে। কেদার-নাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতি-র্লিঙ্গ। যথাঃ—

> সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনং।
> উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কার মমরেশ্বরে॥
> কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং।
> বারানস্যঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌমতীতটে॥
> বৈদ্যনাথং চিতাভুমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে।
> সেতুবন্ধেতু রামেশং ঘুসৃনেশং শিবালয়ে॥

কেদারেশ্বরের পুরীতে শীত অত্যন্ত অধিক। শীতকালে সমস্ত পুরী বরফে আবৃত হইয়া যায়। ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুস্পার্শ্ব যেন ক্ষীরসমুদ্রের ধবলপ্রবাহে পরিপ্লুত হয়। পথ, ঘাট, মন্দির, প্রান্তর, পর্ব্বত, জল, স্থল, কিছুই লক্ষিত হয় না। দশদিকে কেবল সেই তুষার ধবল গিরিবরের প্রভাপুঞ্জ স্ফুরিত ও উদ্ভাসিত হইতে থাকে। নিষ্কলঙ্ক, নিত্যশুদ্ধ দেবদেবের পূর্ণ বিভুতি যেন দেশ, কাল, পাত্র, বিলুপ্ত করিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু কে সেই দিব্য শোভার দর্শক! তিনি আপনিই তখন দৃশ্য, আপনিই তখন দর্শক। কেদার-নাথের উত্তর ও পূর্ব্বদিগবর্ত্তী পর্ব্বতের সমগ্র ঊর্দ্ধভাগ এখন—এ জ্যৈষ্ঠমাসেও তুষার স্তূপে সমাবৃত হইয়া কি অপূর্ব্ব ধবল-নির্ম্মল-কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দেবদেবের পূর্ণ অধিষ্ঠান ভূমি বুঝি এমনিই ধবল ও নির্ম্মল হইতে হয়। এই অমলোজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইয়া যেন সদানন্দের উন্মুক্ত অট্টহাস্যের অপূর্ব্ব শোভা-সম্ভার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে। আরও একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ঊর্দ্ধবর্ত্তী ঐ তুষার-সাম্রাজ্যে কত সূক্ষ্ম সুনিপুণ কারুকার্য্যময়, কত কোণ-বিশিষ্ট, কত উচ্চচূড়, উৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহ সারি সারি সুসন্নিবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বুঝি গৌরিশঙ্করের লীলাভূমি, অমরবাঞ্ছিত কৈলাস রাজ্য। আরও একটু ধ্যানমগ্ন হইলে, দর্শক আরও কত সুকৃতিগম্য পরম রম্য দৃশ্য ও ভাববিশেষের আভাষ পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। এখানকার এ দৃশ্য ও ভাব যিনি দেখিয়াছেন ও উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বুঝেন, অপরকে বুঝাইবার মত ভাষা নাই। আবার যিনি যেমন ভাব লইয়া আসিবেন, তিনি সেই-রূপই দেখিবেন। সকল বস্তুই স্থূল-সূক্ষ্ম-ভাবে বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে,—সকলেই কি সে সকল একরূপ চক্ষে দেখিতে পারে? যাহার যেমন জ্ঞান, যাহার যেমন ধ্যান, যাহার যেমন ভাবস্ফূর্ত্তি তিনি তদ্রূপই দেখেন। কিন্তু এখানে আসিয়া যে কেহ অতৃপ্ত হইয়া যাইবেন, তাহা নহে। তাই আমি ধর্ম্মোদ্দেশী তীর্থযাত্রী ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন পথশ্রম-

ভয়ে এই তীর্থে আগমন করিতে কুণ্ঠিত না হন। এখানে পঁহুছিলে পথক্লেশ আর ক্লেশ বলিয়া বোধ হইবে না; প্রত্যুত তিনি আপনাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবেন।

তুষার-পাতের ছয়মাস এখানকার যাত্রা বন্ধ থাকে। দূরবর্ত্তী উখীমঠে ঐ ছয়মাস কেদারনাথের পূজা ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। বৈশাখ মাসের অক্ষয়া-তৃতীয়ায় এবং অবস্থা বুঝিয়া তাহার পূর্ব্বেও দেবদেবের মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়। পাণ্ডাগণ বৈশাখ মাসের প্রথমেই লোক পাঠাইয়া পাহাড় কাটার উপযুক্ত সময় হইয়াছে কিনা অনুসন্ধান লয়েন। যদি উপযুক্ত সময় হয়, তবে তাঁহারা কুলিদিগকে আনাইয়া বরফ কাটাইয়া মন্দির দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া লয়েন। প্রত্যেক কুলি একখানি নৌকা ও করাত লইয়া আসিয়া ঐ বরফ কাটে। তাহাদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি এক টাকা। পাহাড় কাটা শেষ হইলে তাহারা আসিয়া পাণ্ডাগণকে জানাইলে তাঁহারা গিয়া মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন করেন।

এখানকার শীত হাড়ভাঙ্গা; গঙ্গোত্তরী অপেক্ষাও অধিক। পাণ্ডাজী আমাদের জন্য কয়েকখানি তিব্বতীয় কম্বল সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তথাপি ঘরে আগুন না জ্বালিলে আরাম পাওয়া যাইত না। কাষ্ঠ এখানে অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। এজন্য এখানে অনেকে ত্রিরাত্রি বাস করিতে পারে না। বিশেষতঃ এখানে পাক করাও সহজ ব্যাপার নহে। এখানে হালুইকরের দোকান যথেষ্ট আছে। ঐ সকল দোকানে পুরী, তরকারী, মোহন-ভোগ, সন্দেশ প্রভৃতি মিলে। অধিক শীতের জন্য পাহাড় অঞ্চলের অসাধারণ উপদ্রবকারী যে মাছি, তাহা এখানে নাই।

৫ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। অদ্য প্রাতে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তর স্নানতর্পণাদি শেষ করিয়া বাবার মন্দিরে যাইয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনাদি এবং দর্শন স্পর্শন করিলাম। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে, কেদারনাথের নিকট একটী সুরঙ্গ আছে। আর সেই সুরঙ্গ নেপালের বাবা পশুপতীনাথজীর সঙ্গে যোগ আছে। এই সুরঙ্গে স্বর্ণ বা রৌপ্য যাহা দেওয়া যায়, তাহা বাবা পশুপতিনাথজীর মস্তকে পতিত হয়। ঐ সুরঙ্গটী কেদারনাথের অতি সন্নিকট। পাণ্ডাগণকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু বলে না। কোনরূপে ঐ সুরঙ্গের কথা জানিতে পারিয়া যাত্রীরা কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে পুরোহিত পাণ্ডারা নিজে লয়, যাত্রীদিগকে ঐ সুরঙ্গে নিক্ষেপ করিতে দেয় না। ঐ সুরঙ্গের অবস্থিতির বিষয় আমার সহধর্ম্মিনী স্বপ্নে জানিতে পারেন এবং কেদারনাথকে প্রদক্ষিনকালে পুরোহিতগণের অজ্ঞাতসারে ঐ সুরঙ্গে কিছু অর্থ নিক্ষেপ করেন ঐ সুরঙ্গটী বাবার মন্দিরের উত্তরদিকে সংলগ্ন। বাবার মন্দিরের মধ্যস্থিত অন্যান্য দেবদেবী ও জগন্মাতাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলাম। তথা হইতে বাসায় আসিয়া পাণ্ডাকে বিদায় করিলাম। পাণ্ডা বিদায়ের ব্যাপারে অবশ্য যাত্রী ও তাহাদের মধ্যে অশান্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। পাণ্ডারা যাত্রীর সহিত প্রথম যেরূপ ব্যবহার করেন, শেষ ব্যবহারের সহিত তাহার ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন না। যাহা হউক আমরা কোনক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

৬ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ।—অদ্য সকালে রামবাড়ী চটী হইতে রওনা হইয়া বেলা ৪টার সময় রামপুর চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় বিশ্রাম করিলাম । অদ্য সমস্ত দিন বৃষ্টিপাত হইতেছে ।

৭ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ।—অদ্য ভোর ৬টার সময় রওনা হইয়া বেলা ১২॥টার সময় বেতা-চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় সে দিবস বিশ্রাম করিলাম । এখানে তাম্রনির্ম্মিত কঙ্কণ পাওয়া যায় । যাত্রীরা উক্ত কঙ্কণ খরিদ করিয়া ৺বদরীনাথের পাদপদ্মে স্পর্শ করাইয়া লন এবং তাহা ধারণ করেন । উক্ত কঙ্কণ টাকায় তিন জোড়া করিয়া বিক্রয় হয় ।

৮ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ।—অদ্য প্রাতে বেতা-চটী হইতে রওনা হইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী নালী-চটীতে আসিলাম । এখান হইতে বদরীনাথ যাইতে হয় । এই স্থানে আসিয়া কেদারনাথের পাণ্ডার লোককে বিদায় দিলাম । নালীচটী হইতে রওনা হইয়া বেলা ১২টার সময় উখীমঠে পহুছিলাম । তথায় স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া বাবা কেদারনাথের গদি, অন্যান্য দেবতা, ওঁকারনাথমহাদেব ও উখিমায়িকে দর্শন করিলাম । পরে কিছু জলযোগ করিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া বেলা দুইটার সময় ভেরা-চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় আহারাদি সমাধা করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম করিলাম । ক্রমশঃ ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার ।

—:0:—

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ।

সে যে জাহ্নবীর তীর !
যেথা লক্ষ কণ্ঠ মুরজ-নিঃস্বনে,
জানা'ল বিশ্বে, মিশ্র-ভবনে
এসেছে যেজন, মুছাবে নয়ন
তপ্তা ব্যথিতা ধরণীর ।
হরি-পাদ-পদ্ম-ঝরা
সে যে প্রেমনীর—
হর-শির-শোভা-করা
জাহ্নবীর তীর !

সে যে পূর্ণিমারনিশি !
যবে রাইয়ের অঙ্গে আবরি অঙ্গ,
রূপের সায়রে তুলি' তরঙ্গ,
চাঁদের কিরণে, সুনীল গগনে
ফুটা'য়ে তুলিল হাসি ।
গুণ্ঠিত চন্দ্রমা,—হেরি,
আছে দশ দিশি,
গোরাচাঁদ আলো করি,
পূর্ণিমার নিশি !

সে যে মধু মধু-মাস !
যবে কুঞ্জকাননে যমুনার কূলে,
কিশোর কিশোরী কদমের মূলে—
দুলিত দোলায়,-ফাগের আভায়
রঞ্জিয়া চিকুর-পাশ ।
গঙ্গা-তীরে, রাঙ্গা রাগে,
নিয়ে মৃদু-হাস,—
নদীয়ায় তাই জাগে
মূর্ত্ত মধু-মাস !

সে যে ভক্তি-হৃদি মাঝ !
যেথা জাহ্নবীর নীর—পূত আঁখি-জল
শুভ্র চরিতে—জোছনা তরল,
গোরা-গুণ-গান—কোকিলার তান,
মূর্ত্তিমান্ তাহে ঋতুরাজ !

নামরূপে তাই হরি,
বিরাজিছ আজ,
নিত্য-নবদ্বীপ-পুরী—
ভক্ত হৃদি মাঝ।

ব্রহ্মচারী—নরেন্দ্রচন্দ্র।

—:0:—

সাধু গঙ্গেশ।*

পবিত্র ভারতভূমে যুগ-যুগান্তর হইতে কত মহাত্মা, কত সাধু মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে ? আজীবন সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া পরিণামে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া লোকলোচনের অজ্ঞাতসারে, ভারতভূমির এই বিস্তীর্ণ অঙ্কশয্যায় কতজন অনন্ত সমাধি লাভ করিয়াছেন কে তাহার সন্ধান পাইবে ! এই পুণ্যভূমিতে এমন স্থান খুব কমই আছে, যাহা কোন না কোন মহাপুরুষের পদরজে পবিত্রীকৃত হয় নাই। ইহার জল-স্থল, তরু-লতা, অন্তরীক্ষ, সবই যেন পবিত্র ভাব বিকীরণ করিয়া এখনও দিক্‌দিগন্ত মাতাইয়া তুলিতেছে,—ইহার ধূলিকণাও বুঝি পবিত্র। তটিনীর কল কল নিনাদে, নির্ঝরিণীর ঝর, ঝর শব্দ, মলয়ের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে, বিহগের মধুর কাকলিতে, আজও ভারত-গগন মুখরিত,—সেই প্রেমময়ী জগজ্জননী অপূর্ব্ব লীলা বিস্তারে যেন তাঁহার মহিমা বিঘোষিত করিতেছেন। যে মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবনীর আভাষ মাত্র আজ পাঠক-গণকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, তিনি অনন্ত লীলাময়ী জগজ্জননীর একজন কৃতী সন্তান। মাতৃনাম প্রচারের জন্য এবং জীবকে প্রেমামৃত আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি এই পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময় এবং স্থান আমরা সংগ্রহ করিতে না পারায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দিতে পারিলাম না। কেবল তাঁহার অলৌকিক জীবনীর আভাষ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

গঙ্গেশ কোন এক পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার বয়স যখন মাত্র এক বৎসর তখন তাঁহার পিতা একমাত্র পুত্র গঙ্গেশ এবং স্ত্রী মহামায়াকে সংসারে রাখিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক একেবারে নিরুদ্দিষ্ট হন। নিরাশ্রয়া মহামায়া একমাত্র পুত্রের মুখ চাহিয়াই সমস্ত শোক-দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। গঙ্গেশ বাল্যকাল হইতেই খুব শক্তিশালী ছিলেন; ভয় কাহাকে বলে আদৌ জানিতেন

* সাধকাগ্রগণ্য ৺শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহোদয়ের "গঙ্গেশ" নাটকাবলম্বনে লিখিত। যোগানন্দ—

না। কেহ তাঁহাকে কথায় ঠকাইতে পারিত না,—মুখের উপর এমন তত্ত্বমূলক উত্তর প্রদান করিতেন, যে শ্রোতাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। তাঁহার মা মহামায়াদেবী ঠিক যেন মহামায়াই ছিলেন; তাঁহার মত ধর্ম্ম-প্রাণা সেকালে খুব বিরল ছিল। গঙ্গেশও মায়ের উপযুক্ত ছেলেই হইয়াছিলেন;—অতি শিশুকাল হইতেই জগজ্জননী সম্বন্ধে, তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা প্রকাশ পাইত; তদুপরি মায়ের উপদেশামৃত-সিঞ্চনে সেই সংস্কার ক্রমেই আরও দৃঢ়তর হইতেছিল। গঙ্গেশ অনেক সময় সন্ন্যাসীর ছেলে বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন। তিনি খুব অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, কোন কথারই শেষ মিমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, কিছুতেই নিরস্ত বা তৃপ্ত হইতেন না। ছলে, বলে বা কৌশলে তাঁহাকে ভুলাইতে কাহারও সাধ্য ছিল না। শিশুকাল হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, যে তিনি মহাবিদ্যার সন্তান, সুতরাং যার মা মহাবিদ্যা স্বরূপিনী, তাঁর ছেলে আবার পার্থিব বিদ্যা কি শিক্ষা করিবে? তাই লেখাপড়ার দিকে তার আদৌ মন যাইত না; মহামায়াদেবীও বহু চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করাইতে পারিলেন না। অন্য কেহ এসম্বন্ধে অনুরোধ করিলে গঙ্গেশ তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া দিতেন এবং এমন তত্ত্বপূর্ণ কথা দিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে উপস্থিত সকলই বিস্মিত হইয়া যাইতেন।

গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলে একটী বটবৃক্ষমূলে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া, মহামায়া একদিন পুত্রকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। সেখানে যাওয়ার পর, গঙ্গেশ অদূরে একটী শাবক সহ বাঘিনীকে দেখিতে পাইল; অমনি বীর-শিশু উল্লাসে হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন;—"মা-মা, ঐ দ্যাখ্ মা, কেমন সুন্দর বাঘের বাচ্চা; আমি ওটাকে ধরব,—আর ওর ঘাড়ে চড়্ব।" এই কথা বলিয়াই গঙ্গেশ সেইদিকে ছুটিলেন; মহামায়া চীৎকার করিয়া ছেলের পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং এই কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু গঙ্গেশ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মহামায়া প্রমাদ গণিলেন; এবং পুনঃ পুনঃ ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিয়া গঙ্গেশের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গঙ্গেশ কিছুতেই শুনিলেন না, বরং জেদ করিয়া মাকে বলিতে লাগিলেন, "বাঘ দেখে তোর এত ভয়! আগে জান্লে আমি তোর সঙ্গে আসতেম্ না; লোকে বলে আমার বাবা যেখানে গিয়াছেন, সেখানে কত বাঘ ভালুক আছে—আর তুই বেটী আমার মা হয়ে এত ভয় করিস্?" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ মায়ের হাত ছাড়াইয়া বাঘের দিকে দ্রুত-পদে ছুটিলেন—মহামায়া আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী-ঠাকুর গঙ্গেশকে সেই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, মহামায়ার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মহামায়া গঙ্গেশকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর কৃপাতেই যে পুত্রটী এ যাত্রা রক্ষা পাইল, ইহা নিশ্চিত ভাবিয়া সন্ন্যাসী-

ঠাকুরের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর একজন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ; মহামায়া তিন দিন পরেই দেহত্যাগ করিবেন, তখন গঙ্গেশ একেবারে নিরাশ্রয় হইবে, তাই তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবার জন্য তিনি সেখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গঙ্গেশের যাহাতে পাগলামী দূর হইয়া মঙ্গল হয়, সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে মহামায়া সেইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন "মা ওর পাগলামিতেই জগতের মঙ্গল হইবে—মা জগদম্বা উহাকে সর্ব্বদা দেখিতেছেন সুতরাং ওর কখনও অমঙ্গল হইবে না"। তৎপর মহামায়াকে যে তৃতীয় দিবসে এই সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাকে ইহা জানাইলেন। মহামায়া নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন; সুতরাং এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়াও নিজের জন্য আদৌ বিচলিত হইলেন না; তবে গঙ্গেশের জন্য চিন্তিত হইলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন "মা তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর—সেই ভব-দুঃখ-হারিনী নিজে এসে কোলে করে তোমার গঙ্গেশের সকল দুঃখ দূর করিবেন। মা তোমার গঙ্গেশের প্রসাদে এসংসারে অনেকের দুঃখমোচন হবে,—আর তোমাকে কি বলব মা, গঙ্গেশের জন্য তুমি এক তিলার্দ্ধও ভেবো না।" মহামায়া গঙ্গেশের সম্পূর্ণ ভার সন্ন্যাসীঠাকুরের উপর প্রদান করিয়া, তাহাকে প্রণামান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে গঙ্গেশের বয়স আটবৎসর মাত্র ছিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথামতে তৃতীয় দিবসে মহামায়ার দেহত্যাগ হইল; সন্ন্যাসীঠাকুর নিজে উপস্থিত থাকিয়া গঙ্গেশকে লইয়া মহামায়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে গঙ্গেশের মাতুলালয় ছিল। সেই মহাপুরুষ মনে করিলেন, আপাততঃ গঙ্গেশকে তাহার মাতুলালয়ে রাখা যাউক, তৎপর অবস্থানুযায়ী যেরূপ ব্যবস্থা করা দরকার সেরূপ করা যাইবে।" এই মনে করিয়া তিনি গঙ্গেশের মাতুল ভবদেব সিদ্ধান্তের বাড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে গঙ্গেশের সহিত অনেক রূপ কথা হইতে লাগিল; গঙ্গেশ বলিতেছিল "আমার ঘুমন্ত মাকে লাল চেলীর কাপড় পরাইয়া কাঠের উপর রাখিলে কেন? তখন আমি মার বুকে একটু দুধ খেতে গিয়েছিলাম, আর তোমরা সকলে হরিবোল দিয়া উঠিলে! আমি ভাবলেম এ আবার কি হইল, তাই ফিরে এলাম—মা তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাস্‌ছিল!" সন্ন্যাসীও তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন; তৎপর তিনি গঙ্গেশকে মাতুলালয়ে রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গঙ্গেশের মাতুল ভবদেব সিদ্ধান্তের পুত্র সন্তান ছিল না, তাই গঙ্গেশকে পাইয়া তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে একজন খুব বড় অধ্যাপক এবং তাহার বাটীতেই একটী চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে বহু ছাত্র শিক্ষা পাইত; ভবদেব সকলকেই পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। গঙ্গেশের এপর্য্যন্ত বিদ্যারম্ভ হয় নাই; ভব-

দেব বহুযত্নে শুভদিনে গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভের আয়োজন করিলেন। গঙ্গেশকে স্নান করাইয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া বসান হইল; গঙ্গেশের কিন্তু এসব কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে মনে ভাবিতে লাগিল "যাদের বিদ্যার অন্ত হয়, তাদেরই বিদ্যা আরম্ভ করিতে হয়! আমি মহাবিদ্যার ছেলে আমার অবার বিদ্যার আরম্ভই কি, আর বিদ্যার অন্তই বা কি?" এই সব ভাবিয়া তিনি মাতৃনামে আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উপস্থিত লোকেরা মনে করিল, "আহা! আজ মহামায়া বেঁচে থাকলে, পুত্রের বিদ্যারম্ভ দেখ্‌তো—তার কতই না আনন্দ হ'ত। গঙ্গেশ বুঝি মহামায়ার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে।" হায় ভ্রমান্ধ মানব! তোমরা বাহির দেখিয়া অন্তর বিচার করিতে চাও! সঙ্কীর্ণ মন লইয়া, ভক্ত-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস বুঝিবে কিরূপে? ভবদেব গঙ্গেশকে সান্ত্বনা করিয়া সরস্বতীমাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। গঙ্গেশ বলিলেন, "সব মাই ত এক মা, তবে সরস্বতী-মা আবার পৃথক্ মা কেন?" ভবদেব বুঝাইলেন যে, সেই মায়েরই এক নাম সরস্বতী মা। গঙ্গেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, যেমন কালী-মা, তারা-মা, সরস্বতী-মা, সেইরূপ মামীমা, মাসীমা, খুড়ীমা, এরাও সেই মা নয় কি? ভবদেব বলিলেন "হাঁ"; তখন গঙ্গেশ বলিলেন, তবে এখন হইতে আমি সকলকেই শুধু "মা" বলিয়া ডাকিব, তবেই ত আমার বিদ্যারম্ভ হইল। ভবদেব বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন, অবশেষে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সবগুলি বর্ণমালা গঙ্গেশকে পাঠ করাইলেন; কিন্তু গঙ্গেশ বলিলেন, "কই ইহার মধ্যে ত আমার মার নাম পাইলাম না?" ভবদেব বলিলেন "এই পঞ্চাশৎ অক্ষর সবগুলিই তোর মায়ের নাম—তোর মায়ের নাম ছাড়া আর অক্ষর নাই"। গঙ্গেশ প্রাণে প্রাণে না বুঝা পর্য্যন্ত কোন কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, তাই তিনি আবার বলিলেন,—"এগুলি আমার মায়ের নাম কি করে হ'ল?" তখন ভবদেব বুঝাইলেন, যেমন কালী বলিতে প্রথম ক তারপর আ, এই হ'ল কা; তারপর, ল ঈ সবে মিলে হ'ল কালী; এইরূপে মায়ের সব নামই এই পঞ্চাশৎ অক্ষরের মধ্যে আছে। তখন গঙ্গেশ 'ক' বলিয়া ক অক্ষরের দিকে স্থির-দৃষ্টি করতঃ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তৎপর ভাবাবেশে পঞ্চাশৎ অক্ষরের তত্ত্ব বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভবদেব গঙ্গেশকে কোলে উঠাইয়া লইয়া "তারা" নাম শুনাইতে লাগিলেন; মায়ের নাম শ্রবণে তাঁহার কখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, আবার কখন 'মা' 'মা' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ মায়ের নাম শ্রবণের পর গঙ্গেশের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ এই ভাবেই সম্পন্ন হইল।

পার্থিব বিদ্যাতে গঙ্গেশের কিছুতেই মন গেল না; ভবদেব বহু শাসন করিয়াও কিছুতেই যখন তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন ক্রমেই যেন তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন ভবদেব গঙ্গেশকে ডাকিয়া পাঠ দিতে বলিলেন। গঙ্গেশ উত্তর করিলেন,—"আমি ওসব কিছু বুঝি না।" ভবদেব বলিলেন "যা বুঝিস্ না, তা আমাকে

বল, আমি অর্থ করিয়া দিব।" তখন গঙ্গেশ বলিলেন, "আমি যা বুঝি না, তা আবার তোমাকে কি করে বলি, বল দেখি ? আর মামা তোমাকে ত কোনদিন অর্থ করিতে দেখিলাম না, তুমি কেবল অনর্থই করিতেছ।" তারপর ভবদেব তাঁহাকে ব্যাকরণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "কোন্ ব্যাকরণ ?" ইহাতে ভবদেব রোষভরে বলিলেন "তোর কতগুলি ব্যাকরণে অধিকার হইয়াছে ? তখন তিনি বলিলেন, "আমি মাহেশ ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছি।" ভবদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি তার প্রথম সূত্র কি ? তিনি বলিলেন, "প্রথম সূত্র—মা।" ভবদেব বলিলেন,—"হা রে নির্ব্বোধ, তুই একি বলছিস্—মাহেশের প্রথম অক্ষর মা হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "যেই অক্ষর সেই সূত্র, সেই আমার মা—সব এক।" ভবদেব বলিলেন "তোর বিদ্যার দৌড় বুঝেছি—এখন পদ সাধ্‌তে পারিস ?" তিনি বলিলেন "হাঁ পারি, পদ সেই মায়ের পদ !" ভবদেব বলিলেন "হাঁ এরূপ পদ হইলেই তোর খুব সুবিধা হয় বুঝি, না ? গঙ্গেশ উত্তর করিলেন,— "হাঁ মামা, তা ঠিক, আমার সুবিধার কথা বলছ ? সে পদ যদি সাধতে পারতে, তবে তোমারও খুব সুবিধা হত !" ভবদেব কিছুতেই গঙ্গেশকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া, তাঁহার উন্নতির আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা গঙ্গেশের সহিত তর্কে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না, গঙ্গেশ কূট তর্কে সকলকেই পরাস্ত করিয়া দিতেন, তাই তাহারাও গঙ্গেশের উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিল। এদিকে ভবদেব গঙ্গেশের উপর খুব বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া, ছাত্রগণও এই সুযোগ ছাড়িত না; তাহারা যখন তখন গঙ্গেশকে প্রহার এবং লাঞ্ছনা করিত। গঙ্গেশ তাহাদের দুর্ব্ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতেন। ক্রমে গঙ্গেশের উপর সকলেই খুব খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিল, এমন কি গঙ্গেশ নিয়মিত আহার পর্য্যন্ত পাইতেন না। তৎপর গঙ্গেশ একদিন ভৈরবের মহাশ্মশানে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার আরও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন; সে দিন হইতে আর পুঁথি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর মামী তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কতকগুলি পুড়াভাত তাঁহার পাতে ঢালিয়া দিয়া রোষভরে বলিলেন "এই নে জন্মের মত খেয়ে আজই এখান হইতে দূর হ ? আর এখানে কখনও আসিস্ না।" গঙ্গেশ এইকথা শুনিয়া না খাইয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন এবং কিছুদূরে একটী নির্জ্জন প্রান্তরের পার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে পড়িয়া মা, মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাকে ডাকিতে ডাকিতে কখন বা মূর্চ্ছা যাইতেন, কখন আবার চৈতন্য হইত। এইরূপে বহু কষ্টে ও অনাহারে দুইদিন গত হইয়া গেল। এদিকে গঙ্গেশের একটী মামাত ভগ্নী তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিত; এই দুইদিন গঙ্গেশের কোন সংবাদ না পাওয়ায় সে বড়ই চিন্তিত হইল,—তৃতীয় দিন সে নিজেই গঙ্গেশের খোঁজে বাহির হইল এবং মায়ের ইচ্ছায় সেই বৃক্ষতলে গঙ্গেশকে পাইল। গঙ্গেশ তখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁর উত্থানশক্তি ছিল না।

সেই ভগ্নীটী আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া গঙ্গেশকে পান করাইল,—বুঝি মা জগদম্বাই এই বেশে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছিলেন। দৈবক্রমে একটী পরিচিত রাখাল-বালক সেখানে গিয়াছিল, তাহার সাহায্যে সেই ভগ্নী গঙ্গেশকে বহুকষ্টে আবার বাড়ীতে আনিল। তথাপি বাটীর লোকে আর তাঁহাকে বাটীর মধ্যে স্থান দিল না। চতুষ্পাঠীতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইল। এবার ছাত্রদের আরও সুবিধা হইল, তাহারা গঙ্গেশের উপর যথেচ্ছাচার করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একদিন অমাবস্যা নিশিতে রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় হঠাৎ গঙ্গেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি দেখিলেন এক ভয়ঙ্কর-কাল-ভৈরব মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান, গায়ের রং ঘুটঘুটে কাল, তিনটি চোখে যেন ধবক্ ধবক্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। মাথায় বৃহৎ জটাভার, হস্তে ভীষণ শূল! এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া গঙ্গেশ চমকিয়া উঠিলেন, এরূপ মূর্ত্তি আর কখনও তিনি দেখেন নাই। তৎপর ভৈরব, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, গঙ্গেশ শয্যায় বসিয়াই এ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে চতুষ্পাঠীর কোন ছাত্র গাড়ুহস্তে বাহিরে যাইয়া সেখান হইতে ভয়ে চীৎকার করতঃ ঘরে আসিয়া পড়িয়া গেল,—আর গাড়ুর সমস্ত জল ঘরের দরজায় গড়াইয়া পড়িল। তাহার চীৎকারে অন্যান্য ছাত্রগণ উঠিয়া কেহ কেহ বাহিরে গেল কিন্তু ভীষণ অন্ধকার দেখিয়া ফিরিয়া আসিল; কেহ বা গাড়ুর জলে পা পিছলাইয়া দরজায় পড়িয়া গেল। সকলের মনেই একটা ভয়ের সঞ্চার হইল,—এমন ভীষণ অন্ধকার তাহারা কখনও দেখে নাই,—অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু এমনই দৈব ঘটনা যে অগ্নি জ্বালান মাত্র দমকা বাতাস আসিয়া নিভাইয়া দিতে লাগিল, ক্রমে তাহাদের অগ্নি-শলাকা নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহারা আরও ভীত হইয়া গেল, পরিশেষ সকলে ঠিক করিল যে, গঙ্গেশ নির্ভীক, ওকে দিয়া পাড়া হইতে অগ্নি আনান যাউক। এই ভীষণ রাত্রিতে গঙ্গেশ প্রথমে বাহিরে যাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন,—কিন্তু সকলেই মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে অগত্যা গঙ্গেশ এই দুর্য্যোগে "তারা" নাম জপিতে জপিতে আগুন আনিবার জন্য বাহির হইলেন, কিন্তু অন্ধকারে বহু-কষ্টে অনেক বাড়ী ঘুরিয়াও তিনি আগুন যোগাড় করিতে পারিলেন না; ফিরিয়া আসিয়া ছাত্রদিগকে এই সংবাদ দিলেন, ছাত্রগণ গঙ্গেশের কথায় বিশ্বাস না করিয়া আবার তাঁহাকে বলপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিল এবং বলিয়া দিল যে, আগুণ লইয়া না আসিলে তাহার নিস্তার নাই। গঙ্গেশ এবারও কোন বাড়ীতে আগুণ না পাইয়া মাঠেরদিকে গেলেন, সেদিকেও আগুণ দেখিতে পাইলেন না, তবে এক ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে ভৈরবের মহাশ্মশানে প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির ক্ষীণালোক দৃষ্টিগোচর হইল। গঙ্গেশ এবারও আসিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু তাহারা আজ এমনই নির্দ্দয় হইল যে, গঙ্গেশকে শ্মশান হইতে অগ্নি আনিয়া দিতে আদেশ করিল, নচেৎ তাহারা কিছুতেই ছাড়িবে না। গঙ্গেশ অনন্যোপায় হইয়া "তারা" মাকে স্মরণ করিয়া শ্মশান

অভিমুখে রওনা হইলেন।

ভাবিয়া দেখিলে এবিষয়ে কত কথাই মনে হয়, আজ গঙ্গেশ কি ভীষণ বিপদেই পতিত হইয়াছেন—একে ভীষণ দুর্য্যোগ,—পূর্ণ অন্ধকার রাত্রি, আবার সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারেই একক্রোশ রাস্তা চলা, তার উপর আবার একটী বালকের মহাশ্মশানে একাকী চিতার অগ্নি আনিতে যাওয়া! ইহা হইতে আর কি ভীষণ বিপদ হইতে পারে? কিন্তু এই বিপদের অন্তরালে যে কি মঙ্গলই নিহিত আছে তাহা কে বুঝিবে? ভীষণ দর্পি ভীষণা, কালরাত্রিরূপা করালবদনী সংহারমূর্ত্তির অন্তরালে যে, বর-অভয়করা আনন্দময়ী মায়ের শান্তিমূর্ত্তি বিরাজিতা আছে, তাহা কয়জন লোক বুঝিতে সক্ষম হয়? তাই বুঝি বিশ্বপতি হইয়াও পাগল ভোলা সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন,—তাই বুঝি সংহারের কোলে আনন্দময়ীর আনন্দমূর্ত্তি প্রকটিতা,—তাই ভক্ত গাহিয়াছেন :—

"বিপদ সম্পদের তরে দিতে পরমপদ তারে,
বিপদ নইলে জন্মান্ধজীব ডাকে না তোরে,
মা তোর করুণার ফল বিপদ কেবল
জাগায় অবোধ বালকে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গঙ্গেশ ছোটকাল হইতেই নির্ভীক ছিলেন, তার উপর সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন অপূর্ব্বভাবে গঠিত হইয়াছিল। তিনি যেন নিজঃকে পরের জন্যই বিলাইয়া দিয়াছিলেন,—ছাত্রদের এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেন এবং তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্যই নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়াও মরণের কোলরূপ মহাশ্মশানে যাইতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না! এত অল্প বয়সে এরূপ ত্যাগ খুব কমই দেখা যায়। যাহাহউক গঙ্গেশ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভৈরব ঘাটের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সেই মহাশ্মশানটী গঙ্গাতীরে প্রায় এক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, নরকঙ্কাল, চিতার অঙ্গার প্রভৃতি বহন করিয়া বহুকাল হইতে ইহা অতীতের স্মৃতি জগৎকে জানাইয়া আসিতেছে—মানবের যত্নে গড়া সাধের দেহের পরিণাম দেখাইয়া, যেন বিকট হাস্যে দিকদিগন্ত কঁপাইয়া তুলিতেছে এবং দর্শকদিগের প্রাণে ভীতি উৎপাদন করতঃ বৈরাগ্যের উদ্বোধন করিতেছে! এহেন শ্মশানবন্ধু না থাকিলে বুঝি বা মানব ভগবানকে একেবারেই ভুলিয়া যাইত! পূর্ব্বে এই শ্মশানে, কেহ কেহ সাধনাদিও করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ ছিল। আমাদের গঙ্গেশেরও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির সহিত এই মহাশ্মশান ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত—গঙ্গেশ পূর্ব্বজন্মে এই শ্মশানেই কঠোর সাধনাদিও করিয়াছিলেন, পরিশেষে মায়ের এরূপ আদেশ হয় "এজন্মে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না—পরজন্মে নির্দ্দিষ্ট সময়ে, মঙ্গলবার অমাবস্যা মহানিশিতে এই শ্মসানেই আমার দর্শন পাইবে।"

আজ গঙ্গেশের সেই শুভদিন এবং শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে—আজ মা জগজ্জননী গঙ্গেশকে কোলে লইয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান করিবেন, কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়া মায়ের এমনি লীলা যে গঙ্গেশের প্রাণে এসব ভাব আদৌ জাগে নাই। মায়ের কৃপা এমনি বটে—মা যে অহেতুকী কৃপাময়ী।

গঙ্গেশ চিতা হইতে কিছু আগুন তুলিয়া বাড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন; কিন্তু অনেক দূর চলিয়া যাওয়ার পর তাহাও নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—মায়ের কি ভীষণ পরীক্ষা। পরীক্ষার আগুনে ময়লামাটী দগ্ধ না করিয়া বুঝি মা ছেলেকে কোলে নেন না। গঙ্গেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুকাল চিন্তার পর আবার শ্মশানের দিকে যাইতে লাগিলেন, এবং মনে মনে এরূপ সংকল্প করিলেন, "বার বার আগুণ নিভিয়া যাইবে! এবার এক খানা চিতার জলন্ত বড় কাঠ কাঁধে করিয়া লইয়া যাইব—দেখি কিরূপে আগুণ নিভে!" ধন্য অধ্যবসায়! এরূপ না হইলে মায়ের কৃপা হবে কেন? তৎপর তিনি যেমন এক খানা জলন্ত কাঠ চিতা হইতে উঠাইয়া লইলেন, অমনি সেই শ্মশানের ভৈরব হুঙ্কার দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু নির্ভীক গঙ্গেশ ভৈরবের সেই উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়াও ভয় পাইলেন না। ভৈরব তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "আমি এই শ্মশানের রাজা ভৈরব, তোকে মারব, বল তুই কার আদেশে চিতায় হাত দিলি?" গঙ্গেশ বলিলেন, "তুমি কার আদেশে আমায় হাতে ধরলে?" তিনি বলিলেন "আমি মায়ের আদেশে তোমায় ধরেছি।" তিনি বলিলেন "আমি আমার আদেশে কাঠ নিয়েছি, তোমায় মা কি আমাকে মারতে আদেশ দিয়াছেন? তোমার মা কে?" ভৈরব বলিলেন "আমার মা শ্যামা" গঙ্গেশ অমনি বলিলেন, "তবে ত সে আমারই মা! ছাড়্ বেটা আমার হাত ছাড়্! আমার মা বুঝি হুকুম দিয়াছেন আমাকে মারতে!—না?" ভৈরব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোকে বল্‌ছি এখনও তুই সাবধান হ' আমাকে ভয় কর, আর আমার শরণাগত হ'!" নির্ভীক গঙ্গেশ উত্তর দিলেন, "তোকেও বলছি, তুই সাবধান হ' আমাকে ভয় কর, আর শেষে যা বলি তাও হ'!" "আচ্ছা হই"—এই বলিয়া ভৈরব তাহার দুই হাত জোরে ধরিয়া ভ্রুকুটী পূর্ব্বক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া তাঁহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; কিছুকাল ভৈরবের চোখে চোখে দৃষ্টি করার পর গঙ্গেশ হঠাৎ ভীত হইলেন এবং মা-মা বলিতে বলিতে চক্ষু বুজিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভৈরব তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিয়া তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। গঙ্গেশ চাহিয়া দেখিলেন, সেই কাল-ভৈরব আর নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে কোলে করিয়া আছেন। তখন গঙ্গেশের সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, "হাঁ সন্ন্যাসী দাদা, তুমি আমাকে এমন করে ভয় দেখালে? তুমি সত্য করে বল, তুমি কি আমার সেই সন্ন্যাসী দাদা, না আর কেউ?" ভৈরব বলিলেন, "গঙ্গেশ, তখন আমি তোমার সন্ন্যাসী দাদা ছিলেম, কিন্তু এখন আমি তোমার গুরু। শুনেছ ত এই শ্মশানের নাম ভৈরব ঘাট—এই শ্মশানের অধিকার যতদূর, ততদূর সমস্ত লোকের সাধন-সিদ্ধির কর্ত্তৃত্বের ভার আমার উপর। তোমার মায়ের জন্মান্তরের সাধন বলে তিনি তোমার মত সন্তান গর্ভে ধরেছিলেন এবং সেই বলেই তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে, ছদ্ম সন্ন্যাসীবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়েছিলাম—

আমার প্রত্যক্ষ রূপ দর্শনের যোগ্য সাধনবল তাঁহার ছিল না; যাইহোক সেই প্রসঙ্গে তুমি এই সন্ন্যাসী দাদাকে পেয়েছিলে। সেই সন্ন্যাসী দাদা আমিই—এই ভৈরব-ঘাটে আমারই নাম বিজয়ভৈরব!" গঙ্গেশ সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না—ভৈরব মূর্ত্তিতে দর্শন পাইলেন। ভৈরব তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—ভয় না পাইলে ত সেই অভয়াকে পাওয়া যায় না, তাই তোমাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর কোন ভয় নাই" ভৈরব করপুটে গঙ্গাজল আনিয়া গঙ্গেশকে অভিষেক করিলেন। গঙ্গেশ কৃতাঞ্জলিপুটে ভৈরবের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তৎপর ভৈরব তাঁহাকে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া দিলেন—মূর্খ গঙ্গেশ তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গদগদ কণ্ঠে ভাবাবেশে গুরুস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন!

তৎপর গঙ্গেশ ভাবাবেশে গুরুপদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন; ভৈরব তাঁহাকে সস্নেহে উঠাইয়া বলিলেন, "দেখতো গঙ্গেশ উনি কে?"

তখন গঙ্গেশ দেখিলেন, শব-শিব-হৃদয়-সরোজ-নিহিত-দক্ষিণ-চরণা, জয়তি কাপি মে মধুর মধুর-হসিতাননা দিগ্বসনা লোল রসনা!!" অমনি তিনি 'মা' 'মা' বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—মাও তাঁকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন, আজ গঙ্গেশের সকল দুঃখের অবসান হইল।

মা তখন গঙ্গেশকে বলিলেন "বৎস তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" গঙ্গেশ বলিলেন, "মা, আজ তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আমার আর চাইবার পাইবার কিছু নাই।" মা বলিলেন, "বৎস যে শাস্ত্রের সাধনায় তুমি আজ সিদ্ধ, সেই শাস্ত্র অনুসারেই আমি ফল দিতে বাধ্য! তাই তুমি কিছু না চাইলেও আমাকে যে দিতে হবে!" তখন তিনি বলিলেন, "তবে মা তুমিই বলে দাও, কি চাইব।" মা বলিলেন "বৎস আমাকে যে পেয়েছে, তার কিছুই পেতে বাকী নাই, তা আমি জানি, কিন্তু বাবা, আমি মা হয়ে যখন আসি তখন ছেলের হাতে কিছু না দিয়ে থাকতে পারি না।" গঙ্গেশ বলিলেন "তবে মা তোর যা খুসী তাই দে" মা বলিলেন "বৎস তোর মামার বাড়ীর দেশের লোক সবাই তোকে মুর্খ বলে জানে, আমার এ দুঃখ সয় না বাপ্! আমি তোমাকে এই বর দিলাম, আমার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডঘরে যত বিদ্যা আছে আজ হতে তুমি তার সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধবিদ্য হইলে।" তৎপর মা গঙ্গেশকে কোল হইতে নামাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই নামিবেন না, তখন মা তাঁকে অনেকরূপ বুঝাইয়া বলিলেন "বৎস, তুমি জগতে আমার নাম প্রচার করিতে আসিয়াছ! এই শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও—কার্য্য শেষে আমার অঙ্কে চিরবিশ্রাম লাভ করিবে! আমি যে তোমার অন্তরে বাহিরে সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছি,—যখনই তুমি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে, তখনই ত আমাকে দেখিতে পাইবে, তবে আর চিন্তা কি?"

তৎপর গঙ্গেশ বলিলেন, "মা তোমার মধ্যেই না সব মা আছেন? কৈ তাতো

আমাকে দেখাইবে না ?" তখন মা বলিলেন, "বৎস আমার অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, আবার আমি নামরূপবর্জ্জিতা অরূপা—আমার আদিও নাই অন্তও নাই ! বৎস, আমার ব্রহ্মবিভূতি মহাবিদ্যা রূপ দর্শন কর।" ভবদুঃখহারিণী, ভক্তহৃদয়রঞ্জিনী মা এই বলিয়া দশদিকে ব্যাপ্ত হইয়া, ভক্তকে দশমহাবিদ্যারূপ দর্শন করাইলেন। তখন গঙ্গেশ সর্ব্বরূপের আদ্যা জগতরূপিণী, কালবরণী মহাবিদ্যা মহাকালীকে জগত জুড়িয়া দেখিতে পাইলেন; তৎপর অগ্নিকোণে ভীষণ তারা মূর্ত্তি, দক্ষিণদিকে মায়ের মধুর ষোড়শী মূর্ত্তি, নৈঋতকোণে মায়ের ভুবনেশ্বরীরূপ, পশ্চিমদিকে ভবসুন্দরী ভৈরবীমূর্ত্তি, বায়ুকোণে ভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তারূপা, ঈশানকোণে শত্রুকুলঘাতিনী গবলা মূর্ত্তি, পূর্ব্বদিকে অপরূপা মাতঙ্গী মূর্ত্তি এবং শূন্যকক্ষে ভুবনমোহিনী কমলারূপা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। গঙ্গেশ মহোল্লাসে দশদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া মায়ের অপরূপ অনন্তরূপসুধা পান করিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন—তিনি কখন ভীত, কখন বিস্মিত, পুলকিত, আবার কখনও বা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন। তখন মা বিভূতিরূপ সম্বরণ করিলেন। এদিকে রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্ব গগনে ঊষার ক্ষীণালোক উকিঝুঁকি মারিতেছে। মা তখন গঙ্গেশকে ভবদেবের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। গঙ্গেশ রাত্রি কালের ঘটনা যথা সম্ভব গোপন রাখিবে এরূপ মনস্থ করিয়া সেই চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে বসিয়া রহিলেন।

গঙ্গেশ যখন শ্মশানের দিকে আগুণ আনিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার উপর ছাত্রগণের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে ভৈরবের চরগণ কৃতসঙ্কল্প হইল। কারণ ভক্তের লাঞ্ছনায় যে ভগবানের আসন টলিয়া যায়। তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন ? তাই ভৈরবের আদেশে তাঁর চরগণ ছাত্রদিগের অশেষ লাঞ্ছনা করিল—ভয়ে এবং প্রহারে কেহ কেহ মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিকালেই ভবদেব আসিয়া এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। গঙ্গেশের উপর অন্যায় অত্যাচার করাতে এবং তাহারও নিজের শৈথিল্য দোষে ইহা হইয়াছে এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন তখন বাড়ীতে সকলেই গঙ্গেশের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎপর সন্ধান করিয়া গঙ্গেশকে চণ্ডীমণ্ডপে পাওয়া গেল। তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করা হইল এবং সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে অলৌকিক বিষয় গোপন রাখিয়া আগুণ আনার বিষয় সমস্ত খুলিয়া বলিল—ছাত্রদের ব্যবহারের কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তৎপর তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি পঞ্চদেবতাকে নিবেদন কিম্বা গণ্ডূষ গ্রহণ না করিয়াই খাইতে লাগিলেন; ভবদেব তাহা দেখিয়া খুব বিরক্তির সহিত তাঁহাকে ভৎসনা পূর্ব্বক "গরু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মায়ের কৃপাতে গঙ্গেশ আর সে গঙ্গেশ নাই, তিনি এখন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ? ভবদেবের উদ্দেশ্যে তিনি তখন এই শ্লোকটী বলিলেন !—

কিং গবি গোত্বমুতাগবি গোত্বম্ ?
চেদ্ গবি গোত্বমনর্থকমুক্তং।

অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টম্,
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্ ?

তাঁহার মুখে ভবদেব এই অদ্ভুত শ্লোক শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন—এই শ্লোকটী বুঝাইয়া দিতে পারে কি না, বিস্মিত লোচনে গঙ্গেশকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভবদেবকে শ্লোকটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্লোকটীর মর্ম্ম এইরূপঃ—

"আমাকে গরু ব'লবে কেন? গোর ধর্ম্ম গোত্ব, সেকি গো-তেই থাকে? না আর কিছুতেও থাকে? গোতেই যদি গোত্ব থাকে, তাহলে আমি ত গরু নই, আমাকে অনর্থক কেন গরু বল্‌লে? আর যদি গরু না হলেও গোত্ব থাকে এমনই হয়, তবে আমিও যেমন গরু, তুমিও তাই!" ভবদেব তখন বুঝিতে পারিলেন যে, গঙ্গেশ মায়ের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন; অমনি তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া ভয়ভক্তিগদগদ-স্বরে বলিলেন "আমি সব বুঝেছি—তোকে আমরা চিনি নাই; তুই কোথায় কি পেলি, কোথায় কি ঘট্‌ল সব খুলে বল।" এইরূপ বলিয়া ভবদেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন গঙ্গেশ সংস্কৃত শ্লোকে মায়ের জয়গাথা গাইতে গাইতে ভাবে ঢল ঢল হইলেন এবং মাতৃনামে সকলকে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। এই আনন্দে চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ নিরানন্দে থাকিবে গঙ্গেশের তাহা সহ্য হইল না, তিনি একে একে মুমূর্ষু ছাত্রগণকে ধরিয়া তুলিতে লাগিলেন; তাঁহার স্পর্শে তাহাদের সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া গেল—তাহারা নূতন জীবন পাইয়া মাতৃনাম গানে যোগদান করিল। আজ ভবদেবের কি আনন্দ! তাঁর বাড়ীতে আজ আনন্দময়ী মায়ের নামে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত—সকলেই আনন্দে আত্মহারা।

এইরূপে বহুকাল মাতৃনাম প্রচারে জীবোদ্ধার করতঃ গঙ্গেশ দেহত্যাগে আনন্দময়ী জগজ্জননীর শান্তিময় অঙ্কে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন।

এক্ষণে ভবভয়হরা জগদারাধ্যা জগজ্জননী আনন্দময়ীমাকে স্মরণ করতঃ আমরাও প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নরায়ণি নমোঽস্তুতে॥

—:0:—

কে আছে আমার?

সংসার-জ্বালাতে তাপিত হৃদিতে
কৃপাবারি ঢেলে শীতল করিতে,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার?

বিপথ হইতে আনিয়ে সুপথে,
বিষভাণ্ড হৃদি অমৃতে পূরিতে,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার?

অনন্ত আঁধারে অকূল সাগরে,
কর্ণধার হ'য়ে কূল দিতে মোরে,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার?

অজ্ঞান তিমির করিবারে দূর,
জ্ঞানদীপ ল'য়ে হ'তে অগ্রসর,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার?

মোহ ঘুচাইয়ে, সত্যেতে স্থাপিয়ে,
তোমাতে আমার দিতে ডুবাইয়ে,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার ?

করমের বশে, যদি যাই ভেসে,
করুণা করিয়ে টেনে নিতে কাছে,
তুমি বিনা বল কে আছে আমার ?

শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
তুমি যে আমার জীবনে মরণে,
তুমি বিনা বল কে আছে আমার ?

মায়া মোহে ভুলে যদি যাই ভুলে,
তোমায় ডাকিতে; ঘুচা'তে সে ভুলে
তুমি বিনে বল কে আছে আমার ?

তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
এই সত্যবাণী মোরে বুঝাবার
তুমি বিনা বল কে আছে আমার ?

গহন কান্তারে, পর্ব্বত গহ্বরে,
অতল সলিলে রক্ষিতে আমায়,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার ?

আপদে বিপদে, শঙ্কটে সম্পদে,
বাঁচা'তে আমায় প্রতি পদে পদে
তুমি বিনে বল কে আছে আমার ?

হৃদয়ের ধন, অমূল্য রতন,
জগৎ মাঝারে বলিতে আপন
তুমি বিনা বল কে আছে আমার ?

রোগে তাপে শোকে, ক্লিষ্ট যবে দুখে,
অশ্রু মুছাইয়ে তুলে নিতে বুকে
তুমি বিনা বল কে আছে আমার ?

তুমি মাতা পিতা, তুমি বন্ধু ভ্রাতা,
তুমি যে আমার গুরু জ্ঞানদাতা,
তুমি বিনে বল কে আছে আমার ?

দীন—উমেশচন্দ্র।

হরিদ্বারে কুম্ভ-যোগ
ও
সাধু-মহাসম্মিলনী।

বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা, শম্ভুজটাবিহারিণী, পতিতপাবনী, কলুষনাশিনী ভাগীরথী, ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে প্রেমামৃত দানে তাঁহার চির-শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইবার জন্য প্রেমময়ী রূপে ভূতলে অবতীর্ণা। হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া ভেদ করতঃ মদোন্মত্ত ঐরাবতের দর্পচূর্ণ করিয়া, করুণারূপিনী সর্ব্ব-তীর্থময়ী মা আমার পরম পবিত্র তপোভূমি তীর্থরাজ হরিদ্বারে ত্রিধারাতে বিভক্ত হইয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা!

এই হরিদ্বারেই একদিন মদান্ধ দক্ষরাজ শিববিহীন বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠানকরতঃ শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, তখন পতিপ্রাণা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে এই তপোভূমিতেই মায়িক দেহের অবসান করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন! যে সতীদেহ বিষ্ণু-

চক্রে খণ্ডিত হইয়া নানা স্থানে পতিত হইয়া এক একটী মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে, সেই দেহপাতের পবিত্র কুণ্ডস্থানটী অদ্যাপি কণখলে বিরাজিত থাকিয়া মহাতীর্থরূপে মোক্ষফল প্রদানকরতঃ প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা যে স্থানে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,—যে যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণু প্রকট হইয়া লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মকুণ্ড আর সেই বিষ্ণু-পদ-চিহ্ন অদ্যাপিও বিরাজিত থাকিয়া জীবকে মোক্ষফল প্রদান করিতেছে। ঋষিপ্রবর দত্তাত্রেয় তপোবল প্রভাবে যেখানে গঙ্গাধারাকে আবর্ত্তন করাইয়া তদীয় কুশ প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া লইয়াছিলেন, সেই কুশাবর্ত্ত ঘাট এখনও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রকার বহু প্রাচীন এবং পবিত্র স্মৃতি এই পবিত্র ক্ষেত্রের সহিত বিজড়িত আছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? কি প্রাচীনত্বে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, কি গঙ্গার সুমধুর কলনাদে হরিদ্বার জগতে অতুলনীয়। একাধারে শান্তি, প্রীতি, এবং ভক্তির আধার, প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন। মোক্ষদায়ক সপ্তভূমির মধ্যে হরিদ্বার * অন্যতম।

এহেন হরিদ্বারে এবৎসর কুম্ভযোগে সাধু-মহাসম্মিলনী হইবে, লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর শুভাগমনে এই পবিত্র ক্ষেত্র আরও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে, আর এই মধুর সম্মিলন যে দর্শন করিবে তাহার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে!! বহুদিন হইতে এই মহাসম্মিলন দর্শনের জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, তাই আমরা মঠ হইতে কুম্ভে যোগ দেওয়ার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। ২৮শে ফাল্গুন বুধবার (১৩২১ সন) কাশীধামস্থিত "শ্রীনিগমানন্দ-গম্ভীরা হইতে আমরা হরিদ্বারে অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তৎপর আউড রোহিল খণ্ড রেলে লাক্সার জংসন হইয়া রাত্রি ৩টার সময় আমরা পুণ্যভূমি হরিদ্বারে পৌছিলাম। তখন বৃষ্টি হইতেছিল, কাজেই নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। প্রাতে সহরে প্রবেশ করিলাম। কি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য!

---

* পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা,—হরিদ্বার, হরদ্বার, গঙ্গাদ্বার, স্বর্গদ্বার, মায়াপুরী, মোক্ষদ্বার, কণখল ইত্যাদি এই সব নাম একই ক্ষেত্রকে বুঝাইয়া থাকে যথা:—

"কেচিদুচুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেচপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ" ॥
কাশীখণ্ড।

প্রত্যেক নামের পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। মহামায়া সতী এই ক্ষেত্রে মায়িক দেহাবসান করায় এই স্থানের নাম মায়াপুরী হইয়াছিল। "মায়াপুরী-মাহাত্ম্যে, এই নামের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। কেদারনাথে শিব আছেন, আর বদরীনাথে, নারায়ণ আছেন, এই দুটী স্থানই ভগবানের অতি প্রিয় এবং এই দুই স্থানে যাইতে হইলে এই ক্ষেত্রই একমাত্র দ্বার বা পথ; এইজন্য এই ক্ষেত্রের নাম হরিদ্বার বা হরদ্বার। কণখল নামেরও অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দেখা যায়—যথা:—

খলঃ কোনাম মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কণখলং তীর্থং নাম্না চক্রু মুনীশ্বরাঃ॥

অর্থাৎ এমন খল কে আছেন যিনি এই কণখল তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ করেন না। এজন্য ঋষিগণ ইহার নাম কণখল রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে এই নাম গুলির কোন কোনটী দ্বারা এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগকে বুঝাইয়া থাকে।

বাল-সূর্য্যকিরণ পাহাড়ের গায়ে প্রতিভাত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে-পাহাড়গুলি যেন দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় হরিদ্বারকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে,—তাহারা যেন সোহাগে গলাগলি করিয়া পরস্পর গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ—যেন তাহারা ক্রমশঃ উচ্চস্তরে সারি সারি বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন ! এক একটী যেন নিস্তব্ধতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ! আর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গঙ্গা কল কল নিনাদে হিমাদ্রির পাদদেশ ধৌত করতঃ উচ্ছ্বসিত অঙ্গে প্রবল বেগে ছুটিয়াছেন । এদিকে রাজপথে বিরাট জনপ্রবাহ আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছে । বিবিধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বেশধারী সাধুগণ চলিয়াছেন,—কাহারও বা রাজার ন্যায় বৈভব, কেহ বা জটাজুটসমাযুক্ত বিভূতিমণ্ডিত কৌপীন মাত্রৈক সম্বল, আবার কেহ বা দিগম্বর বেশে চলিয়াছেন । কখনও বা সেই জনপ্রবাহ হইতে "গঙ্গা মায়ীকি জয়" ধ্বনি উঠিয়া শৈলশিখরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগদিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে । সকলের মুখেই যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ছটা খেলিতেছিল ! সকলেই যেন একপ্রাণ হইয়া এই বিরাট যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন ! প্রাকৃতিক মাধুর্য্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম । বিরাট কুম্ভমেলার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে, তবে আমরা যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব । প্রথমে কুম্ভযোগ কি; এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের উদ্দেশ্যই বা কি এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতাই বা কে; এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক :—

অমৃত কুম্ভযোগ ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে "অমৃত-কুম্ভযোগ" আর্য্যগণের নিকট অতি পবিত্র এবং পুণ্যদায়ক অত্যুত্তম যোগ বলিয়া সমাদৃত ও আচরিত হইয়া আসিতেছে । এসম্বন্ধে বিষ্ণুযাগাদি গ্রন্থে বহু পৌরাণিক প্রমাণ দৃষ্ট হয় যথা:—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কলসোৎপত্তিমুত্তমাম্ ।
উত্তরে হিমবত পার্শ্বে ক্ষীরোদ নাম সাগরঃ ॥
আরব্ধং মন্থনং তত্র দেব দানব পূর্ব্বকঃ ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥
* * * *
কলসশ্চ সমুদ্ভূতো ধন্বন্তরি করোল্লসৎ ।
সুধাস্তং সুধয়া পূর্ণঃ সর্ব্বেষাংহি মনোহর ॥

ইত্যাদি—

এই সব শাস্ত্র-বচনের সারাংশ এই :—হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে ক্ষীরসমুদ্র; এই সমুদ্র মন্থন করার জন্য দেবাসুর মিলিত হইলেন । মন্দর পর্ব্বত মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকী মন্থন-রজ্জু হইলেন; আর স্বয়ং বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে মন্দরকে ধারণ করিলেন । সমুদ্র-মন্থনে পুষ্পক রথ, ঐরাবত, পারিজাত, কৌস্তুভ, লক্ষ্মী, সুরভী প্রভৃতি উত্থিত হইলেন, পরিশেষে অমৃত-কুম্ভ সহ ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন । তিনি সেই কুম্ভ দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তে দিলে, তিনি তৎপুত্র জয়ন্তের নিকট রাখিলেন । দেবগণের প্রেরণায় জয়ন্ত সেই "অমৃত কুম্ভ" লইয়া স্বর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন । জয়ন্তের এরূপ গর্হিত

আচরণ দেখিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলেন এবং জয়ন্তের নিকট হইতে সেই কুম্ভ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে দৈত্যগণকে আদেশ দিলেন। গুরু আজ্ঞায় উৎসাহিত হইয়া দৈত্যগণ স্বর্গপথ রোধ করিল; এদিকে জয়ন্তকে রক্ষা করার জন্য দেবগণও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল; বার দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল, জয়ন্তও এই কয়েক দিন পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে অমৃত কুম্ভ লুকায়িত রাখিয়া রক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে দেবতাগণের পরাজয় হইল। দৈত্যগণ তখন অমৃত কুম্ভ খুঁজিয়া বাহির করিল, এবং পান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। এই অমৃত কুম্ভ পৃথিবীর যে চারিস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পুণ্যশীল জনগণ কর্ত্তৃক তদবধি পবিত্র কুম্ভ-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবতাদিগের দ্বাদশ দিবস নরলোকে দ্বাদশ বৎসর কাল সূচিত থাকায়, দ্বাদশ বৎসর অন্তে প্রত্যেক কুম্ভ রক্ষার স্থানে কুম্ভ মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই সময় হইতেই "কুম্ভযোগ" পর্ব্বরূপে ভারতের আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত নিয়মে আচরিত হইয়া আসিতেছে।

> গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ ধারা গোদাবরী তটে।
> কলসাখ্যোহি যোগহয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ॥

(১) গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার (২) প্রয়াগ (৩) অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) (৪) গোদাবরী-তট (নাসিক) এই চারি স্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর এক এক স্থানে কুম্ভ হইয়া থাকে; সুতরাং গড়ে বার বৎসর পর পর প্রত্যেক স্থানে কুম্ভ হয়।

পুরাণাদিতে হরিদ্বারে কুম্ভ কাল এরূপ বর্ণিত আছে যথা:—

> বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেব পুরোহিতে
> গঙ্গাদ্বারেচ কুম্ভাখ্য সুধামেতি নরোত্তমঃ।
>
> স্কন্দ পুরাণ॥

পুরাণান্তরে:—

> কুম্ভরাশি গতেজ্জীবে যদ্দিনে মেষগে রবৌ
> হরিদ্বারে কৃত স্নানং পুনরাবৃত্তি বর্জ্জনং।
> লোকে কুম্ভমিতিখ্যাতং জানিয়াৎ সর্ব্বতো নরৈঃ
> গঙ্গায়া স্নান-মাহাত্ম্যং নালং বক্তুং চতুর্মুখঃ।

হরিদ্বার মাহাত্ম্যে—

> ধন্যানাং পুরুষাণাং হি গঙ্গাদ্বারস্য দর্শনং
> বিশেষতস্তু মেষার্ক সংক্রমেতীব পুণ্যদং"

তথা স্কান্দে—

> পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতো গুরৌ।
> গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভ নামা তদোত্তমঃ॥

অর্থাৎ যৎকালে বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে এবং সূর্য্য মেষ রাশিতে অবস্থিত হন, সেই সময় হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

প্রয়াগের কুম্ভ কাল:——

যথা—

> মেষরাশি গতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ
> অমাবস্যা তদা যোগ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে।

অর্থাৎ গুরু মেষ রাশিতে চন্দ্র সূর্য্য মকর রাশিতে এবং তিথি অমাবস্যা হইলে তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়।

পুরাণান্তরে—

> মকরেচ দিবানাথে অজগেচ বৃহস্পতৌ
> কুম্ভযোগ ভবেত্তত্র প্রয়াগে হ্যতি দুর্লভঃ॥

অর্থাৎ—সূর্য্য মকর রাশিতে আর বৃহস্পতি

মেষ রাশিতে অবস্থিত হইলে প্রয়াগধামে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

গোদাবরীতটে কুম্ভ কাল :—

যথা—

কর্কে গুরুস্তথা ভানু চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়স্তথা
গোদাবর্য্যা তদা কুম্ভ জায়তেঽবনীমণ্ডলে।

অর্থাৎ—কর্কট রাশিতে গুরু, সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে এবং অমাবস্যা যোগ হইলে গোদাবরী তটে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। পুরাণান্তরে :—

সিংহরাশিগতে সূর্য্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
গোদাবর্য্যাং ভবেৎকুম্ভঃ পুনরাবৃত্তি বর্জ্জনঃ॥

সূর্য্য ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে মুক্তিদায়ক কুম্ভযোগ হয়।

অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী কুম্ভ কাল :—

ঘটে সুরিঃ শশি সূর্য্য কুহ্বাম দামোদরে যদা।
ধারায়াংচ তদা কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

তুলা রাশিতে সূর্য্য চন্দ্র ও গুরু সংযোগ তিথি অমাবস্যা হইলে উজ্জয়িনীতে "সুধা-কুম্ভযোগ" হইয়া থাকে।

পুরাণান্তরে :—

মেষরাশি গতে সূর্য্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ।
উজ্জয়িন্যাং ভবেৎ কুম্ভঃ সর্ব্ব সৌখ্য বিবর্দ্ধনঃ॥

সূর্য্য মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে উজ্জয়িনীতে সকলের সুখদায়ক কুম্ভযোগ হয়।

পুরাণোক্ত কুম্ভ-পর্ব্বের কতকাংশ আলোচনা করা গেল। এক্ষণে ইহার সহিত সন্ন্যাসী-মহাসম্মিলনীর কিরূপে সংযোগ হইল, তাহাই বর্ত্তমানে বিশেষ আলোচনার বিষয়।

শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যই এই মহাসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা, এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যৎকালে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেব ভারতের তদানীন্তন বেদবিগর্হিত আচারগুলি উচ্ছেদ করিয়া ও জনগণের ভ্রান্তি নিরাশ করিয়া বিমল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অজ্ঞানান্ধ জনগণ তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানালোকে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। আচার্য্যদেব তাঁহার এইরূপ দিগ্বিজয়ের ফলস্বরূপ ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। এই সকল মঠের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ যাহাতে কোনও সময়ে কোনও বিশেষ স্থানে মিলিত হইয়া, কোথায় কিরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, কিরূপ কার্য্য করিলে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে এবং সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তৎতদ্বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ পান, তজ্জন্য তিনি শিষ্যগণকে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কুম্ভযোগে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতে মিলিত হইবার জন্য আদেশ করেন। সেই অবধি এই সকল স্থানে যথারীতি কুম্ভ উপলক্ষে সন্ন্যাসিগণ মিলিত হইতে থাকিলেন, এই মিলনই কুম্ভমেলা। এই উপলক্ষে সাধারণ জনগণও সমবেত হওয়ায়, এই সকল সাধুমহাত্মাগণের উচ্চ ভাবরাশি তাহাদিগের মধ্যেও বিস্তৃত হইতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণও এই মিলনের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সানন্দে ইহাতে যোগদান করিলেন। এইরূপে ভারতে এক নূতন জাগরণের দিন আসিল; সকলেই জ্ঞানালোক পাইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিল। ভারত এক সুন্দর

শ্রীধারণ করিল ! সেই দিনগুলি ভারতের কি শুভ দিন ও মহিম-মণ্ডিত, তাহা বলা যায় না !

কালের কুটীল গতিতে দেশের জনগণের মধ্যে যেমন ধর্ম্মভাবের অভাব হইতে লাগিল, তেমনই এই কুম্ভ মিলনের উদ্দেশ্যও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইল। কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইলেও, এখনও যাহা আছে, তাহাও হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিতেছে, আর ঐ সকল সমবেত সাধু মহাত্মার মঙ্গল চিন্তার ফলেই ভারতের অদৃষ্ট লিপি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই সম্মিলন আরও মঙ্গলদায়ক হইবে, বর্ত্তমান কুম্ভে আমরা এরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ক্রমশঃ।

জনৈক দর্শক।

———:0:———

যোগানন্দ-লহরী।

(৭)

বেহাগ—একতালা

নমি গো মা গঙ্গে পতিতপাবনি,
প্রেমতরঙ্গিণি জগতত্তারিণি।
জয় মা জাহ্নবী কলুষনাশিনী,
সর্ব্বতীর্থময়ী সত্যসনাতনী॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গোলকবাসিনী,
শশাঙ্ক-শেখর-শির-বিহারিণী,
ব্রহ্মকমণ্ডলু নিবাসিনী তুমি,
তুমি দ্রবময়ী আনন্দদায়িনী॥
বিষ্ণুলোকে মাগো তুমি মন্দাকিনী,
সুরলোকে পুনঃ তুমি সুরধুনী,
তুমি ভাগিরথী ভূতলে জননী,
সগর সন্তান উদ্ধার কারিণী;—
তব পূত নীরে যেবা স্নান করে,
পাপ তাপ নাশি, মোক্ষ দেও মা তারে;
কুলু কুলু রবে ডাক মা সবারে
করুণারূপিনী অভয়দায়িনী॥

সুখদা বরদা শান্তনু গেহিনী,
দেবেন্দ্র-মাতঙ্গ-মদ বিমর্দ্দিনী,
অকুল সাগরে তুমি নিস্তারিণী,
তুমি শান্তিময়ী শমন-বারিণী;—
জয় মা জ্ঞানদা অজ্ঞাননাশিনী,
তুমি অগতির গতি প্রদায়িনী,
ত্রিলোক বন্দিনী তুমি মা কল্যানী,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদায়িণী ॥
পূণ্যবান জন তরে নিজগুণে,
তবে কি মহত্ত্ব রবে মা ভূবনে ?
গতিহীনে স্থান দিলে ও চরণে
তবে সে বুঝিব মহিমা তেমনি;—
যোগেনের সাধ অন্তিমে মা গঙ্গে
ভাসে যেন দেহ তোমারি তরঙ্গে,
(তব) চির শান্তিময় অসীম দ্রবাঙ্গে
অনন্ত সমাধি দিও গো জননী ॥

———:0:———

পূর্ব্বরাগ।

(রাধাপক্ষে।)

[১]

অঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বং যা উৎকণ্ঠাময়ী রতিঃ স পূর্ব্বরাগ।
উজ্জ্বল নীলমণি।

"সঙ্গ নহে রাগ জন্মে, কহি পূর্ব্বরাগ।"

সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে একজনকে দেখিয়া হঠাৎ নায়িকার হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়; জীবন প্রসূনের কোরকগুলি বেপথু-প্রবাহে বিকাশোন্মুখ হইয়া উঠে; হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে কোকিলার কুহু তান বাজিয়া উঠে—কি জানি কি এক অননুভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত ভাবের স্ফুরণে তাহার দেহ মন এলাইয়া পড়ে। সে বন্যায় তাহার বিচার, যুক্তি ভাসিয়া যায়; কোন দিকে না চাহিয়া, কোন কিছু না বুঝিয়া, জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে, সে নায়ককে ভালবাসিয়া ফেলে—তাহার সমস্ত জীবন যৌবন বাঞ্ছিতের পায়ে ঢালিয়া দেয়। কিন্তু কেন যে নায়িকা নায়ককে দেখিয়া মুগ্ধ হইল—কেনই বা তাহাকে ভালবাসিল, তাহার কোন বিশিষ্ট কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। এই সঙ্গশূন্য প্রথম দর্শন জাত ভালবাসা অহেতুক। কিন্তু ইহার স্পর্শে তরুণীর জীবন ক্রমে অসহনীয় হইয়া পড়ে। এই অনুরাগের অতল জলে

জাতি-কুল-মান বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার হৃদয়-প্রিয়তমের সঙ্গলাভের জন্য আকুল হইয়া উঠে। যতদিন না সঙ্গ লাভ হয় ততদিন আর সোয়াস্তি নাই, বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় তাহার যাতনার শেষ নাই! নায়ক দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল, কিন্তু নায়িকা তাহাকে ভুলিতে পারিল না—তাহার মুর্ত্তি যে নায়িকার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয় রহিয়াছে। কি উপায়ে,—কি ছলে তাহার চিত্ত-চোরকে দেখিবে, তাহার ব্যগ্র আঁখি যে সতত তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার বাক্যামৃত পানের জন্য তাহার শ্রবণ যে লোলুপ হইয়া রহিয়াছে!—তাহার হৃদয়ে যে আগুণ জ্বলিয়াছে, মরণ ভিন্ন কে সে আগুণ নিভাইবে?—কে সে জ্বালা জুড়াইবে?

একতিল প্রিয় বদন মাধুরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর না পূরয়ে আশা,
বাসনা নয়নে ভরি॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন যে হেরি,
যেন কভু দেখি নাই।
কি দিয়া বান্ধিল পরাণ আমার
ভাবিয়া কিছু না পাই॥

এই পূর্ব্বরাগের (প্রণয়ের) উৎকর্ষাবস্থা বা পরিণত অবস্থাকে রাগ বলে;—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রণয়ের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইলে অতি দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রণয়োৎকর্ষের নামই রাগ। ইহা অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতার হেতুভূত প্রেমময় তৃষ্ণা, যথাঃ—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

বাঞ্ছিত প্রিয়জনের প্রতি চিত্তের যে প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহাই রাগের স্বরূপ লক্ষণ; আর রাগানুরোধে সেই অভীষ্ট প্রিয়জনের নিয়ত অনুধ্যানই উহার তটস্থ লক্ষণ; আর স্বীয় অভিলষিত প্রিয়জনের অনুধ্যানে নিয়ত থাকা নিবন্ধন সেই প্রিয়জনের স্বারূপ্য লাভ তাহার উত্তর লক্ষণ বা রাগের পরিণতি। যথাঃ—

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাস্তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপং পরিত্যজন্॥

"স্নেহ, দ্বেষ অথবা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া দেহী একাগ্র-চিত্তে যাহাতে সমস্ত মন নিবিষ্ট করে, সে তাহারই স্বরূপতা লাভ করে। গহ্বর মধ্যগত কীট-বিশেষ পেশস্কৃত নামক ভ্রমর বিশেষের নিরন্তর পরিচিন্তনে, পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তৎস্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়।"

রাগও এইরূপে পরিপাকদশায় আশ্রয়ালম্বনকে বিষয়ালম্বনে পরিণত করিয়া থাকে। এইরূপেই ভালবাসার পাত্রী ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়, ভক্ত ভগবানের সত্ত্বায় লীন হইয়া যায়। যাঁহাকে ভালবাসা যায়, তিনি দূরে থাকিলে, আমার চরম তৃপ্তি হয় না। তাই 'আমাকে' 'তিনি' হইতে হয় অর্থাৎ আমার 'আমিত্ব' পৃথক থাকিতে, তাঁহার প্রাণের সহিত আমার প্রাণের, তাঁহার মনের সহিত আমার মনের, তাঁহার আত্মার সহিত আমার আত্মার সমতা হইতে পারে না। আর যে পর্য্যন্ত এই সমতা না হইবে সে পর্য্যন্ত প্রণয়ের স্থায়িত্ব হইতে পারে না। আমার 'আমিত্ব' পরি-

হার করিয়া আমাকে 'তাঁহাতে' পর্য্যবসিত করিতে হইবে। এই খানেই রাগের চরম উৎকর্ষ এবং পরিসমাপ্তি, ইহাই তাহার উত্তর লক্ষণ।

বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে রাগ তিন প্রকার; মঞ্জিষ্ঠা, কুসুমিকা ও শিরীষা। তন্মধ্যে—

> অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
> ভবেৎ মঞ্জিষ্ঠারাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥

মঞ্জিষ্ঠা নামক রক্তবর্ণ লতিকার বর্ণ যেমন ধৌত হইলে বা অন্য প্রকারে নষ্ট হয় না এবং নিজের উজ্জ্বলতার জন্য অন্য কোন বর্ণের অপেক্ষা রাখে না, নিরন্তর স্বীয় কান্তিতেই বৃদ্ধিশীল, মঞ্জিষ্ঠা নামক রাগও তদ্রূপ। এই রাগ শ্রীরাধা-মাধবের মধ্যে বিরাজিত।" মঞ্জিষ্ঠা রাগ অহেতুক ভাবে আপনিই বর্দ্ধনশীল বলিয়া সকল রাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তৎপর কুসুমিকা রাগ, যথা:—

> কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতম্।
> অন্যরাগচ্ছবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথাযথম্॥

যে রাগ কুসুমফুলের ন্যায় হৃদয়-ক্ষেত্রকে রঞ্জিত করিয়া দেয় এবং অন্য রাগের চিত্রের অভিব্যঞ্জক, অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠা শিরীষাদি রাগের দ্যুতিঃ প্রকাশ করিয়া শোভিত হয়, তাহার নাম কুসুম্ভ রাগ। কুসুম ফুলের রং স্থায়ী হয়না বটে, কিন্তু কোন কষায় দ্রব্য সহযোগে এই রং প্রদান করিলে, তখন তাহা স্থায়ী হয় এবং বাহিরেও অতিশয় উজ্জ্বল দেখায়! চন্দ্রাবলীতে এই রাগ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের মোহনরূপাদি কষায়ে চন্দ্রাবলীর কুসুম্ভ রাগ চিরস্থায়ী হইয়াছে ও বাহিরেও উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়াছে। এই রাগ মধ্যম।

নব প্রস্ফুটিত শিরীষ কুসুমে যে হরিদ্রাবর্ণের আভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, ফুল বাসি হইলেই তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। সেইরূপ সম্ভোগার্থে যে রাগ ফুটিয়া উঠে এবং বিপ্রলম্ভে (বিরহে) ম্লান হইয়া পড়ে তাহারই নাম শিরীষা।

কুব্জা সুন্দরী প্রভৃতিতে এই রাগের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। ইহা অধম।

রাগের পরিণতাবস্থা অনুরাগ। এই রাগ যখন গাঢ়তা বশতঃ নবনবায়মান হইয়া সদানুভূত প্রিয়জনকে নবনবায়মানরূপে অনুভূত করায়, তখনই তাহাকে অনুরাগ কহে। যথা:—

> সদানুভূতমপি কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
> রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

আবার অনুরাগ যখন যাবতীয় রাগবৃত্তির সহিত স্বসংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহা ভাব বলিয়া আখ্যাত হয়।

> অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
> যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

ভাব আবার পরিণতাবস্থায় মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই পূর্ব্বরাগ হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্তই শ্রীমতী রাধার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়াছিল! কিন্তু পূর্ব্বরাগ বুঝিতে হইলে রসতত্ত্বালোচনার প্রয়োজন। যাহাকে কখনও দেখে নাই বা যাহার কখনও নাম শুনে নাই, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া কেন যুবক যুবতীর প্রতি ও যুবতী যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়; তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আলোচ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত

সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৃষ্ট পদার্থমাত্রের মধ্যেই এমন একটী অব্যক্ত সম্মিলনী শক্তি আছে, যাহার ফলে একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুর প্রতি আকৃষ্ট ও তাহার সহিত মিলিত হইতেছে। অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এই নিগূঢ় কারণ—রস। এই সম্মিলনী শক্তি এই রসতত্ত্বেরই স্ফুরণ। রসই জগতের প্রাণ; এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বে কেবল রসেরই লীলা খেলা। রসের জন্যই জীব পাগল, এই রসের আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়াই সে অনন্ত কাল ধরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেবল জীবই বা বলি কেন, মহদাদি অণুপর্য্যন্ত সকলেই এই রসের জন্য উন্মত্ত। তাই প্রেমিক-চূড়ামণি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন :—

রসের সাগর, কিসে জনমিল
রস বা বলিব কারে।
কেবা কোথা গেল, কে তা আস্বাদিল,
কে তাহা বলিতে পারে॥
অমিয়ার সার প্রেম নাম তার,
রসের তিনটী ধার।
নিতি নব রস, হয় অনুভব,
বুঝিতে শকতি কার॥
অমিয়ার নিধি, মথি নিরবধি,
তাহে উপজিল রস।
তাহার সংযোগ যদি হয় যোগ,
জগত তাহার বশ॥
রসের মাধুরী সবা হতে ভারী,
জানিতে শকতি কার?

এই রসের উৎপত্তি, নিত্য বৃন্দাবনে; সেই চিন্ময় নিত্যধাম হইতে এই রস উৎসারিত হইয়া মরজগতে জীবের প্রাণে ফল্গু-নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।

"এই যে নিগূঢ় ধন"
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য"।

এই ব্রজের রস চারিটী;—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। তন্মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা আধার ও আধেয় রাধা ও কৃষ্ণ॥

আনন্দৈক সুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দো নন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

"যিনি নিখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্ত্তা এবং যিনি গোকুলে পূর্ণতম পরমানন্দ রূপে প্রকাশিত হইয়া ব্রজবাসী মাত্রেরই নন্দন, অর্থাৎ আনন্দ বিধায়ক ছিলেন সেই আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ কমললোচন শ্রীশ্যামসুন্দরই কৃষ্ণ নামে অভিহিত।

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করেন, তিনিই হরা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মনোহরা (সম্বোধনে হরে)। শ্রীকৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী শ্রীরাধাই এই নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

আবার শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" জীব ভগবানের তটস্থ, নিত্য ব্যষ্টি-শক্তি, সুতরাং পূর্ণ ভগবান যে রসের আধার, ব্যষ্টি জীবের মধ্যে ব্যষ্টিভাবে তাঁহারই বিকাশ হইয়া থাকে। এই খানেই জীব জগতের রসতত্ত্বের মীমাংসা। অতঃপর আমরা রসাধার শ্রীকৃষ্ণে এই রসের

স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া ইহার তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্ ॥

সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিন যখন শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন তিনি সচ্চিদানন্দঘন। কিন্তু এই তিন, ভগবানে পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলে লীলার বিকাশ হয় না; তাই তাঁহাকে ভোগ্য ও ভোক্তা, দৃশ্য ও দ্রষ্টারূপে পৃথক হইয়া লীলাভিনয় করিতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু শক্তি রূপে বিভক্ত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি এই তিন শক্তি প্রধান। চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ও জীবশক্তি তটস্থা। এই তিনটীর মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই (স্বরূপ শক্তি) সর্ব্বপ্রধানা। যথা:—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাহে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥
চৈঃ চঃ।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন শক্তির মধ্যে আনন্দই স্বরূপ-শক্তি। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ও চিদংশে সম্বিদ; অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই হ্লাদিনী, বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই সন্ধিনী আর তটস্থ জীবশক্তিই সম্বিদ নামে অভিহিতা। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বিশুদ্ধ অন্তরতম অংশই হ্লাদিনী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। ইনিই বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এবং প্রেমস্বরূপ। আর রস-শেখর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই রসস্বরূপ। প্রেম আর রস লইয়াই বৃন্দাবনের লীলা।

প্রেমপাগল মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেম ও রসতত্ত্ব প্রচার উদ্দেশ্যে, গোদাবরী তটে প্রেমিকপ্রবর রায় রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া প্রেম ও রসতত্ত্বের যে মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, আমরা তাহার একটু আভাষ দিতেছি:—

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
চৈতন্য চরিতামৃত।

রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে কেহ জানায় নাই, কেহ জানিতেও চাহে নাই। বৃন্দাবনে যাহার কেবল প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই গুহ্য রস ও প্রেমতত্ত্ব প্রচারের জন্য ভগবানকে আবার, গৌরাঙ্গ রূপে আসিতে হইয়াছিল। পূর্ণ ভগবান ব্যতীত তাহার স্বরূপ প্রচার কেহ করিতে পারে না; তাই সেই তত্ত্ব প্রচারের জন্যই মহাপ্রভুর এই প্রশ্ন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরায় প্রশ্ন করিলেন:—

এবে জানিল সাধ্য সাধন নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্ব রূপ ॥

উত্তরে রামানন্দ বলিলেন:—

"ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈভব আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব রস পূর্ণ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপতি স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুরী নিরন্তর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আবরণে আবৃত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময়ী সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি বহিরঙ্গ। সর্ব্বাকর্ষকত্বাদিগুণযুক্ত, শ্রীবৃন্দাবনবিহারোচিত শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী শৃঙ্গাররসরাজ মূর্ত্তিই—সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ স্বরূপই রসতত্ত্ব। তিনি নিজ ভক্তগণের হৃদয়ে স্বকীয় স্বরূপের যতটুকু প্রদান করেন, তাহাই তাঁহার সীমা!

অনন্তর রায় রাধিকাতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে আহ্লাদিনী কারণ॥
আহ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস, প্রেমের আখ্যান
প্রেমের পরম সার রাধা ঠাকুরাণী॥
সেই তো মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।
প্রেমের স্বরূপ দেহে প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥

চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান, শ্রীরাধা তাঁহার নিজ-শক্তি। এই উভয় বস্তুই চন্দ্র ও তদীয় রশ্মির ন্যায় নিয়ত সম্মিলিত রহিয়াছে। কৃষ্ণস্বরূপের ঐশ্বর্য্যময় আবরণের ন্যায়, তাঁহার এই শক্তিরও ঐশ্বর্য্যময় আবরণ আছে। শ্রীরাধার স্বরূপ চিচ্ছক্তি, তাঁহার অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ স্বরূপ এই হ্লাদিনী তত্ত্ব, শ্রীরাধার এই পরম অন্তরঙ্গ স্বরূপই প্রেমতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ভক্তগণের হৃদয়ে নিজ শক্তি লাভের যতটুকু অধিকার প্রদান করেন, তাঁহারা কেবল ততটুকুই উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব ইহারা সকলেই প্রেম শব্দ বাচ্য। অতএব যেমন প্রপঞ্চে একীভূত পঞ্চভূত দেহাকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তদাকারে প্রকটিত হয়। আর ইহা প্রেমে বিভাবিত অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে প্রেমে মাখা।

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা-দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ রসতত্ত্ব এবং শ্রীরাধা প্রেমতত্ত্ব অর্থাৎ পরমপুরুষ রস-তত্ত্ব ও পরাপ্রকৃতি প্রেমতত্ত্ব। কৃষ্ণ রাধাতে আকৃষ্ট হন প্রেমের জন্য আর রাধা কৃষ্ণে আকৃষ্ট হন রসের জন্য। এখন আমরা দেখিতে পাইব যে এই রস ও প্রেমতত্ত্বই আমাদের পূর্ব্ব কথিত জাগতিক সম্মিলনী-শক্তির মূলীভূত নিদান। ক্রমশঃ।

বৈষ্ণব পদরজভিখারী—দীন প্রেমানন্দ।

---:0:---

সমালোচনা ও সংবাদ।

আমরা নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু আর্য্য-দর্পণের কর্ম্মকর্ত্তাগণ হরিদ্বারের কুম্ভযোগ উপলক্ষে বহুদিন মঠে অনুপস্থিত ছিলেন, এই কারণে যথা সময়ে পুস্তকগুলির সমালোচনা বাহির করিতে পারি নাই; তজ্জন্য আমরা লজ্জিত। বহুদিন অতীত হইয়াছে বলিয়া, আমরা নিম্নে পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম।

---0---

ঈশ্বরের স্বরূপ। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এল্ প্রণীত এবং গৌহাটী সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত; মূল্য ৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে ব্রাহ্মণা-ধর্ম্মানুমোদিত ঈশ্বরের নিরাকার (নির্গুণ) সাকার (সগুণ,) প্রতীক প্রভৃতি স্বরূপের সংক্ষেপে ও সরল ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি

---0---

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ এম্, এ প্রণীত এবং গৌহাটী সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তক খানিতে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধে সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের গৌরবস্থল ব্যক্তিগণ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজকে যে ভাবে বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি-নিরাস করিতে একজন কৃতবিদ্য হিন্দুকে অগ্রসর দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আরও বুঝিয়াছি, আমাদের এই সনাতন সমাজ এখনও নির্জ্জীব বা স্পন্দহীন হয় নাই। যাহারা নূতন ভাবের মদিরায় মত্ত হইয়া সমাজ-সংস্কারক রূপে শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার ঋষিগণকে অনাবশ্যক ভাবে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাত করে, তাঁহাদের অবিদ্যা-মলিন অহংবুদ্ধির অসার মতবাদ সুযুক্তির সহিত খণ্ডন করিয়া,—ভক্তিবিনম্র-হৃদয়ে শাস্ত্রালোচনা না করার কুফল দেখাইয়া গ্রন্থকার হিন্দুমাত্রেরই ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তক খানির মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

---0---

হিন্দুবিবাহ-সংস্কার। এই পুস্তক খানিও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ প্রণীত এবং গৌহাটী সনাতন ধর্ম্ম-সভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। এই পুস্তকে "হিন্দু ম্যারেজ রিফর্ম লীগ" প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা আমাদের সমালোচ্য নহে। তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গ্রন্থকারগণের এই সকল সমাজ সেবক পুস্তকাবলী প্রকাশের এবং অল্প মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা দ্বারা গৌহাটী সনাতন ধর্ম্মসভা প্রকৃত সমাজের সেবা করিয়া ইহার অশেষ কল্যান সাধন করিতেছেন।

সাত্বতপদ্ধতি। শ্রীযুক্ত পুণ্ডরী-কাক্ষ ব্রতরত্ন, স্মৃতিভূষণ সঙ্কলিত এবং কলি-কাতা—১৭১ নং হ্যারিসন্ রোড, ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তক-খানি গোপাল ভট্ট প্রণীত বৈষ্ণবস্মৃতি "সৎক্রিয়া-

সার-দীপিকা" অবলম্বনে লিখিত। ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবস্মৃতি অনুমোদিত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিই সাত্বতপদ্ধতির লক্ষ্য। অনন্তশরণ বৈষ্ণব প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে এই গ্রন্থোক্ত প্রথা সর্ব্বথা আচরণীয়।

———0———

নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিঃ। শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারি-সঙ্কলিত এবং কলিকাতা—শ্রীশ্রীবৈষ্ণবীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনামাত্র, ১৬১নং হ্যারিসন্ রোডে প্রাপ্তব্য। ইহাতে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায়ের ও গৌড়েশ্বর বা মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের এবং বৈষ্ণব মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের আবশ্যকীয় দৈনিক কৃত্যগুলির পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

———0———

শ্রীএকাদশী সন্দর্ভঃ। এই পুস্তকখানিও শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারি সঙ্কলিত এবং কলিকতা শ্রীশ্রীবৈষ্ণবীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র, ১৬১ নং হ্যারিসন্ রোডে প্রাপ্তব্য। ইহাতে পৌরাণিক প্রমাণ সম্বলিত একাদশী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিযোগীতায় কলিকতা ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল কর্ত্তৃক "গোকুলচন্দ্র সুবর্ণ পদক" ও "ব্রততত্ত্ব" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

———0———

তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ। কলিকাতা—১৬১ নং হ্যারিসন্ রোড, ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল হইতে মূল ও শ্রীমৎবিদ্যাভূষণের টীকা সহ সিদ্ধান্তরত্নোপাধিক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী কর্ত্তৃক সতাৎপর্য্যবঙ্গানুবাদিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত; মূল্য ১।০ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি শ্রীমৎ শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত প্রথম সন্দর্ভ। ইহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বর, জীব প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটী অনাদিতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, পরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার পরতমত্ব এবং জীবেশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদ-বাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই বৈষ্ণবীয় দর্শনের বঙ্গভাষায় শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বৈষ্ণব-দর্শন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাধকের উপকার করিয়াছেন। এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্যরত্ন দান করিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে দার্শনিক জ্ঞানের যে মহাগৌরবময় গবেষণা পরিলক্ষিত হয়, তাহা ভগবত্তত্ত্ব পিপাসু ভক্তমাত্রেরই আস্বাদ্য। আইভরি কাগজে নূতন অক্ষরে মুদ্রিত। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই আদরের ধন সন্দেহ নাই।

———0———

প্রেমের ডালি। শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে প্রণীত এবং হুগলী—এলাটী "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত; মূল্য ॥০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার ভক্তি-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। "রাঙ্গা পা-দুখানি" লিখিয়া—রাঙ্গাপা-দুখানির সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া তিনি ভক্ত মাত্রেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকখানিতেও শ্রীভগবান গৌরহরির শ্রীচরণাশ্রিত গ্রন্থকারের প্রাণের আবেগ ভরা কয়েকটী গদ্য—পদ্য

গীতিকাময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার আর সমালোচনা কি করিব; তাহাতে যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি তাহা ভক্ত মাত্রেরই আস্বাদ্য—আলোচনার অবসর কৈ?

———0———

শ্রীপ্রতাপরুদ্র-চরিত। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব চরণ দাস প্রণীত এবং হুগলী—এলাটী "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত; মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। ইহাতে উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র-গজপতির চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বড় অধিক নাই, আছে কেবল তাঁহার জীবনের মধুময় অংশ। প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে শরণ লইয়া ইনি রাজ্যমধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সমগ্র ভারতের এক তৃতীয়াংশের স্বাধীন রাজা, তাঁহার গৌরবময় জীবন কিরূপে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পাঠ করিলে সর্ব্ব প্রকার অহঙ্কারের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাইবে। এই পুস্তক পাঠ কালে শ্রীগৌরাঙ্গ-গত-প্রাণ প্রতাপরুদ্রের চরিত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণ শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্ত চরিত্রের আনন্দ-চিন্ময় রসের তরঙ্গে সন্তরণ করিবেন। এহেন ভক্ত-চরিত্রের স্বাদ গ্রহণ করিতে আমরা সাধারণকে অনুরোধ করি।

———0———

বৈষ্ণব-তত্ত্ব-দীপিকা। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারি সঙ্কলিত এবং হুগলী—এলাটী "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত; মূল্য ।০ আনামাত্র। এই গ্রন্থে গুরু শিষ্যের কথোপকথনছলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কতকগুলি তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিধর্ম্ম মূলক অনেক উপদেশও আছে। সাম্প্রদায়িক হিসাবে পুস্তক খানিতে অনেকের প্রয়োজন সাধিত হইবে।

———0———

বার্ষিক উৎসব। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আসাম প্রদেশীয় সারস্বত মঠান্তর্গত অত্র শান্তি আশ্রমের ৮ম বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ৩রা হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু-ব্রহ্মের বিশেষ পূজা, হোম, গীতা-চণ্ডী ও স্তোত্রাদি পাঠ এবং নাম যজ্ঞাদি বিশেষ-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলার ভক্তগণ সমাগত হইয়াছিলেন। যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়া ছিলেন। বৃষ্টি-বাদল সত্ত্বেও ষ্টেশন হইতে সকলে ৺নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমে উপস্থিত হন এবং অনবরত নামগানে ভক্ত মণ্ডলীর পরম পরিতোষ উৎপাদন করেন। হোম, পূজা ও যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ নির্ম্মাল্য ও যজ্ঞীয় ফোটা ধারণ করেন, পরে ফল মূল, খেচরান্ন ও মিষ্টান্ন, মিঠাই আদি প্রসাদ বিতরিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের আশ্রিত অনাথ-নারায়ণগণেরও নব বস্ত্রাদি দানে সেবা পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই উৎসব উপলক্ষে যোরহাট ষ্টেট রেলওয়ের মহামান্য ট্রাফিক ম্যানেজার

বাহাদুর সকল গাড়ীগুলিই 'শান্তি-আশ্রম' ষ্টেশনে দাঁড়াইবার অনুমতি দিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

আমরা সংবাদ পাইয়াছি, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের ভক্তবৃন্দ উক্ত অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঈদৃশ শুভানুষ্ঠান যে তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদক, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি, ভক্তদের জীব সেবায় মতি ও শ্রীভগবানে রতি দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

———0———

শ্রীশঙ্করোৎসব। ৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে জগদ্গুরু ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশে কাহারও জন্মোৎসব উপলক্ষে এমন সার্ব্বভৌম উৎসব আর একটীও অনুষ্ঠিত হয় না। আসাম প্রদেশের অত্র সারস্বত-মঠে ঐ দিবস যথারীতি জন্মোৎসব হইয়াছে। ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পূজা, হোম, আরাত্রিক হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্র ও উপদেশ মঠের সন্ন্যাসিগণের দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল।

———0———

কলিকাতা—বাঙ্গালার শ্রীশঙ্কর মঠে জগদগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে ২—৩০ মিনিট পর্য্যন্ত চণ্ডীপাঠ—গীতাপাঠ, পূজাদি এবং প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সভা হয়। বহু গণ্য-মান্য-সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি বলেন,—"শঙ্কর দ্বৈতাদ্বৈত সবকথা বলিয়াছেন। দ্বৈত শাস্ত্র আলোচনায় যিনি চরিতার্থ হন নাই, তিনি তখন অদ্বৈত বুঝিতে চেষ্টা করেন। যে কিছুই জানে না, তাহার পক্ষে অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝা কঠিন। শঙ্কর হিমাদ্রির জলপ্রপাত ও আকাশ বজ্রের স্বরূপ, যেমন পর্ব্বতানদীর শৈবাল রাশি প্রবল স্রোতে জলপ্রপাতে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ শঙ্কর-জলপ্রপাতে-স্রোতে আর্য-সমাজের বহু দিনের আবিলতা কোথায় ভাসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ হয়, সেই জন্য শঙ্কর সকলেরই অর্চনীয় হইয়া ছিলেন। শঙ্কর বালক, আমি ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ, কিন্তু যখন তাঁহার জ্ঞানের অসীমতার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তাঁহাকে বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতর বলিয়া বোধ হয়।" তিনি সভাপতি রূপে বঙ্গাল র শঙ্করমঠের উন্নতি কল্পে সমবেত সভ্যগণকে অনুরোধ করিবেন। বঙ্গবাসী যে জগদগুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচর্য্যের মহিমা বুঝিয়া তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছেন তাহা স্মরণ করিয়া আমারা আনন্দানুভব করিতেছি কিন্তু আমাদের আসাম যে তিমিরে সেই তিমিরে; উপধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পবিত্র স্নিগ্ধ আলোক আবরিত। সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে—আজিও সে শব্দ আসামে আসিয়া পৌছে নাই, কখন পৌঁছিবে কি না তাহা একমাত্র শ্রীভগবানেই জানেন। আমরা আসাম বাসীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য পতিতপাবন শ্রীভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

———0———

শ্রীবুদ্ধোৎসব গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমাতে ভগবান শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ও মহানির্ব্বাণের দিনে তাঁহার পূজা, আরতি, ভোগ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। বুদ্ধচরিত ও উপদেশাবলী আলোচনা করা হইয়াছিল।

———0———

ওঁ তৎসৎ ।

আর্য্য-দর্পণ ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা ।

৮ম বর্ষ, } শ্রাবণ । { ৪র্থ সংখ্যা ।

পূর্ব্বরাগ ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) ।

আকীট ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অংশে পুরুষ এবং পরাপ্রকৃতি হ্লাদিনী শ্রীরাধার অংশে রমণী গঠিত ; সুতরাং জীবজগতে পুরুষের মধ্যে রস ও রমণীর মধ্যে প্রেম ব্যষ্টিভাবে বর্ত্তমান আছে । পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জীব ভগবানের নিত্য তটস্থ শক্তি; সুতরাং রস ও প্রেমের আস্বাদ তাঁহার প্রাণে প্রাণে আছে । তাই যেখানেই রস ও প্রেমের সন্ধান পাইতেছে, জীব সেখানেই উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছে । উদ্দেশ্য আপন আপন অভাব পূরণ করা, অর্থাৎ সমষ্টি রসতত্ত্ব ও সমষ্টি প্রেমতত্ত্ব লাভ করা । কিন্তু এ মায়িক জগতে কি সে অভাবের পূরণ হইতে পারে ? এই প্রাকৃত জগতের প্রত্যেক বস্তুই যে অভাব দিয়া গঠিত ! এখানে রস ও প্রেমের কণামাত্র আছে ; কিন্তু কণায় কি আর সে অভাব পূরণ হইতে পারে ? তাই জীব দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া যাইতেছে—কিন্তু তৃষ্ণা মিটিতেছে না, প্রাণের জ্বালা জুড়াইতেছে না ? সে জানে না যে রস ও প্রেমতত্ত্ব শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বমোহন শ্রীকৃষ্ণের পরমাণুবৎ অংশও সর্ব্বমোহন, তদীয় স্বরূপের সকল শক্তি, সকল অংশই তদংশে বর্ত্তমান । তাই কেবল এই পরম গুণনিমিত শ্রীকৃষ্ণাংশও সর্ব্ব প্রাণীর চিত্তাকর্ষণে সমর্থ— স্বকীয় প্রেমরসে ত্রিভুবন প্লাবিত করিতে পারগ !

"শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

তাই জীবের সকল অভাব মিটাইবার স্থান এইখানে । যিনি জীবনে শ্রীরাধা ও

শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণের জ্বালা মিটিয়াছে, তৃষ্ণা গিয়াছে এবং হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে।

এই রস ও প্রেমের জন্যই, স্ত্রীবিদ্যুৎ ও পুংবিদ্যুৎ যেরূপ পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ নায়ক নায়িকাতে ও নায়িকা নায়কে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকর্ষণের গতি ভগবন্মুখী হইলেই প্রেম, আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভিমুখী হইলেই কাম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই রস ও প্রেম যে কেবল মানবের মধ্যেই আছে, তাহা নহে; তবে মানবের মধ্যে বিকাশের আধিক্য আছে বটে।

কোকিলের কুহুরবে, মলয়জনিঃসারী মলয়ানিলের সৌরভে, নভোমণ্ডলের দিগন্তব্যাপী নীলিমায়, অগণিত বৃক্ষরাজির নবকিসলয়দলে, স্রোতস্বতীর কুলু কুলু গীতে, নৈশগগনের তারকাবেষ্টিত শশধরে, সেই রস ও প্রেমের মাধুরী উছলিয়া পড়িতেছে; আর ফুলের ত কথাই নাই। তাই প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটী দেখিয়া ভাবুক আত্মহারা হইয়া যায়, ফুলের পাঁপড়িগুলির মধ্যে যেন তাহার প্রাণটীকে মিশাইয়া দিতে চায়। সৌন্দর্য্যের এক কণিকায় যেন কোন অজানা ঘুমন্ত ভাবের স্মৃতি আনিয়া দেয়। পৃথিবীময় এই রস ও প্রেমের লীলা।

প্রাকৃত জগতের ব্যষ্টি রস ও প্রেমের যে বৈচিত্র্য লীলা, তাহাই আমরা ধারণা করিতে পারি না; আর অপ্রাকৃত চিন্ময় বৃন্দাবনে পূর্ণরস ও প্রেমের যে বৈচিত্র্য, তাহা প্রাকৃত জগতের স্থূল দেহধারী মানবের ইন্দ্রিয়ের অনুভবনীয় হইবে কি করিয়া? আমরা স্থূল-বুদ্ধি বিশিষ্ট; কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় বুঝিতে হইলেই স্থূলের দৃষ্টান্ত নিয়া থাকি; আদর্শ না হইলে আমরা বুঝিতে পারি না। তাই প্রপঞ্চাতীত চিন্ময় দেহধারী রাধাকৃষ্ণের কিরূপ লীলাখেলা ও তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ প্রেম, তাহা বুঝিবার জন্য প্রপঞ্চান্তর্গত স্থূলজগতের নায়ক নায়িকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে প্রেম ও যে ভাব, তাঁহার কোটী অংশের একাংশের তুল্য প্রেম যুবকযুবতীর মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। পরন্তু রাধাকৃষ্ণের পবিত্র ভাবের মধ্যে, যুবকযুবতীর কামকলুষিত ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অপ্রাকৃত প্রেম-বৈচিত্র্যকে মলিনতার আবরণে ঢাকিয়া ফেলি। প্রাকৃত নরনারীর ভালবাসারই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম; আর তাঁহাদের সেই অনন্ত প্রেমের গাঢ়তা কিরূপে আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে? রস ও প্রেমতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া বক্ষ্যমান বিষয় হইতে আমরা বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্বরাগের বিষয় পুনরালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পূর্ব্বরাগের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তাঁহাদের নিত্যলীলা-মাধুরীর পুনরাভিনয়। জীবকে সেই রসরাজের পূর্ণরসের আস্বাদ দিবার জন্য, তাঁহার পিপাসিত কণ্ঠে সেই "প্রেম অমৃত পীযূষ ধারা" ঢালিয়া দিবার জন্য, শ্রীশ্রীনিত্যবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, ভূবৃন্দাবনে আসিয়া লীলা করিয়াছিলেন—যাহার অনুসরণে মানব পূর্ণশান্তির অধিকারী হইতে পারে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াং যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥
শ্রীমদ্ভাগবৎ।

"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিকাশার্থ মানুষ দেহ আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ-মানবগণ তাহা করিতে পারে।"

মধুময় বৃন্দাবনে চিরবসন্ত বিরাজিত। কোকিলের কুহুতান, ময়ূরের কেকারব, যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, কুসুম-পরিমলবাহী মৃদু মলয়ানিল, প্রাণোন্মাদকারী ভ্রমরের গুঞ্জন—এই সমস্তই বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজিত ॥

মধু ঋতু মধুকর পাতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি।
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥

* * *

সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটনগতিভঙ্গ।
মধুর তটিনী-নট-রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রস গান!
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥

বৃন্দাবনের সবই মধুমাখা, সবই নিতুই নূতন।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল ॥
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন,
নব নব প্রেম বিভোর।
নবীন রসাল মুকুল-মধু মাতিয়া
নব কোকিল-কুল গায় ॥

রাগের এইরূপ অনুকূল অবস্থা বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

নটবর শ্রীকৃষ্ণের দরশনে শ্রীরাধার যে সময় পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে, তখন বিধাতা যেন জগতের সমস্ত লাবণ্য আনিয়া শ্রীমতীর তনুখানি সাজাইয়া দিয়াছেন—দেখিলে মনে হয়, "কুসুমমিব শোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।" এই উছলিত রূপ-মাধুরী প্রেমিক চণ্ডীদাসের বীণায় যে তান তুলিয়াছিল, আমরা নিম্নে পাঠকগণকে তাহা উপহার দিতেছি:—

"কাঞ্চন-বরণী, কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল সাড়ী শোভে গায় ॥
দেখিতে বদন, মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল কুল ॥
আঁখিতারা দুটী বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি, লুব্ধ ভ্রমরা,
ছুটিতেছে নিরবধি ॥
কিম্বা দন্তভাতি মুকুতার পাতি,
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ
কাণে কর্ণমালা চেঁড়ি ॥
শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার,
উপমা কহিব কাহে।

কেশরী জিনি, কৃশ মাজা খানি
মুঠি করি ধরা যায় ॥
গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করি-করা পারা।
চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায় ॥

* * *

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা পূর্ব্বরাগের একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহি। পূর্ব্বরাগের দশ অবস্থা।

অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্বে যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ ॥
লালস, উদ্বেগ, জড়, কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র, রোগ, বায়ু, মোহ, নিদানে মরণ ॥

(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগরণ, (৪) কৃশতা, (৫) জড়িমা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি অথবা বধিরতা, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ, (১০) মরণোদ্যম, এই দশ অবস্থা। কামকলুষিত নরনারীর মধ্যে দেহাত্মক স্থূল মিলনের পূর্ব্বে এতগুলি অবস্থার সমাবেশ দেখা যায় না। শ্রীমতী রাধার মধ্যেই এই দশ অবস্থার বিকাশ দেখা গিয়াছিল। আর দেখা গিয়াছিল প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধ্যে; কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই এই বিচিত্র ভাবপুঞ্জের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তবে কোন কোন ভগবদ্ভক্তের মধ্যেও এক বা ততোধিক ভাবের স্ফুরণ হইতে দেখা যায়।

একদিন কিশোরী সখিগণের সহিত যমুনা হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিলেন, অদূরে যমুনা-পুলিনে নীপবৃক্ষমূল আলো করিয়া নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সখাগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতেছিলেন। সখিগণের অলক্ষ্যে শ্রীমতীর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল।

"নাহি উঠল তীরে, রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বরকান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি অধোমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সবজন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আর বদন তঁহি ফেরি ॥
তঁহি পুন মতি হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল ॥
নয়ন চকোর কানুমুখ শশিবর
করল অমিয় রসপান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে, রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল—জান ॥

শ্রীকৃষ্ণের মোহনরূপ চকিতের মত শ্রীরাধার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মরি, মরি, একি মাধুরী! কিন্তু ক্ষণিক দর্শনে তো কেবল কুতূহলই বাড়িল, দেখার সাধ তো মিটিল না! আর শ্যামের পানে চাহেনই বা কি করিয়া! সঙ্গে যে গুরুজন রহিয়াছেন। ছলনাময়ী রাই, তাড়াতাড়ি সখিগণকে ছাড়িয়া আগু হইয়া চলিয়া গেলেন; তারপর সখিগণকে ডাকিবার ছলে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।—মরি, মরি, কি ভুবন আলো করা রূপরে!—কিন্তু এ সুযোগও তো নিমেষে ফুরাইয়া গেল! আর কোনও ছলে কি

আর একটী বারের জন্ত তাঁহাকে দেখা যায় না। রাই এবার বুকের মতিহার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সমস্ত মুক্তাগুলি মাটীতে ছড়াইয়া পড়িল। সখিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া সেগুলি কুড়াইতে লাগিল। ক্ষণিকের জন্ত রাই আবার কানুকে দেখিয়া লইলেন। কিন্তু হায়, মুক্তা কুড়ানও তো হইয়া গেল। এখন যে ঘরে ফিরিতে হইবে!

এই প্রথম দর্শন। কিন্তু ইহাতেই বীজ উপ্ত হইল। ইহার পর

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা-সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে।
এবে দিন দুই তিন দেখিয়া আন ছান্দে।
ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে।
সই বড়ি পরমাদ হৈ'ল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥
ক্ষণে ধনি চমকে ক্ষণে উঠে কাঁপ।
করে পরশিল নহে এত অন্তাপ॥
মনের যুকতি কেহ লিখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন-কলেবরে॥
সবে এক দেখিয়ে করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থগিত হয় চিত॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুর ভাব আছে॥

সেই প্রথম দর্শন অবধি রাই যেন কেমন হইয়া গেলেন। একা একা নির্জ্জনে বসিয়া কি জানি কি চিন্তা করেন; সখিরা ডাকিয়াও উত্তর পান না। সময় সময় চমকিয়া উঠেন; কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে সহসা আন্‌মনা হইয়া যান। দেখিয়া সখিরা চিন্তিত হইলেন।

এমন সময় একদিন শ্রীমতী ভাটের মুখে "শ্যামের" নাম শুনিতে পাইলেন। "শ্যাম"! শুনিয়া রাধার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল—প্রাণ আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল। সখীর গলা ধরিয়া রাই বলিতে লাগিলেন,

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

সেদিন যমুনাতীরে রাই তড়িতের মত একবার শ্যামকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামের নাম জানিতেন না। আজ সেই সুধামাখা শ্যাম নাম, "তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম" তাহার তৃষিত হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিল। যতই সেই নাম স্মরণ হইতে লাগিল, ততই কি জানি এক আবেশে তাঁহার হৃদয় এলাইয়া পড়িল—নামের মাধুর্য্যে তাঁহার মন প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। তাই আবার বলিতে লাগিলেন—

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

এতদিন শ্রীমতী কোন অবলম্বন পান নাই। আজ শ্যাম নাম, তাঁহার অবলম্বন হইল। নাম জপ করিতে করিতে প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল; এখন আর তাঁহার হৃদয় শুধু স্মৃতিতে তৃপ্ত নহে—শ্যামের "দরশ" বিনা আর যে তাঁহার সোয়াস্তি নাই।

সখিদিগের মধ্যে বিশাখা চিত্রবিদ্যায় নিপুণা, রাধার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া

বিশাখা শ্যামের এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনিলেন। চিত্রপট দেখিয়া শ্রীরাধা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন:—

এমন রূপ কেমন করিয়া।
লিখিলে বিশাখা ধৈরয ধরিয়া?
দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন পুরুষ কি জগতে আছে?
(মোহন)

চিত্রে শ্যামের রূপ দেখিয়া বৃষভানুসুতা একেবারে মুগ্ধা হইয়া পড়িলেন। চিত্রপট দেখিতে দেখিতে রাই আত্মহারা—তাঁহার আঁখিতে পলক পড়িতেছে না! একদৃষ্টে সে চিত্র দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "মরি! মরি! কি করিয়া বিশাখা চিত্রপটে এ ভুবন-মোহন রূপ ফুটাইয়া তুলিল? এ যে সকল সৌন্দর্য্যের সার—এ রূপের যে জগতে আর তুলনা নাই! হায়, এই রূপের সায়র,—কি করিয়া বিশাখা সামান্য চিত্রপটে ইহার প্রতিরূপ তুলিল? যে সায়রের তরঙ্গে তরঙ্গে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে—সেই অতল অপার রূপের সায়র, কোন যাদুবলে বিশাখার ক্ষুদ্র তুলির কাছে ধরা দিল? আঁকিতে আঁকিতে কি বারেকের তরেও তাহার ধৈর্য্যের বাঁধন টুটিয়া গেল না? এক এক অঙ্গের রূপ লিখিতে গিয়া তাহার পরাণ বিভোর হইয়া গেল না? হাত হইতে তুলি খসিয়া পড়িল না? এক অঙ্গের মাধুরী ধরিতে গিয়া কেমন করিয়া সে অপর অঙ্গে চিত্ত সমর্পণ করিল? এ রূপ যে দেহের নয়,—এ রূপ যে দেহের অন্তরালে, মনের অগোচরে, কল্পনার বাহিরে—ধ্যানের মাঝে লুকান'। এ রূপ কি চিত্রে বাঁধিয়া রাখা যায়?

"কিরূপ দেখিনু মধুর মূরতি পীরিতি রসেরি সার।
হেন লয় মনে এতিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক আর।"

রূপ দেখিয়া কিশোরীর পূরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; এ রূপ যে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। ত্রিভুবন-সুন্দর শ্যাম-সুন্দরের রূপের সহিত জগতে কাহার তুলনা হইতে পারে? যে রূপের এক কণা পাইয়া কুসুমনিচয় রূপের মাধুরী ছড়াইয়া জগৎকে মাতাইয়া তুলিতেছে, যে রূপের কোটী অংশের এক অংশ পাইয়া নীলাকাশে চাঁদের বিমলহাসি ফুটিয়া উঠিতেছে,—যে রূপসিন্ধুর এক বিন্দু পাইয়া প্রকৃতিদেবী তাঁহার বৈচিত্র্যময় বিশ্বরাজ্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন,—সেই অতুল রূপের তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে?

চিত্রপটে শ্যামের রূপ দেখিয়া শ্রীরাধার হৃদয়ের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল; এখন কেবলই তাঁহার সেই রূপ, সেই আঁখি, সেই মুখ মনে পড়িতে লাগিল। তুষানলের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিতে হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কই, তাঁহাকে তো কাছে পাওয়া যাইতেছে না! সে অরুন্তুদ যন্ত্রনা সহিতে না পারিয়া আকুল-স্বরে শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন:—

'হামসে অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি, হরি, এমন কেন বা হ'ল
বিষম বাড়বা—অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া দিল॥

বয়সে কিশোর রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে না পানে, পশিল পরাণে
বুক বিদারিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নাহি চিতে
এখন করিব কি?"

কিশোরী বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। শ্যাম পরপুরুষ,—আর তিনি পরের স্ত্রী, তবু তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ তাঁহার মনে পড়ে কেন? শ্যামের কথা ভাবিতে তাঁহার পরাণ শিহরিয়া উঠে কেন? হায়, একি হইল? তিনি যে ইচ্ছা করিয়াও শ্যামকে ছাড়িতে পারিতেছেন না! যতই শ্যামের রূপ হৃদয় হইতে সরাইয়া দিতে চাহেন, সে যে ততই জোর করিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসে। যতই ভাবেন, শ্যামের নাম আর উচ্চারণ করিবেন না, ততই যে রসনা তাঁহার অজ্ঞাতসারে সে নাম জপ করিতে থাকে!

যাঁহাকে একবার প্রীতির নয়নে নিরীক্ষণ করা যায়,—যাহার অমিয়মাখা কমল-বয়ান একবার মানস-সরোবরে প্রেমের কিরণে ফুটিয়া উঠে; যাহার শ্রীমুখের সুধাময় বাণী প্রাণের অন্তস্তল একবার স্পর্শ করে, তাঁহাকে কি আর কখনও ভুলা যায়? তাঁহার স্মৃতি কি মুছিয়া ফেলা যায়? মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও যে তাঁহাকে ভুলিতে পারে না। বরং যতই হৃদয় হইতে তাঁহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, আরও ততই তাহা উজ্জ্বল হইয়া চিত্তপটে অঙ্কিত হয়। প্রণয়ের রেখা যাহার হৃদয়ে একবার অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার দাগ আর উঠিবার নয়, পাষাণের রেখার মত সে দাগ দৃঢ় হইয়া থাকে।

* * *

একদিন কিশোরী, সখিগণের নিকটে বসিয়া আছেন, এমন সময় যমুনা-পুলিনস্থ কাননাভ্যন্তর হইতে বিশ্ববিমোহন বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

কদম্বের বন হইতে
কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে,
হাহা কুলাঙ্গনাগণ,
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হইল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এই।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হইলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃত একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥

অস্ত্র নহে যেন ফোটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর ॥

বংশীর স্বর-লহরী রাধার কর্ণে প্রবেশ করিল, শরাহতা কুরঙ্গিনীর স্থায় বৃষভানুসুতা সে স্বরে বিদ্ধা হইলেন। স্বরমুগ্ধা রাধার প্রতি লোমকূপে সে ধ্বনি সঞ্চরণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কণ্টকিত করিয়া তুলিল। তাঁহার মন প্রাণ, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়আর্কষণ করিতে লাগিল। সে বিশ্ববিমুগ্ধকারী তানে কে না মুগ্ধ হয়? জগৎ-যন্ত্রের-যন্ত্রী, সংসার প্রপীড়িত বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত, জলিতকণ্ঠ জীবের প্রাণে রস ও প্রেমামৃত ঢালিয়া দিবার জন্ত বংশী-ধ্বনিতে নিয়তই সঙ্কেত করিতেছেন। কিন্তু হায়, হতভাগ্য মায়ামুগ্ধ জীব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সে মোহন বাঁশীর মোহন তান না শুনিয়া কুরঙ্গের মত বিষয়-ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া প্রতারিত হইতেছে!

যাঁহার চিত্র প্রাণমন পাগল করিয়া তুলিয়াছে, যাহার নাম প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে,—যাঁহার বংশীতান চিত্ত উদাস করিয়াছে, তাঁহাকে কি না দেখিয়া আর থাকা যায়? কিশোরী আর থাকিতে পারিলেন না, জল আনিবার ছল করিয়া সখিগণের সহিত যমুনার ঘাটে ছুটিয়া গেলেন।

যমুনার তীরে আবার শ্যামকে দেখিয়া রাই ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই আসা অবধি, রাইয়ের জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, সেই হইতে কিশোরী সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝোরেন, কাহারও সহিত কথা বলেন না, কেহ ডাকিলে উত্তর দেন না,—কেবল স্তব্ধের মত বসিয়া থাকেন।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া,
ঘরে আইলা বিনোদিনী,
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি ॥
নিজ করোপর, রাখিয়া কপাল,
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে, বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘের ধারা ॥
হেনকালে তথা, আইলা ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিতা হইয়া
তুলিয়া লইলা কোরে ॥
নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনি, হয়েছ এমনি
কহ না কি লাগি শুনি ॥
আজনম সখি হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কান্দিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেন হইলে আগেয়ান?

ললিতার এই স্নেহমাখা জিজ্ঞাসায়, শ্রীমতীর প্রাণ উথলিয়া উঠিল। এতদিন অন্তরে যে জ্বালা জলিতেছিল, আর কেহ ত আসিয়া তাহার ভাগ নেয় নাই। আজ সমব্যথী ললিতাকে পাইয়া, তাঁহার সে প্রীতির উৎস উছলিয়া উঠিল। সখিকে জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন;—

"সখি, যেদিন যমুনা পুলিনে, নীপমূলে ত্রিভঙ্গিম-ঠামে দাঁড়ান কালশশীকে দেখিয়া আসিয়াছি, সেইদিন হইতেই আমি মজিয়াছি ; সখি, এখন আমি আর আমাতে নাই । আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল, সবই যে সখি, তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়া আসিয়াছি । এখন সদাই তাঁর সে অপরূপ মূর্ত্তি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ! সেই হাসিমুখ, সেই চূড়া, সেই বাঁশী, সেই বনফুলের মালা, সেই পীতবাস, চঞ্চল নয়নে সেই তেরছ চাহনি—সই, আমি যে কিছুই ভুলিতে পারিতেছি না ! এক একবার তাঁহাকে মনে পড়িতেছে, আর আমার প্রাণে যে মুষলের ঘা পড়িতেছে ! বল সই, এখন আমি কি করি ? একে কুলবধূ, তা'তে লোক গঞ্জনার ভয়— সই, আমি কোন দিক রাখি ? হায়, কি ক্ষণেই সেই কাল রূপ দেখিতে গিয়াছিলাম !

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবনী
অবনী বহিয়া যায় ।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর, কি খনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে ।
নিরবধি মোর, চিত্ত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায় ।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বাঁধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে ।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে ।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
নাহি কহি লোকলাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয় ।"

ক্রমশঃ ।

দীন—প্রেমানন্দ ।

তুমি ও আমি ।

অনাদি অব্যয় তুমি ব্রহ্ম সনাতন ।
ক্ষুদ্র আমি পরমাণু ঘৃণ্য অভাজন ।

(২)

পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি দেব ভাস্কর আলোক
অনন্ত দুষ্কৃত আমি অন্ধকার শোক ।

(৩)

সুগন্ধ সুবাস তুমি কুসুম শিরীষ
বিশ্ব-উপেক্ষিত আমি অস্পৃশ্য পুরীষ ।

(৪)

বিশ্ব-বক্ষে তুমি প্রভো, শ্যাম বট তরু,
ভয়াবহ আমি যেন সাহারার মরু ।

(৫)

শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ তুমি প্রীতি-পারাবার,
রৌদ্রতপ্ত বালি আমি অশান্তি আধার।

(৬)

ব্রহ্মাণ্ড আনন্দ তুমি চিন্ময় সুন্দর,
আমি কিন্তু বীভৎসের অনন্ত নির্ঝর।

(৭)

তোমার বিমল দৃষ্টি স্নিগ্ধ মধুময়,
আমার চাহনে বিশ্ব ভস্মীভূত হয়।

(৮)

কাঙ্গাল-বান্ধব তুমি দর্পচূর্ণকারী,
কাঙ্গাল-পীড়ক আমি "অহং" জ্ঞানে মরি।

(৯)

তোমার স্নেহের বক্ষ মানস-সরসী,
আমার হৃদয় ভরা গরলের রাশি।

(১০)

প্রাণময় তুমি প্রভো, ভোলা মহেশ্বর,
প্রাণহীন আমি যে গো কঠিন ভূধর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

:0:

বাহারের গল্প।

(গুরুনিষ্ঠা)

বাহার ফকির বড় আমোদপ্রিয় লোক। বয়স ৪০ কি ৪৫ বৎসর। সে নানাবিধ বাক্যবিন্যাসে, কথার ছটায়,—রঙ্গ ভঙ্গীতে আমাদিগকে আনন্দিত করিয়া থাকে। তাহার হাস্যোদ্দীপক গল্পে,—তাহার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয়ে,—আমরা মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। বাহার ফকির-বংশ-সম্ভূত। তাহার পিতৃ-পিতামহগণ ফকিরী করিতেন। সে বাল্যকালে কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া আর ফকিরী করিতে যায় নাই। সরকারী আফিসে দপ্তরীর কাজ করে। সে ভিন্ন তা'র বংশে আর কেহ কখনও চাকরী করে নাই। বাহারের মুসলমান-ধর্ম্মে বিশ্বাস অগাধ; কিন্তু সেই বিশ্বাস তাহাকে একদেশদর্শী গোড়া মুসলমান রূপে গঠিত করিতে পারে নাই। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও যে উদ্ধার হইবে, তাহাদের ধর্ম্মেও যে সত্য আছে, ইহা সে খুব বিশ্বাস করে। যেখানে যেভাবে যে কোন মুসলমান-প্রচারকের নিকট সে ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করে, তাহার সার সার অংশগুলি আমাদের নিকট বর্ণনা করে এবং কোন কোন বিষয় ও ভাব যদি হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত মিল হয় বলিয়া আমরা বলি, তবে আর বাহারের আনন্দের সীমা থাকে না। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসিগণের প্রতিও বাহারের ভক্তিশ্রদ্ধা যথেষ্ট দেখা যায়। এজন্য সে তাহার মুসলমান ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃক কখন নিন্দিতও হইয়া থাকে।

মুসলমান-ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাহার যথেষ্ট পাঠ করিয়াছে, অনেক সময় আরবী বা পারসী শ্লোক সুস্বরে পাঠ করিয়া আমাদিগকে শুনায়।

কখনও বা দু'একটী গল্প আমাদিগের নিকট বলিয়া থাকে। আজ সেইসকল গল্পের একটী গল্প ভক্তিমান পাঠকগণকে উপহার-প্রদান জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

একদিন অবসর সময়ে বাহার বলিল, "বাবু! আপনার মুরসিদ (গুরু) আসিয়াছিলেন, আপনাকে কি উপদেশ দিলেন? তাঁর শিষ্যাদির সংখ্যা কত হইবে? সকলেই খুব উন্নত না কি?

উঃ—,আমার গুরুর নিকট হইতে মৌখিক উপদেশ তেমন বিশেষ কিছু লইতে হয় না। তাঁর নিকট বসিয়া থাকিলেই অনেক তত্ত্বকথার মিমাংসা, অনেক জটিল রহস্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মোটামুটী সার এই যে "জগৎজীবের সেবাই একমাত্র সার ধর্ম্ম। জীবসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। জগতভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সেবাকার্য্যে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিলেই মানবদেহ ধারণ সার্থক হইবে।" তাঁর শিষ্য বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই আছে। সকলেই তাঁর খুব অনুরক্ত ভক্ত বলিয়াই আমরা জানি।

বাহার—দাখেন বাবু, যখন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন কেহ বা প্রাণের টানে, আবার কেহ বা হুজুগে পড়িয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। খুঁজিয়া দেখিবেন, হুজুগপ্রিয় লোকের সংখ্যাই বেশী। তবে জগতের প্রকৃত উপকার যাহা মহাপুরুষগণ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহার ঐ খাঁটী ভক্ত বা শিষ্যগণ সংখ্যায় খুব কম, ২।৪ জন হইলেও তাহাদের দ্বারাই সাধিত হয়। হুজুগের দল একটু গোল দেখিলেই কে কোথায় পলায়ন করে তা'র ঠিক নাই, এ সম্বন্ধে আমাদের হাদিসে (ধর্ম্মগ্রন্থে) বেশ একটী গল্প আছে; যদি অনুগ্রহ করে শোনেন, তবে বলিতে পারি।

আমি,—তা, বেশ ত বল না? শোনা যা'ক। তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের গল্পগুলি আমার নিকট শুনিতে বেশ ভাল বোধ হয়।

তখন বাহার সানন্দে বক্তৃতার ভাবে বলিতে লাগিল,—আরব দেশে কোন এক বাদসাহের রাজধানীতে হঠাৎ একটী দরবেশের আবির্ভাব হইল! তিনি কে এবং কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে তদ্দেশে আগমন করিলেন, তাহা পূর্ব্বে কেহই জানিত না। তাঁহার আনাভি-লম্বিত সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু-রাজি, স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নত বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিলে স্বভাবতঃই লোকের প্রাণে প্রশ্ন উঠে,—ইনি কে? আর স্বতঃই যেন প্রাণ তাহার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইতে থাকে। রাজধানীর বহির্ভাগে একটী আম্রকাননে তিনি তাঁহার আসন স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে কেহ কখনও কিছু খাইতে দেখিত না। তিনি সদা ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে চতুর্দ্দিক হইতে জনসাধারণ ছুটিয়া তাহার নিকট আসিতে লাগিল। দরবেশসাহেব যেখানে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার উপরিভাগে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণ জন্য ৩।৪ হাত পরিসর একটী শ্বেত চাঁদোয়া খাটান ছিল। তিনি তাহার নীচে বসিয়া নিবিষ্ট মনে জপাদি করিতেন।

দলে দলে লোক দরবেশ দেখিতে আসিতে লাগিল। কেহ অন্ধ, চক্ষুপ্রার্থী; কেহ খঞ্জ, চলচ্ছক্তিপ্রার্থী; কেহ বা রোগী, রোগ-মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে। এইরূপ লোকে সেস্থান ভরিয়া যাইতে লাগিল। ফকির সাহেবের সেবার জন্য কেহ অর্থ, কেহ কাপড়, কেহ চাউল, কেহ দাইল, কেহ লবণ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী উপহার প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোন জিনিষ অঙ্গুলী দ্বারাও স্পর্শ করিলেন না। ক্রমে দ্রব্যসম্ভার স্তূপাকারে পরিণত হইল; প্রচুর দ্রব্যাদি দেখিয়া এই জনতার মধ্যে হইতে ১০।১২ জন উদ্‌যোগী যুবক মিলিত হইল; এবং ফকির সাহেবের অনুমতি লইয়া পাককার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। শত শত দীন দুঃখী উদর পূরণ করিয়া ভোজন করতঃ তৃপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ফকিরসাহেবের আসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। রোগী কেহ বা আরোগ্য হইল কেহ বা হইল না; ইহার অনুসন্ধান করিবার কেহই রহিল না—হুজুগে লোক সব উন্মাদবৎ হইয়া গেল। সকলের মুখেই কেবল ফকিরসাহেবের গুণকীর্ত্তন শুনা যাইতে লাগিল। তত্ত্ব-পিপাসু দুই একজন ফকিরসাহেবের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। ইহা দেখিয়া দেশসুদ্ধ লোকের তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়ার ঝোঁক পড়িয়া গেল। তখন সকলেই বলিতে লাগিল, ফকিরসাহেবের মত শক্তিশালী লোক আর দুনিয়ায় নাই, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লইলেই বেহেস্তের দুয়ার খোলা পাওয়া যাইবে।" এইরূপ আশার মোহে সকলেই মন্ত্র লইতে লাগিল। দয়াল ফকির কাহাকেও বিমুখ করিলেন না। ক্রমে বাদসাহের কর্ম্মচারিগণও একে একে সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কোতোয়াল, বরকন্দাজ হইতে আরম্ভ করিয়া উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র সভাসদ পর্য্যন্ত কেহই আর বাদ রহিল না। দেশ সমেত একণে ফকিরের শিষ্য। দুই তিন মাসের মধ্যে এইরূপে ফকিরসাহেব মুক্তি-দাতা, ভবত্রাতারূপে প্রকাশ পাইলেন। বাদসাহ স্বয়ং এখনও মন্ত্র গ্রহণ করেণ নাই। সহরে সকলেই সর্ব্বদা ফকিরসাহেবের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার পারিষদ-বর্গ সকলেই ফকির সাহেবের শক্তিমত্তার প্রশংসা করিতেছে। বাদসাহও ফকির সাহেবের প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; এবং একদিন তিনিও মন্ত্রগ্রহণ করিবেন, এরূপ মত প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইল। একদিন তিনি অমাত্য-গণ সমভিব্যাহারে ফকিরসাহেবের নিকট রওনা হইলেন। দূর হইতে ফকিরসাহেবকে একটী ক্ষুদ্র চাঁদোয়ার নিম্নে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বাদসাহ মনে মনে ভাবিলেন"—হায়, হায়, ফকির সাহেবের এত শিষ্য! বিচারের দিন এই ক্ষুদ্র চাঁদোয়ার নীচে ধরিবে কি প্রকারে?" বাদসাহ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ফকিরসাহেবের নিকট-বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে যথাবিহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলেন। অন্তর্য্যামী ফকির বাদ-সাহের সন্দেহের বিষয় বুঝিতে পারিয়া

বলিলেন, হুজুর ! আগামীকল্য মধ্যাহ্নকালে আপনাকে দীক্ষিত করিব। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অদ্যকার দিবস আমি পারিব না। ইহা শুনিয়া বাদসাহ সেদিনকার মত ফিরিয়া গেলেন।

আমি বলিলাম, বাহার ক্ষুদ্র চাঁদোয়ার নিম্নে স্থান হইবে না, বাদসাহ ভাবিলেন; ইহার অর্থ কি ?

বাহার —"আমাদের হাদিসমতে মৃত্যুর পর সকল জীবের এক সঙ্গে খোদাতাআলার নিকট বিচার হইবে। সেদিন সূর্য্যের তেজ প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে থাকিবে। সেই সূর্য্যের তেজ হইতে রক্ষাকর্ত্তা তখন মুরসিদ ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না। শিষ্যগণ তখন নিজ নিজ মুরশিদের চাঁদোয়ার নিম্নে আশ্রয় লইয়া ঐ সূর্য্যের বিশ্বদাহী কিরণজাল হইতে আত্মরক্ষা করিবে। বাদসাহ ভাবিলেন, অত ছোট চাঁদোয়া যাঁহার, তাঁহার এত শিষ্য সেই বিচারের দিন কোথায় ধরিবে ? বাদসাহের এই সন্দেহ-ভঞ্জন মানসে ফকিরসাহেব তাঁহাকে পরদিন আসিতে বলিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে ফকিরসাহেব নগর মধ্যে তাঁহার কোন এক শিষ্যের বাড়ীতে চোরের ন্যায় এক খানি ঘরে প্রবেশ করতঃ আসবাব আদি ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। গৃহাভ্যন্তরে শব্দ শুনিয়া গৃহস্বামী জাগরিত হইল এবং বুঝিল চোর প্রবেশ করিয়াছে। তখন সে অতি দ্রুত বহির্দ্দেশ হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং ঘরে চোর ঢুকিয়াছে বলিয়া খুব চীৎকার করিতে লাগিল। ২।৪ জন প্রতিবেশী আসিলে গৃহস্বামী দরজা খুলিয়া দেখিল, তাহারি মুরশিদ গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, চুরি করিতে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে ধরা পড়ায় ফকিরসাহেব নিঃসন্দেহে চোর বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে এই সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সহর কোতোয়ালের নিকট সংবাদ পাঠান হইল। কোতোয়ালও ফকিরসাহেবের শিষ্য। মুরসিদের এহেন ব্যবহার দেখিয়া সে ক্রোধে জ্বলিয়া গেল, এবং এতদিন ভণ্ডামী করিয়া ফাকি দিয়া লোকের মন ভুলাইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে যথেচ্ছা তিরস্কার, গালাগালি করিতে লাগিল; ও পীঠমোড়া করিয়া চোরের ন্যায় বাঁধিয়া দু এক ঘা মারিতেও ক্রটী করিল না। ফকিরসাহেবের প্রতি লোকের এত অনুরাগ, তাঁহার প্রতি লোকের এত বিশ্বাস-ভক্তি সবই যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। সকলেই তাঁহাকে চোর মনে করিয়া ক্রোধে অধীর হইতে লাগিল এবং নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখিত হইল। ফকির-সাহেব সর্ব্বদা তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রহিলেন এবং নীরবে সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। তখন চোরকে বিচারালয়ে বাদসাহের নিকট পাঠানই স্থির হইল। এই সংবাদ সহরময় প্রচারিত হওয়ায় সহরস্থ বহুলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। যখন কোতোয়াল চোরকে ধরিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন একটী বৃদ্ধ

ও একটী বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে চোরের পায় পড়িল এবং পরে কোতোয়ালের পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, যে তাহাদের মুরসিদ চোর নন। প্রকৃত সাধু। তাঁহাকে কেন মিছামিছি চোর বলিয়া ধরা হইয়াছে, এখনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। কিন্তু তাহাদের কাতর ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করিল না। অতঃপর চোরকে লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইল। বাদসাহ এবম্বিধ ব্যাপারে একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। কোতোয়ালকে ফকিরসাহেবের বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাকে এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঐ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল দোহাই বাদসাহের; আমাদের মুরসিদ, এই ফকিরসাহেব কখনই চোর নহেন এবং হইতেও পারেন না।

প্রত্যেকদিন যাঁহার আসন পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক আহার্য্যসামগ্রী ও অর্থাদি প্রদান করিতেছে এবং যিনি তাহার কপর্দকও গ্রহণ না করিয়া দীনদুঃখিগণকে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ ভাবে চুরি করার চেষ্টা কখনই সম্ভবে না। হুজুর মালিক, ইহাই বিবেচনা করিয়া যাহা হয় ব্যবস্থা করিয়া আমাদের মুরসিদকে খালাস (মুক্ত) করিয়া দিতে আজ্ঞা করুন। ফকির তখন জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—জাহাপনা! আমার ক্ষুদ্র চাঁদোয়ার অন্তরালে আমাদের এই তিন জনকে,—আমি ও এই দুই জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে শেষ বিচারের দিনে ধরিবে না কি? গতকল্য তুমি যখন দীক্ষিত হইবার অভিলাষী হইয়া আমার নিকট যাইতেছিলে, তখন তোমার এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাই দূর করিবার জন্য আমি এই খেলা পাতিয়াছিলাম। যদি তোমার এখনও আমার সাধুতায় বিশ্বাস থাকে, তবে আমি তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। বাদসাহ তখন ফকিরকে অন্তর্য্যামী জানিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং সিংহাসন হইতে উঠিয়া ফকিরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ফকিরসাহেব বাদসাহের দেহে তাহার পদ্মহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "বৎস, কেবল শিষ্য হইলেই মুক্তি লাভ হয় না। কায়মনোবাক্যে মুরসিদের প্রতি বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হওয়া চাই, দেহমন প্রাণ তাহার চরণে সমর্পণ করা চাই—তবেই দীনদয়াল খোদাতাআলার দয়া হইবে। নতুবা দেখলে ত, এই তোমার কোতোয়াল আমার শিষ্য, আমাকে পিঠমোড়া করিয়া বাধিতেও দ্বিধা বোধ করিল না। যাহারা হুজুগে মাতিয়া কিংবা নাম-যশের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস এই কোতোয়ালের তুল্যই হয়। শত শত লোক উপস্থিত ছিল কিন্তু এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যতীত কেহই আমার পক্ষ সমর্থন করে নাই। গুরুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই মুক্তির কারণ, নাম মাত্র শিষ্যত্ব নহে। বাহার বলিতে লাগিল, বাবু এইরূপ হুজুগে-শিষ্যের অভাব এদেশে নাই। সকলের মুখেই লম্বা লম্বা কথা, সকলেই একটা কিছু বিশেষত্ব দেখিলেই আসিয়া সোরগোল করিতে থাকে, কিন্তু একটু মুস্কিল উপস্থিত হইলেই সব সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রের ন্যায় মিলাইয়া যায়।

বাহারের গল্প শুনিয়া আমরা খুব আনন্দিত হইলাম। এরূপ গল্প সে মাঝে মাঝে করিয়া থাকে। অন্য কাজের জন্য বাহার চলিয়া গেল, আমরাও নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেলাম।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

:0:

পরমা-প্রকৃতি।

[“সকাম মায়িক জগতে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে না।” পাগল মানুষের এই কথা অবলম্বনে লিখিত]

(গীতিকা)

পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী শকতি, বাহিরে প্রকাশ
হবে না, হবে না।
ব্যর্থ প্রয়াস, মিছে অভিলাষ, হৃদয়-নিকুঞ্জে
হের না, হের না॥

এ যে লীলা শুধু ভাবের গোচর;
ভাব-জগতের মহাতত্ত্ব সার;
বাক্য যাহারে, বর্ণিতে না পারে,—
চিত্রেতে ফুটাতে পারে না, পারে না।

হেন কারিকর নাহি এ জগতে,
গঠন করিতে পারে কোনমতে,
এ বাহ্য ধরায়, উপাদান নাই,—
যারে গড়িতে না পারে কল্পনা।

যার যত টুকু আছে ভাবসাধা,
তার তত টুকু হৃদয়ে আরাধ্য।
সিদ্ধপুরুষের বিশুদ্ধ হৃদয়—
বিনা পূর্ণ রস খেলে না খেলে না।

মাটীর জগতে কোথা পাবে বল ?
ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠান স্থল।
কনকের কান্তি করে ঝলমল,
পাগলের ভাবে কর না ভাবনা।

বেদগুহ্য ছবি হেরেছে যে জন,
সে রাখে অন্তরে, অন্তরের ধন;
কাহারো বা জাগে ক্ষীণ স্মৃতি টুকু,—
সে যে, সুদূর অতীতের ঘটনা।

আত্মসুখত্যাগে, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে;
রসিকের কথা রসিকেই জানে,
অপ্রাকৃত রস, যাহে কৃষ্ণ বশ,—
প্রাকৃত ধরায় মিলে না মিলে না।

রসতত্ত্ব-কথা পাগলের মুখে,
কানে শুনে, যেন অন্তরেতে থাকে,
অপরাধশূন্য নাম সংকীর্ত্তন,—
ইহাই প্রকাশ কর না, কর না।

অধিকার ভেদে না হ'লে প্রচার,
উপধর্ম্ম সৃষ্টি হয় অনিবার,
অপরাধ আসে বিবিধ প্রকার,
সে পথ কখনো ধ'র না, ধ'র না।

হ্লাদিনীর সেবা-পূজা চাও যদি,
ঢাক ঢোল তার কভু নহে বিধি,
আত্ম-নিবেদন নৈবেদ্যের নিধি,—
দিয়ে, সেবা ব্রতী হও না, হও না॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে,
সোণামুখী—গরীবভাণ্ডার।

:0:

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ
ও
সাধু মহাসম্মিলনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জমায়েত।

হরিদ্বারে কুম্ভের চিরন্তন প্রথানুসারে শিব-চতুর্দ্দশী-যোগে স্নানের পর হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসিগণ ক্রমে ক্রমে হরিদ্বারে আসিয়া মিলিত হইতে থাকেন। এ বৎসরেও এই নিয়মের অন্যথা হয় নাই; বরং অন্যান্য কুম্ভ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সাধুর জমায়েত হইতেছিল। এবৎসর কুম্ভ যোগের প্রথম স্নানের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ১লা চৈত্র সোমবার; আর শেষ স্নানের দিন ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার। প্রথম স্নানের শোভা যাত্রার বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে,—মেলা স্থানের পরিচয়, প্রধান প্রধান সাধু-মণ্ডলিদের আসন স্থান, এবং শোভাযাত্রার গতিপথ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া এস্থলে আবশ্যক মনে করি।

মেলা স্থানের পরিচয়।

হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, জ্বালাপুর ভীমগড়া বা ভীমগোদা (ভীমকুণ্ড) এবং ভীমগড়ার উত্তরে প্রায় দেড়মাইল স্থান ব্যপিয়া সাধু সন্ন্যাসী ও মোহান্তদের আসন হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই মেলা স্থানটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ মাইল হইবে * এবং প্রস্থে কোথাও অর্দ্ধ মাইল, কোথাও সিকি মাইল এবং কোথাও কম বেশীও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গঙ্গার অপর পারে ও চেলওয়ালা দ্বীপে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত স্থানে মেলা বসিয়াছিল। সুদীর্ঘ মেলাস্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষাধিক অস্থায়ী খড়ের কুটিয়া (কুঁড়ে ঘর) বসিয়াছিল। সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, দোকানী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই সমস্ত কুটিয়াতে আশ্রয় লইয়াছিল। দূর হইতে সারি সারি কুটিয়াগুলি সুদৃশ্য বন্দরের মত দেখাইত। মেলা উপলক্ষে স্থায়ী

---

*হরিদ্বার সহরটী প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ; কনখল সহর প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ এবং হরিদ্বার সহর হইতে উত্তরাভিমুখে ভীমগড়া হইয়া প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছিল; সুতরাং মোটামোটী ৭ মাইল ব্যাপিয়া মেলাস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত— মেলা উপলক্ষে হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত ঋষিকেশেও অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছিল; কারণ মেলাতে আগত যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই সুপ্রসিদ্ধ তপোভূমি—ঋষিকেশ ও লছমনঝোলা দর্শন প্রয়াসী ছিলেন; সুতরাং ধরিতে গেলে মেলাস্থান ঋষিকেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

এবং অস্থায়ীভাবে অসংখ্য রুটী, মিঠাই এবং অন্যান্য খাবারের দোকান বসিয়াছিল। কনখলের সংলগ্ন গঙ্গাধারার অপর তীরে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত বালুর চরে, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের শত শত তাঁবু ও অসংখ্য বৃহৎ ছাতা বসাইয়া আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এপারে ওপারে যাতায়াতের জন্য ১৪ টী অস্থায়ী বড় পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভীমগড়ার উত্তরে ২ টী, কাশ্মীর জম্মু ঘাটে ১টী, কুশাবর্ত্ত ঘাটে ২টী, ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের নিকট ২টী, এবং কনখলের নিকটে ১টী, এই ৮টী পুল গঙ্গার মূল ধারার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গার প্রবল স্রোতের উপর এতগুলি অস্থায়ী পুল কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পাঠকের কৌতুহল জন্মিতে পারে; এজন্য এবিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। একটী প্রকাণ্ড মোটা দড়ি এ পারে ওপারে বৃক্ষ কিম্বা লৌহস্তম্ভে বাঁধা হইয়াছে, তৎপরে এই দড়ির সহিত বড় বড় নৌকা পর পর এ পার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়াছে। তৎপর এক নৌকা হইতে অপর নৌকা পর্য্যন্ত কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি পাতিয়া ক্রমশঃ তাহার উপর খড় এবং মাটী দিয়া প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই পুলগুলি মজবুতও কম ছিল না, মাঝে মাঝে উপর দিয়া বোঝাই গরুরগাড়ীও চলিয়া যাইত। উপরোক্ত ৮টী পুল ব্যতীত নীলধারা এবং অন্যান্য ধারার উপর আরও ৬টী অস্থায়ী পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুলগুলি অনেক স্থলেই জোড়া জোড়া করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল অর্থাৎ একটী দিয়া এপার হইতে ওপারে শুধু যাইবার জন্য, এবং অপরটী দিয়া ওপার হইতে এপারে আসিবার জন্য; কাজেই ভিড়ের সময়েও যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় নাই। যাহাতে উপরোক্ত নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয় তজ্জন্য উভয় পারেই কড়া পাহাড়ার বন্দোবস্ত ছিল।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট।

কি সাধু-সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ, কুম্ভযোগে এই ঘাটে স্নান করাই সকলের উদ্দেশ্য। যুগ যুগান্তর হইতে কুম্ভযোগে এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কত জন যে চাপা পড়িয়া ও পদদলিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহার শেষ নাই। নাগা সন্ন্যাসী, নানকপন্থী, শিখগণ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে কে আগে স্নান করিতে অধিকারী এই লইয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য এখানে যে কি ভীষণ রক্তারক্তি ও পৈশাচিক অভিনয় হইয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গাস্নান করিয়া মোক্ষলাভ করিবার পূর্ব্বেই অনেকেই মল্লযুদ্ধে বা লগুড়াঘাতে মোক্ষলাভ করিত। সরকারী কাগজাদিতে উল্লেখ আছে যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কুম্ভমেলাতে সাধুদের মধ্যে দাঙ্গাদাঙ্গামা হইয়া ১৮০০ লোক নিহত হয় এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কুম্ভে নানকপন্থী শিখগণ ৫০০ শত গোস্বামীকে হত্যা করে। সদাশয় গবর্ণমেন্ট এই পৈশাচিক অভিনয়ের যবনিকা পতন করিয়াছেন। ভারতীয় প্রধান মঠধারিগণ এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন সম্প্রদায় আগে স্নান করিবে তাঁহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

এই নির্দ্ধারণ মতে জগদ্‌গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসিগণই সর্ব্বাগ্রে স্নানের অধিকারী (নাগা সন্ন্যাসিগণও এই দশনামীর অন্তর্ভুক্ত)। এই ঘাটটী পূর্ব্বে খুব অপ্রশস্ত ছিল, তৎপরে অম্বররাজ মানসিংহ ইহা প্রশস্ত করিয়া বান্ধাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু কালক্রমে তাঁহাও অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কুম্ভমেলার সময় স্নান করিতে আসিয়া ৪১৯ জন যাত্রী ভিড়ে চাপা পড়িয়া এবং পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তদবধি সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট তখন এই ঘাটটী আরও প্রশস্ত করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন ; এবং পরে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে এই ঘাট এবং কুণ্ডের নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং ভীমগড়ার নিকট হইতে কৌশলে গঙ্গার ধারা ফিরাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে বসিয়া ধ্যান, পূজা, অর্চ্চনাদি করিবার জন্য এবং গঙ্গাদর্শনের জন্য সুদৃশ্য মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, "হর কি প্যারী"* দ্বীপের সহিত একটী বৃহৎ পাকা পুল দ্বারা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট সংযোজিত হইয়াছে। এই কুণ্ডের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীহরির পদচিহ্ন আছে। হিন্দুস্থানিরা ইহাকে "হরিকী চরণ পৈঠী" বলিয়া থাকে। এই মন্দিরটী কুণ্ডজলে একটী দ্বীপের মত অবস্থিত; চারিদিকে বুক জল হইবে। স্নানের সময় এই মন্দির প্রদক্ষিণ করাও যাত্রিগণের অন্যতম কাজ। এই ঘাটে মোট ৩৯ টী প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি আছে। উপরের সিঁড়িগুলি প্রায় ৪০ হাত লম্বা হইবে। ঘাটের উপরিভাগ প্রায় ২৫।৩০ হাত প্রশস্ত; এবং কুণ্ডটীর ব্যাস ৬০।৭০ হাত হইবে। এই কুণ্ডের নিম্নদেশ পাথরে বাঁধান ; কোন স্থানেই বুক জলের অধিকজল হইবে না। পতিতপাবনী গঙ্গা সকলের পাপতাপ ধৌত করতঃ কুণ্ডের মধ্য দিয়া সবেগে ছুটিয়াছেন।

হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখানে সর্ব্বদাই লোকে লোকারণ্য—দিবারাত্রি স্নান দান পূজার্চ্চনাদি চলিতেছে। কি মনোহর দৃশ্য !—যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে ! কি অপূর্ব্ব সম্মিলন !—এখানে জাতিভেদ নাই, স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই—সমস্ত ভেদাভেদ একত্রে বিলীন হইয়াছে ! সকলের মুখেই যেন আনন্দের ভাব খেলিতেছে, ভক্তিবিহ্বল অসংখ্য নরনারী গায়ে গায়ে ঠেকিয়া উল্লাসে স্নান করিতেছে ; কিন্তু কাহারও মুখে কুভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোকগণ এখানে একত্র হইয়া একই উদ্দেশ্যে "গঙ্গামায়ীকি জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি তুলিতেছে। সানন্দে চরণ-পদ্ম মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে। কোথাও বা যুবকগণ জল-ক্রীড়াতে মগ্ন, কেহ বা গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতেছেন;

---

*হর কি প্যারী অর্থাৎ হরের প্রিয়—ইহা ব্রহ্মকুণ্ডের সংলগ্ন পাকা বাঁধান একটী দ্বীপ বিশেষ। কথিত আছে, পুরকালে মহাদেব এখানে বসিয়া যোগ করিয়াছিলেন ; তাই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

কোথাও বা সাধুগণ "গঙ্গে হর" বা "হর হর ব্যোম" রবে গঙ্গা জল কাঁপাইয়া সুশীতল জলে অবগাহন করিতেছেন, আবার কেহ বা সংকল্পপাঠ, দান, তর্পণ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত। ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারেই "হরকি প্যারী" বাধান দ্বীপ এবং তাহাতে অনেকগুলি বিস্তৃর্ণ সোপান সংলগ্ন আছে; এই সোপানগুলিও ব্রহ্মকুণ্ডের সংলগ্ন; সুতরাং এই দ্বীপে আসিয়াও অসংখ্য লোক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিত। এখানে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী ধ্যান ধারণায় নিরত থাকিতেন। ব্রহ্মকুণ্ডে মৎস্যের খেলা আর এক নূতন জিনিষ। শত শত প্রকাণ্ড মহাশূল মৎস্ত নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে—যাত্রিগণ রুটী, আটার গুলি, মুড়ি, কিম্বা মিঠাই ছড়াইতেছে আর মৎস্যগুলি—লাফাইয়া কে আগে খাইবে, তাঁহার চেষ্টার ক্রটী করিতেছে না। মৎস্যগুলি এমন নির্ভীক যে, যাত্রিগণের হাত হইতে কখনও খাইতেছে, আবার কেহ বা তাহাদের পৃষ্টদেশেও হাত বুলাইয়া দিতেছে। কি মনোহর দৃশ্য!—ধন্য স্থান মাহাত্ম্য! আজ এখানে অহিংসা স্থাপিত থাকায়—জলচরগণও যেন পোষা হইয়া গিয়াছে। ইহারা ভয় কাহাকে বলে জানে না বরং আহার পাইবে আশায়, মানুষ দেখিলে সেই দিকে ধাবিত হয় এবং জলের উপর ভাসিতে থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের সান্ধ্য-দৃশ্য আরও সুন্দর! সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই যাত্রিগণ দীপাধারে প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহা ঠোঙ্গাতে ফুলের উপর বসাইয়া গঙ্গাজলে ভাসাইতে থাকে। সারি সারি—অসখ্য দীপগুলি তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে—সে অতি মনোহর দৃশ্য!! ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরেই অনেকগুলি সুগঠিত দেবমন্দির উচ্চ উচ্চ চূড়া লইয়া শোভমান রহিয়াছে। সন্ধ্যার সময় "হরকি প্যারী" দ্বীপ হইতে এখানকার অভাবনীয় শোভা দর্শন করা যায়। সে সময় কুণ্ডসংলগ্ন মন্দিরগুলিতে ভৈরব গর্জ্জনে সমস্বরে শঙ্খ, ভেরী, কাঁসর, ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠে। গগনভেদী সেই শব্দে জল স্থল কাঁপিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বলায়াকার কুণ্ডটী অসংখ্য আলো বক্ষে করিয়া যেন নাচিতে থাকে!! কুম্ভের নিম্ন সোপানে দাঁড়াইয়া বৃহৎ আরত্রিক হস্তে লইয়া পুজারীগণ গঙ্গামায়ের সান্ধ্য-আরতি করিতে থাকেন, আর তাঁহাদের পশ্চাতে সোপানাবলীতে দাঁড়াইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত অসংখ্য নরনারিগণ কৃতাঞ্জলী হইয়া ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে উচ্চৈস্বরে সানন্দে জয়ধ্বনি করিতে থাকে! কি সুন্দর দৃশ্য! এদৃশ্য না দেখিলে বুঝান যায় না,—এমন ভাষা নাই, যাহা দ্বারা এই ভাব সম্যকরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

আখরা প্রভৃতির বিবরণ।

জুনা আখরা—হরিদ্বার সহরের ভিতর এই আখরাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আখরাটী প্রায় সিকি মাইল লম্বা এবং চৌড়া হইবে। এখানে দশনামী সন্ন্যাসিগণের পঞ্চায়েৎ আছে। দশনামীভুক্ত বহু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক সন্ন্যাসিগণের আসন এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাগা, আলেখিয়া এবং নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। এতদ্

ব্যতীত আলেখিয়া সম্প্রদায় ভূক্ত ৩।৪ শত ভৈরবীও এই আখরার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাঁহাদের কুটিয়ার সহিত পুরুষদের কুটিয়ার কোন সংশ্রব ছিল না। এখানে আলেখিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত প্রায় সকলেই পঞ্চায়তী সমষ্টিভাণ্ডারের পঙ্ক্তে বসিয়া আহারাদি পাইতেন। আলেখিয়া সম্প্রদায়ের ভৈরব ভৈরবিগণ দুবেলাই সুসজ্জিত বেশে সারি সারি হইয়া ভীক্ষার্থে বহির্গত হইতেন। ইহাঁরা সুদীর্ঘ চিমটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেন এবং মাঝে মাঝে সুমধুরস্বরে "আলেখ", "বোম বোম্ হর" বলিয়া দুলিতে দুলিতে চলিতেন। ইহাঁদের বেশ-ভূষা অদ্ভুত,—সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, মস্তকে দীর্ঘ জটাভার, ললাটে সিন্দুরের দীর্ঘ ফোটা, শরীর ছেড়া রঙ্গিন কাপড়ে ঘেরা, তদুপরি কাল রঙ্গের দড়ি দিয়া বুকে পিঠে জড়ান, দু'হাতে কতকগুলি বিচিত্র রঙ্গের রুমাল বাঁধা, মালার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, হাঁটুর উপর বড় বড় ঘুঙুর ঝুলান, চলিবার সময় ঠং ঠং করিয়া বাজিতে থাকে, হাতে দরিয়া-নারিকেলের খাপড়া (ভিক্ষাপাত্র)। এই অদ্ভুত সাধুগণ কাহারও নিকট কিছু মুখে যাচ্ঞা করেন না, শুধু "বোম্ বোম্" বলিয়া চলিয়া যাইতে থাকেন, যদি কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ খাপড়াতে ফেলিয়া দিতে হয়। ইহাঁরা যখন দলবদ্ধ হইয়া চিমটা বাজাইতে বাজাইতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হয়; আর বহুদূর হইতে চিমটা এবং ঘুঙুরের শব্দ শুনা যায়। এই আখরাতে বহু নাগা সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালাইয়া দিগম্বর হইয়া বসিয়া থাকিতেন, আবার কেহ বা দিগম্বর হইয়া বালকের মত বেড়াইতেন। ইহাঁদের সকলেই সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা জটাজুট সমাযুক্ত; আবার কেহ বা সমস্ত শরীর মুণ্ডন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময়ে এই আখরাতে সাধুগণ ললিত ছন্দে স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন—ইহা শুনিতে বড়ই মধুর হইত।

মহানিরঞ্জনী আখরা —এই আখরাটী জুনা আখরার নিকটেই অবস্থিত। ইহা দশনামী সন্ন্যাসিগণের পঞ্চায়তী আখরা। এই আখরাতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এখানে উপস্থিত সাধুগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত এবং মণ্ডলীর সাধুদের পঙ্ক্তি হইত। এই আখরার মোহান্তগণের নাম গঙ্গাপুরীজী ও মহাদেব গিরিজী।

গোরক্ষনাথী আখরা —এই আখরাটী হরিদ্বার সহরেই প্রকাণ্ড ঘেরা-বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে নাথ-সম্প্রদায়-ভূক্ত প্রায় হাজার সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ-আরতি হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিভূতিমণ্ডিত এবং কৌপিনমাত্র পরিহিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকের দুই কানেই বৃহৎ ছিদ্র করিয়া এক একটী বেলওয়ারী চুরীর মত জিনিষ পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে কানফোড়া সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে। এই আখরাতে এক জন সিদ্ধ-মহাপুরুষ আসিয়া

ছিলেন; তাহার নাম "বাবা গম্ভীরনাথ"। ইহার নামটী যেমন কাজেও তেমন; একটি সাদা ধুতি পরিয়া আসনে গম্ভীরভাবে বিরাজিত থাকিতেন। সৌম্যমূর্ত্তি এই মহাত্মাকে দর্শন করিবার জন্য বহুলোক তথায় আগমন করিত, ইনি বিনয়-নম্রবচনে এবং জলদ-গম্ভীরস্বরে উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন।

ভোলানন্দ গিরির আশ্রম ঃ—এই আশ্রমটী জুনা আখরার নিকটে গঙ্গা-তীরে বিস্তীর্ণ স্থানে অবস্থিত। ভোলানন্দ গিরি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ইনি খুব নামজাদা সাধু। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহুলোক ইঁহার শিষ্য ও ভক্ত। বাংলা-দেশেও ইঁহার রাজা, জমিদার এবং বহু গণ্যমান্য শিষ্য আছেন। এই আশ্রমেও কতক সাধু সন্ন্যাসীর আসন হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বহু শিষ্য ও ভক্ত ইহার আশ্রমে এবং আশ্রমের নিকটেই ইহার দুইটী ধর্ম্মশালাতে স্থান পাইয়াছিলেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে ইনি ১টী "দাতব্য-চিকিৎসালয়", "সেবা বিভাগ," "অনুসন্ধান বিভাগ" প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার অনেক ভক্ত ও শিষ্য উপরোক্ত "ভোলানন্দ রিলিফ মিশনে" সেবকের কাজ করিতেন। আশ্রমের পথের পার্শ্বেই ১টী কাষ্ঠাসনে ইহার আসন হইয়াছিল; ইনি সেখানে বসিয়া উপস্থিত সকলকে উপদেশ প্রদানে সুখী করিতেন। এখানে সন্ধ্যার সময়ে আরতি এবং সুললিত ছন্দে স্তোত্র পাঠ হইতে।

নির্ম্মলা আখরা ঃ—এই আখরাটী ষ্টেশনের রেল লাইনের অপর পারে মায়াপুরের বিস্তীর্ণ ময়দানে বহু তাঁবু খাটাইয়া অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এটী নির্ম্মলা-সম্প্রদায়ভুক্ত। নির্ম্মলা-সাধুগণ নানক-পন্থী—দশম গুরু গোবিন্দসিংজী প্রতিষ্ঠিত-সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সাধুগণ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকিতেন; অনেকের পায়ে নাগরাই জুতা, মস্তকে সুরঞ্জিত পাগড়ী এবং গায়ে আলখেল্লা। ইঁহারা খুব জাকজমকের সহিত চলিতেন। এখানে প্রায়ই দেশীয় বাদ্য এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষিত ব্যাণ্ড বাজিত। ইঁহাদের ৫।৬টা হাতী, বহু উট, মূল্যবান নিশান, গুরু-পাদুকা রাখার স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত দোলা, বহু মূল্যবান হাওদা, আসাসোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য ছিল; এখানে সহস্রাধিক সাধুর আসন হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত বহু গৃহস্থও এখানে স্থান পাইয়াছিলেন। এখানে "গ্রন্থসাহেব" পাঠকৃতা ও উপদেশাদি দেওয়া হইত।

রাধাগোবিন্দজীর মন্দির ঃ—এই মন্দিরটী হরিদ্বার সহরেই ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। হরিদ্বার সহরে ইহাই একমাত্র বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত মন্দির। গৌরবের বিষয় বটে! এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী; ইনি একজন বাঙ্গালী সাধু। ইনিও কতক সাধু-সন্ন্যাসীকে তাঁহার আশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন এবং যথাযোগ্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কেশবানন্দজীর আশ্রম ঃ—এই আশ্রমটী ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের সোজা-

ঝুজি, গঙ্গার অপর পারে উচ্চ ভূমিতে প্রতি-ষ্ঠিত। অনেক ফল ফুলের গাছে আশ্রমটীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী কেশবানন্দজী। ইনিও একজন বাঙ্গালী সাধু। ইনি বৃন্দাবনে খুব সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠাবান। ইনি অধিকাংশ সময়েই বৃন্দাবনে থাকেন। ইনি বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ। পাঞ্জাবে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহার বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন। অনেক রাজা মহারাজাও ইহার ভক্ত হইয়াছেন; ইনি শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা বহু দুরারোগ্য রোগীর রোগ আরাম করতঃ শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সৌম্যদর্শন, পক্কশ্মশ্রু এবং জটা-জুটসমাযুক্ত, ইহাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভক্তির উদ্রেক হয়। ইনি উপস্থিত লোকগণকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে এবং মিষ্টালাপে তুষ্ট করিতেন। ইহার আশ্রমে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এবং সকলেই পরিতোষের সহিত যথাযোগ্য আহারাদি পাইতেন। ক্রমশঃ—

জনৈক দর্শক।

———:0:———

যোগানন্দ-লহরী।

(৮)

দীনজনে দয়া কর হে
ওহে জগজ্জীবন।
তৃষিত পরাণ মম
চাহে তব দরশন॥

তোমায় ভূলে আছি বলে,
আমি ভাসি হে অকুলে,
অকুলকাণ্ডারী কোথা—
দীন পতিতপাবন॥

অজ্ঞান তিমিরে ডুবে
কত দিন আর থাকিব হে,
তোমা হেন পরম ধনে
হয়ে আছি বিস্মরণ;

জ্ঞানালোক পরকাশে,
উর হে হৃদি-আকাশে
তুমি যে জ্যোতির জ্যোতি —
অন্ধতম বিনাশন ॥

তুমি কৃপা কর যারে,
অনায়াসে পায় তোমারে,
কাতরে ডাকে কিঙ্করে,
এস হে হৃদয় ধন ;—

তুমি না চিনালে পরে,
কে তোমারে চিনতে পারে,
চিন্তাতীত চিন্তামনি
তুমি যে অচিন্ত্য ধন ॥

তব প্রেম একবিন্দু,
পাই যদি কৃপাসিন্ধু,
তবে ওহে দীনবন্ধু
সফল হবে জীবন ;—

অনন্ত সমাধি আমি
লভিব হে শ্রীচরণে
রব অনন্ত মিলনে
যোগেনের এই
আকিঞ্চন ॥

—:0:—

ভীষণ-সমস্যা।

রত্নগর্ব্বা স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতের আজ কি ভীষণ অবস্থা! চারিদিকে কেবল হাহাকার রব উঠিয়াছে। যে ভারতবাসী অন্নবস্ত্রের অভাব-জনিত দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না,—অনশন, অর্দ্ধাশন যাহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল,—যাহারা অতিথি-সৎকারে বিমুখ হওয়া

স্বা-প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা মহাপাতক মনে করিতেন,—যে ভারত সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ ছিল যে, বিনা সম্বলে যে কেহ অক্লেশে ভারতের সর্ব্বস্থান পরিভ্রমন করিতে পারে, আজ সে সব কথা বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ বা উপন্যাসের কল্পিত কথা বলিয়া মনে হইতেছে,—যে ভারতবাসী শস্যশ্যামলা, পীযূষসলিলা ভারত-জননীর কুসুম-সুকোমল অঞ্চলের ছায়ায় শুইয়া থাকিলেও, স্বচ্ছন্দে-বনজাত শাকপাতাদি আহার, নদ-নদীর সুপেয় জল পান ও সুগন্ধি কুসুম-সৌরভযুক্ত মন্দমন্দ মারুত-হিল্লোল সেবন করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে নীরোগে দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারিত,—আজ তাহারা অনশন, অর্দ্ধাশন ও অন্নবস্ত্রা-ভাবেক্লিষ্ট, রোগেশোকে জর্জ্জরিত,—অকালমৃত্যু করাল বদন ব্যাদন করতঃ তাহাদের সম্মুখে নিত্য বর্ত্তমান।

দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। মহাকাল সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া নানা স্থানে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। চারিদিকে হা! অন্ন হা অন্ন! রব উঠিয়াছে। বুভুক্ষিত নরনারী অকালে মহাকালের কুক্ষিগত হইয়া জ্বালাময় সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে!!

কি অশুভক্ষণেই ইউরোপে মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল,—সে সমরানলে যে কত অমূল্য জীবন ধ্বংস হইতেছে,—কত পিতা-মাতা পুত্রহীন,—স্ত্রী স্বামীহীন হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? একদিকে ইউরোপে সমারানলে কতশত জীবনের আহুতি দেওয়া হইতেছে, আর অন্যদিকে ভারতে রোগে ও অনশনে শত শত নরনারীর জীবন-দীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইতেছে! ইউরোপের সমরানলের প্রকোপ হইতে ভারতও অব্যাহতি পায় নাই,—ঐ মহাযুদ্ধানলের জ্বালাময় উত্তপ্ত শিখা ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের দরিদ্র কৃষককুলের ধ্বংসসাধনে বিশেষরূপে উদ্যত হইয়াছে। সমরের প্রভাবে আমদানী রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে, দেশে জিনিষপত্র মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। একে ত ভারত দীনহীন,—কোন প্রকারে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছিল, কিন্তু কালের কুটীল আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভারতের অবস্থা দিন দিন শোচনীয়তর হইয়া উঠিয়াছে। যে ভারতে দুর্ভিক্ষ স্বপ্নের অগোচর ছিল, সেই ভারতে বর্ত্তমান সময়ে দুর্ভিক্ষ ভারত-বাসীর নিত্যসহচর হইয়াছে,—ঘরে ঘরে দরিদ্রা, রোগশোক বিরাজ করিতেছে; তাহার শৃগালকুকুরের ন্যায় উপেক্ষিত-ভাবে পথে ঘাটে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। যখনই ভারতের যে কোন অংশে দুর্ভিক্ষ কি সংক্রামকভাবে মহা-মারীর প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে,—কিম্বা অবিশ্বাস করিবার সাধ্য নাই; কেননা ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। গত ১৩২০সনের দামোদর-বন্যায় এরূপ কত ঘটনা যে ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; তখনকার সাময়িক সংবাদপত্রে এসব কথা বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। এই না সেদিন আসাম যোরহাটের অন্তর্গত কতক স্থানে বিসূচিকা রোগ সংক্রামকরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তখনও এরূপ ঘটনা

ঘটিতে আমরা দেখিয়াছি; বোধহয় "আর্য্য-দর্পণের" পাঠকগণ সে কথা বিস্মৃত হন নাই। দুদিন না যাইতেই আবার আসাম ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও সঙ্গে সঙ্গে তদনুচর বিসূচিকা ও উদরাময় করাল বদন ব্যাদান করতঃ অনশনক্লিষ্ট প্রজাদিগকে গ্রাস করিয়া তাহাদিগের সকল দুঃখের অবসান করিয়া দিতেছে। চাঁদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পাবনা ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

একে ত দেশে অর্থাভাব, তাহাতে আবার ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রাদি মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দীনদরিদ্র প্রজাদিগের যে কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই সহজে অনুমান করিতে পারেন। প্রজাগণ আশা করিয়াছিল, যে আশু ধান্য হইলেও কিছুদিনের জন্য প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে, কিন্তু হা দুরদৃষ্ট! কপালগুণে তাহাও ঘটিয়া উঠিল না! লোকে বলে, "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়,"—ভারতবাসীর অবস্থাও আজ তদ্রূপ হইয়াছে। সাগরে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন প্রাণের আশায় সমুপস্থিত ভাসমান তৃণকুটা যাহা পায়, তাহাই ধরিয়া প্রাণরক্ষা করিতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া জীবনে হতাশ হয়, আজ ভারতবাসীর অবস্থাও তদ্রূপ। জ্যৈষ্ঠ-মাসে প্রবল বারিপাতে নানাস্থান ভাসিয়া গিয়াছে;—আশু ধান্যের আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে;—দীনদরিদ্র প্রজাগণের "বাড়াভাতে" ছাই পড়িয়াছে। এদিকে প্রবল বর্ষা,—ঘরে এক মুষ্টি অন্ন নাই, আরও ৪।৫ মাস কাটাইতে না পারিলে হৈমন্তিক ধান্যেরও আশা নাই; সুতরাং নিরন্ন প্রজাকুল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জীবনে হতাশ হইয়াছে। অবস্থা এমন দাড়াইয়াছে যে, তাহারা পেটের দায়ে পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে !!

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান কৃষিজাত পণ্য পাট অনাদৃত ও অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়ায় নিরন্ন কৃষকগণ জমীদারের খাজানা ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকগণ, সামান্য জমিতে পাট আবাদ করিলেই যথেষ্ট অর্থাগম হয় দেখিয়া আপন আপন জমির উৎকৃষ্ট অংশেই পাট আবাদ করতঃ বাকী জমিতে ধান্য রোপন করিয়া থাকে। বিগত কার্ত্তিক মাসেও যথোচিত বৃষ্টি না হওয়ায় হৈমন্তিক ধান্যও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল; তদুপরি স্থানে স্থানে সর্ব্ববিধ্বংসিনী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীও সময় বুঝিয়া আপন আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পাইতে যত্নে ক্রটি করে নাই। হাতে পয়সা নাই, গৃহে ধান নাই, রোগ ও অনশনক্লিষ্ট দুঃস্থ জনসাধারণ আপন আপন রোগক্লিষ্ট পুত্র-কন্যাগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেও অক্ষম। রোগক্লিষ্ট, অনশনেজর্জ্জরিত, বুভুক্ষিতোদর পরিজন-বর্গের প্রতিপালন জন্য, যত্ন-সঞ্চিত বীজ ধান্য পর্য্যন্তও নিঃশেষিত হইয়াছে। নিরন্ন কৃষকগণ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়াও উত্তমর্ণের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করতঃ বিষণ্নবদনে ফিরিয়া আসিতেছে। যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বা দেখিতেছেন, তাহারাই দুঃস্থ কৃষকগণের দুরবস্থা সম্যক উপলব্ধি

করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেশের দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় ও দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের কথা ভাবিতে গেলে পাষাণও বুঝি দ্রবীভূত হয়। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র কৃষকগণ পেটের দায়ে—প্রাণের দায়ে, লজ্জা-সরম ত্যাগকরতঃ ভিক্ষায়ে ২।১ দিন অর্দ্ধাশনেও দিন কাটাইতে পারিতেছে; কিন্তু গরীব ভদ্র পরিবারদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে গেলে শরীর অবশ হইয়া আইসে, আর অশ্রুজল সংবরণ করা যায় না। তাঁহারা ভিক্ষা করিতেও অক্ষম, আবার প্রকাশ্যে দানও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক; সুতরাং গুপ্ত উপবাসই এখন তাঁহাদের মরণের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

এই ত গেল, মোটামুটীভাবে মানুষের কথা;—কিন্তু কৃষকের একমাত্র সম্বল গরুর কথা ভাবিলে আর স্থির থাকা যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল বারিপাতে স্থানে স্থানে গো-গ্রাস লুপ্ত হইয়াছে। গো-কুল একমাত্র খড় খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে; কিন্তু তাহাও যে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর কি হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

একদিন শোণিত-পিপাসাকাতর চিতোর-লক্ষ্মী আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিলেন,—"ময় ভুখা হুঁ! আর আজ বঙ্গমাতা "ময় ভুখা হুঁ! বলিয়া তাঁহার অনশনক্লিষ্ট, রোগেশোকেজর্জ্জরিত সন্তানগণের জন্য ও এক মুষ্টি অন্নভিক্ষা করিতেছেন। ঐ শুন,—তাঁহার কাতর কণ্ঠস্বরে বাঙ্গালার দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"ময় ভুখা হুঁ!

ভ্রাতৃগণ! তোমরা এখনও আমোদ আহ্লাদে মত্ত,—বরং তামসায় আত্মহারা, তোমাদের বিবাহবাসরে, শ্রাদ্ধে ও প্রীতিভোজে কত ভুক্তাবশিষ্ট চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় অপচয় হইতেছে, শৃগাল কুকুরে খাইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না—আর তোমাদের দেশবাসী,—প্রতিবাসী তোমাদের সুরম্য হর্ম্ম্যরাজির পার্শ্বে তোমাদেরই নিরন্ন ভ্রাতৃগণ একমুষ্টি অন্নের জন্য লেলিহান দৃষ্টিতে,—করুণ নয়নে তোমাদের পানে চাহিয়া আছে!—আজ তাহারা একমুষ্টি অন্নের অভাবে গাছের শিকড় পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। তাহাতে উদর পূর্ণ হইতেছে না,—তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। তোমরা কর্ণে তুলা দিয়া দ্বিতল সুরম্য হর্ম্ম্যে কুসুমসুকোমলশয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ,—তোমরা বিলাস ব্যসনস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আপনাকে বাহ্য জগত হইতে দূরে রাখিয়াছ; কাজেই বঙ্গমাতার দিগদিগন্ত প্রকম্পিত "ময় ভুখা হুঁ!' আর্ত্তনাদের ধ্বনি তোমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না!!

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ ভারতের অতীত ইতিহাসে ও সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, আজ দেখিতেছি, অমর কবিগণের সেই অতীতবাণী আমাদের সম্মুখে সজীব হইয়া ফুটিয়া উটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের অবস্থা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইতিহাসের ও সাহিত্যের ঐ সকল চিত্র অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। তখনও শত শত বুভুক্ষিত নরনারী "খেতে দে", "খেতে দে", বলিয়া চীৎকার করিয়া-

ছিল,—অর্দ্ধাহারে, অনাহারে রোগে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এখনও "খেতে দে", "খেতে দে", সেই মর্ম্মভেদী-চীৎকার উঠিয়াছে,—অর্দ্ধাশনে, অনশনে, শতশত নরনারী কালের কুক্ষিগত হইতেছে।

সদাশয় গবর্ণমেণ্ট, দুর্ভিক্ষদমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত ? আমাদেরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। দেশের শিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ, উদারহৃদয় ধনী,—দাতা ও জনসাধারণ আপন আপন সামর্থ্যানুসারে অনাহার-ক্লিষ্ট, বুভুক্ষিত নরনারীর জন্ম একমুষ্টি উদরান্নের সংস্থান করে সকলেই স্ব স্ব শক্তি প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হউন। যাহার যেরূপ শক্তি, তিনি সেই শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। আত্মবৎ জগৎসেবায় সকলেই সাধ্যানুসারে আপন আপন শক্তি প্রয়োগ করুন। অনেকে কত অর্থই অনর্থে ব্যয় করিতেছেন, তাহার সামান্ত অংশদানেও এ বিপদের কতক প্রতিবিধান হইতে পারে। যে যেরূপভাবে এই সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন, তিনি সেইভাবে অগ্রসর হউন। ধনী ধন লইয়া, পরদুঃখকাতর প্রাণ লইয়া ও কর্ম্মী আপন কর্ম্মময় দেহ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

ভ্রাতৃগণ! আর ভাবিবার সময় নাই, আজ সকল কর্ম্মত্যাগ করিয়া, আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দুর্ভিক্ষ দমনে অগ্রসর হও। একদিন উপবাস করিয়া দেখ,—জঠর জ্বালা কত তীব্র, কত ভীষণ! সেই নিত্য উপবাস-অনশনের জ্বালায় তোমাদের দেশ-ভ্রাতাগণ মরিতে বসিয়াছে! ভ্রাতৃগণ! আজ অন্নদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা কর।

ভ্রাতৃগণ! জননী জন্মভূমি তোমাদের বিরাট দেবতা। তোমাদের স্বজাতি,—তোমাদের স্বদেশ এই বিরাট দেবতার অঙ্গ। যদি জননী জন্মভূমির পূজা করিতে চাও,—যদি জননী জন্মভূমির আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া ধন্ত হইতে চাও,—তবে তোমাদের ক্ষুধিত, বুভুক্ষিত, অনশন-পীড়িত, উপবাসখিন্ন দেশবাসীর করুণ আর্ত্তনাদ নিবারণ কর। তোমাদের কোটি হস্তে এক মুষ্টি করিয়া তণ্ডুল দিলে,—তোমাদের কোটি হস্তে এক কপর্দ্দক করিয়া দান করিলে তোমাদের স্বদেশবাসীর এই অন্নজ্বালা জুড়াইবে! তোমাদের স্বজাতি এই বিষম অন্নকষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতেই জননী জন্মভূমির সেবা পূজা হইবে;—জননীর করুণ ক্রন্দন বিমল হাস্তে পরিণত হইবে, কেননা সন্তানের আনন্দেই সন্তানবৎসলা জননীর আনন্দ,—সন্তানের সুখেই যে জননীর সুখ—তাই:—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

ভ্রাতৃগণ! স্মরণ রাখিও তোমরা সেই আর্য্যবংশের সন্তান, যাহারা একদিন পরার্থে,—পরের জীবনরক্ষার্থে ধনসম্পত্তি ত তুচ্ছ কথা, আপন শরীরের মাংস স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই,—পরের প্রীত্যর্থে স্বহস্তে একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিতেও বিচলিত হন নাই। তোমাদের দেহ রক্তমাংসে গঠিত নয় কি! তোমাদের প্রাণে দয়া মায়ার লেশমাত্রও নাই কি? তোমাদেরও ত ছেলেমেয়ে আছে, তাহাদের দুঃখকষ্টে যদি প্রাণ

কালে, তবে তোমাদের চক্ষের সম্মুখে এই যে সদাপ্রস্ফুটিত অমল গোলাপবৎ কচি কচি শিশুগুলি অনশনে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, তাহা কি তোমদের প্রাণে আঘাত করিতেছে না? তোমাদের প্রাণ কি এতই কঠিন? তোমরা না জ্ঞান গরিমায় শিক্ষা দীক্ষায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে বিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত সভ্য? যদি পরের দুঃখে প্রাণ না কাঁদিল,—যদি পরের দুঃখ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলাম,— "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তি সতি," এই ঋষিবাক্য জানিয়াও যদি পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলাম, তবে ধিক্, আমদের অর্থকরী শিক্ষায়—শত ধিক্, আমাদের বিলাসপ্রবণ দীক্ষায়! এরূপ শিক্ষিত হইতে পরদুঃখকাতর মূর্খ চাষাও যে বরং শ্রেষ্ঠ। দেশের এই অবস্থা দেখিয়াও যদি আমরা দেশের সেবায়, দশের সেবায় দেহমন প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিলাম,—তবে আর সর্ব্বজীব হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া গৌরব করা কেন? তবে বনের পশুতে আর আমাতে কি প্রভেদ থাকিল? সেও আপন স্বার্থ নিয়া ব্যস্ত, আমিও আপন স্বার্থরক্ষায় সর্ব্বদা তৎপর। ইহাই কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? যদি কার্য্যকালে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে পুঁথিগত বিদ্যার কি প্রয়োজন? আসুন আমরা সকলে আপন আপন শক্তি লইয়া সমবেত হই,—সৎকার্য্যে ভগবান সহায়। নিশ্চয়ই মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সহায় হইবেন। দুঃখের পর সুখ অবশ্যম্ভাবী; তাই প্রবাদবাক্যে প্রচলিত আছে,—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"। এই দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই সংঘটিত হইয়াছে। কেননা অমঙ্গল মঙ্গলের বার্ত্তাবহ; ইহা দুঃখ নয়, ইহা বিপদ নয়, ইহা আমাদের পরীক্ষা। আমরা "শিক্ষিত", "আমরা মানুষ" বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, তাই এই পরীক্ষা উপস্থিত। সকলেই ভগবানের জয়োচ্চারণ করতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন,—দেখিবেন তাঁরই কৃপায় অচিরে বিপদ কাটিয়া যাইবে,—আকাশ (মেঘমুক্ত) হইবে'—আমাদের সুখসূর্য্য নবীনালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এ পরীক্ষা এক-জনের জন্য নয়,—একদেশের জন্য নয়,—শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমান,—কি বৌদ্ধ, খৃষ্টানের জন্য নয়—ইহা সমগ্র মানবজাতির পরীক্ষা, ইহা দেশ, কাল, পাত্র বা জাতি-কুল বিশেষের পরীক্ষা নয়। আমরা সম্মিলিত শক্তিতে মিলিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপায় এ বিপদের অবসান করিতে সক্ষম হইব। সকলেই মনে রাখিবেন,—

"তৃণৈর্গুণ ত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"।

ভ্রাতৃগণ! আর সময় নাই—বুভুক্ষিত স্বজাতির দুর্দ্দশা মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হউন! অনশনক্লিষ্ট স্বজাতির রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হউন। ইউরোপের মহাযুদ্ধে, নিহত যোদ্ধৃবৃন্দের অসহায় পরিবারবর্গের কষ্টে সকলে যেরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণে ব্রতী হইয়াছিলেন,—আজ সেই প্রাণ, সেই হৃদয়, সেই সহানুভূতি এবং সেই সমবেদনা ও পরিহিতৈষিণার ভাব লইয়া আসুন আবার আমরা সমবেত শক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশের অন্নাভাব

বিপন্ন কৃষককুলের—পরিবার রক্ষায় যত্নবান হই ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, নিরন্ন কৃষকগণের সাহায্যকল্পে অত্র আশ্রমে একটী "দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডার" খোলা হইয়াছে; আমরা সেবকগণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি । সহৃদয় মহাত্মাগণ যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন (যতই অল্প হউক না কেন) তাহা অত্র আর্য্য-দর্পণ-কার্য্যালয়ে ম্যানেজারের নিকট কিম্বা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে স্থানীয় সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে । আশাকরি, আমাদিগের এই সকাতর প্রার্থনা ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ দেশবাসীর নিকট উপেক্ষিত হইবে না

বিনীত

দীন—স্বরূপানন্দ ।

—:0:—

গৌর ।

(১)

কাঞ্চণ বরণ তনু,
ভ্রূযুগল কামধনু,
আঁখি ঠারে হরিলরে মন;
চাঁচর চিকুর কেশ,
বিনাইয়া কৈল বেশ,
হেরি রূপ ভুলিল মদন ।

(২)

গলে বনমালা দোলে,
মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে,
পরিধানে শোভে পীতবাস,
রূপেতে ভুবন আলো,
রূপ জল মুগ্ধ হ'ল,
কোটী শশী তাহে পরকাশ ।

(৩)

প্রেমে ঢল ঢল অঙ্গ,
মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গ,
বলে সবে বল হরিবোল,
হরি নাম কর গান,
তবে পাবে পরিত্রাণ,
দূরে যাবে সব গণ্ডগোল ।"

(৪)

(গোরার) দুনয়নে বহে ধারা,
প্রেমেতে আপন হারা,
বাহু তুলি করিছে নর্ত্তন,
কলিতে ভূভারহারী
এইরূপে অবতরি,
করিলেন পাষণ্ড দলন ।

দীন—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত ।

বৈদিক—প্রসঙ্গ।

(১৩)

প্রকৃতির আশ্রয় প্রকৃত কিনা?

অতঃপর প্রকৃতির আশ্রয় ব্যতীত পরমাণুগুলির গত্যন্তর নাই। যেহেতু নিমিত্ত-কারনের অভাবে পরমাণুগুলি মিলিত না হওয়ায় জগতের অনুৎপত্তি বা জগত সৃষ্টি হইতেছে না। এইহেতু যাঁহারা প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয় ব্যতীত আর কি উপায়ে পরমাণু মিলন সাধিত হয়? অতএব প্রকৃতিই পরমাণু মিলনের কারণ হউক বা প্রকৃতির আশ্রয়ই পরমাণুগুলির প্রকৃত আশ্রয় হউক; এরূপ হইলে প্রকৃতিকে সর্ব্বশক্তিমান হইতে হইবে, অন্যথায় সাম্প্রদায়িক আপত্তি অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বশক্তিমান হইলে সকল সম্প্রদায়ের আপত্তি 'সেই' সর্ব্বশক্তিমানের সহিত অভেদ হইবে, সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পরস্পরাশ্রয় বাধ-ব্যাধির আশঙ্কা ঘুচিবে। যেহেতু ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের মধ্যে 'অণুবৎ' কোন কিছু ত্যাগ করিয়া কেহই সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না; পূর্ণত্বের হানি হইয়া অপূর্ণত্ব প্রকাশ পায়। আবার মুখের কথায় সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া অযথা-কল্পিত বুঝাইলেও চলে না। এইজন্যই স্বতঃ-প্রমাণ বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃপুনঃ আলোচনা ভ্রমশূন্য প্রমাজ্ঞান লাভ করতঃ অনুকূল তর্কের সহিত বিচারের নির্দ্দোষত্ব নিখুঁত রাখিতে হয়। অন্যথায়,—প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান হউক,—একথা আমি বলিতেছি,—আপনারাও সকলে বলুন! তাই বলিলে সাধারণে সে কথায় ভুলিবেন কেন? বা প্রকৃতিই সর্ব্বশক্তিমান হইবে কেন? যেমন শিশির বিন্দুকে জমাট বাঁধিতে বলিলে—সে জমাট বাঁধিবে না, অগ্নিকে শীতল হইতে বলিলে—সে শৈত্য-গুণসম্পন্ন হইবে না। জল শৈত্য গুণ হারাইয়া—উষ্ণত্ব লাভ করিবে না;—তদ্রূপ আমরা সমস্ত জগতের লোক বলিলেও "প্রকৃতি" সর্ব্বশক্তিমান হইবে না। সে যাহা আছে, চিরদিন তাহাই থাকিবে। আজ নিত্যবস্তু, কাল ভিন্নরূপ, কদাচ হইবে না, হইতেও পারে না, সম্ভাবনাও নাই। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমানত্ব কতদূর?

বিচারের পূর্ব্বে এই প্রকৃতির পরিচয় জানিতে হইবে, যথা,—পূর্ব্বে "আত্যন্তিক মঙ্গল কাহাকে বলে" প্রশ্নের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, সনাতন পূর্ণপরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান বিধায়ে, কার্য্য কারণ ভাব দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্বয়ং যে উপায়োৎকর্ষে বা কৌশল রহস্যে—সাকার বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তাঁহার সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় রহস্যবলই ইচ্ছা, বাসনা, কামনা, মায়া, প্রকৃতি, অজ্ঞান, রাধা, কৃষ্ণ, রাম, হরি ইত্যাদি নামের আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। ইনি সে "প্রকৃতি" নহেন। যিনি মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান বস্তু, সেই পরাৎপর পূর্ণপরব্রহ্মকে,—প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনার দ্বারা কৃষ্ণ, রাধা, হরি

বলিয়াই ডাক, আর কালী, তারা, আদ্যাশক্তি, মহামায়া, ইত্যাদিতে "মা মা বলিয়াই" পূজা কর বা যমপুকুর, পুণ্যীপুকুর, শীতল-ষষ্ঠী, মনসা ইত্যাদিতে পুষ্প বর্ষণ কর,—অথবা সহস্রসার পদ্মে রাখিয়াই ধ্যানকর; সেই এক পূর্ণ পরাৎপরব্রহ্ম ভগবান বস্তুকেই বুঝাইয়া থাকে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জলের নাম জল, পানি, উদক, অম্বু, সলিল, নীর, তোয়, পয়ঃ, বারি, সরিৎ, জীবন, ওয়াটার নিলু ও ভনি ইত্যাদি নানারূপ হইলেও স্বরূপে সেই এক জল বস্তুকেই বুঝায়, তদ্রূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি কাহার কারণ বা কার্য্য, সাধ্য বা হেতু, জনক বা জন্য, সমবায়ি বা অসমবায়ি কারণ নহেন। আবার তিনি কখন নিষ্ক্রিয়, কখন সক্রিয়, কখন নিরাকার, কখন সাকার, কখন নির্গুণ, কখন সগুণ, কখন বিকাশ, কখন সঙ্কোচ, কখন পুরুষ, কখন নারী "মিশ্র পদার্থবৎ বিনাশশীল" নহেন। এইরূপ তিনি জগতের ভিতরেও আছেন,—বাহিরেও আছেন হিসাবে "অনু-প্রবিষ্ট" নহেন; অনাদি অনন্তকাল স্বতঃ-প্রকাশমান। সুতরাং স্বতঃ-প্রকাশমান বস্তু প্রবিষ্ট বা প্রবেশবিশিষ্ট হইতে পারে না; তাহা অনুপমান। কাজেই উপসর্গ বিশেষের 'অনু,' পশ্চাৎ প্রবেশের 'অনু,' প্রবেশ বিশিষ্টের 'অনু,' অথবা ভিতর বাহির ইত্যাদি তুলনার 'অনু,' তিনি নহেন। তিনি অতুলনীয়; অন্য বস্তুর দ্বারা তাঁহার তুলনা হয় না। তবে অর্থবোধের নিমিত্ত যাহার যে রূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাব প্রকাশ করে মাত্র। তাই বলিয়া স্ববিরোধী বা স্ব-ব্যাঘাতক বাক্য যেমন "মম মাতা বন্ধ্যেতিবৎ"—অর্থাৎ আমার মাতা বন্ধ্যা ইত্যাদির ন্যায় বলিলে চলিবে কেন? পক্ষান্তরে আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে, জগতের আদি, অন্ত বা ভিতর, বাহির কিছুই নাই। সুতরাং কোন উপায়েই সেই অনুপমান অজ্ঞাত বস্তু (যাঁহাকে পূর্ণ পরব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়) জগতের ভিতর বাহির তুলনায় "অনু-প্রবিষ্ট" হইবেন না, সম্ভাবনাও নাই। তবে অর্থ সৌকার্য্যার্থে বা শ্রুতি বাক্যের "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" স্থলে বাক্য মনের অবিষয় ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্য-মান বস্তুকে—সর্ব্বব্যাপী, স্বয়ং প্রকাশ, নিত্য বোধরূপে চিরবিরাজমান ইত্যাদি বলিয়া বেদ বাক্যের "যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং," "যশ্ছন্দ সাম্যযতো বিশ্বরূপঃ" স্থলে অর্থাৎ জগত যাহাকে জানিতে পারে না, অথচ জগত যাহার রূপক বা প্রতিবিম্ব অর্থে, সেই পরম প্রভুকে জগতের অত্যন্ত নিকটের বা জগতের বাহিরের বস্তু বলিলে,—কোনরূপ ব্যভিচার কল্পনা হয় না; প্রামাণ্যও দণ্ডলা-গুলিক বা পাশরজ্জু হইয়া উঠে না। সুতরাং পাঠকগণও "এই প্রবন্ধের অর্থ কল্পনায় জগতের বাহির শব্দটি ঐরূপ ভাবে গ্রহণ করিলে অর্থোপপত্তির অনর্থকত্বও ঘটে না বা বজ্রলেপের আশঙ্কাও থাকে না। অতএব পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া বাক্যের দোষ গুণ আলোচনা করিতে হয়। অন্যথায় "ভ্রান্তাস্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ সর্ব্বে লৌকিক তার্কিকাঃ ইত্যা-দিতে" পণ্ডিতাভিমানী নানা বেশধারী ধর্ম্ম-প্রচারকগণ শ্রুতি-তাৎপর্য্যের লাঘব কল্পনা হেতু কেবল বৃথাযুক্তি ও প্রতিকূল তর্ক

যাঁরা কদাচ ভ্রমশূন্য হইতে পারেন না; ভ্রমা জ্ঞানও ঘটে না। যাক সে কথা। বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতি উল্লিখিত কার্য্যে কারণ-বিহীন জগতের অত্যন্ত বস্তু নহেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ—দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যকল্পে গত আষাঢ় মাসে, অত্র আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীমান সুরেন্দ্র-নাথ ও অতুলচন্দ্র ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহারা পাবনা, ফরিদপুর নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমন করতঃ শারদীয় পূজাযোগে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

—0—

সতীর চিতারোহণ—বিহার-আরা পিয়ানিয়া গ্রামে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুর পর-যখন ঐ ব্যক্তির চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন তাহার প্রতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নী স্বামী-শোকে অধীরা হইয়া আচম্বিতে জ্বলন্ত চিতায় ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক নশ্বর দেহের অবসান করতঃ পতিলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

—0—

আদর্শ সতী—সেদিন দীল্লির ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ভাই বালমুকুন্দজীর ফাঁসি হয়। পতির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সতী-কুল্যা পতিপরায়ণা পত্নী পতি-ধ্যান করিতে করিতে এ পাপতাপময় সংসার মরুভূমি হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ধন্য সতি! এহেন মৃত্যু কেবল সতীভূমি ভারতেই সম্ভবে!!

শুভবিবাহ—সেদিন কলিকাতা শ্যাম-বাজারের পরলোকগত জমিদার মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মিত্র মহা-শয়ের পুত্রের বিবাহোপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রায় ১৯০০৲ টাকা সাত্ত্বিক দান করিয়া-ছেন! এ বিবাহে বাহ্যাড়ম্বর নাই! কোনরূপ অপব্যয় নাই, দেশকাল-পাত্রানু-সারে দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যথা—৺মোহন বাবু ও তাঁহার পত্নীর স্মরণার্থ কাশীর রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে একটী ওয়ার্ড খুলিবার জন্য ৫০০০৲ টাকা, কলিকাতা অর-ফেনেজে ১০০০৲, পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে ১০০৲, ইত্যাদি; তাই বলিতেছিলাম সাত্ত্বিক দান—একেই বলে শুভবিবাহ। বিবাহের দেনা-পাওনা ব্যাপারও আনন্দায়ক; কন্যাপক্ষ গৃহস্থ মাত্র। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ে তাঁহা-দের কষ্ট হইবে বিবেচনায়, বরপক্ষই সে ব্যয়ভার বহন করিয়া উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন; বাঙ্গালার কবে আবার এমন দিন আসিবে—প্রত্যেকেই এই মিত্র পরিবারের রীতি অনু-সরণ করতঃ সমাজে শান্তির স্রোত প্রবাহিত করাইবেন। পুরাকালেও ভারতে শুভকার্য্যে দানাদির এরূপ ব্যবস্থা ছিল। ভগবচ্চরণে সানুনয়ে প্রার্থনা শ্রীযুত প্রমথও চন্দ্রনাথ বাবু দেশের-দশের এরূপ উপকার সাধন করতঃ দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

—0—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

বৈদিক—প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

(১৪)

এই প্রকৃতি বিশ্বসংসারের মূল, সকল কার্য্যের কারণ, উৎপত্তিশূন্য ও নিত্যবস্তু। ইঁহার অন্য নাম অব্যক্ত, প্রধান, অব্যক্তবীজ,, অব্যক্ত গুণকেন্দ্র, জগদ্যোনি, জগদ্বীজ ইত্যাদি। ইনি অচেতন, গুণময়ী, পরিবর্ত্তনশীলা; অর্থাৎ পরিণত না হইয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারেন না,—অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অব্যক্ত। ইঁহার প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয় অহঙ্কার, তৃতীয় ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা পরমাণু, চতুর্থ পরিণাম জগৎ। অন্য পক্ষে এই প্রকৃতি কাহার বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহেন; ইনি শুদ্ধ প্রকৃতি জগতের কারণ। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত (অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশের পরমাণু বিশেষকে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বলা যায়; আর ইঁহাদের গুণ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শও শব্দকে পঞ্চ তন্মাত্র নামে অভিহিত করা হয়। মতান্তরে যেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত তাহারই নাম পঞ্চতন্মাত্র; অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পরমাণুর নাম ও গুণ বিশেষকে—সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বলা যায়।) এই সাতটী বস্তু প্রকৃতি বিকৃতি; অর্থাৎ এক প্রকার কারণ ও কার্য্য; অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব একবার মূল প্রকৃতির কার্য্য,— একবার অহঙ্কারের কারণ; এইরূপ অহঙ্কার একবার মহত্তত্ত্বের কার্য্য, একবার সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের কারণ; আবার সূক্ষ্ম পঞ্চভূত একবার অহঙ্কারের কার্য্য, একবার স্থূল পঞ্চভূত বা স্থূল জগতের কারণ। আর স্থূল জগৎ কাহার কারণ নহে—অর্থাৎ স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্থূল তেজ, স্থূল বায়ু, স্থূল আকাশ ইঁহারা কাহার কারণ নহে; কেবল মাত্র ইঁহাদের সূক্ষ্ম

পরমাণুর (সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের) কার্য্য মাত্র। আবার সূক্ষ্ম পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অহঙ্কারের কার্য্য হইলেও, আরও কতকগুলি অহঙ্কারের কার্য্য আছে; যথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন এই এগারটী খাঁটী কার্য্য; ইহারা কাহার কারণ নহে। একুনে সর্ব্বসমেত স্থূল পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটী বস্তু খাঁটী বিকৃতি অর্থাৎ খাঁটী কার্য্য মাত্র। কাহার কারণ নহে। এই ষোলটী স্থূল, আর সূক্ষ্ম পাঁচটী পরমাণু-(ভৌম, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় ও আকাশ) বা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত মোট একুশটী (১৬+৫) এবং অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব দুইটী, অথাৎ (১৬+৫+২) তেইশটী পদার্থ ব্যক্ত; বাকী মূল প্রকৃতি "অব্যক্ত" ইনিও একটী হওয়ায় (১৬+৫+২+১) চব্বিশটী পদার্থ ব্যক্ত ও অব্যক্তের সমষ্টি হইতেছে। ইহাদের উপর পুরুষ নামক একটী পদার্থ আছেন; তিনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতি বা কার্য্যও নহেন, গুণময়ও নহেন, ভোগ্যও নহেন, সাধারণও নহেন, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বস্তু বিশেষ; অথচ ভোগকর্ত্তা ও চেতন স্বরূপ। উল্লিখিত চব্বিশ তত্ত্ব,—এবং পুরুষ—"মোট" পঁচিশ তত্ত্বের অন্তর্ভূত প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ হইতেছেন। এই অব্যক্ত কারণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত দ্বারা ত্রিগুণ ভাবে পরিবর্ত্তনশীলা। ইহার দুই অবস্থা, যথা সাম্য ও বৈষম্য। যখন-সত্ত্ব,—রজঃ ও তম গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থা—অর্থাৎ যখন গুণত্রয় সমভাবে থাকে,—ন্যূনাতিরিক্ত হয় না, তখন তাহার নাম প্রকৃতি। আর গুণত্রয় যখন ন্যূনাধিক হয় অর্থাৎ সত্ত্ব দুই, রজঃ এক, তমঃ এক—(২+১+১) এই রূপ চারি সংখ্যায় এক প্রকার গুণের ন্যূনাধিক বা গুণ বৈষম্য,—মতান্তরে সত্ত্ব দেড়, রজঃ দেড় তমঃ এক (১৷৷০+১৷৷০+১) এইরূপ চারি সংখ্যায় অন্যরূপ গুণবৈষম্য ইত্যাদিতে বহু বহু বৈষম্য যখন হইতে থাকে; তখন তাহাকে প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা বা পরিণামাবস্থা বলা যায়; অর্থাৎ—প্রলয়ে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, আর সৃষ্টিকালে বৈষম্যাবস্থা বা পরিণাম আরম্ভের অবস্থা।

উল্লিখিত প্রকৃতি অচেতন বিধায়ে যাহার সহবাসে চৈতন্যময়ী হন, সেই পুরুষ নিষ্ক্রিয় গুণময় নহেন,—অথচ চেতন। তিনি,—প্রকৃতি বা শক্তি ব্যতীত "জগৎ"—সৃষ্টি করিতে পারেন না। এইজন্য প্রকৃতি-পুরুষ মিশ্রনে অনবরত জগতের সৃষ্টি কার্য্য চলিতেছে; অর্থাৎ—মহাবিষ্ণু জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে, গুণের আশ্রয়ে "ভূমার দিকে" একটা স্পন্দন দ্বারা বৃত্তাকারে প্রকাশিত হন; নতুবা ভূমা হয় না। আবার শক্তি ব্যতীত গতির বিকাশ ঘটে না। নিষ্কাম ধর্ম্মে ভূমা, ভূমা হইতে ব্রহ্মলাভ। আর পুরুষ প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী স্বগ শূন্য। এবম্ভূত উপায়ে জগৎ-সৃষ্টি বিহিত হয়; সুতরাং অব্যক্ত প্রকৃতিই যখন জগত প্রস্তুতের মূল কারণ হইতেছেন, তখন প্রকৃতির দ্বারা পরমাণু মিলন না হইবে কেন? বা প্রকৃতিই পরমাণু সংযোগের কারণ না হইবে কেন?

ভালকথা। যে মূল মন্ত্রের উপর বর্ত্তমান প্রকৃতি তত্ত্বটী বিহিত হইতেছে, সেই মন্ত্র যদ্যপি উল্লখিত অর্থের অনুকূল হয়, বা যে ভিত্তির উপর বর্ত্তমান প্রকৃতি

তত্ত্বটী দাঁড়াইতেছে,—সেই ভিত্তি যদ্যপি অটুট হয়, অথবা সিদ্ধপ্রবর মহর্ষির গভীর উদ্দেশ্য যদ্যপি "সৃষ্টি প্রসঙ্গের অতীতাবস্থায়" ঐরূপ অর্থ প্রকাশ করে ; তাহা হইলে প্রকৃতিই পরমাণু মিলনের 'একমাত্র' কারণ হইবে। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান উপাধি অবশ্যম্ভাবী হইবে—তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে ? অন্যথায় "মহর্ষি সাংখ্যকারের অভ্রান্ত ও অমূল্য উদ্দেশ্যের ভিতর যাই থাকুক না কেন,"—নানা বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের মৌখিক কথা বা কাগজ কলমের অনুগ্রহে যতদূর চলে, সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই বর্ত্তমান প্রকৃতির জগৎকারণত্ব, নিত্যত্ব, আত্মার নানাত্ব, জগতের সত্যত্ব, ঈশ্বরের অতিরিক্তত্ব, ভূমা নামক একটা পৃথক স্থলের অস্তিত্ব, আবার নিষ্কমের পর ভূমা, তথা হইতে ব্রহ্মত্ব ; "হপচয়োপচয়ৌ চ সদৈক রসে" অর্থাৎ আমি সকল সময় সর্ব্বাবস্থায় একভাবেই থাকি, কখন হ্রাস বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি ও সংশয় পরিণামাদি আমাতে নাই ;—এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ সঙ্কোচে প্রধানের পরিণামত্ব ইত্যাদি বাক্য শোভায়মান হইবে। অন্য পক্ষে বেদবিদ্ সাধুগণের নিকট "বাসি ফুলের মালার ন্যায়" শুষ্ক—অসার ও মূল্যহীন দাঁড়াইবে,—ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে এই প্রকৃতি তত্ত্বের কার্য্য সৎ, কারণও সৎ ; কারণের গুণ কার্য্যে ও কার্য্যের গুণ কারণে ;—গাভীর স্তন্য দুগ্ধ ক্ষরণ ইত্যাদি বিষয় 'প্রকারান্তরে' আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেখিতে হইবে,—"বেদ-বাক্যের" কোন মন্ত্রের উপর এই তত্ত্বটী অভ্যুত্থিত।

প্রথম শ্রুতি—অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণবর্ণাং,—দ্বিতীয় শ্রুতি—মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—তৃতীয় শ্রুতি—তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি,—চতুর্থ শ্রুতি—পৃথিবীচ পৃথিবী মাত্রা চাপশ্চাপো মাত্রা চ তেজোশ্চ তেজো মাত্রা—ইত্যাদি, পঞ্চম শ্রুতি—মহতঃ পরমব্যক্তমিতি—

"প্রথম অজামেকাং"—অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণা অজা প্রকৃতি প্রভূত প্রজাসৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানাত্মাই "অজা" প্রকৃতির সেবা করিয়া ভোগ্য বস্তুর সহিত ইহাকে ভোগ করতঃ-অজ্ঞানান্ধকার পরিত্যাগ করেন। এখানে লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা রজঃ সত্ত্ব ও তমো গুণের সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে ;—অর্থাৎ রঞ্জনাত্মক বিধায়ে লোহিত শব্দে রজঃ, সত্ত্ব প্রকাশাত্মক বিধায়ে শুক্ল শব্দে সত্ত্ব, আবরণাত্মক বিধায়ে কৃষ্ণ শব্দে তমোগুণকে বুঝাইতেছে। অতএব লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বিশেষণ দ্বারা রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই বুঝাইল। সেই সাম্যবস্থাই "অজা" প্রকৃতি ; তিনিই অব্যক্ত নামে অভিহিত হন।

উত্তম কথা। যাহার জন্ম নাই, সেই বস্তুই অজা, এইরূপ অর্থে এই তত্ত্বের প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রকৃতির শ্রুতিমূলত্ব বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রকৃতির শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করা যায় না বা প্রকৃতি যে শ্রুতিমূলক, ইহাও সমর্থিত

হইতে পারে না। যেহেতু যে বস্তুর জন্ম নাই, অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, সেই বস্তু অজা হইলে, অজা বস্তুকে "উৎপত্তিশূন্য অর্থাৎ অনাদি, আবার অনাদি হইলেই অনন্ত এইরূপ অর্থে" অনাদি ও অনন্ত হইতে হয়। অতএব অজা শব্দ, অনাদি ও অনন্ত বস্তুর বিজ্ঞাপক হইল। এই প্রকৃতিতত্বের যিনি পুরুষ, তিনিও উৎপত্তি, লয়শূন্য বা অনাদি, অনন্ত। এরূপ স্থলে অজা শব্দ দ্বারা প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে ইহারই বা প্রমাণ কি? যখন এই তত্বের পুরুষ "জন্ম-রহিত স্থলে" অজা শব্দ অনাদি, ও অনন্ত বস্তুর বিজ্ঞাপক; তখন "অজামেকাং ইত্যাদি" মন্ত্র দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে কেবল প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে,—পুরুষকে বুঝাইবে না, এরূপ কোন নিশ্চয় অর্থবাদ সমর্থন করে না। অতএব প্রকৃতি অজা হইবে, কি পুরুষ অজা হইবে, নির্ণয় উপলক্ষে বিরোধের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। আবার বিরোধস্থলে বস্তুর প্রকৃত অর্থ-নির্ণয় অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, সন্দেহ বা ভ্রমশূন্য প্রমাজ্ঞান লাভ অসম্ভব হয়। কাজেই "বিচার ফলস্য নির্ণয়স্য প্রত্যাশা দূরত এব;" অর্থাৎ বিচারফল নির্ণয়ের প্রত্যাশা দূর হইয়া যায়। সুতরাং বিরোধের মিমাংসায় এইতত্বের প্রকৃতিও অজা হইবে না, আর পুরুষও অজা হইবে না, প্রকৃতি ও পুরুষের অত্যন্ত বা অতিরিক্ত যে বস্তু, যেখানে নাম রূপের খেলা নাই, "অর্থাৎ যে বস্তু মন বুদ্ধির অবিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান, সুতরাং অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য ক্ষয়ব্যয় রহিত, নিরুক্ত,—অনিরুক্ত-বর্জ্জিত, ভ্রমমোহবিনির্ম্মুক্ত, গুণাতীত, অক্ষরও পরম পদার্থ" সেই মনোবাণীর অতীত অনাশ্রয় বস্তুই অজা (যাহার জন্ম নাই) শব্দের উদ্দেশ্য হইবে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই "সর্ব্বভয় প্রশমন" অনির্ব্বাচ্য বস্তুই অনাদি ও অনন্ত, তাহার কোন রূপ নাম থাকিতে পারে না। অর্থবোধের নিমিত্ত "সেই বস্তুর" যে কোন নাম রাখা হউক না কেন, তাহা কল্পনার চিহ্ন বা সংজ্ঞাবৈচিত্র্য স্বরূপ হইয়া দাড়াইবে। এরূপ হইলে "এই তত্বের" প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব ও পুরুষের ভূমাত্ব সমস্তই বিনাশশীল হইয়া অনিত্য উপাধিতে আসিবে, প্রকৃতি পুরুষের মিশ্রনে জগৎসৃষ্টি বা প্রকৃতির জগৎ কারণত্ব ও নিত্যত্ব লোপ পাইবে।

পক্ষান্তরে লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণ, রূপের প্রকাশক, গুণের নহে। যেমন আলতার বর্ণ লাল, জবা ফুলের বর্ণ লাল, রক্তের বর্ণ লাল, ইহাদের বর্ণ বা রূপ এক,—কিন্তু গুণ বিভিন্ন; কুইনাইন সাদা, ময়দা সাদা, চাল গুড়ি সাদা, ইহাদের বর্ণ বা রূপ এক,—কিন্তু গুণ পৃথক; কাল গরু, কাল কোকিল, কাল ঘোড়া, ইহাদের বর্ণ বা রূপ এক,—কিন্তু গুণ স্বতন্ত্র; তদ্রূপ লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা কোন 'এক' নির্দ্দিষ্ট গুণকে বুঝায় না; উহা "এক প্রকার" রূপেরই প্রকাশক মাত্র। রূপবান্ বা গুণবান্ বস্তুতে মূর্ত্তি বা আকারের উপচয় অবশ্যম্ভাবী; অর্থাৎ মূর্ত্তি বা আকার ব্যতীত রূপ বা গুণের উপচয় কদাচ সম্ভব নহে। যেমন আমি কাল বর্ণ, তুমি গৌর বর্ণ, দিগম্বর বাবু শ্রাম বর্ণ, আমাদের আকার না থাকিলে রূপ বা গুণের বিচার চলে না;—তদ্রূপ

স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর ইত্যাদিতে সারা জগতের আকার বা অবয়ব না থাকিলে অর্থাৎ সাকার না হইলে, রূপ বা গুণের নির্ণয় হইতেই পারে না। কিন্তু এই প্রকৃতি তত্ত্বের প্রকৃতি অব্যক্ত, নিরাকার, নাম রূপাদি শূন্য; সুতরাং লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণ (যাহা রূপের প্রকাশক বিধায়ে সাকার হইতেছে) অব্যক্ত অজা প্রকৃতির বিশেষণ এরূপ কথা বলাই চলে না। অন্যথায় প্রকৃতিকে ঐরূপ বিশেষণে জড়াইলে, তাহার অব্যক্ত বা অজা নাম ভুলিতে হইবে। প্রকৃতির বিকার হইয়া "অর্থাৎ বৈষম্যাবস্থায়" ব্যক্ত ভাব প্রকাশ পায়; সুতরাং লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণ তাহার বিকার বা বৈষম্যাবস্থায় বিশেষণ হইতে পারে; অর্থাৎ সৃষ্টির পর সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় (অতীতাবস্থায়) বা অব্যক্তাবস্থায় অথবা রজঃ, সত্ত্ব ও তমো গুণের সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ নিরাকার স্থলে লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপের প্রকাশক সাকার বস্তু কদাচ "অজা প্রকৃতির" বিশেষণ হইতে পারে না। যেহেতু লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণ উৎপত্তিশূন্য বা অজা নহে; সৃষ্ট বস্তু। এই জন্য সৃষ্টির পর ঐ সকল বিশেষণ অবশ্যম্ভাবী।

অন্যথায় সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা,---যে স্থান বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, মনেও ধারণা হয় না, ভাবনা দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না, "অর্থাৎ বাঙ্মনোতীত গোচরম্"—সেই অব্যক্ত স্থানের বিশেষণ লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণ হইলে—"মম মাতা বন্ধ্যেতিবৎ"—প্রামাণ্য 'নিশ্চয়' নিরর্থক হয়; বাক্যটীও দগ্ধজলাঞ্জলিক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ "আমার মাতা বন্ধ্যা";—"লাল সাদা, কাল রংয়ের নিরাকার বা অব্যক্তাবস্থা";—"ঢাক ঢোল বাজান নীরবতা";—ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় স্ববিরোধী বাক্য হইয়া ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়। অতএব লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণা অজা প্রকৃতি প্রভূত বা বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, এই বাক্যটী স্ববিরোধী বা স্বব্যাঘাতক হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ হইলে অব্যক্ত প্রকৃতির "সাম্য ও বৈষম্য" দুই অবস্থা 'এরূপ কথা' বলা চলে না। যেহেতু বৈষম্যাবস্থায় বা বৈষম্য উপাধিতে অব্যক্ত নাম ছাড়িতে হইবে। আবার কখন ব্যক্ত, কখন অব্যক্ত, কখন সাম্য, কখন বৈষম্য—"মিশ্র পদার্থবৎ" হইলে নিত্যাবস্থা উপাধি ভুলিতে হইবে। যেহেতু মিশ্র পদার্থ মাত্রেই বিনাশ বা ধ্বংসশীল। ইহার উপর পূর্ব্বকথিত পরমাণুতত্ত্বের "অর্দ্ধ জরতীয়" উদাহরণের ন্যায় অন্যান্য "অর্দ্ধার্দ্ধীয়" উদাহরণের আশঙ্কাও অসম্ভব নহে। অতএব প্রকৃতিকে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, সমানাকারা ইত্যাদি উপাধির বিশেষণে প্রবৃত্তি রূপ অর্থভাবনার দ্বারা আনন্দানুভব করিতে হইলে, কতকগুলি ভাব বা নানাবিধ ভাব জড়াইলে চলিবে না। তাঁহাকে ভাব-অভাব, সত্য মিথ্যা, নিত্যানিত্য, বিদিত-অবিদিত, ভাল-মন্দ, সু-কু,-ইত্যাদির অতীতাবস্থায় "এক-ভাবে" রাখিতে হইবে। যে ভাব জন্মে না—মরে না; শুষ্ক হয় না, পচিয়া গলিয়া পড়ে না; দগ্ধ হয় না, কম্পিত হইতেও পারে না, ভেদ-করা যায় না—ছেদ্যও নহে। তাহা বিধি-নিষেধের অতীত, সহজ আগন্তুক মল রহিত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়

ও স্বগতভেদবর্জ্জিত, ষোড়শাদি কলা রহিত, মনোদোষশূন্য—নির্ব্বিকল্প পদার্থ। সেই ভাবের নাম বা উপাধিই ত পূর্ণ পরব্রহ্ম। তাঁহাই "অ-জ"—কিনা অজন্ম অর্থাৎ যাঁহার জন্ম নাই বা উৎপত্তি নাই, সুতরাং অনাদি। আবার অনাদি হইলেই অনন্ত। অনন্ত বস্তু জানা যায় না বা উপলব্ধিতে আসে না। তাহা জানি বলিলে বা উপলব্ধির ভিতর আসিলেই অনন্ত ভাঙ্গিয়া সীমাবদ্ধে আসিবে। কাজেই অনন্ত বস্তু জানা যায় না বা অজ্ঞাত। অতএব অ-জ শব্দ অনন্ত ও অজ্ঞাত অর্থের প্রতিপাদক হইল বা অ-জ শব্দ হইতে অনন্ত, অজ্ঞাত, না জানা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পাইল। প্রবৃত্তি রূপ অর্থ ভাবনার দ্বারা সেই বস্তুর নাম বা উপাধি "অজা" হয়; অতনু, অটুট ইত্যাদিও হইয়া থাকে।

সেই না জানা "অজ" স্থল হইতে লাল, সাদা, কাল, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, বহুবিধ সৃষ্টি বা প্রভূত প্রজা নিয়মিত হইতেছে। অথবা সেই স্থল 'সমস্ত' সৃষ্টি বস্তু উৎপাদন-শক্তিবিশিষ্ট বা সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানদেবতা জ্ঞানময় আত্মাই অজো-হেকো। শ্রুতি মতে বাগিন্দ্রিয় তাঁহার শরীর স্বরূপ অর্থাৎ যস্য বাক্ শরীরং। তিনি স্বীয় বাগিন্দ্রিয় রূপ শরীর দ্বারা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সকলকে ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম অদন। ইহা দ্বারাই 'অন্যান্য প্রমাণে' তিনি সকলের ভক্ষক, সর্ব্ব-সংহারক, জগৎ সংহারক, তিনি স্বয়ং ব্যতীত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলেরই খাদক ইত্যাদি উপাধি পাইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহার বাগিন্দ্রিয় রূপ শরীরের নাম অদন বা অত্রি। যদিও বাগিন্দ্রিয় অদন করে (ভক্ষণ করে) বলিয়া ইহার নাম অত্তি হওয়া উচিত, তথাপি শ্রুতি বলেন যে, যাহারা বাগিন্দ্রিয়কে অত্রি বলিয়া জানেন, তাহারা পরমার্থ নিশ্চয় করতঃ স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, সমস্ত জগতকে জ্ঞানেরই বিকাশ জানিয়া, মন, বাক্যশরীর প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সৃষ্ট পদার্থ সমূহকে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থ সমূহকে, জ্ঞান বিচারের প্রামাণ্য কল্পনায় ভোগ করিয়া থাকেন—অর্থাৎ মহাবাক্য বিচারের আনুকূল্যার্থে পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থ সমূহের উদাহরণ পৌনঃপুনিক ব্যবহারে আনিয়া ভোগ করেন কিনা সুখানুভব করেন। সেবা করেন কিনা ভাবোদ্যোতক জানিয়া" ব্যবহারে অনায়ন করেন। ভোগান্তে-ত্যাগ করেন—কিনা মহাবাক্যের বিচারান্তে ত্যাগাত্যাগে সহিত অভেদ হইয়া যান। কাজেই কাজকর্ম্মাদি দূরে পলায়ন করে। যেহেতু জড়-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, সত্যজ্ঞান, সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী নহে। সুতরাং পৌনঃপুনিক জ্ঞানদেবতার আরাধনায় পৃথিব্যাদি ভূত-পদার্থ সমূহ,-জ্ঞানের সহিত অভেদ প্রতীয়মান হইলে কাম্য কর্ম্মাদি থাকিবে কেন? এবম্ভূত জ্ঞানীর অন্য একটী নাম অত্রা-প্রভু, ইনিই শ্রুতি বাক্যের "অজ-হেকো" মন্ত্রে—বিজ্ঞানাত্মার স্বরূপ। এই অত্রা-প্রভুই—বাগিন্দ্রিয়কে "বেদ-বাক্যের" শিরা রূপ চমসের (যথা সোমশ্চমসে) তীরবর্ত্তী অত্রি বলিয়া জানেন। এইজন্যই তিনি সকলকে ভোগ করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে

ভোগ করিতে পারে না। আর যাহারা অজ্ঞান তাহারা স্বীয় রুচি অনুসারে পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থ সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভোগ করে, সেবা করে, শেষে অজ্ঞানান্ধকারে পথহারা-হয়। মহানুভব আচার্য্যগণের পবিত্র উপদেশ বাক্যে তাহাদের অজ্ঞানতা দূরে যায়, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ অর্থই "অজামেকামিতি"—শ্রুতিবাক্যের সার ভাবার্থ-রূপে গণ্য হইয়া যায়। এরূপ হইলে ঐ মন্ত্র দ্বারাই "অর্থাৎ অজামেকাং ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের অনুগ্রহেই-" বর্ত্তমান প্রকৃতির নিত্যত্ব বা জগৎকারণত্ব লোপ পায়, নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের ব্যখ্যা—"যস্তু শ্রুতের্ব্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাঙ্খ্যযোগয়োঃ" অর্থাৎ যে সকল বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ বা শ্রুতি (বেদ) প্রতিপাদিত নহে; তাহা সাংখ্য ও যোগের আভাস মাত্র হইয়া দূরে পলায়নকরে।

মতান্তরে অগ্নি, জল, অন্ন পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইতেছে, ইহাদের বর্ণ যথাঃ—লোহিত অগ্নি, শুক্ল জল, কৃষ্ণ অন্ন। অতএব পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের প্রকৃতিভূতা, "যাহা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইতেছে"- তাহাই অজা বলিয়া যাহরা "অজামেকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করেন; তাঁহাদের বাক্যও স্বতন্ত্ররূপে প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু অজা গুণ-ত্রয় স্বরূপা নহে। কেননা—লোহিত, শুক্ল ইত্যাদি শব্দ রূপবোধক, গুণবোধক নহে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তবে প্রকৃতি অনিত্য বস্তু হইলে, তাহাতে সকলই সম্ভব হইতে পারে। ভূতত্রয়স্বরূপা, গুণত্রয়স্বরূপা, যে কিছু বল অনিত্য স্থলে সকলই শোভা পায়। অন্তথায় অগ্নি, জল, অন্ন, অ-জ বা অজাকৃতি নহে। অতএব অজা শব্দ প্রকৃতিনিমিত্ত নহে বা যৌগিকও নহে,—উহা প্রকৃতির কল্পনার উপদেশ মাত্র। বন্ধন ও মোক্ষ ব্যবস্থা প্রতিপাদনের জন্য ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং চরাচর জগতের যোনি বলিয়া "প্রকৃতির" উপাধি বিহিত হইয়াছে। যাহারা—অজ্ঞান তাহারা প্রকৃতিকে ভোগ করে, জ্ঞানী জ্ঞানবিচারে—"কল্পনার কিম্বা প্রমার উপদেশ কিনা"? নির্ণয় করতঃ পরিত্যাগ করে। ইহা দ্বারা আত্মা কাহার অনুসরণ করে এরূপ বুঝায় না। সুতরাং-"অজামেকামিতি" মন্ত্র প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করে না,—বা প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ কারণত্ব অটুট রাখে না।

শ্রুতি বলেন—বেদ বা শ্রুতি প্রতিপাদিত তত্ত্ববিচারই-সাংখ্যশব্দের অর্থ,—এবং শ্রুতি প্রতিপাদিত উপাসনাই যোগ শব্দার্থ এইরূপ সাংখ্য ও যোগপ্রতিপাদিত—তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির প্রতিকারণ। হিন্দু জানে বেদ সকলের বড়, বেদের বড় কেহ নহে'। অতএব সকল কথা বেদ বা শ্রুতিবাক্যের সহিত মিলাইতে হইবে। কিন্তু প্রমাণের পোষকতায় শ্রুতিবাক্যে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দেখান এক প্রকার অসম্ভব। যদিও কোন উপায়ে সম্ভব হয়;—তাহাও আজকাল-কার 'পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী" পাঠকের মনোমত হয় না।

অতএব আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, প্রথম শ্রুতি "অজামেকামিতি—" মন্ত্র দ্বারা বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতির নিত্যত্ব, জগৎ কারণত্ব ও সর্ব্বশক্তিমানত্ব সমর্থিত

হয় না,—বা "প্রকৃতির আশ্রয়ই প্রকৃতি" এই বাক্যও সমীচীন হইয়া দাঁড়ায় না। এই জন্যই শ্রুতীয় শ্রুতি—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—:0:—

স্বপ্রকাশ।

আছ তুমি জগদ্ব্যাপী
এ কথা ত সবাই বলে।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
অনলে কিম্বা অনিলে॥

ঘটে, পটে, মঠে, মাঠে,
বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গে!
যে জেনেছে সে বলেছে,
আছ তুমি সবার সঙ্গে॥

অণু হ'তে মহদণু,
কিছু নয় কো তোমা ছাড়া।
তুমি নাকি আপন মনে
সবার প্রাণে দিচ্ছ সাড়া॥

যেই জন তোমার নামে
সপিয়াছে হৃদয় মন।
আছ তুমি আলো করে
তারি হৃদয় বৃন্দাবন॥

ভজন সাধন জানি না কো
আমি তোমার দাসের দাস।
নিজ গুণে কৃপা করে
হও গো হৃদে স্বপ্রকাশ॥

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:0:—

(সেবা না সাধনা।)

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'।

ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ প্রধানতঃ এই তিনটী—

১। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়াশীল, সর্ব্বদাই তাহাদের দুঃখাপনোদনে সচেষ্ট।

২। তিনি ভগবন্নাম গুণগানে রুচি-সম্পন্ন।

৩। তিনি সাধু-সেবাপরায়ণ।

ভক্তের এই তিনটী লক্ষণের মধ্যে জীবে দয়াই প্রধান ও প্রথম। জীবের দুঃখে যাহার প্রাণ কাঁদে না, দীনের কাতর-আর্ত্তনাদে যাহার প্রাণে বেদনার সঞ্চার হয় না, দুখীর দুঃখ দেখিয়া যাহার মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হয় না; দুস্থের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যাহার চিত্ত বদ্ধপরিকর হয় না, তাহার নামকীর্ত্তন বৃথা, তাহার সাধুসেবা নিষ্ফল। ভগবন্নাম গুণগান এবং সাধুসেবা তাহার হয় নাই—তাহার পাষাণ হৃদয়ে শুদ্ধ নামের পবিত্র

প্রেমমন্দাকিনী ও সাধুর করুণার ধারা প্রবাহিত হইতে পথপ্রাপ্ত হয় নাই।

যিনি জগৎ কর্ত্তার করুণাভিখারী,—যিনি প্রেমময়ের প্রেমকণিকার কাঙ্গাল, তাঁহাকে প্রথমতঃ জীবকে ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। জীবগণ শ্রীভগবানের অতি প্রিয়, আদরের বস্তু। কাজেই তাঁহার প্রিয়জনকে ভাল না বাসিয়া তাঁহার প্রতি যে ভালবাসা প্রেম বা ভক্তি তাহা ভাণ—ভণ্ডামী বা আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র।

শ্রীভগবান এই জগতের কর্ত্তা; এ জগৎ তাঁহারই সংসার। তিনি স্বেচ্ছায় এই লীলাবিলাস করিতেছেন। এ জগৎ তাঁহার অতি প্রিয়। প্রতি অণু, পরমাণু পর্য্যন্ত তাঁহার করুণায় আবরিত ও রক্ষিত। যদি আমরা তাঁহাকে চাই,—যদি তাঁহার করুণার কাঙ্গাল আমরা হই, তাহা হইলে এই যে তাঁহার দৃশ্যমান জগৎ—তাঁহার অতি আদরে পালিত সন্তানগণ—ইহাদিগকে সেবাকরা ও ভালবাসা সাধনার প্রথম স্তর রূপে অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার যত সহজে দয়ার সঞ্চার হইবে, এত সহজে আর কোন কার্য্যেই হইবে না। নিজের সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখিলেও এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তোমার অনুসন্ধান না করিয়া,—তুমি কে বা কোথায় থাক না জানিয়া, তোমার প্রিয় সন্তানটীকে যদি কেহ খুব ভালবাসে,—বিপদে যদি উদ্ধার করে,—আর্ত্ত অবস্থায় দেখিয়া যদি সেবা করে,—তবে তুমি কি তাহার নিকট অযাচিত ভাবে বিক্রীত হইয়া যাও না? তুমি কি তাহাকে তাহার কার্য্যের গুণে প্রাণের সহিত ভালবাস না? এ স্থলে ঐ লোকটী তোমার প্রীতি উৎপাদনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিল, তাহা না করিয়া যদি সে প্রথমেই আসিয়া মিষ্ট কথায় তোমাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত, তবে তোমার মনে হয়তঃ শত সন্দেহ উপস্থিত হইত এবং তাহাকে চাটুকার বলিয়াই মনে করিতে। মুখে বাক্যের ছটা দেখিলে প্রথমে আনন্দের পরিবর্ত্তে মনে আশঙ্কারই সঞ্চার হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, করুণানিধান ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের দয়াপ্রাপ্তির জন্য জীবসেবা একটী অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা,—সন্দেহ নাই। কায়মনোবাক্যে জগৎ-জীবের সেবা করিলেই জন্ম সফল হয়।

> এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহেষু।
> প্রাণৈরর্থৈ র্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥
>
> শ্রীমদ্ভাগবত।

এই সংসারে প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা জীবগণের সতত মঙ্গলাচরণই দেহী মাত্রের জন্ম সাফল্যের কারণ। দেহ, মন, প্রাণ ও ধন দ্বারা জীবের মঙ্গলবিধান—সেবা করাই মানব জনমের একমাত্র সার্থকতা।

দীর্ঘকালব্যাপী সাধন ভজন করিয়া যে চিত্তশুদ্ধি না হয়, মুহূর্ত্তকাল আর্ত্তের সেবা করিতে পারিলে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়, প্রাণে বিমলানন্দের উদয় হয়।

বেদান্ত মতে জীব-জগত শ্রীভগবানেরই বিকাশ; অতএব তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন; জানিয়া জীবের সেবা করিলে তাঁহারই সেবা করা হয়। তিনি সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত তাঁহাতে অবস্থান করিতেছে।

কাজেই যিনি জীবসেবাকার্য্যে দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেন,—তাঁহার আর অন্য সাধন ভজনের আবশ্যকতা থাকে না। পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের এমন মধুর সাকার অভিব্যক্তিতে যদি প্রাণ না টানিল—,তাঁহার জগৎ রূপের প্রকাশ দর্শনে যদি দেহ-মন-প্রাণ না মুগ্ধিল,—তবে জড় পিণ্ডময় এ স্থূল দেহ লইয়া,—স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি লইয়া তাঁহার—"অবাঙ্মনসো গোচরম্" রূপ তাঁহার আদি, মধ্য শূন্য, অন্তর্বহি শূন্য, অস্তি নাস্তি পারের রূপের প্রতি মন ধাবিত করিতে যাওয়া বাতুলের প্রয়াস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রেমময় প্রেমের হিল্লোলে জগত ভাসাইতেছেন, ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই প্রেমময়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ তিনি জগৎময় কেমন প্রেমের পসরা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তোমার প্রেমের ক্ষুদ্র কণিকা-টুকু লইয়া, যদি পার, তাহাতে মিশাও, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। দেখিবে লক্ষ জীবনের কর্ম্মরাশি মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যোগিজনদুর্ল্লভ, জগতের প্রিয় প্রভু তোমার সেবা গ্রহণ করিয়া তোমাকে কৃতকৃতার্থ করিবেন। তুমি সেবানন্দে আপনা হারাইবে।

এমন কি প্রকৃত ভক্ত প্রেমানন্দ অপেক্ষা সেবানন্দের পক্ষপাতী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোস্বামীপাদ বলিতে-ছেন—

> নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
> সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে॥

যে আনন্দ কৃষ্ণসেবায় বাধা প্রদান করে, সে আনন্দ ভক্ত গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবৎ মহাগ্রন্থে লিখিত আছে—"এক-দিন দারুক শ্রীহরিকে ব্যজন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে প্রেমানন্দ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্তম্ভাধিক্য বিস্তার করিতেছিল; কিন্তু ভক্ত দারুক উহাকে সাক্ষাৎ হরিসেবার বিঘ্ন মনে করিয়া তৎপ্রতি অনাদর করিয়া-ছিলেন।" অতএব দেখা যাইতেছে; সেবানন্দ সকল প্রকার আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সেবা-সাধনা অবলম্বন করিতে পারিলে ভব-পারের আর ভাবনা থাকে না।

কলি মাহাত্ম্যেই হউক, বা যে জন্য হউক এই সেবাধর্ম্ম আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কর্ম্মী মহা-পুরুষগণের আবির্ভাবে ইহা আবার লোক-চক্ষুর গোচর হইতেছে। দুস্থের সেবায় যে কি আনন্দ,—আর্ত্তের আর্ত্তি দূর করায় যে কি তৃপ্তি তাহা এখন চাক্ষুষ দেখিয়া অনেকেই সেবার মহিমা বুঝিতেছেন। আমা-দের দেশে প্রায় প্রতি গ্রামেই দীনদরিদ্র নারায়ণগণের সেবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। বহুস্থানে বারোয়ারী উৎসবে বাই-খেমটার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ উৎসবে জগন্মাতা কালী কি শ্রীভগবানের কোন প্রকার শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা হয়। ইহাতে বর্দ্ধিষ্ণু বাবুদের ভোজের ব্যবস্থা হয়,—নাচ গান তামাসাদি কত কি হইয়া সর্ব্ব-সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় হয়। আনুসঙ্গিক ভোগপূজা হোমাদিও হয় এবং সময় সময় কীর্ত্তন বা ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাদিও হইয়া থাকে। এই সমস্ত দেখিয়া প্রাণে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, এই কি ধর্ম্ম?

এই কি মায়ের প্রীতি সম্পাদনের প্রকৃষ্ট উপায়? ধর্ম্ম কি শুধু উৎসবে, সভায় বক্তৃতা দানে, ধর্ম্মোপদেশ দানে, জ্ঞান ভক্তির আলোচনাতেই পর্য্যবসিত? দশ জনের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ চাঁদাস্বরূপে সংগ্রহ করিয়া বার-ইয়ারী উৎসব বার-ইয়ারে করিলেন। দশজনের অর্থ ব্যয় হইল, কয়েকটী বিশেষ বিশেষ লোকের আনন্দের কিছু সহায়তা হইল। কিন্তু এই কি ধর্ম্ম? এইরূপ আত্মতৃপ্তির উৎকট আকাঙ্ক্ষাই কি ধর্ম্ম? দুঃখের দৃশ্য ঢাকিয়া রাখিয়া সুখের ছবি নিজ তৃপ্তির জন্য ফুটাইয়া তোলাই কি একমাত্র ধর্ম্ম? আমার প্রতিবেশী; আমার ভাই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, রোগজীর্ণ দেহ খানি কষ্টে বহন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু তাহার প্রতি একবার ফিরিয়া তাকাইবার অবসর পাইলাম না। কারণ তাকাইলে,—সে দিকে লক্ষ্য করিলে, যে আমার আনন্দপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়,—আমার সুখের ফোয়ারা সে দৃশ্যে যে শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহার পূজায়,—যাঁহার মহোৎসবের ভাণ করিয়া আমরা আনন্দে আত্মহারা হইতেছি, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা ত একবার লক্ষ্য করা হইল না? কৈ জগন্মাতার স্নেহের ইঙ্গিত, জগৎ পিতার আদেশ ত শুনা হইল না? তাঁহার দুস্থ সন্তান একটী অনাহারে ইহ সংসার ত্যাগ করিতেছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মায়ের পূজায় আমরা অগ্রসর হইতেছি, ইহাতে কি মা সন্তুষ্ট হইবেন? ভ্রাতৃদুঃখে বেদনা বোধ না করিলে কি মাতৃস্নেহ লাভ করা যায়? ভাইকে অনাহারে অসহায় অবস্থায় বনে রাখিয়া আসিলে কি মা স্নেহবাহু উত্তোলন করিয়া সন্তানকে বক্ষে ধারণ করেন? আহা! মায়ের পাঁচ আঙুলে যে সমান বাঁধা! তুমি বড়, তোমার কর্ত্তব্য তোমার ছোট ভাইয়ের সাহায্য করা। তুমি ধনী, সুখী, সুস্থ; তোমার নির্ধন, দুঃখী, দুস্থ ভাইয়ের প্রতি একবার স্নেহচক্ষে তাকাও, তাহার দুঃখ দূর কর, ভ্রাতৃপ্রেমে প্রাণমন ভরপুর কর, দেখিবে মাও তোমার প্রতি স্নেহ-চক্ষে তাকাইবেন, তাঁহার সেই চাহনিতে তোমার শিরায় শিরায় প্রেম-পীযূষধারা প্রবাহিত হইবে; তোমার প্রাণের প্রতি পরদায় মোহনতান বাজিয়া উঠিবে,—তোমার হৃদয়ে অনলস্রোত প্রবাহিত হইবে। তুমি তখন করুণাময়ী মায়ের স্নেহক্রোড়ে স্থান পাইবে এবং মাতৃস্নেহে আপনা হারাইয়া ভববন্ধন মুক্ত হইবে,—এইরূপে সেবা সাধনার ফল লাভ হইবে!

যে ভাইকে জানিল না,—ভাইয়ের মরম-বেদনা বুঝিল না,—ভাইয়ের অনুসন্ধান করিল না,—ভাইকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিল না,—ভ্রাতৃস্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত হইল না, সে মাকে চিনিবে কিরূপে? তাহার মাতৃ-আবাহন বৃথা। তাহার সন্তান নাম মিথ্যা।

বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে কিরূপে দীন-দরিদ্রের দুঃখমোচন হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পূজার সময় নাচগানে বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া স্থানে স্থানে (অন্ততঃ যে সকল গ্রামে এইরূপ পূজার অনুষ্ঠান আছে) দীনদরিদ্র, রোগী ও অন্ধ, আতুর ও অসহায়ের সেবার বন্দোবস্ত হওয়া

উচিত। এই সেবাই ত প্রকৃত মায়ের সেবা হইবে। দরিদ্রনারায়ণের পূজাতেই মায়ের প্রকৃত পূজা হইবে। দুঃখহারিনী, দুর্গতিনাশিনীর পূজার এইরূপ ব্যবস্থা করিলে, এই উপাদানে বাস্তবিক দুর্গতি নাশ হইবে। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে,—"হা অন্ন, হা অন্ন" হাহাকারের দিনে,—দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্যের দিনে, আর কি নৃত্য গীত শোভা পায়? এ ঘোর দুর্দ্দিনে কি দেশের অবস্থা ভুলিয়া,—দীন-দুঃখীর কাতর ক্রন্দনে দৃকপাত না করিয়া আত্মসুখে ডুবিয়া থাকা কি আর শোভা পায়? ধর্ম্ম, দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় এবং সাধন-পদ্ধতিও তদনুরূপ হয়। এ কালে দীনের সেবা, আর্ত্তের পূজাই ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মা-চরণেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রীতি সম্পাদিত হইবে। এই বারোয়ারী উৎসব উপলক্ষে যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা হইতে পূজা ও ভোগের ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থে এই সেবার কাজ প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই অতি সহজে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যে পূজায় প্রাণ নাই, সে পূজায় কোন ফল হয় না, যে পূজান্তে প্রাণে জগদ্‌জীবের প্রতি ভালবাসা জাগিয়া না উঠে, সে পূজা পূজা-পদ বাচ্য নহে। যে পূজায় মায়ের প্রীতি লাভ হয় না, এরূপ পূজার আবশ্যকতা কি?

এই পূজায় যদি ধর্ম্ম লাভ না হয়, তবে ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম জগৎ জীবের সেবায়। ভগবান সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, প্রতি ঘটে শিবই জীবরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া নরনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই কালধর্ম্ম এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ।

আত্মসুখচিন্তা সে ত পশুরও আছে,—পশুও নিজের সুখের জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তবে আত্মসুখ-নিরত মানবে ও পশুতে পার্থক্য কি? পার্থক্য—জ্ঞানে। মানব জ্ঞাননয়নে ভগবানকে দেখিতে পায়, জীবে জীবে শিবের বিকাশ দেখিয়া মহাসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। তাই বলিতেছি, যদি শান্তি-সুখের অধিকারী হইতে চাও,—তবে পরার্থে আত্মত্যাগ করিয়া,—আত্মপ্রতিষ্ঠ হও। দেখিবে জগতের তৃপ্তিতে তোমার তৃপ্তি,—জগতের সুখে তোমার সুখের পর্য্যবসান হইবে। প্রাণে এত আনন্দের সঞ্চার হইবে, যাহা জীবনে কখনও অনুভব কর নাই। ক্রমে বুঝিবে জগৎকে সেবা করিয়াও নিজেরই সেবা করিতেছ। জগৎময় তুমি,—তোমাময় জগৎ হইবে। তোমার প্রাণপ্রভু তোমার হৃদয়ে, বাহিরে সদা বিরাজ করিবে। তখন সকল দুঃখের,—সকল যাতনার অবসান হইবে। সেবা সাধনার মধুময় ফল লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইবে!

অতএব দেখা যাইতেছে, কেবল মাত্র নিজ সুখ পিপাসার পরিতৃপ্তি ধর্ম্ম নহে। সর্ব্ব জীবে দয়ায়,—আর্ত্তের সেবায় যে পরমানন্দ তাহাই ধর্ম্ম এবং জীবমাত্রেই শিবজ্ঞান ধর্ম্ম সাধনার সুধাময় ফল।

দীন—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

—:০:—

ভক্ত কথামৃত।

[বৰ্দ্ধমান-মানকরের সিদ্ধভক্ত শ্রীল রাধামাধব দাস মহাশয়ের সদুক্তি সংগ্রহ]

প্রেমের সাধন।

"এ অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ—
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাহে ফলে প্রেম ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে বাঁচে জগজ্জন॥"

"শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

এই শ্লোকের ভাবার্থ—শাস্ত্রবিধি অবহেলাকারী, যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির যদি কোন প্রকারে প্রেম লাভ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার মূল্য না বুঝিতে পারিয়া অনাদর ও অবহেলা করে। অবশেষে উহাই তাহার উৎপাতের হেতু হয়। সর্পের মস্তকে মণি, গাভীতে গোরোচনা ঠিক এইরূপ।—শ্রুতি, স্মৃত্যাদির বিধি কিরূপ, তাহা শ্রীচৈতন্য--চরিতামৃতে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান কাম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কহে॥

চৈঃ চঃ মধ্য। ১৯শ

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"
"শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টাদিশতি ভবদারাধন বিধিঃ।
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী॥
পুরাণাদ্যা যেবা মহজ নিবহাস্তে তদনুগা।
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং॥

চৈঃ চঃ ২২শ পঃ।

শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ পঞ্চরাত্রের বিধিস্বরূপ একবাক্যে কলিকালে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া উচ্চ হরিনাম সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আলোচনা ও তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান কলিযুগের বিধিপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম। যাঁহারা এই শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের আজ্ঞা পালন করেন, তাঁহাদের সমস্ত বিধিই পালন করা হয়। যাহারা তাহা অবহেলাপূর্ব্বক অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সম্মত সত্য-ত্রেতাদির ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা প্রভুর নিকট অপরাধী। কলিকালে, স্মৃতির আচার রক্ষা কিছুতেই হইবে না; তজ্জন্যই ভগবান প্রেমদাতা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অবতার। যাহারা কলিযুগের অবতার স্বীকার করেন না, তাঁহারা গীতাও মানেন না; তাঁহাদের নিকট—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গীতার এ উক্তিও অর্থশূন্য এবং সমস্ত শাস্ত্রই অবহেলার সামগ্রী হইয়া পড়ে।

"সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু নাহি পায়"—
—শ্রুত্যাদি বিধির অনুবর্ত্তন না করিয়াও, যদি কোন মহন্তের কৃপায় সুদুর্লভা হরিভক্তি লাভই হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা শেষে কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, তদ্বিষয়ে— "শ্রীভক্তমাল" গ্রন্থে একটী উপাখ্যান লিখিত আছে, তাহা এই;—কাশীধামে শ্রীরামানন্দ স্বামী নামে এক মহান্ত বাস করিতেন। কোন কর্ম্মকার-গৃহস্থ তাঁহার প্রতিবেশী ছিল। এক দিন, একটা বিড়াল, স্বামীজির প্রসাদ, কর্ম্মকার

বধুর অন্নে মিশ্রিত করায় বৈষ্ণবপ্রসাদ-ভোজনে তাহার প্রেম উৎপন্ন হইল। কামারগণ ব্যাধি মনে করিয়া উহার নানারূপ চিকিৎসা করাইল; কিন্তু প্রেম ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রেম কোন প্রকারে নষ্ট হইবার দ্রব্য নহে—

"যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ।
বিয়োগ হইলে কভু না জিয়ায়"।

তখন কামারগণ রামানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্বামিজী কোন প্রকারে বুঝাইতে না পারিয়া, অবশেষে যাজক ব্রাহ্মণের গৃহে এক মুষ্টি অন্ন ভোজন করিতে আদেশ দিলেন। এই অন্ন ভক্ষণ করিবামাত্র প্রেম অন্তর্হিত হইল; এবং ইহাতে কর্ম্মকারগণের আনন্দের সীমা রহিল না।

মহান্তের কৃপায় অনায়াসলব্ধা ভক্তি আত্যন্তিকী হইয়াও, এইরূপ উৎপাতের কারণ হইল। তজ্জন্য, এই প্রেম লাভ করিতে হইলে, উপযুক্ত সাধন বা বিধির প্রয়োজন। অগ্রে তত্ত্বানুসন্ধান, পরে প্রেমলীলা-রস আস্বাদনের প্রয়াস; নতুবা কপট গুরুর আশ্রয়ে প্রতারিত হইতে হয়! আসুন প্রেম পিপাসুগণ, আমরা এই ভাবে প্রেমের সাধন করিতে অগ্রসর হই; তাহা না হইলে অধঃপতন ও অপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।"

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।
সোনামুখী, গরীব-ভাণ্ডার।

—————:0:—————

পূর্ব্বরাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কি জানি কি এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে কিশোরীর মনপ্রাণ কোথায় ভাসিয়া গেল; তিলমাত্রও প্রাণে সোয়াস্তি নাই, বসন ভূষণে দৃষ্টি নাই,—হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। নয়নে করুণ দৃষ্টি, মুখে অব্যক্ত যাতনার চিহ্ন,—সে অবস্থা দেখিলেই বোধ হয়, যেন কি এক অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়ায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! এক স্থানে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, আকুলি বিকুলি করিয়া একবার ঘরের ভিতরে যাইতেছেন, আবার বাহিরে আসিয়া যে কদম্ববন হইতে সে দিন বংশীধ্বনি আসিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল—সেই বনেরদিকে তাকাইয়া রহিতেছেন, আর কত কি ভাবিতেছেন,—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন,
কদম্বকাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হলো।
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥

সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বর নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূবালা।
কিবা অভিলাষে বাড়য়ে লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥

কিশোরী অন্তরের ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আহারে রুচি নাই, চাঁচর চিকুরদাম অযত্নে রুক্ষ হইয়া যাইতেছে; কমলিনীর কমলকোমল দেহলতা খানি শুকাইয়া যাইতেছে। নবজলধর দেখিলে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন, আবার আপন মনে কি বলেন। মেঘ দেখিয়া তাঁহার শ্যামরূপ মনে পড়িত,—আর শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছুটিয়া যাইত। ময়ূর দেখিলে শ্যামের চূড়ার কথা মনে করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকিতেন,—চোখের তারা স্থির, দেহ নিশ্চল ও স্পন্দরহিত হইত; প্রস্তর মূর্ত্তির মত শ্রীরাধা সেখানে দাড়াইয়া;—যেন তাঁহার মধ্যে প্রাণ নাই। দেহ আছে, দেহী নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান সে একের মাঝে লয় পাইয়াছে!

রাধার কি হলো অন্তরের ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়ে বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে,
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

এদিকে রাইয়ের এই শ্যাম-নবানুরাগের কথা অল্প দিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িল,—আর নগরময় নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। এসকল শুনিয়া ললিতা আসিয়া রাইয়ের নিকট তাঁহার গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনী যে লোকে জানিতে পারিয়াছে, আর কুলোকে যে নানা কুৎসাও রটাইতেছে, তাহা সকল বলিলেন। কিন্তু রাধা?—রাধা তো আর রাধাতে নাই। শ্যামরূপে তাঁহার কুল বল, মান বল, সকলি ত ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি যে শ্যামকাঙ্গালিনী, শ্যামই যে তাঁহার সর্ব্বস্ব—নিন্দা অপযশের কথা যে তাঁহার ভাবিবার অবসর নাই। শ্যামময় শ্রীরাধার কাছে আজ কি তাঁহার শ্যামসুন্দরের অনুরাগ অপেক্ষা কুল মানই বড় হইবে? তাই ললিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রাই বলিতেছেন—

"শ্যামরূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া
দুকুল ঠেলিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া অপযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি, কি আর লোকের ডর।
ও চাঁদ বয়ানে নয়ান ভুলল;
আর নাহি মনে লয়॥
অপযশ ঘোষণা থাক দেশে দেশে;
সে মোর চন্দন চুয়া।

শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসীদল দিয়া ॥
কিসের সরম, ঘর ব্যবহার
তিলেক না সহে গায়।
——এ তনু নিছিনু
শ্যামের রাঙ্গা পায় ॥”

ক্রমে শ্যামপ্রেমে শ্রীমতী উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। এতদিনের তীব্র আঘাতে আজ মনের সকল বাঁধনগুলিই ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাই আজ রাই বাঁধনহারা, পাগলপারা। যখনই নন্দনন্দন মদনমোহনের কথা মনে পড়িতেছে, তখনই ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর ন্যায় ধূলায় লুটাইতেছেন। আর যখনই বা বলি কেন? রাধা যে আজ জগৎ জুড়িয়া শ্যামের স্মৃতি ছড়ান দেখিতেছেন। মেঘ দেখিলে,—কোকিল দেখিলে,—তমাল দেখিলে,—কাল বরণ দেখিলেই যে তাঁহার কালবরণকে মনে পড়িতেছে—আর অমনি আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া লুটিতেছেন। সখিরা নিকটে গেলে তাহাদের হাত ধরিয়া রোদন করেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন না, কিন্তু মুখের ভাবে বোঝা যায়, যেন কি বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না;—সে অব্যক্ত, অসহনীয় যাতনার কথা যে প্রকাশ করিয়া বলিবেন, তাহার সে শক্তিও আজ লোপ পাইয়াছে। কে আজ কিশোরীর সে অনন্ত বেদনার পরিমাণ করিবে? কে সে “ব্যথিত বেদন” বুঝিতে পারিবে? রাইয়ের তনু তনুতর হইয়াছে; নিদাঘের আতপের ন্যায় নিদারুণ বিরহজ্বালা, আজ সে পুষ্পপেলব অঙ্গ হইতে সমস্ত লাবণ্যটুকু শোষণ করিয়া লইয়াছে—সে রুক্ষকেশা, ত্রস্তবাসা, বিবশা উন্মাদিনীকে দেখিয়া সখিরা শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু কত বড় দুঃখে, কত বড় জ্বালায় জ্বলিয়া যে এ স্বর্ণ কমলিনী আজ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারিলেন না। হৃদয়ে যে প্রীতির উৎস ছিল, পাষাণ চাপিয়া এতদিন শ্রীমতী তাহার উচ্ছ্বসিত জলরাশিকে কোন রকমে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—কিন্তু সে কোমল প্রাণ আর কতদিন তাহার সহিত যুঝিবে? তাই আজ সে উৎসের মুখ ছুটিয়া গিয়াছে,—আর সে প্রেমপ্লাবনে সহজ বুদ্ধিটুকু পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। আজ রাধা

আঁচরে মুখশশী গোই।
ঝর ঝর লোচনে রোই ॥
কারণ বিনু খেনে হসই
উতপত দীঘ নিশসই ॥
তাতল তনু নাহি ছুটই।
সতত মহীতলে লুটই ॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই ॥

আনন্দ চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা রাধার সে অবস্থা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। ধূলি-ধূসরিত গাত্র, কেশ রুক্ষ, দেহ শীর্ণ, কালা ভাবিতে ভাবিতে সোণার বরণ কাল হইয়া গিয়াছে—সে দশা দেখিলে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়?

প্রেমে রাই পাগল হইয়াছিলেন—সহজ জ্ঞান ছিল না, চেতনাটুকু তখনও ছিল—কানুর পীরিতি বুঝি আজ সেটুকুও ছিনাইয়া লইয়া যায়। কানুকে পাইবার আশায় রাই এক এক করিয়া সব ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তবু তাহাকে পান নাই। আজ শেষ দিন।

আজ রাইয়ের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে। বাহ্যজ্ঞান আদৌ নাই, নিকটে কেহ গেলে চিনিতে পারেন না, চক্ষুর তারা স্থির হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। রাই বুঝি আর বাঁচে না! সেই কবে যমুনাস্নানে যাইয়া কিশোরী শ্যামরূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই হইতে তাঁহার কি দিনই গিয়াছে! কতবার নিজের চিত্তপটে বঁধুর সহিত মিলনের ছবি আঁকিয়াছেন, হৃদয় আসনে তাঁহাকে বসাইয়া অশ্রুজলে তাঁহার অভিষেক করিয়াছেন, তাঁহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিনিদ্রনয়নে কত রজনী কাটাইয়া দিয়াছেন। তারপর বঁধুর অঙ্গসঙ্গ চাহিয়া, তাঁহার কোমল অঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে, দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, বঁধুর সন্ধানে মন দেহ ছাড়িয়া তাঁহারই আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সে কত কথা! সেই তীব্র উন্মাদনা, সেই সখীর কণ্ঠ ধরিয়া রোদন, সেই প্রিয়-চিন্তায় ইন্দ্রিয়-সত্ত্বার বিলোপ—সে কি দিনই গিয়াছে! কিন্তু কই, এত তপস্যাতেও শ্যাম আসিলেন কই? তাই বুঝি আজ শ্যাম-অনুরাগ-যজ্ঞে তাঁহার জীবন আহুতি দিতে হয়। না দিয়াই বা কি করিবেন? আশায় আশায় কতদিন চলিয়া গিয়াছে, আর কতদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবেন? ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। রাধার সে সীমা অতিক্রম হইয়া গিয়াছে। রাধা বলিয়াই এতদিন ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার প্রাণ শ্যামময় হইয়া গিয়াছে, কাল বরণ দেখিলেই কৃষ্ণের কথা মনে পড়িয়া যাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া প্রাণে দুঃসহ জ্বালাময় করিয়া তুলে, তিনি কি করিয়া শ্যামের সঙ্গসুখ ব্যতীত বাঁচিতে পারেন? যত প্রকার উপায়ে শ্যামকে পাওয়া যাইতে পারে, রাই প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ্বাস হইয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশপ্রাণে মরণের কোলে বসিয়াছেন!

রাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ললিতা ভীতা হইয়া অন্যান্য সখিগণের নিকট যাইয়া বলিতেছেন—

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুনঃ ॥
না বাঁধে চিকুর না পড়ে চীর।
না খায় আহার, না পিয়ে নীর ॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি নাইরে সুধি ॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তাহারি নাম ॥
না চিনে মানুষ, নিমিখ নাই ॥
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।
তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে ॥
আছয়ে শ্বাস, না রহে জীব।
বিলম্ব না কর, আমার দিব ॥

পূর্ব্বরাগের দশ অবস্থার এই শেষ অবস্থা। এই শেষ অবস্থার নাম মৃত্যু। তবে কি রাধার মৃত্যুই অনিবার্য্য? যাঁহারা দিবানিশি কৃষ্ণচিন্তা করেন, যাঁহারা অনুক্ষণ তাঁহার নাম জপ করেন, তাঁহাদের পরিণাম কি মৃত্যু? শ্রীকৃষ্ণ না আনন্দরসৈক-নিলয়! যাঁহার স্মরণে আনন্দ, যাঁহার নামে আনন্দ

যাঁহার ধ্যানে আনন্দ, যাঁহার গুণগানে আনন্দ! তবে তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার নামে রাধার এ অবস্থা কেন?

যে বস্তু যত বড়, সে বস্তু পাইতে তত কষ্ট এবং তত বেগ পাইতে হয়। আর যে বস্তু যত কষ্ট করিয়া লাভ করা যায়, সে বস্তু তত প্রীতিকর হইয়া থাকে; এবং তাহার আদরও বহুদিন থাকে। রাইয়ের পূর্ব্বরাগের সূচনা হইতে হইতেই যদি দুই এক দিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেন, তাহা হইলে হয়তঃ, দুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ আর তত "অসেচনক" থাকিতেন না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, অনায়াসলব্ধ সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় দুই দিনের মধ্যেই বাসী ফুলের মত ঝরিয়া পড়ে। তাহাদের প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইতেও দুইদিন, ছিন্ন হইতেও দুই দিন। শ্রীরাধা এত কষ্টের পর শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে দিন দিন প্রীতিকর হইতে প্রীতিকর হইয়াছিলেন। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—

জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
* * *
শ্যাম সুন্দর প্রাণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার।
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম সাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনুমন, ভজন পূজন,
শ্যামদাসী হল রাধা॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতিকুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

পূর্ব্বরাগের পর "মিলন"; এত কষ্টের পর শ্রীরাধা শ্যামসঙ্গলাভে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে এবং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি রসিক কবিদিগের পদাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সময়ান্তরে আমাদের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের "মিলন" বা "রাস" এই অংশ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কিনা তাহা ইচ্ছাময়ই জানেন।

ভক্তের কিরূপ অবস্থা হইলে ভগবান্ লাভ হয়, তাহা শ্রীরাধার দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝা যাইতে পারে। ভক্তের যখন শ্রীরাধার ন্যায় ভগবানের জন্য উৎকণ্ঠা জন্মিবে, যখন আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, ধ্যানে জ্ঞানে, সেই এক মনোচোরা হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করিবেন, "আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি" এই অবস্থা হইবে,—যখন তাঁহার জন্য প্রাণ উন্মত্ত পাগল হইবে,—যখন কেবল সেই জীবনবল্লভ ব্যতীত জগতের যাবতীয় বস্তুই কণ্টকের মত বোধ হইবে,—অন্য বস্তুর ছায়াস্পর্শে বিষের ন্যায় শরীর জ্বলিয়া যাইবে,—যখন শ্রীরাধার ন্যায় প্রাণ যায় যায় হইবে, তখনই তাঁহার ভগবান লাভের সময় আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সময়ে ভক্তের ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগিবে না; তখন শরদিন্দুর মৃদুস্নিগ্ধ কিরণে উষ্ণতা বোধ হইবে, বসন্তের

মলয় হিল্লোলেও শরীর পুড়িয়া যাইবে, কুসুমসুষমাও প্রাণে জ্বালা বৃদ্ধি করিবে। ভক্তের যখন এইরূপ অ গাময় অবস্থা হয়, তখনই ভগবান ভক্তের হৃদয়-নিকুঞ্জের কদম্ববৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া রাধা নামে সাধা বাঁশীর মোহনতানে তাঁহার মন প্রাণ হরণ করিয়া লন। ভক্ত এই সময়ে বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া মিলনানন্দে আত্মহারা হইয়া যান। প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দরকে পাইতে হইলে শ্রীরাধার ন্যায় কুলশীলে জলাঞ্জলি দিয়া, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া প্রাণের টানে, স্রোতের তৃণের ন্যায় প্রেমময়ের প্রেম-পারাবারে ভাসিতে হয়। প্রাণের ঠাকুরকে প্রাণ না দিতে পারিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই রাগের ভজন ব্যতীত বৈধীমার্গের ভজনে প্রেমময় দূরে থাকেন। ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য পাগল, ভগবানও তেমন ভক্তের জন্য পাগল, অর্থাৎ শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাগলিনী হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার জন্য তেমনই পাগল হইয়াছিলেন। বারান্তরে সে বিষয়ের (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের) আলোচনা করিবার আশা রহিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই,—এই দীনহীন অকিঞ্চনের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারহস্য বর্ণনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তবে এই মাত্র ভরসা যে, ভগবত্তত্ত্ব বা তাঁহার লীলারহস্য যে ভাবে যতটুকু আলোচনা করা যাউক না কেন, তাহাতেই কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে ভগবান ও তাঁহার চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা শ্রীরাধার ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণপঙ্কজে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম। ওঁ হরি ওঁ।

দীন—প্রেমানন্দ।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী।

ঝিঁঝিট (৮) একতালা।

নমস্তে গোপাল, শ্রীনন্দদুলাল, ভকতবৎসল মুকুন্দমুরারী ॥
নমো নারায়ণ, পতিতপাবন, রাধিকারমণ রাসবিহারী ॥
দেবকীনন্দন শ্রীমধুসূদন,
যশোদাজীবন গোপিকারঞ্জন,
রাখালপরাণ গোধনচারণ, করুণানিধান নিকুঞ্জবিহারী ॥
আদি অন্তহীন নিত্যনিরঞ্জন,
পুরুষপ্রধান শ্যাম-নবঘন,
জগতজীবন অনাথশরণ, ভুবনমোহন মুরলীধারী ॥
কালীয়দমন পুতনাঘাতন,
কংসবিমর্দ্দন ত্রিলোকপালন,

জয় জনার্দ্দন লজ্জানিবারণ, জয় শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী ॥
জয় বিশ্বেশ্বর প্রেমপারাবার,
জয় পরাৎপর সর্ব্ব-সুখাধার,
সত্য সনাতন পরম-কারণ, চিদানন্দ-ঘন যমুনাবিহারী ॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
অচ্যুত কেশব গৌরাঙ্গসুন্দর,
তুমি নিরাকার অনন্ত আকার, সকলি তোমার বিভূতি হরি ॥
তুমি ইন্দ্র চন্দ্র তপন বরুণ,
তুমি আত্মা মন আকাশ পবন,
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর, তুমি সর্ব্বব্যাপ্ত বিশ্বরূপে হরি ॥
জয় যদুপতি শ্রীনাথ শ্রীপতি
জয় রমাপতি জয় পশুপতি
জয় সীতাপতি অগতির গতি, রাম রঘুপতি নররূপধারী ॥
ধরে মৎসরূপ বেদের উদ্ধার,
কূর্ম্ম দেহে ধর পৃথিবীর ভার,
বরাহ ধারণে ধরণী দশনে, নরসিংহ কায়ে দানবসংহারী ॥
বামন হইয়ে বলিরে ছলিলে,
ভৃগুপতি হয়ে ক্ষত্রিয় নাশিলে,
রামরূপ ধরে রাবণে নাশিলে, আবার হইলে রাম হলধারী ॥
বুদ্ধরূপী হয়ে অহিংসা স্থাপিলে,
ম্লেচ্ছ বিনাশনে কল্কী রূপী বলে,
অনন্ত রূপেতে খেল ঘটে ঘটে, কি বুঝিব আমি মহিমা তোমারি ॥
বঙ্কিম নয়ন হসিত বদন,
মালিকা-ভূষণ হে পীতবসন,
নূপুরক্রন্দন মদনমোহন, বিশ্ব বিমোহিত ও রূপ নেহারি ॥
দীন যোগেনের এই আকিঞ্চন,
ওহে আদিদেব ব্রহ্ম সনাতন,
ত্যজি ভেদজ্ঞান লভি তব প্রেম, মিশে যেন যাই চরণে তোমারি ॥

—:০:—

দেবর্ষি নারদ ও দুর্ব্বাসা ।

হিন্দুমাত্রের নিকটই দেবর্ষি নারদ ও দুর্ব্বাসা বিশেষরূপে পরিচিত। কেননা পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়,—যেখানে ঢেকী আরোহণে নারদ উপস্থিত, তথায় একটা কলহ বিবাদ না হইয়া যায় না; অথবা যেখানে কলহ অবশ্যম্ভাবী, নারদ তথায় বিনা আহ্বানেই উপস্থিত; যেন কলহই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তাই নারদের নাম "কোন্দলে" ঋষি। আবার দুর্ব্বাসার পক্ষেও সেই একই অভিযোগ; কাহাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিতে হইবে,—কাহাকে রাজসিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া পথের ভিখারী করিতে হইবে,—অথবা কাহাকে দেব, গন্ধর্ব্ব বা যক্ষযোনি হইতে মানবেতর পশুযোনিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে, তখনই দেব-নরের ত্রাসোৎপাদনকারী, জ্বলন্ত ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা ঋষি উপস্থিত; যেন কলহ বাধাইয়া আমোদ উপভোগ করা, বা শাপ দিয়া ভস্মীভূত করিয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়াই নারদ বা দুর্ব্বাসা ঋষির জপ, তপ ও সাধনা। এ জগতে সকলেই পরের উপকার করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কেহ পরের উপকার করা দূরে থাকুক, পরের অনিষ্ট চিন্তাই যেন তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় জড়িত; তাই অযাচিতভাবে,—অসময়ে এ দুজনার একজনকে উপস্থিত দেখিলেই মানুষ ত মানুষ,—দেবতাদিগেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। তাহাদের মনে হইত, আজ কি অশুভ ক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল,—না জানি কোন বিপদই বা উপস্থিত হয়। আর সত্য সত্যই সেদিন একটা কিছু না হইয়া যাইত না। সেজন্য নারদ কি দুর্ব্বাসাকে দেখিলে, সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের চিত্তবিনোদনে ব্যস্ত হইতেন; কিন্তু তা'হলে কি হয়,—"ভবী কিছুতেই ভুলবার নয়"। তাঁরা তাঁহাদের কাজ অবশ্যই করিবেন। একটা না একটা ত্রুটী ধরিয়া, হয় কলহই বাধাইয়া দিলেন, অথবা একটা শাপ প্রদান করতঃ অদৃশ্য হইলেন। এ দুজনার প্রত্যেকের সম্বন্ধে দু'একটী পৌরাণিক ঘটনা উল্লেখ করতঃ এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রজাপতি দক্ষ দেবসমাজে জামাতা শিবের নিকট বড়ই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন; কেননা শিব জামাতা হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে শ্বশুরের নিকট শির অবনত করেন নাই,—তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করেন নাই। আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত দক্ষ এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক হইয়া শিবহীন যজ্ঞের সূত্রপাত করিলেন। ত্রিলোকবাসীর নিমন্ত্রন হইবে,—কিন্তু শিবের নিমন্ত্রন হইবে না। কামচারী নারদের উপরই নিমন্ত্রনের ভার পড়িল, এবং তাহাকে কৈলাসে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। অনেকে হয়তঃ এমনতর লোক দেখিয়াছেন যে, তাহাকে যে কাজ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়, সে সেই কাজটাই আগে করিবে। দেবর্ষি নারদও ঠিক সেই গোছের ঋষি ছিলেন। যখন তাহাকে কৈলাসে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, তখন তথায়ই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে

যাইতে হইবে। দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে বীণা বাজাইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং শিবকে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ প্রদান করিলেন। শিব নারদকে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ সতীর নিকট জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু নারদ কি তাহা না করিয়া পারেন? ফলে এই হইল যে, সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ নাশ ও দক্ষের ছাগমুণ্ড প্রাপ্তি।

আবার পারিজাতহরণের কথটা মনে করিয়া দেখুন,—দেবর্ষি নারদ কি কাণ্ডটাই না বাধাইয়া ছিলেন। পারিজাতের জন্য ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়া পরিণামে যুদ্ধে গিয়া গড়াইল।

শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যা। সরলা বালিকা কিছুই জানে না,—কিছুই বুঝে না। ঘটনাচক্রে মৃগয়াব্যপদেশে চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলার উপর আশ্রমের অতিথিসৎকারের ভার দিয়া কণ্বমুনি স্থানান্তরে গিয়াছেন। শকুন্তলা সাধ্যানুসারে রাজার আতিথ্যসৎকার করিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন শকুন্তলা সহবাসে কালযাপন করতঃ রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি আসিবার কালে শকুন্তলাকে বলিয়া আসিলেন যে, রাজধানীতে পঁহুছিয়াই রাজোচিত সম্মানে তাহাকে রাজধানীতে যাওয়ার জন্য বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিবেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, দুষ্মন্তের কোন সংবাদ নাই, কিম্বা শকুন্তলার রাজপুরী গমনের ব্যবস্থা করিতে রাজধানী হইতে কেহ আসিল না। শকুন্তলা দুষ্মন্ত-চিন্তায় দিন দিন কৃশা হইতে লাগিলেন। তাহার আর সে লাবণ্য নাই;—সে বালিকাসুলভ চপলতা নাই,—অধরে আর সে মধুর হাসি নাই। শকুন্তলা যে মৃগশিশুগুলিকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া কত আমোদ উপভোগ করিতেন, শকুন্তলা স্বহস্তে মুখে তুলিয়া না দিলে যাহারা খাইত না,—যাহাদিগকে এক দিন খাইতে দিতে না পারিলে শকুন্তলার কত যাতনা হইত,—এখন তাহাদের প্রতি শকুন্তলার সে যত্ন নাই, শকুন্তলা ভুলেও চক্ষু তুলিয়া তাহাদিগের প্রতি ফিরিয়া চাহেন না। ফুলের গাছ,—লতাবল্লরী অযত্নে, জলাভাবে শুখাইয়া যাইতে লাগিল, শকুন্তলার সেদিকে দৃষ্টি নাই, শকুন্তলা সদাই যেন অন্যমনা, বিষাদমগ্না। তিনি দুষ্মন্ত-চিন্তায় সব ভুলিয়া গিয়াছেন। একদিন কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসা ঋষি অতিথিরূপে কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন; কিন্তু অতিথি-সৎকার কে করে? আর কেই বা তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করে? শকুন্তলা ত আর এখন কণ্বের আশ্রিতা নহেন,—তিনি এখন মহারাজা দুষ্মন্তের পত্নী,—পতি-চিন্তায় বিভোরা। দুর্ব্বাসা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি শকুন্তলাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, "তুমি যাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া অতিথি-সৎকারে বিমুখ হইলে, সে তোমাকে চিনিতে পারিবে না।" শকুন্তলার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই,— তিনি পাষাণবৎ নিশ্চেষ্টা,—দুষ্মন্ত চিন্তায় এতই আত্মহারা যে দুর্ব্বাসার সে বজ্রগম্ভীর অভিশাপ বাক্য তাহার শ্রবণ-

বিবরে প্রবেশ করিল না। শকুন্তলার সখিগণ প্রমাদ গণিলেন। তাহারা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া শাপ বিমোচনের প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা, "অভিজ্ঞান প্রদর্শনে," শাপ বিমোচন হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা শাপ প্রদান বা শাপ বিমোচন সম্বন্ধে কিছুই জানিলেন না।

বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষ সস্ত্রীক একবৎসর যাবৎ একাদশীর ব্রত করিয়া আসিতেছেন; অদ্য ব্রত উদযাপনের দিন—দ্বাদশীর মধ্যে পারণ করিতে হইবে। সমস্তই প্রস্তুত, রাজা পারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে ভোজন করাও, আমি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আসিতেছি, তুমি আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করাও,"—এই বলিয়া দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলেন। এদিকে দ্বাদশী অতীত হইয়া যায়, পারণ না করিলে ব্রত নিষ্ফল হয়, অন্যদিকে অতিথিসৎকার না করিয়া আহার করিলে মহা প্রত্যবায় হইবে। রাজা প্রমাদ গণিলেন; রাজ-পরিবারের সকলেই মহা চিন্তিত হইলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আজ কি অনর্থই ঘটিবে। আর সময় নাই, এদিকে দুর্ব্বাসাও আসিতেছেন না; অগত্যা রাজপণ্ডিতগণ এই ব্যবস্থা প্রদান করিলেন যে, কুশাগ্রে একবিন্দু জল গ্রহণ করতঃ পারণ রক্ষা করা হউক। গত্যন্তর না দেখিয়া বিষ্ণুভক্ত রাজা যেইমাত্র জলবিন্দু গ্রহণ করিলেন, আর যাও কোথা;—অমনি ক্রোধের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। মুনিবর ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন; সকলেই মুনিবরকে কত বুঝাইলেন, রাজাই বা অন্যায় স্বীকার করতঃ কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন;—কিন্তু কিছুতেই দুর্ব্বাসার ক্রোধের শান্তি হইল না। দুর্ব্বাসা রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ভগবান চিরকালই ভক্তাধীন; সুতরাং দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাজার কোন বিপদ হইল না, পক্ষান্তরে দুর্ব্বাসাই বিপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক, শিব-লোক প্রভৃতি পরিভ্রমন করিলেন; কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। পরিশেষে ভগবদাদেশে রাজা অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিপদমুক্ত হইয়াছিলেন।

আর একটি ঘটনা শুনুন, সেখানে একাকী নারদ কিম্বা একাকী দুর্ব্বাসা নহেন। তথায় উভয়েই উপস্থিত। সোণা আগুনের তাপেই গলিয়া থাকে, যদি তাহাতে সোহাগার যোগ হয়, তবে ত কথাই নাই। এখানেও যে তাই, মণিকাঞ্চনের যোগ; সুতরাং সে ঘটনা কতদূর গড়াইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

একদিন দুর্ব্বাসা ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্রসভায় উপস্থিত; দেবসভায় ঘৃতাচী, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্যতৎপরা। দেবরাজ ইন্দ্র মুনিবর দুর্ব্বাসার চিত্তবিনোদনার্থে উর্ব্বশীকে নৃত্যক্রিয়া প্রদর্শন করিতে আদেশ করিলেন। কদাকার বৃদ্ধ দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া চিরযৌবনসম্পন্না, সুন্দরী উর্ব্বশীর অহঙ্কার উদ্রেক হইল। দুর্ব্বাসা তাহা জানিতে পারিলেন। কেননা তখনকার ব্রহ্মবিৎ মুনি

ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। দুর্ব্বাসা ক্রোধপরায়ণ হইয়া উর্ব্বশীকে এই অভিশাপ দিলেন যে, "তুই নরলোকে দিবাভাগে ঘোটকী ও রাত্রিতে নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়া অনুশোচনা করতঃ কৃত পাপের ফলভোগ করিবি," ঋষিবাক্য অলঙ্ঘ্য; কাজেই উর্ব্বশী ভীতিবিহ্বলচিত্তে কাতর বচনে শাপ বিমোচনের প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে মুনিঋষিগণ যেমন সহজেই ক্রুদ্ধ হইতেন, আবার অতি অল্পেই শান্তি মূর্ত্তি অবলম্বন করিতেন। "অষ্টবজ্র মিলনে" শাপ বিমোচন হইবে বলিয়া দুর্ব্বাসা ইন্দ্রপুরী ত্যাগ করিলেন।

শাপভ্রষ্টা উর্ব্বশী দিবাভাগে ঘোটকীবেশে বনে বনে ভ্রমন করেন, আবার রজনীতে নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়া অশ্রুবদনে বিলাপ করতঃ নিশাযাপন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে এক দিন দণ্ডীরাজা সেইবনে উপস্থিত হইলেন, এবং অপূর্ব্ব সুন্দরী ঘোটকী দেখিয়া তাঁহার বড়ই লোভ হইল। তিনি ঘোটকী লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। দুর্ব্বাসার বাক্যানুযায়ী ঘোটকী রজনীযোগে উর্ব্বশীর দেহ ধারণ করিত। রাজা দণ্ডী উর্ব্বশীকে নিয়া মহোল্লাসে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

রাজা দণ্ডী অপূর্ব্ব ঘোটকী লইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছেন,—ইহা কি নারদের সহ্য হইতে পারে? একটা ত কিছু করা চাই! তা না হ'লে সে "কোন্দলে" নাম বিফল হইয়া যায়। কালবিলম্ব না করতঃ নারদ ঢেঁকী আরোহণে দ্বারকাধামে উপস্থিত হইয়া দণ্ডী রাজার অপূর্ব্ব ঘোটকীপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন; এবং তাঁহাকে আরও বলিলেন যে, এ ঘোটকী আপনাকে শোভা পায়;—দণ্ডী ইহার যোগ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ নারদকেই দূতরূপে অবন্তীনগরে দণ্ডীরাজার নিকট প্রেরণ করতঃ ঘোটকী চাহিয়া পাঠাইলেন; এবং আরও বলিয়াদিলেন যে, যদি সে স্বেচ্ছায় ঘোটকী না দেয়, তবে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিবেন। দণ্ডীরাজা ঘোটকী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না; অগত্যা শ্রীকৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া ঘোটকী সহ পলায়ন করিলেন। রাজা দণ্ডী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সকলেই বিপন্ন দণ্ডীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দণ্ডী অনন্যোপায় হইয়া ঘোটকীসহ গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে অর্জ্জুনপত্নী, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাদেবী তথায় উপস্থিত হইলেন। পরদুঃখকাতরা সুভদ্রাদেবী ভ্রাতার সহিত কলহ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও বিপন্নকে আশ্রয় প্রদান করতঃ উদার হৃদয়ের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। ইহার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে; শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবন সহ তাঁহার আশ্রিত; রক্ষিত ও ভক্ত পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এইত গেল মোটামোটি কথা; সত্যই কি নারদ ও দুর্ব্বাসার চরিত্র এত হেয়,—এত ঘৃণ্য ও এত কদর্য্য ছিল? পরের অপকার করা,—পরের অনিষ্ট চিন্তা করা,—শান্তির সংসারে অশান্তির দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া,—রাজচক্রবর্ত্তীকে পথের ভিখারী করা,—পরম মিত্রের সঙ্গে বিবাদ সংঘটন করা,—পতিপ্রাণা সতীকে পতির বুক হইতে

কাড়িয়া নিয়া বিরহানলে দগ্ধ করাই কি তাঁহাদের সাধন ভজন ছিল? যে নারদ মায়ামোহের পাশচ্ছেদন করতঃ হরিগুণ গানে জগৎ ভুলিয়াছিলেন,—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলেন,—যিনি ভগবানের পরম-ভক্ত,—যিনি ভক্ত, সত্ত্বগুণে পূর্ণ, সদা ভগবৎ প্রেমে বিভোর,—যিনি ত্যাগ বৈরাগ্যে দেবতা-দিগের আদর্শ বলিয়া "দেবর্ষি" আখ্যা পাইয়াছিলেন, তাঁহার কি এই কাজ? আর যে দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিলোকের হিতার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্মশান আপন আবাস ভূমি করিয়াছেন,—ছাই অঙ্গের ভূষণ,—ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধেয় বসন এবং অমৃতের পরিবর্ত্তে সমুদ্রমন্থনোত্থিত হলাহল পান করতঃ নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছেন,—যিনি মণি-হারের বদলে ফণিহার গলায় দুলাইয়া ববম্ ববম্ রবে গাল বাদ্য করতঃ আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রকৃতিসতীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন,—জীবের পরম হিতৈষী সেই শিব-অংশে যাহার জন্ম,—মহাদেব যাঁহাকে আপনার সমকক্ষ জানিয়া মরুত্ত রাজার যজ্ঞ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন—সেই শিবতুল্য ঋষি দুর্ব্বাসা কি ক্রোধী, জীবের অহিতকারী? তা কখনই হইতে পারে না। দেবতা-ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী। যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেই সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইতে পারিতেন,—যে ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়কে ধরণী দান করতঃ নিজে চীরবল্কল-ধারী, ফলমূলাহারী ও বৃক্ষতলবাসী হইয়া জীবের উপকারার্থে আত্মত্যাগের স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন,—যে ব্রাহ্মণ অনিত্য ধনসম্পদ পরিত্যাগ করতঃ জীবকে নিত্যধনে ধনী করিবার ইচ্ছায় ভগবদুদ্দেশে কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা করিয়াছিলেন,—যাহাদের তপঃপ্রভাবে এত অত্যাচার সত্ত্বেও আজ ধরাধাম হইতে হিন্দুনাম বিলুপ্ত হয় নাই,—যাঁহাদের সাধনবলে হিন্দু আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছে,—যাঁহাদের তপোবলে আজ আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছি, সেই ব্রাহ্মণ না কি পরশ্রীকাতর,—পর-ছিদ্রান্বেষী,—পরের অনিষ্ট-কারী?

আমরা অদূরদর্শী, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব; আপ-নাকে চিনি না,—দেবচরিত্র, ঋষিচরিত্র বুঝিব কিরূপে? আপন ছাঁচে জগৎ গড়াইতে চাই, কাজেই আমরা শিব গড়াইতে বাঁদর গড়াইয়া বসি। আমার মত সবাইকে দেখিয়া থাকি; তাই নারদের চরিত্র, দুর্ব্বাসার চরিত্র আমা-দের নিকট হেয়, ঘৃণ্য। নারদ কি দুর্ব্বা-সার নাম শুনিলেই সরল নাসিকাটী কুঞ্চিত করিয়া বিজ্ঞের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনী-গুলির প্রত্যেকটীর মূলে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে; একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই অতি সহজেই বোধগম্য হইবে।

যদি দক্ষযজ্ঞ-সংবাদ কৈলাসে না পঁহুছিত, তবে সতীর আদর্শ সতী-চরিত্র লোক লোচ-নের গোচরীভূত হইত না—সতীর মর্য্যাদা কেহ বুঝিত না,—কেহ সতীকে চিনিত না;—দক্ষ-যজ্ঞ নাশ না হইলে সত্যের রাজ্যে,—স্বার্থের রাজ্যে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইত; তাই নারদের কৈলাসে গমন। আবার পারিজাত হরণের অব্যবহিত পরেই সত্যভামার ব্রতোদযাপন। তদ্বারা দেবর্ষি নারদ

দেখাইয়াছিলেন,—নাম, নামী অভেদ। নামী হইতে নামের মাহাত্ম্য অধিক। নামী যাহা করিতে অক্ষম, নামের গুণে তাহা সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তৌলযজ্ঞে আরও দেখা যায় যে,—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী সত্যভামা বড়ই অহঙ্কারিণী ও অভিমানিনী ছিলেন; বিশেষতঃ জগদারাধ্য যোগিজনদুর্লভ জগৎস্বামীকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আত্মাভিমান আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—তিনি বড়ই পতিসোহাগিনী, পতি তাঁহার হাতের পুতুল। এখানেই তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন; তাই রমণীর এক মাত্র আরাধ্য পতি—যিনি রমণীর নিকট জগতে অতুলনীয়, সত্যভামা তাঁহাকে (জগৎপতিকে) তুচ্ছ, অনিত্য ধন-রত্নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। এখানে নারদ এই দেখাইয়াছিলেন যে, যতই ভগবানের প্রিয় হও না কেন—তিনি ন্যায়পরায়ণ; অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন না—সুতরাং তাঁহাকে কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া সত্যভামার দর্পচূর্ণ করিতে হইয়াছিল।

"অজনাভ", যে রাজা ভরতের নামে "ভারতবর্ষ" নামে বিখ্যাত হইয়াছে, শকুন্তলা তাঁহারই গর্ভধারিণী। আত্মসুখরতা, কর্ত্তব্যভ্রষ্টা, কামুকী রমণী কখনই ভরতের ন্যায় যোগ্য পুত্র গর্ভে ধারণ করিতে পারেন না। যদি ক্ষেত্র উর্ব্বরা না হয়, তবে তাহাতে সুফল লাভের আশা, বিড়ম্বনা বই কিছুই নয়। কামই প্রেমের রূপান্তর মাত্র;—যখন কাম আত্মসুখে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া ভগবদর্থে প্রয়োজিত হয়, তখনই প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। স্বর্ণ না পুড়াইলে তাহার উজ্জলতা লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না,—কাদা না ধুইলে লৌহ চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় না। শকুন্তলা আদর্শ রমণী ছিলেন,—ভরতের যোগ্যা জননী ছিলেন; তাই তাঁহার স্বরূপত্ব বিকাশের জন্য তাঁহার উপর দুর্ব্বাসার ক্রোধরূপ বিধাতার অমোঘ বজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে বিরহানলে পুড়াইয়া,—অশ্রুজলে তাঁহার হৃদয়ের পঙ্কিলতা, আবিলতা ধুয়াইয়া—তাঁহাকে প্রেমিকা সাজাইয়া জগতের সম্মুখে তাঁহার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

রাজা অম্বরীষের ঘটনা হইতে এই দেখা যায় যে, তুমি যতই ধার্ম্মিক হও না কেন,—যতই জ্ঞানী বা ভক্ত হও না, কেন পরীক্ষায় না পড়িলে তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না—জগৎ তাহা জানিতে পারে না; কিম্বা তোমার আদর্শ চরিত্র সমাজ-শিক্ষার, লোক-শিক্ষার সহায়ক হয় না;—তাই দুর্ব্বাসা নিজে বিপন্ন হইয়া ভক্ত অম্বরীষের চরিত্র জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করতঃ তাঁহারই (অম্বরীষের) মত ভগবন্নির্ভরশীল হইতে জগৎকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় দুর্ব্বাসা আরও দেখাইয়াছিলেন যে, ভক্ত ভগবানের কত প্রিয়,—কত আদরের জিনিষ।

আর দুর্ব্বাসা নারদের মণি-কাঞ্চ-যোগে সত্য সত্যই একটা বিশেষ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, পাণ্ডবদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, তাঁহাদের বীরত্ব, ধর্ম্মশীলতা, ভগবন্নির্ভরতা লোকসমাজে প্রকাশ করিবার জন্য;—ত্রিলোকে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপনের জন্যই অষ্টবজ্রের মিলন হইয়াছিল, ইহাতে আরও দেখা যায়—যে ভগবান লোক বাক্যের বশীভূত নহেন, কিম্বা তিনি আত্মীয়তা কুটুম্বিতার

ধার-ধারেন না। যিনি কর্ত্তব্যে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন—কর্ত্তব্য পালনে অম্লানবদনে প্রাণ-প্রিয় পুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, "ভগবান তাঁরই"। সুভদ্রা ও পাণ্ডব-দিগের এই বিশেষত্বটুকু দেখাইবার জন্যই দুর্ব্বাসার অভিশাপ ও নারদের দৌত্যকার্য্য।

বিশ্বামিত্র ও হরিশ্চন্দ্র-প্রসঙ্গেও আমরা এই একই শিক্ষা পাইয়া থাকি। এখানেও হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার চরিত্র জগৎবাসিকে জানাইবার জন্য, বিশ্বামিত্র ত্যাগী হইয়াও বমনকারীর পুনঃ বমন ভোজনের ন্যায় হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কতই না কষ্ট, কতই না অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন।

তবেই দেখা গেল যে, পূর্ব্বকালে যে মুনি ঋষিগণ কথায় কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিতেন তাহা নিরর্থক নহে—জীবের ভাবী মঙ্গলোদ্দেশ্যেই এসব কার্য্য সংঘটিত হইত; জীবের অনিষ্ট সাধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিষীভূত হইত না। যে ভাবেই হউক, জীবের উন্নতিসাধন—জীবকে প্রকৃত পথে পরিচালনোদ্দেশ্যেই তাঁহাদের ইচ্ছা বা চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হইত। মুনি ঋষি, সাধু, মহাপুরুষগণ এক ভগবান ব্যতীত আপনার বলিয়া কিছু রাখেন নাই, তাঁহাদের জীবন ভগবদর্থে উৎসর্গীকৃত; সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য,—তাঁহাদের ইচ্ছা,—এমন কি তাঁহাদের একটী শ্বাস পর্য্যন্ত জগতের হিতার্থে,—জীবের কল্যাণার্থে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা ভ্রান্ত জীবের হিতৈষী,—জীবের মঙ্গল কামনাই তাঁহাদের একমাত্র জীবনের ব্রত; তাই তাঁহারা খাটী জিনিষ পাইলেই, তাহা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে যতই কষ্ট, নিন্দা, গঞ্জনা বা লাঞ্ছনা উপভোগ করিতে হউক না কেন,—অম্লানবদনে সে কষ্ট, নিন্দা গঞ্জনার বোঝা শির পাতিয়া গ্রহণ করতঃ হাসিমুখে সত্য জিনিষ—খাটী জিনিষ সন্তান-তুল্য মোহান্ধ জীবের হাতে তুলিয়া দিয়া, তাহাদিগকে সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম পথে চলিতে ইঙ্গিত করিতেন; এই তাহাদের অপরাধ। তাই দুর্ব্বাসা, নারদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষি ও সাধু মহাপুরুষগণ নিন্দিত। সাধারণ চক্ষে দেখা যায়, পিতামাতা সন্তানকে,—শিক্ষক ছাত্রকে, চিকিৎসক রোগীকে,—গুরু শিষ্যকে বড়ই নিগৃহীত করিতেছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কি ঠিক? পিতা মাতা, শিক্ষক, চিকিৎসক ও গুরুর ইচ্ছা কখনও এরূপ নয় যে, তাঁহারা অকারণে কাহাকে পীড়ন করেন। তাঁহারা অন্যায়ের শাস্তা মাত্র। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়া থাকেন, তাহা সন্তান, ছাত্র, রোগী বা শিষ্যের ভাবী মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন।

দীন—উমেশচন্দ্র।

---:0:---

শ্রীগৌরাঙ্গ।

(১)

মোর হৃদি সরোবরে গোরা প্রফুল্লকমল।
নবনী-কোমল তনু করে প্রেমে টল মল॥
নয়নকমলযুগ করে প্রেমে চল চল।
করুণায় দুনয়নে বহে সদা অশ্রুজল॥
চরণকমলযুগে লুটাই দিবস যামী।
দীনভাবে দীনবেশে গৌরাঙ্গ জগৎস্বামী॥

(২)

জীব দুঃখে দুঃখী হয়ে চিন্তি কে গো দিবানিশি
"কেমনে অধম জীবে পাইবে গোকুল-শশী।"
আপনি করিয়ে কর্ম্ম শিখাইল জীবকুলে।
সহজ করিল পন্থা পাইতে শ্রীনন্দলালে॥
চরণকমলযুগে লুটাই দিবস যামী।
দীনভাবে দীনবেশে গৌরাঙ্গ জগৎস্বামী।

(৩)

মাতা পত্নী তেয়াগিল কেবা জীব দুঃখে কেঁদে।
কে শিখাল নেচেগেয়ে পে'তে সেই কালাচাঁদে।
হরিনামে হরিপ্রেমে জগৎ মাতাল কে?
কিশোরীর প্রেমসুধা জগতে বিলা'ল কে?
চরণকমলযুগে লুটাই দিবস যামী।
দীনভাবে দীনবেশে গৌরাঙ্গ জগৎস্বামী॥

(৪)

কিশোরীর প্রেমাবেশে পাগল হইল গোরা।
"রা,-রা,"-"রা,-রা," বল্‌তে তাঁর দুনয়নে
বহে ধারা॥
প্রেমের পাগল হেন দেখেছ তোমরা কেউ?
ডুবা'ল জগৎ যেবা তুলিয়া প্রেমের ঢেউ॥
চরণকমলযুগে লুটাই দিবস যামী।
দীনভাবে দীনবেশে গৌরাঙ্গ জগৎস্বামী॥

দীনা—কুমারী শৈলবালা।

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

সাধুবেলা ছত্র। কুম্ভ উপলক্ষে সাধু সন্ন্যাসিগণের যাহাতে আহারাদির কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এজন্য ভীমগড়ার উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ ভূভাগে এবং বণখণ্ডে বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাগণ বহু ছত্র খুলিয়াছিলেন; তন্মধ্যে এই ছত্রটী অন্যতম। এই ছত্রটী সিন্ধুনদতটস্থিত সুপ্রসিদ্ধ সখরের "সাধুবেলা" (সাধুমণ্ডলী) আশ্রমের অন্তর্গত। এই ছত্রের মোহন্তের নাম হরিনাম দাসজী। ইনি অতীব বিনয়ী ও মিষ্টভাষী।

প্রতিদিন এই ছত্রে প্রায় এক হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত সাধু সন্ন্যাসিগণ "পঙ্গতে"* বসিয়া আহারাদি পাইতেন এবং প্রত্যেককেই জল সহ মাটীর জলপাত্র দেওয়া হইত। পরিবেশনকালীন মোহন্তজী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যোরহস্ত হইয়া সমস্ত পংক্তিগুলি প্রদক্ষিন করিয়া নিজেও এক পংক্তিতে বসিতেন; তৎপর স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া "হরি হর ওম্" বলিয়া সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। এই দৃশ্যও দেখিতে অতি মনোহর। যে সকল সাধু "পঙ্গতে" বসিয়া আহার করিতেন না, তাহাদিগকে মাধুকরী† দেওয়া হইত। পঙ্গতে বসিয়া সাধুগণ আহারে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্রই প্রায় হাজার সাধুকে দুইটী উচ্চ কাষ্ঠ মঞ্চ হইতে মাধুকরী বিতরণ করা হইত। কুম্ভ উপলক্ষে যে সব ছত্রে মাধুকরী দেওয়া হইত, তাহা এক আধখানা রুটী নহে; কোন ছত্র হইতে প্রকাণ্ড চারিখানা, কোথাও বা তিনখানা রুটী, তদুপযোগী ডাল, তরকারী, কোথাও বা এতদ্ব্যতীত কিছু ভাতও দেওয়া হইত; আর "ভাণ্ডারা" হইলে ত কথাই নাই! একজন সাধুর পক্ষে এক বা দুই ছত্রের অধিক মাধুকরী গ্রহণ করিতে হইত না। নিকটবর্ত্তী কতকগুলি ছত্র হইতে একজন মাধুকরী গ্রহণ করিলে আট দশ জনেও তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারিবে না! ছত্রের পরিবেশনকারিদের সবিনয় ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; প্রত্যেককে পরিবেশন-কালীন "দীনদয়াল", "মহারাজ", "নারায়ণ", "রাম" বা "গুরুদেব" প্রভৃতি নামে সম্বোধন-পূর্ব্বক কাহার কি লাগিবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। মাধুকরী-দাতাগণও "দর্শন দিজিয়ে মহারাজ", "কৃপা করিয়ে দীনদয়াল" প্রভৃতি সবিনয় উক্তিতে আহার্য্য বিতরণ করিতেন। ইহাঁরা রুটীকে "ফুলকা" তরকারীকে "শাক" এবং ভাতকে "চাউল" বলিতেন; কারণ এতদ্দেশে ঐসব নামই প্রচলিত। বলা বাহুল্য যে এই সকল পরিবেশনকারিগণ সকলেই সাধু; কেহই বেতনভোগী চাকর নহেন। প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে আহার এবং মাধুকরী বিতরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত। দুই একদিন পঞ্চে এখানে "ভাণ্ডারা" হইত; অর্থাৎ সেই সব দিনে বিশেষভাবে সাধুসেবার ব্যবস্থা হইত। ভাণ্ডারাতে মিঠাই, মালপোয়া, পোলাও প্রভৃতি দ্বারা সাধুসেবা হইয়া থাকে। এই ছত্রের সন্ন্যাসিগণ নানকপন্থী; এখানে শ্রীগুরুর আসন এবং "গ্রন্থ সাহেব" (গুরু নানকজীর উপদেশসবলিত সুবৃহৎ গ্রন্থ) বহুমূল্য আবরণে আবৃত থাকিতেন; এবং যথাবিহিত সেবাপূজাদিরও ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন প্রাতে এবং বিকালে এখানে পাঠ, উপদেশ এবং ধর্ম্মবিষয়ক অতি সুন্দর বক্তৃতাদি হইত। আমরা কোন কোন সময় সেই সব সভায় যোগদান করিতাম; কোন

---

*সাধু মহাত্মাগণ সমবেতভাবে আহারার্থ উপবেশন করাকে এতদ্দেশে "পঙ্গত লাগা" বলিয়া থাকে।

† বৃন্দাবনেই এই মাধুকরী প্রথার প্রথম প্রচলন হয়; মধুকর যেমন নানা ফুলে ভ্রমন করিয়া আপন আহার্য্য সংগ্রহ করে, সেইরূপ দীনভাবাপন্ন সাধক বহু স্থানে ভিক্ষা করিয়া আপনার একবেলার আহার্য্য সংগ্রহ করেন; অর্থাৎ কোন স্থানেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

দিন জ্ঞানবিষয়ক, কোন দিন বা ভক্তি-বিষয়ক অতি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতাদি হইত। বহু গৃহস্থ নরনারীও সুস্থিরভাবে উপদেশাদি শ্রবণ করিতেন। এই ছত্রে হাতী, ঘোড়া এবং সাজসজ্জাদি ঐশ্বর্য্যেরও অভাব ছিল না।

কালীকম্বলী বাবার—এই ছত্রটী পঞ্চ.তি ছত্র। কুম্ভমেলা উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে ভীমকুণ্ডের কিছু উত্তরে গঙ্গাতীরে সুদৃশ্য স্থানে খোলা হইয়াছিল। এই ছত্রের বর্ত্তমান মোহন্ত "বাবা কালী-কম্বলী ওয়ালে রামনাথজী"; ইনি সাধারণতঃ হৃষীকেশে বাস করিয়া থাকেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কালীকম্বলী বাবার* সঙ্গী ছিলেন। ইহাঁর তত্ত্বাবধানে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের পথে এবং অন্যত্র স্থানে ৫০.৬০টী ছত্র ও ধর্ম্মশালা পরিচালিত হইতেছে। এই ছত্র হইতে প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উপস্থিত সাধুসন্ন্যাসিগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত, কোন দিন বা শারদাই (ভাঙ্গ মিশ্রিত সরবৎ) বিতরণ হইত। এই ছত্রে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই ছত্রের ১টী শাখা ছত্র স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগকে আহার্য্যাদি দেওয়া হইত।

এই ছত্রে মধ্যে মধ্যে ভাণ্ডারাও হইত।

কমলদাসজীর ছত্র—এই ছত্রটী ভীমকুণ্ড হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তরে গঙ্গার নিকটে অবস্থিত। এই ছত্রটী বারমাসই সাধু সন্ন্যাসীর জন্য খোলা থাকে। বিস্তীর্ণ ভূমিতে পাকা ঘেরা প্রাঙ্গনে, ত্রিতল প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যরাজিতে এই ছত্র সুশোভিত। এই ছত্রটী নানকপন্থীদের। একটী সুসজ্জিত কোঠাতে বিচিত্র বেশভূষাসহ গুরুর আসন স্থাপিত রহিয়াছে। ছত্রটীর মোহন্তের নাম মণ্ডলেশ্বর কমলদাসজী। তিনি বড়ই বিনয়ী ও সুপণ্ডিত; কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি কর্ম্মবশে নেত্রবিহীন। কুম্ভ উপলক্ষে এখানে প্রায় হাজার লোকের "পঙ্গত" বসিত; একটী সাধু হাতে ধরিয়া তাঁহাকে পঙ্গতে লইয়া আসিতেন, তিনি বিনয়নম্রবচনে সকলকে পরিতোষ করতঃ সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতেন। এই ছত্র সকলের শেষে বন্ধ হইত। মোহন্তজীর বিশেষ আদেশ ছিল, কেহ যেন এই ছত্র হইতে বিমুখ হইয়া না যায়। একটী উচ্চ মঞ্চ হইতে প্রত্যেক দিন ১২টা-১টা পর্য্যন্ত মাধুকরী দেওয়া হইত। এই ছত্রেও প্রায়ই ভাণ্ডারা হইত। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইহাঁর বহু গণ্যমান্য শিষ্য ও ভক্ত আছেন, এবং সাধুসেবার্থ ইনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এখানে প্রাতে ও বৈকালে পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত। বহু সাধুসন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ভক্তও এই ছত্রে স্থান পাইয়াছিলেন।

কাশী-নিরঞ্জনী ছত্র—এই ছত্রটী কমলদাসের ছত্রের নিকটেই অস্থায়ীভাবে কুম্ভ উপলক্ষে বসিয়াছিল। এই ছত্রটী ৺ কাশী-

---

* ইনি হিমালয়ের একজন প্রসিদ্ধ সাধু। ইহার নাম ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী; ইনি দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন। হিমালয় গহ্বরে ১টী কাল কম্বল গায়ে দিয়া বহুদিন সাধনা করিয়াছিলেন, এজন্য কালীকম্বলী বাবা নামেই পরিচিত। ইহারই কৃপাবলে হিমালয়ের দুর্গম পথ সুগম হইয়াছে। উপরোক্ত ছত্রগুলিও ইহার আজ্ঞায় ভারতীয় ধনকুবেরগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধামের নিরঞ্জনীমঠের অন্তর্গত। এই ছত্রে বহু সাধু সন্ন্যাসী পঙ্‌ক্তে বসিয়া আহারাদি করিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে সাধুদিগকে নূতন বস্ত্র বিতরণ করা হইত। প্রতিদিন বক্তৃতা ও পাঠ হইত। এই ছত্রের মোহন্ত মণ্ডলেশ্বর নিরঞ্জন আচার্য্য ১০৮ পরমাত্মানন্দজী। তাঁহার আসন এই ছত্রেই বিরাজিত ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানে যাইতেন, সঙ্গে বিরাট মিছিল বাহির হইত। হস্তীপৃষ্ঠে তাহার সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ যাইতেন, তিনি নিজে সুসজ্জিত বহুমূল্য পাল্কীতে আরোহন করিয়া সহর পরিভ্রমন করিতেন; সঙ্গে-সঙ্গে সুমধুর ব্যাণ্ড বাজিয়া দিগন্ত মুখরিত করিত; এতদ্ব্যতীত বহু "আসাসোটা"ধারী এবং পদব্রজে বহু সাধুসন্ন্যাসী অনুগমন করিতেন।

ক্রমশঃ।

জনৈক দর্শক।

—:0:—

দেশের অবস্থা।

আসামে এবার প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে উচ্চ ও নিম্ন আসামের অধিকাংশ স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। সে তরঙ্গ-ভঙ্গময় জলস্রোত আসামের নদনদী, নালাখাল, মাঠঘাট, সহরপল্লী বিধৌত করিয়া ছুটিয়াছিল। স্রোতমুখে লোকজন, ছাগল-গরু, ঘোড়ামহিষ এমন কি হাতী পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কাছাড়, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, গোহাটী জেলা এবং ডিব্রুগড় অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ অত্যধিক হইয়াছিল। গৌহাটী-গোলোকগঞ্জ রেলপথ স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়াছিল,—কয়েকটী বৃহৎ সেতু ভগ্ন হইয়াছিল; তজ্জন্য কিছুদিন ঐ রাস্তা বন্ধ ছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের অত্যধিক ক্ষতি হইয়াছে। পার্ব্বত্য বিভাগেই পাঁচ কোটী টাকা রেলকোম্পানীর ক্ষতি হইয়াছে। সুরঙ্গগুলি বন্ধ হইয়াছে। পাহাড় খসিয়া পড়িয়াছে, সেতুগুলি ভাসিয়া গিয়াছে। অসংখ্য কুলি মরিয়াছে। এক বৎসরের পূর্ব্বে আর এপথে গাড়ী চলিবার আশা নাই। এই রেলপথের অন্যান্য বহু স্থানেও অল্প-বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। সদাশয় আসাম-গভর্ণমেণ্ট বন্যপ্লাবিত স্থান সমূহের বিপন্ন অধিবাসিগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে-বিশেষতঃ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষ অবগত হইয়াও আমরা এবার কিছুই করিতে পারিলাম না। কারণ আসামের অধিকাংশ স্থান বন্যাবিধ্বস্ত, এই সকল স্থানেই আমাদের প্রচুর কার্য্য রহিয়াছে। এই প্রকার আরও ২।৪টী সমিতি থাকিলেও কার্য্যের অভাব হইত না। এরূপ অবস্থায় আমরা বিদেশে যাই কিরূপে? তবে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অল্পদিনেই আসামের বন্যাপ্লাবিত বিপন্ন অধিবাসিগণের অভাব পূরণ হইয়াছিল। ডিব্রুগড়ের সেবাসমিতির প্রেসিডেণ্ট রায় শ্রীযুক্ত পরশুরাম খাউন্দ

বাহাদুর আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে অন্নকষ্টের সম্ভাবনা থাকিলেও, এক্ষণে আর আপনাদের প্রয়োজন হইবে না।" আমরা আনন্দে বঙ্গদেশের কার্য্য করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিতে দুইজন সেবক পাঠাইয়াছিলাম। পার্ব্বত্য রেলপথ বিধ্বস্ত হওয়ায় উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ-ঢাকা ঘুরিয়া ত্রিপুরা-নোয়াখালিতে সেবা করিতে যাওয়া অপেক্ষা, অর্থসাহায্যকরাই শ্রেয়ঃ স্থির করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছিলাম,—এমন সময় সংবাদ আসিল—সভয়ে শুনিলাম, আবার ব্রহ্মপুত্রে ভয়ানক জলবৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বের অপেক্ষা দ্বিগুণ জল বাড়িয়াছে। ডিব্রুগড় আবার ভাসিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে নদীতীরস্থ বাঁধের সমান জল হইয়া গেল। ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার প্রভৃতি পি, ডব্লিউ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিস্তর কুলি লইয়া বাঁধ রক্ষা করিতে যোত্নবান হইলেন। অত্র আশ্রম হইতে জলের ভীষণ গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল। বাঁধ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু জল এত বাড়িল যে, সকলেই মনে করিল, বাঁধ ছাপাইয়া বুঝি দেশ ভাসাইল। কোন কোন স্থানে এক হাতের অধিক বাঁধ জাগিয়া ছিল না। বড়ই উদ্বেগে দিবারাত্র কাটিতে লাগিল, তিন দিন পরে জল ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। যোরহাট অঞ্চল রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু বহুস্থান আবার ভাসিয়াছে।

এক্ষণে জলময়ী প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য থামিয়াছে; আর সে জলকল্লোল নাই। এখন আছে শুধু হৃদয়বিদারক ধ্বংস চিহ্নাবলী, আর বন্যাপীড়িতের হাহাকার। এবিপদে সকলকে রক্ষা করা বুঝি বা কাহারই সাধ্যায়ত্ত হইবে না। এখন জগদম্বা ভরসা করিয়া বিপন্ন জনগণের সহায়তার জন্য আমরা অর্থ সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা করিতেছি। যদি চতুর্দ্দিক হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য না করা হয়, তবে সহস্র সহস্র লোক অকালে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, শত শত গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইবে। আমাদিগের নিকট যাহারা যে অর্থ প্রেরণ করিবেন, তাহা অত্র পত্রিকায় স্বীকৃত ও কোথায় কি ভাবে ব্যয়িত হইল, তাহা উল্লিখিত হইবে। আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও অনুরক্ত বন্ধুবর্গ এবং সমগ্র দেশবাসী নরনারীর নিকট অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছি। দানশীল সহৃদয় মহাত্মাগণকে আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখ ও শান্তিতে রাখুন, আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী ভক্তবৃন্দের এ দারুণ দুর্দ্দিনে সাড়া পাইতেছি না কেন?—তাঁহারা এ সময় এত নিশ্চেষ্ট কেন?

—:0:—

ওঁ তৎসৎ ।

আর্য্য-দর্পণ ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা ।

৮ম বর্ষ, } আশ্বিন ও কার্ত্তিক । { ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা ।

চক্ষুদান ।

শরতে শরৎসুন্দরীর আবির্ভাব,—মা আসিতেছেন, বঙ্গে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বর্ষার দারুণ দুর্দ্দিনের অন্ত হইয়াছে,—আকাশে জলভরা মেঘ কাটিয়াছে, চাঁদ উঠিয়াছে; শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় জগৎ ভরিয়া গিয়াছে। কৃষকের রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে—অনশনক্লিষ্ট শুষ্কমুখে আবার হাসি ফুটিয়াছে। স্থলপদ্ম, সেফালিকা ফুলের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের মুখকমলেও হাসি ফুটিয়াছে। ম্যালেরিয়া-দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত পল্লীবাসী নবীন আশায়,—উৎসাহে-উল্লাসে আবার জাগিয়াছে। মৃত-দেহে প্রাণ স্পন্দনের ন্যায় মরা বঙ্গসমাজে আবার জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। প্রবাসী স্বামী-পুত্রের সহিত সম্বৎসর পরে মিলনের আশায় দুঃখিনী বঙ্গনারীর চাঁদমুখে চাঁদের কিরণ দেখা যাইতেছে। মা আনন্দময়ীর শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে কয়েকদিনের জন্য আনন্দ-হিল্লোল বহিবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবীপক্ষ পড়িতে না পড়িতে তাহারই সূচনা আরম্ভ হইয়াছে।

পূজার বাড়ীতে ধূম পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ জুড়িয়া প্রতিমা তৈয়ারী হইতেছে। পাড়ার ছেলেরা পূজার বাড়ীতেই খেলার আড্ডা গাড়িয়াছে। অনবরত হাসি, কান্না গণ্ডগোল করিয়া পাড়া সজাগ রাখিয়াছে। নিষ্কর্ম্মা লোকগুলা জমাট পাকাইয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর পরনিন্দা—পর-আলোচনায় বাদসাহী আনন্দ উপভোগ করিতেছে। গৃহলক্ষ্মিগণ ঘরদ্বার লেপিয়া পুঁছিয়া মায়ের আগমনী ঘোষণা করিতেছেন। অতি দরিদ্রের ঘরেও দু'চারি দিনের আহার্য্য সঞ্চয় হইয়াছে। শতগ্রন্থি-ছিন্নবস্ত্রধারীও স্ত্রী-পুত্রের জন্য নূতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গের প্রতি নগর, গ্রাম, পল্লী, এমন কি প্রতি বাড়ীতে আনন্দময়ীর আগমন চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাট, বাজারগুলি সহরের শোভা ধরিয়াছে।

পূজার বাড়ীতে কোথাও কর্তৃপক্ষ সমবেত হইয়া জিনিস-পত্র ক্রয়ের ফর্দ্দ করিতেছেন। কোথাও নিমন্ত্রনের চিঠি লেখা হইতেছে। দধি দুগ্ধের বায়না লইতে গোয়ালা আসিয়াছে,—খাজন্দার বায়না হইয়া গিয়াছে। ময়রা ভিয়ান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যত গোল উঠিয়াছে পুরোহিত-বায়না লইয়া। যে যত অযোগ্য, সে তত আপনাকে কৃতী মনে করিয়া ক্রমাগত দর চড়াইতেছে। ষষ্ঠী-সুবচনী পূজায় যিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন, পূজার মরসুমে তিনিও সার্ব্বভৌমের আদর প্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল।

কয়েক বৎসর অতীত হইল কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাদিগকে ঢাকা—বন্দুর-বাজারে কয়েকদিন অবস্থিতি করিতে হয়। সে সময় প্রত্যহ সহরের বহুগণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনার্থ সমবেত হইতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্মালোচনা হইত। ঢাকা-জজ্‌কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন মহাশয় প্রত্যহ দুবেলা নাগ মহাশয়দের বাসায় আসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু; বিনয় ও নম্রতার আধার। ভালবাসা তাঁহার স্বভাব। আমরাও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। সে সময়টা পূজার বন্ধের পর বলিয়া গগনবাবুর সহিত অধিক সময় পূজা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বাটীতে পূজা সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, একদিন তাহা বলিয়াছিলেন। অদ্য পূজাবকাশে "আর্য্য-দর্পণের" স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠকগণকে সেই ঘটনাটী উপহার প্রদান করিলাম।

গগনবাবু ফরিদপুর জেলায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান। গগনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েট্। উভয় ভ্রাতাই কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকেন। তাঁহাদের বাটীতে পুরুষানুক্রমে দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। যাঁহাদের বাটীতে মায়ের কৃপা হয়, সে বাড়ীর কর্ত্তাগৃহিনী, ছেলে-নাতি, বৌঝি—এমন কি দাসদাসীরা পর্য্যন্ত ভক্তিপরায়ণ হন। অবশ্য যে সকল ধনী-গৃহে কেবল অর্থবলে অন্য লোকদ্বারা মায়ের অর্চ্চনার ব্যবস্থা হয়, সে সকল বাড়ীর দুই এক স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। গগনবাবুর পিতা মধ্যবিৎ গৃহস্থ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া নিজেরা স্বহস্তে যতদূর পারেন, মায়ের পূজার সাহায্য করিয়া থাকেন। পুরুষানুক্রমে পূজা হইতেছে বলিয়া বাড়ীর সকলেই পূজার বিষয় অবগত। পুরোহিতকে কোনই বেগ পাইতে হয় না, আসনের পার্শ্বে—হাতের কাছে পূজাদ্রব্য সজ্জিত থাকে, বার পর যে দ্রব্যটী প্রয়োজন, পরপর ক্রমানুসারে বাড়ীর মেয়েরা সাজাইয়া রাখেন। আর গগনবাবুর দাদা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পূজার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদের বহুদিনের পূজা—নূতনত্বের আড়ম্বর নাই। বারমেসে কুলপরোহিত দ্বারাই তাঁহারা দেবীর অর্চ্চনা করাইয়া থাকেন। কাজেই বৃদ্ধ পুরোহিত "কুম্ভকংকৃত্বা" স্থলে "কুম্ভকংধৃত্বা" পাঠ করতঃ পাছে ঘট ধরিয়া চতুঃষষ্ঠী বার জপ করিয়া বসেন, এই ভয়ে তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পূজাকালে উপস্থিত থাকিতেন। যাহাতে যথারীতি পূজাকার্য্য সম্পন্ন হয়—

কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সতর্ক প্রহরী থাকিতেন। অন্যান্য কার্য্যের ভার অপরকে দিয়া—নিজের আমোদ-আহ্লাদ ছাড়িয়া মায়ের পূজার সুব্যবস্থা করিতে তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপেই তাঁহাদের বাড়ীতে বহুকাল পূজা হইয়া আসিতেছে।

সেবার পূজা উপলক্ষে আফিস্-আদালত বন্ধ হইলে উভয় ভ্রাতা পঞ্চমীর দিন বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বহিরঙ্গনে প্রবেশ করিতেই তাঁহাদের পুত্রবৎসল বৃদ্ধ পিতা আসিয়া হাসিমুখে গগনবাবুর দাদাকে বলিলেন,—"বাবা! এবার গ্রামের ভট্টাচার্য্যকে পুরোহিতের বায়না দিয়াছি, আজই তাঁরা আসিবেন। এবার যখন উপযুক্ত পণ্ডিত-পুরোহিত পাইয়াছি, তখন আর তোমাকে পূজার সময় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হইবে না। তুমি আমোদ-আহ্লাদ করিতে পার না বলিয়া অনেক টাকা দিয়া এবার যোগ্য পুরোহিত ঠিক করিয়াছি।"

পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য পিতার আন্তরিক যত্ন বুঝিয়া কৃতজ্ঞভরে উভয় ভ্রাতাই পিতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাসিমুখে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে যথাসময়ে পুরোহিত আসিয়া পহুছিলেন। তিনি সে-দেশের একজন নামজাদা অধ্যাপক। ষষ্ঠীর দিন যথাকালে বোধন এবং আমন্ত্রনাধিবাস হইয়া গেল। আজ সপ্তমী পূজা; নবপত্রিকা স্নানান্তে স্থাপনা করা হইল। গগনবাবুর বাটীর স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সংকল্পের সময় উপস্থিত হইলেন। গুরু-পুরোহিত বরণান্তে যথারীতি সঙ্কল্প-কার্য্য হইয়া গেল। পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তমী পূজার বিহিত দ্রব্যাদি পূজারির পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধক্রমে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের অনুষ্ঠান দেখিয়া প্রশংসা করিয়া পূজায় বসিলেন। ইতিমধ্যে কোন কার্য্যবশতঃ গগনবাবুর দাদাকে বাহিরে যাইতে হইল। যোগ্য পুরোহিতর উপর পূজার ভার দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

এদিকে কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে অনেক সময় বহির্ব্বাটীতে থাকিতে হইল। আর পূজামণ্ডপে আসিবার সময় পাইলেন না। পূজা প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় তিনি একটু অবকাশ পাইলেন। অমনি মাতৃভক্ত সন্তান ছুটিয়া মণ্ডপে আসিয়া পৌঁছিলেন। হাসিমুখে পূজা দেখিতে দেখিতে সহসা তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। মুখ ম্লান ও শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি সভয়ে দেখিলেন, প্রতিবৎসর কলার খোলে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বিল্ব-শলাকায় ঐ অঞ্জন লইয়া দেবতার চক্ষুদানকার্য্য সম্পন্ন হইত; এবৎসরও যথাস্থানে কলার-খোলও বিল্ব-শলাকা রাখা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য! পূজা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গেল, অথচ উহা অব্যবহার্য্য রহিয়াছে। তবে কি পুরোহিত চক্ষুদান করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন? তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু ফাটিয়া কান্না বাহির হইল। তিনি বুক চাপিয়া ধরিয়া সভয়ে পুরোহিতকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত প্রথমতঃ থতমত খাইয়া একটু পরে সগর্ব্বে বলিলেন,—"আমি পেটোকাটা পুরোহিত নহি যে, মায়ের চক্ষুদান করিতে কলার পেটো ব্যবহার করিব। আমরা

অন্য উপায়ে চক্ষুদান করিয়া থাকি। তোমরা ছেলে মানুষ তাহা বুঝিবে না। বিশেষতঃ ইংরাজি কেতাবে তাহা লেখা নাই। আমার পূজার ভুল ধরিবার মত বিদ্যা এখনও তোমাদের অর্জ্জিত হয় নাই।"

প্রাণের দায়ে পুরোহিতকে প্রশ্ন করিয়া এরূপ অস্বাভাবিক উত্তরে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইল। এরূপ যোগ্য—দিগ্‌গজ পণ্ডিতের ত্রুটী হইতে পারে, এরূপ ধারণা তাঁহার ভুল, এই ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। অগত্যা চুপকরিয়া থাকিলেন বটে; কিন্তু কিছুতেই মনে মানিল না। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে তাঁহার মনে হইত লাগিল,—এবার মায়ের চক্ষুদান হয় নাই। তিনি কেন পূজা ছাড়িয়া অন্যত্র গেলেন,—কেন পুরোহিতকে নির্ভর করিয়া আপন কর্ত্তব্যপালন করিলেন না। তাঁহার দোষেই এবার পূজা অঙ্গহীন হইল। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। পূজার আনন্দ—উৎসাহ একবারে দমিয়া গেল। তথাপি তিনি একথা পিতা মাতা বা ভ্রাতাদের জানাইলেন না। একাকী নীরবে বৃশ্চিকদংশন-যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর তিনি পূজা ছাড়িয়া আর উঠিলেন না।

সপ্তমী অষ্টমী গত হইল। আজ নবমী; পূজা হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিত লোক আহারে বসিয়াছেন, গগনবাবুরা দুই ভায়ে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সহসা বাটীর ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল। দুই ভায়ে ব্যস্ত হইয়া অন্দর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, একটী গৃহে বাড়ীর যাবতীয় লোক সমবেত হইয়া গোল করিতেছে, আর তাহাদের মাতাঠাকুরাণী মেঝেতে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিতেছেন! তাহারা মাতৃদেবীর নিকট গিয়া কারণ অবগত হইয়া জানিলেন যে, মহামায়ার পূজান্তে ভোগ হইয়া গেলে, তাঁহার মাতার শরীরটা অল্প অসুস্থ বোধ হয়; তিনি অবসন্নভাবে মেঝেতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া পড়েন এবং অল্পক্ষণেই নিদ্রাভিভূতা হন। সেই অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন, যেন একটী বালিকা আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"মা! আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেতে দাও না।" গগনবাবুর মাতা নিদ্রালস্যে অভিভূতা, যেন মেয়েটীকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিলেন,—বাছা! পূজার বাড়ী সকলেই খাইয়াছে—খাইতেছে, এতটা বেলা হ'ল এপর্য্যন্ত তোমাকে কেহ কিছু খাইতে দেয় নাই? এই ঘরে নানা প্রকার প্রসাদী খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে, তোমার যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, নিজ হাতে লইয়া খাও।"

বালিকা বলিলেন,—"তুমি দাও।"

গগনবাবুর মাতা বলিলেন,—"মা! আমি পরিশ্রান্ত হইয়া এইমাত্র একটু শুইয়াছি, আর উঠিতে পারি না; তুমি নিজে লইয়া খাও।"

তখন বালিকা সাবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"ওগো! আমি যে অন্ধ; চখে দেখিতে পাই না, তুমি না দিলে আমি খাইব কি প্রকারে?"

বালিকার এই বাক্যে ব্যথিত হইয়া গগনবাবুর মাতা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, অদূরে একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা

দাঁড়াইয়া আছেন। বালিকা অনিন্দ্যসুন্দরী। এত রূপ তিনি আর কোন মেয়ের এপর্য্যন্ত দেখেন নাই। রূপে যেন ঘর আলো করিয়া প্রসন্নবদনে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি স্নেহ দয়ায় গলিয়া গিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার যে সুন্দর চক্ষু দেখিতেছি, তুমি অন্ধ হইবে কেন?

বালিকা মৃদু হাস্যে চন্দ্র কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—হা চক্ষু আছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নাই। চক্ষে আমি দেখিতে পাই না।"

আহা-এমন সুন্দরী বালিকাকে কি অপরাধে বিধাতা অন্ধ করিলেন, এই ভাবিয়া গগনবাবুর মাতাঠাকুরাণী কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন, বালিকা আর নাই, তৎপরিবর্ত্তে একটা বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে যেন ছাদের সহিত মিলাইয়া গেল। অমনি তিনি 'মা,' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ীর লোকগুলি দৌড়াইয়া আসিল। মহামায়া কেন অন্ধ হইয়া দর্শন দিলেন, এই দুঃখে এবং স্বামী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি জাগিয়াও কাঁদিতে ছিলেন।

গগনবাবুর দাদা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া এতক্ষণ মাতৃদেবীর মুখে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিতে ছিলেন, কিন্তু শেষে বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"মা ঠিক স্বপ্নই দেখিয়াছ, এবার দেবীর চক্ষুদান হয় নাই। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারকার পুরোহিত চক্ষুদানের পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। কেবল মন্ত্র আওড়াইয়া বোধহয় চক্ষুদানের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অভিজ্ঞ ও যোগ্য পুরোহিত বলিয়া আমিও বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাহিরে ছিলাম। পূজার আনন্দে বিঘ্ন হইবে, তোমরা ক্ষুণ্ণ ও ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যস্ত হইবে বলিয়া সে বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। এই কয়দিন নিজেই দারুণ অশান্তি ভোগ করিতেছি; এবং কৃতাপরাধের জন্য নিয়তই কাতরে প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমাদের নিকট সে বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছিলাম, আজ মা আসিয়া স্বপ্নে তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন।"

তখন মাতাপুত্রে করযোরে দেবী উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। পরে স্নেহময়ী মাতা পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর পুত্রেরা জগজ্জননীজ্ঞানে স্বীয় জননীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অধিকক্ষণ মাতা ঠাকুরাণীর নিকট বসিতে পারিলেন না, বাহিরে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছিল, তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহারা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরোহিত এই ঘটনা শুনিয়া গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ভীত ও কুণ্ঠিত হইয়া আপন ত্রুটী স্বীকার করিলেন। বলা বাহুল্য, গগনবাবুর মাতা ঠাকুরাণী পূর্ব্বে এ বৃত্তান্ত জানিতেন না।, সুতরাং সংস্কারবশে চিন্তাগ্রস্ত হইয়া তিনি যে নিদ্রাকালে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা বলিবার উপায় নাই। "স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র" এই সূত্র ধরিয়া এই ঘটনাটীকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে নিতান্ত নির্লজ্জ

ব্যতীত অন্য কাহারও সাহস হইবে না।

হিন্দুর পূজা পুতুল পূজা,—ছেলে খেলা নহে। ভক্তি-বিশ্বাস হারাইয়া এক শ্রেণীর হিন্দু আজ অপরের নিকট নিতান্ত দীন—দয়ার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা হিন্দুর গৃহে দেবতার এরূপ খেলা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। আত্মচৈতন্য প্রকাশ না হইলে কেহ ঘটে বা পটে ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ করিয়া যজমানের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন না। এরূপ মহাপুরুষ লোক সমাজে বিরল সত্য—বিশেষতঃ দক্ষিনার লোভে তাঁহারা কাহারও উপকার করিতে অগ্রসর হন না, ইহাও অতি সত্য; কিন্তু ভক্ত-বৎসল দেবগণ গৃহস্থের ভক্তিবলে মনোময়ী মূর্ত্তিতে দর্শনদান ও অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। এখানেও জগজ্জননী ভক্তের ধারণা-নুযায়ী অন্ধ হইয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া ভক্তের মান বাড়াইলেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরোহিতের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্ম পদ্ধতির গর্ব্ব রসাতলে গেল। নতুবা যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র চক্ষু—মানুষে তাঁহার চক্ষুদান না করিলে তিনি অন্ধ হইবেন, এ কথা বালকেও বিশ্বাস করিবে না। ভাব-ভক্তিহীন কঠোরহৃদয় ব্যক্তি দেবলীলার এ রহস্য লৌকিক বিদ্যা-বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। কেবল এই মাত্র জানিয়া রাখুন যে—

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।

দীন—চিদানন্দ।

—:0:—

অভয় বাণী।

কেন ভ্রমে মজ, মায়া মোহ ত্যজ,
বল শিবোহহং।
শিব শক্তি হ'তে জন্মেছি মহীতে
বল শিবোহহং॥
মাতৃ বলে বলী হওরে সকলি
বল শিবোহহং।
মায়েরি রচনা এ বিশ্ব জান না?
বল শিবোহহং।
খেলিবার তরে এসেছ সংসারে
বল শিবোহহং।
খেলা অন্ত হ'লে মা নিবেন কোলে
বল শিবোহহং।
দ্বিজ, ক্ষত্র, জাতি বৈশ্য, শূদ্র, আদি
বল শিবোহহং।
স্বধর্ম্ম সাধিতে কিবা ভয় চিতে
বল শিবোহহং।
তপ, শম, দম শৌচ, ক্ষমা, জ্ঞান
ব্রাহ্মণের কর্ম্মচয়।
শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি দান, যুদ্ধে গতি
এই গুণে ক্ষত্র হয়।
কৃষি, গোরক্ষণ বাণিজ্য করণ
বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবতঃ।
এব্রহ্মাণ্ড ভরি সেবা ও চাকুরী
শূদ্রে করে অবিরত।
গুণকর্ম্ম অনুসারে দয়াময়ী মা মোদেরে
দিয়েছেন কর্ম্মভার।
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"
মনে রেখো অনিবার।

গুণের আদর কর অহঙ্কার পরিহর
ভাব সবে সহোদর।
পিতা শিব, মাতা শক্তি অগ্রজেরে কর ভক্তি
পাবে এর পুরস্কার।
জন্মাগত ভেদ ভুলে বলী হ'য়ে গুণ বলে
কাজে হও আগুয়ান।
একতা বন্ধনে বাঁধি সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি
কর মা'র নামগান।
গুণে ক্ষত্র হও যারা দেশ রক্ষা কর তারা
মাতৃ অঙ্কে পাবে স্থান।
বৈশ্যবলে অভিমান করে যেই ভাগ্যবান্
ধন বলে যার মান।
গোরক্ষা ও কৃষিকাজ ব্যবসা বাণিজ্য আজ
জীবনের ব্রত তার।
গুণে শূদ্র হও যারা পরিচর্য্যা কর তারা
পাবে যোগ্য পুরস্কার।

এক ব্রহ্ম সর্ব্বঠাই ছোট বড় কোথা ভাই?
বল শিবোহং।
অজ্ঞানেতে জ্ঞান ঢাকা পাপ পুণ্য মরীচিকা
বল শিবোহং।
জগতের মূলাধার, ব্রহ্মময়ী মা আমার,
বল শিবোহং।
হিংসা, দ্বেষ পরিহরি, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভরি
বল শিবোহং॥
পাপ হবে বিদূরিত ধর্ম্ম হবে সংস্থাপিত
বল শিবোহং।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মিলি গাবে সদা 'মা' 'মা' বুলি
বল শিবোহং।
শিবের সন্তান মোরা শিব অবতার।
শিবহ'তে জীব জন্ম হয় কি প্রকার?
অজ্ঞানেতে জ্ঞান ঢাকা তাই দুঃখ পাই,
জীব ভ্রান্তি দূর করি শিব হও ভাই!

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

—:0:—

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

দাদুপন্থী ছত্র—এই ছত্রটীও কমলদাসের ছত্রের উত্তর দিকে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে উপরোক্ত সম্প্রদায়ের বহু সাধু সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—১টী প্রকাণ্ড ঘরে গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানেও যথারীতি ভোগ আরতি হইত। এই ছত্রে মধ্যাহ্নে প্রায় হাজার লোক প্রতিদিন "পঙ্গতে" বসিয়া আহারাদি করিত। বসিবার পূর্ব্বে রামশিঙ্গা বাজাইয়া সকলকে আহ্বান করা হইত। একটী উচ্চ মঞ্চ হইতে উপস্থিত সাধুসন্ন্যাসীকে প্রতিদিন মাধুকরী দেওয়া হইত। এই

ছত্রের মোহন্তের নাম গোপালদাসজী। এখানেও মধ্যে মধ্যে ভাণ্ডারা হইত এবং প্রতিদিন পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত।

কৈলাস ছত্র—এই ছত্রটী ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত ধনরাজগিরি কর্ত্তৃক হৃষীকেশে প্রতিষ্ঠিত কৈলাস আশ্রমের অন্তর্গত। সাধুবেলা ছত্রের পার্শ্বে অস্থায়ী-ভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে প্রতি-দিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উপ-স্থিত সাধুসজ্জনকে মাধুকরী দেওয়া হইত। এই ছত্রের বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীমৎ ১০৮ মণ্ডলে-শ্বর স্বামী জনার্দ্দন গিরিজী। কৈলাসের অন্যান্য মহাত্মাগণ শ্রীমৎ ১০৮ মহন্ত স্বামী পূর্ণানন্দ গিরিজী, এবং রামপুরীজিরও এখানে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইঁহারাও মাঝে মাঝে স্বর্ণরৌপ্য-মণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদা সুশোভিত গজ আরোহনে বাদ্যভাণ্ড লইয়া বিশেষ জাকজমকের সহিত সহর পরিভ্রমন করিতেন।

গরিবদাসী ছত্র।—দাদুপন্থী ছত্রের পশ্চিমদিকে গরীবদাসী সম্প্রদায়ের ৩টী ছত্র অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল—এই সব ছত্রে বহু সাধুসন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং বহু গৃহস্থভক্তও আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই অগ্নিপ্রান্তে অনেকগুলি বড় বড় তাঁবু খাটান হইয়াছিল, আর খড়ের ঘরের ত কথাই নাই। প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা মধ্যে এই ছত্রগুলিতে "পঙ্গত" বসিত এবং মাধুকরী দেওয়া হইত। এখানেও গুরুর আসন, পূজা, ভোগ, আরতি পাঠ ও বক্তৃতাদির যথাবিধি ব্যবস্থা ছিল। এই ছত্রগুলির মোহন্তগণের নাম জগদীশানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণজী, ও সচ্চিদানন্দজী।

শিকারপুরী ছত্র।—এই ছত্রটী, সিন্ধু দেশান্তর্গত শিকারপুরের রাণী সৌভাগ-বাই কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে দুইশত জন সাধুর উপযোগী আহারাদি প্রস্তুত হইত। রাণীজির আদেশ ছিল, যদি ২০০ হইতে কম সাধু উপস্থিত হন, তবে অবশিষ্ট গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিয়া দিতে হইবে। এই ছত্রেও অনেক সাধুসজ্জন স্থান পাইয়া-ছিলেন। এই ছত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী নিরঞ্জনদেবজী। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বাঙ্গালী। তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যই হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী; আর কাশ্মীর রাজ্যে নাকি ইহার খুব প্রভাব। উপরোক্ত নিরঞ্জনদেবও হিন্দুস্থানী এবং ইঁহারই শিষ্য। ইনি সর্ব্বদাই আনন্দে ভরপুর থাকিতেন, ইনি খুব বড় পণ্ডিত, ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইঁহারও বহু ভক্ত ও শিষ্য আছেন।

জ্ঞানগোদরী।—ভীমগড়ার নিকট-বর্ত্তী গঙ্গার উপরে সুদৃশ্য স্থানে "জ্ঞান গোদরী" প্রতিষ্ঠিত। এটী নানকপন্থীগণের একটী স্থায়ী আগড়া। এখানে "গুরুমুখী ভাষার" একটী পুস্তকাগার আছে। সুদৃশ্য মঞ্চোপরে গুরুর আসনাদি সুসজ্জিত ছিল এবং যথাবিধি পূজার্চ্চনারও ব্যবস্থা ছিল। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে উপস্থিত সাধু মহাত্মাগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

বাগান বাড়ীর ছত্র।—ভীমগড়ার নিকটে অনারেবল লালা সুখবীর সিংহের

বাগান বাটীতে কয়েকজন সাধুমহাত্মা দুইটী ছত্র খুলিয়াছিলেন—ইহার একটী হইতে একবেলা, এবং অপরটী হইতে দুবেলা উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসীকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

বৈষ্ণব আখড়া—ভীমগড়ার নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাগান বাটীতে এই আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। বহু বৈষ্ণব,—সাধু এই আখড়াতে আসন করিয়াছিলেন, প্রতিদিন বৈকালে ইহাদের "পঙ্গৎ" বসিত, ইহারা প্রায় সমস্ত দিনই ভজন গানে ব্যাপৃত থাকিতেন।

নানকপন্থী আগড়—এই আখড়াটী ব্রহ্মকুণ্ড এবং কুশাবর্ত্তঘাটের মধ্যস্থলে গঙ্গার পারে স্থাপিত ছিল। এখানে গুরু নানকজীর আসন, পূজা, আরতি—ইত্যাদি হইত। প্রতিদিন বৈকালে পাঠ, বক্তৃতা ও ভজন হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর মাধুকরী বিতরণ করা হইত।

শঙ্করানন্দ আশ্রম—এই আশ্রমটী ভীমকুণ্ডের পারেই স্থাপিত হইয়াছিল। এই আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ গিরিজী। ভারতবর্ষের বহুস্থানে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য আছেন। তিনি বহু শিষ্য ও ভক্তগণসহ আশ্রমে বিরাজিত থাকিতেন; প্রতিদিন দুবেলা উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বড়ই অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক; তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বহু সাধু সন্ন্যাসী ইহাঁর আশ্রমে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। হিমালয়ের উপত্যকাতে এই আশ্রমটী স্থাপিত হওয়ায় অতীব প্রিয়দর্শন হইয়াছিল।

কামদাসের আখড়া—হরিদ্বারের বাজারের রাস্তার পার্শ্বে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই আখড়া প্রতিষ্ঠিত। এটীও নানক-পন্থীদের। এই আখড়ার মোহন্তের নাম কাম-দাসজী। এখানে বহু সাধুসন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার আশ্রমে মিউনি-সিপালিটীর মেলা-টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গোরক্ষা আখড়া—এই আখড়াটী ভীমকুণ্ডের উত্তরে বিস্তৃত জায়গায় স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে অনেক সাধু আসন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উদ্দেশ্য—গোবধ নিবারণ করা, গোজাতির উন্নতি বিধান করা এবং কসায়ের নিকট যাহাতে কেহ গরু বিক্রী না করে, তাহার উপায় করা ইত্যাদি। এই আখড়ার মোহন্তের নাম পরিব্রাজকা-চার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী ভারতভিক্ষু, সন্তসরোবর, আত্মতীর্থ। ইহাঁর প্রধান আশ্রম আবুপাহাড় (রাজপুতনা)। এই আখড়ার সাধুগণ অনেক স্থানে গোরক্ষা উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেন।

আর্য্য সমাজ—মোহিনী আশ্রমের নিকটে বিস্তৃত বাগানে এবং কণখলে পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের সাধুদের আসন হইয়াছিল। ইহাঁরা উপস্থিত সকলকেই বিনয়নম্র ব্যবহারে আপ্যায়িত করিতেন। প্রতিদিন বৈকালে এখানে বক্তৃতাদি হইত এবং আর্য্যসমাজ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পুস্তিকা বিতরণ হইত।

মোহিনী আশ্রম।—ভীমকুণ্ডের কিছু উত্তরে একটী সুদৃশ্য বাগান বাটীতে

এই আশ্রমটী স্থাপিত। এই আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দজী। এই আশ্রমে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন হইয়াছিল। ইহা একটী স্থায়ী আশ্রম—এখানে একটী ধর্ম্ম-পুস্তকের পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। পাঠাগারের নাম "সাধু পুস্তকালয়।" পাঠাগার স্থাপনের দিন বিশেষরূপ উৎসবাদি হইয়াছিল।

উদাসীন বড় আখড়া।—এই আখড়া কনখল-দক্ষেশ্বর শিববাড়ীর নিকটে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে হাজার হাজার উদাসী সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের ধুনি ধূঁ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; আর তাহার চতুর্দ্দিকে বিভূতি-ভূষিত, জটাজুটসমাযুক্ত, কৌপীনমাত্রৈক-সম্বল, সৌম্যমূর্ত্তি সাধুগণ কেহ বা ধ্যানমগ্ন, কেহ বা পাঠাদিতে নিরত—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই বিরাট জনতাতে কিছুমাত্র কোলাহল নাই, কি গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ভাব, কি আনন্দের জ্যোতি সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কে তাহা বর্ণনা করিবে? এই আখড়াতে বহুমূল্য সাজসজ্জা ভূষিত গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানেও যথারীতি ভোগারতি হইত। এই আখড়াটী নানক-পন্থী "সঙ্গতিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আখড়ার মোহন্তগণের নাম মোতিরামজি, হীরা-দাসজী ও মথুরাদাসজী অন্যান্য আখড়ার মোহন্তের ন্যায় ইহাঁদেরও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না—বহু হাতী, ঘোড়া, উট, মূল্যবান দোলা প্রভৃতি লইয়া ইহারা নগর পরিভ্রমন করিতেন। প্রায় একশত হাত উচ্চ একটী সুবৃহৎ কাষ্ঠদণ্ডের উপর, এই আখড়াতে ইহাঁদের সাম্প্রদায়িক নিশান টানান ছিল। দুইটী সাধু এই নিশানে প্রতিদিন চামরব্যজন করিতেন। আরতির সময় এখানে সুমধুর বাদ্য বাজিত। এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন হইয়াছিল; তাঁহার নাম বাবা ঠাকুরদাস। একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসনের উপর এই মহাত্মা বসিয়া থাকিতেন। সৌম্যদর্শন, প্রিয়ভাষী এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য নিতাই বহুলোক তথায় আগমন করিত। তিনিও স্বভাবসুলভ বিনয়নম্রবচনে সকলকে পরিতোষ করিতেন। রামলছমনদাসজি নামক আরও একজন প্রসিদ্ধ সাধু এই আখড়াতে আসন করিয়াছিলেন। ইহাঁর জ্যোতি-র্ম্ময় মুখমণ্ডল, জটাজুটসমন্বিত পক্ককেশ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল! ইনিও মধুর বচনে সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এখানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইত।

গুরুনানকদেবজীকে "অন্নছত্র"—এই ছত্রটী কণখল সহরে "বাঙ্গালী" ছাপা-খানার নিকটে অবস্থিত। এটী স্থায়ী ছত্র; বারমাসই খোলা থাকে। এখানে প্রতি-দিন সাধুমহাত্মাগণ প্রচুর পরিমাণে আহা-র্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাবা কালীকম্লীওয়ালে আত্মপ্রকাশজী। ইনি অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। ইনিই লছমন ঝোলার সুপ্রসিদ্ধ "স্বর্গাশ্রমের" প্রতিষ্ঠাতা।

ইকড়িওয়ালি অন্নছত্র—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে স্থাপিত। এটী বার-মাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানে যথাযোগ্য সাধুসেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সাধু মহাত্মাগণ প্রতিদিন এখানে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা অমৃত সহরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক উত্তমচাঁদ শেঠ।

উদাসীন ছোট আখড়া বা নয়া আখড়া —এই আখড়াটী কণখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নিকটে একটী প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বড় উদাসী আখড়ার ন্যায় এখানেও প্রায় হাজার সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি ইত্যাদি হইত এবং সুমধুর ব্যাণ্ড বাজিত। এই আখড়ার মোহস্তের নাম ব্রহ্মনারায়ণজী। ইহাঁদেরও হাতী, ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। এখানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা ও ভজনাদি হইত। সাধুগণ পঞ্চায়তী "পঙ্গতে" বসিয়া আহারাদি করিতেন। বড় আখড়ার ন্যায় এখানেও ১টী উচ্চ নিশানে চামর ব্যজন করা হইত। এই আখড়াটী নানকপন্থী "ধুনিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত।

মহানির্ব্বাণী আখড়া।—এই আখড়াটী কণখল সহরে অবস্থিত। জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত। বহু সন্ন্যাসীর আসন এইস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এই আখড়ার মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী গুলাবগিরিজী। এখানেও প্রত্যহ বক্তৃতা এবং উপদেশাদি দেওয়া হইত। অন্যান্য আখড়ার ন্যায় ইহাঁদেরও হাতী, বহুমূল্য নিশান, দোলা, ব্যাণ্ড বাদ্য প্রভৃতি সকলই যথাযোগ্য ছিল।

শিকর ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এটী শিকরের মারওয়াড়ী রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই ছত্রটী বারমাস সাধুসেবার্থ খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে যথাযোগ্য সাধু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বহু সাধু সন্ন্যাসী এই ছত্র হইতে আহার্য্যাদি গ্রহণ করিতেন।

হরনাম অন্নছত্র।—এই ছত্রটীও স্থায়ীভাবে কণখল সহরে অবস্থিত। এটীও বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে বহু সাধু মহাত্মা এখান হইতে আহার্য্যাদি পাইতেন; এই ছত্রের মোহন্তের নাম হরনাম সিংজী।

পাতিয়ালা ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানেও বিশেষরূপে সাধু সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহু সাধু মহাত্মা এখানে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রটী পাতিয়ালার মহারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরাখণ্ডের অনেক তীর্থস্থানেই মহারাজা ছত্রাদি স্থাপন করিয়া সাধু সন্ন্যাসিগণের আশীর্ব্বাদই হইয়াছেন। ভারতের অন্যান্য মহারাজা ও ধনকুবেরগণ যদি এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অভাব অভিযোগ অচিরেই দূরীভূত হইত। সেদিন কি আসিবে না? ভগবান ইহাঁদিগকে সুমতি প্রদান করুন!

নির্ম্মলা আখড়া।—এই আখড়াটীও কণখলেই অবস্থিত ছিল। এই আখড়াটী নানকপন্থী দশম গুরু গোবিন্দসিংজীর সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসন করিয়াছিলেন, এখানেও গুরুর আসনে যথারীতি পূজার্চ্চনা হইত। ইহাঁদের ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য আখড়ার ন্যায়। এখানেও পাঠ এবং ভজনাদি যথাযোগ্য সম্পন্ন হইত।

এই আখড়ার মোহন্তগণের নাম বুড়াসিংজী, হীরাসিংজী ও রামসিং জী।

মাইর ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। এটীও বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এই ছত্রে যথাযোগ্য সাধু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এবং সাধুগণ পরিতোষসহকারে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রটী মারওয়াড় দেশীয় মোহনা মাই নামক জনৈকা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ধন্য মা, তুমিই যথার্থ মায়ের কার্য্য করিয়াছ! তোমরা অন্নপূর্ণা রূপে অন্নদানে উদ্যত না হইলে ভিখারী ছেলেদের মুখের পানে আর কে তাকাইবে? ভারতের সতী লক্ষ্মিগণ! তোমরা এই মায়ের আদর্শ গ্রহণ কর—অন্নপূর্ণা রূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের দীন দুঃখী ছেলেদের মুখ পানে একবার তাকাও,—মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হও! আমরা হৃষিকেশেও একটী মাইর ছত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; সেই ছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী মা তুইয় একটী পাকা মঞ্চে বসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাধুগণকে স্বহস্তে একজনে রুটী এবং অপর জনে ডাল বিতরণ করিতেছেন! এদৃশ্য যে কি অপূর্ব্ব তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে—আমার বোধ হইল যেন, সাক্ষাৎ শিব-শক্তি ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন—মা যেন অন্নপূর্ণারূপে মঞ্চে বসিয়া ভিক্ষা দান করিতেছেন, আর শিবকল্প সাধুগণ জোড়হস্তে তাহা গ্রহণ করিতেছেন! ধন্য ভগবানের লীলা!

বস্তিরাম অন্নছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। জনৈক শেঠ বস্তিরাম কর্ত্তৃক এই ছত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই ছত্রে কুম্ভ উপলক্ষে সাধুসেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতিদিন এখানে সাধু সন্ন্যাসিগণ আহার্য্যাদি পাইতেন।

নিরাকারীওনকি আখড়া।—এই আখড়াটী স্থায়ীভাবে কণখল সহরে অবস্থিত। কুম্ভ উপলক্ষে প্রায় পাঁচ ছয় শত সাধুর আসন এই আখড়াতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই আখাড়াটী নানকপন্থীদের; প্রায় সত্তর, আশিজন সাধু বারমাস এখানে বাস করিয়া থাকেন।

চেতনদেবকি কুটীয়া।—এই আখড়া কণখল সহরে উদাসীন নয়া আখড়ার সন্নিকটে সুদৃশ্য বাগানে অবস্থিত। সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই আখড়াটী সুসজ্জিত। এটী দশনামী সন্ন্যাসিগণের স্থায়ী আখড়া। প্রায় পঞ্চাশ, ষাট জন সাধু এখানে বারমাস বাস করিয়া থাকেন। চকমিলান বাগানের মধ্যস্থলে একটী সুদৃশ্য প্রার্থনা মন্দির সুশোভিত রহিয়াছে। বাগানটীও দেখিতে অতি সুন্দর। নানা প্রকার ফুল, ফলের গাছে সুশোভিত। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা আসন করিয়াছিলেন। এই বাগানের বর্ত্তমান মোহন্তের নাম স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ জী।

শ্রীমন্মুনিমণ্ডল মহাবিদ্যালয়।

এই মহাবিদ্যালয়টি কণখল বড় আখড়ার পার্শ্বেই বিস্তৃত জায়গায় স্থাপিত। এখানে বহু শিক্ষার্থী সাধু এবং ব্রহ্মচারী আছেন। এখানে প্রকাণ্ড আঙ্গিনাতে চন্দ্রাতপতলে

বহু-সাধু-সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লোক আসিয়া প্রায়ই উপদেশ এবং বক্তৃতাদি শুনিতেন। এই মহাবিদ্যালয়ের আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ ১০৮ স্বামী কেশবানন্দজী। ইনি অতি সুপণ্ডিত এবং অতি উচুদরের সাধু; সমস্ত পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানেও ইহাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। বহু রাজা, জমিদার এবং গণ্য-মান্য ব্যক্তি ইহাঁর ভক্ত এবং শিষ্য আছেন ইনি সৌম্যদর্শন এবং মিষ্টভাষী,—প্রায়ই সুললিত বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন। ইহাঁর ঐশ্বর্য্যও খুব বেশী; হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণ, রৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদার উপর বসিয়া অন্যান্য সাধুগণসহ প্রায়ই নগর পরিভ্রমন করিতেন। মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য উষ্ণীষ মস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিত। সঙ্গে সঙ্গে সমুধুর ব্যাণ্ড বাজিত। এই বিদ্যালয়েও বহু সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এখানে প্রতিদিন ব্যাণ্ড বাজিত। এখানে কুম্ভ উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে একটী ছত্র খোলা হইয়াছিল, প্রতিদিন এই ছত্রে "পঙ্গত" বসিত এবং উপস্থিত সাধু মহাত্মাগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

পাঞ্জাবী ছত্র।— এই ছত্রটী কণখল সহরে অবস্থিত। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের বহু মহাত্মা মিলিত হইয়া এই পঞ্চায়তী ছত্র স্থাপিত করিয়াছেন। এই ছত্র গ্রীষ্মকালে ছয়মাস কণখলে এবং শীতকালে ছয়মাস ঋষিকেশে খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে বহু সাধু সন্ন্যাসী এখানে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের বর্ত্তমান পরিচালক ভগবানদাস জী।

মহাদেবা ছত্র।—এই ছত্রটীও কণখল সহরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই ছত্রও গ্রীষ্মকালে ছয়মাস কণখলে খোলা থাকে; তৎপর শীতকালে ছয়মাসের জন্য ঋষিকেশে উঠিয়া যায়। মহাদেবা শেঠ নামক জনৈক মারওয়াড়ী কর্ত্তৃক এই ছত্র স্থাপিত হইয়াছে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানেও যথাযোগ্য সাধুসেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বৈরাগী লস্কর।

কণখলের সংলগ্ন পুরাতন গঙ্গাধারার অপর পারে প্রায় ২মাইল লম্বা ১টী বিস্তীর্ণ বালুচরে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের আসন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বহু সহস্র প্রকাণ্ড ছাতা এবং শত শত তাঁবু এই প্রকাণ্ড চড়ার প্রায় ১॥ মাইল স্থান সুশোভিত করিয়াছিল। দূর হইতে দেখিলে স্বপ্নরাজ্যের মত বোধ হইত। যেখানে কয়েকদিন পূর্ব্বে বালুকারাশি ধু ধু করিয়া পথিকের ভীতি উৎপাদন করিত, আজ সেখানে সুদৃশ্য বস্ত্রমণ্ডিত নূতন নগর দেখিয়া কাহার প্রাণে আনন্দের উদয় না হয়? আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য দেখিলাম। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার সাধু এই স্থানে আসন এবং বিগ্রহাদি স্থাপনা করিয়াছিলেন।* সে দৃশ্য বর্ণনাতীত; এক সঙ্গে এত সাধু খুব কমই দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেক দলেই অতি সুন্দর বিগ্রহাদি ছিল; শ্রীরাধা-কৃষ্ণ এবং রামসীতার বিগ্রহই অধিক।

*কুম্ভের প্রথম স্নানের কয়েক দিন পর এই বৈষ্ণবগণ এই স্থানে আসিয়া আসন স্থাপনা করিয়াছিলেন

প্রায় স্থানেই ঢোল এবং করতাল বাজাইয়া উচ্চৈস্বরে ভজন গান হইতেছিল। অনেকেই জটাজুটসমন্বিত এবং বিভূতিভূষিত ছিলেন, আর সকলেরই ললাটদেশ বিভিন্ন রঙের সাম্প্রদায়িক তিলকে পরিশোভিত ছিল। এই দলে রামাইৎ (রামানন্দী সম্প্রদায়) নিমাইত (নিম্বাদিত সম্প্রদায়) রামানুজী (শ্রী সম্প্রদায়) মাধবাচারী, বল্লভাচারী ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ ছিলেন; এতদ্ব্যতীত সপ্ত আখড়ারও বহু সাধু ছিলেন। সপ্ত আখড়া যথা:—(১) নির্ব্বাণী (২) নির্ম্মোহি (৩) ডিগম্বরী (৪) খাকি (৫) নিরাবলম্বী (৬) টটম্বারী (৭) সন্তোখী। এই বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বহু মোহন্ত আসিয়াছিলেন। শুধু রামানন্দী সম্প্রদায়েরই ৫২ জন মোহন্ত আসিয়াছিলেন! সকলের নাম দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না; তবে যাঁহারা এই সব সম্প্রদায় মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান তাঁহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। জগন্নাথ দাসজী।—ইনি বৈষ্ণবদের মধ্যে নাকি সব চেয়ে বড়—এবং খুব প্রতিষ্ঠাবান। কয়েকজন সাধু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথ দাসজী সাধুকা লাট্ হ্যায়—সব সন্তকো রোটী দেনেওয়ালা হ্যায়! ইত্যাদি" এখানকার নিজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সাধুরাই আহার্য্যের ব্যবস্থা ইনি করিতেন। ইহাঁর প্রধান আসন পুরীতে ডারিয়াপাপরিয়া মঠে। ইনি রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত।

২। মহাবীর দাসজী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত মোহন্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর কয়েকটী হাতী, উট এবং অন্যান্য বহু ঐশ্বর্য্য ছিল। ইহাঁর আসন ইন্দোরের ছত্রিবাগে।

৩। কমলদাসজী;—ইনিও শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত, ইহাঁর আসন বৃন্দাবনে।

৪। শিবরী দাসজী—ইনি ডিগম্বরী সম্প্রদায়ভুক্ত, আসন (উজ্জয়নীর) অঙ্গপাদে।

৫। চিত্রকুটের বিহারীদাস জী। (৬) ডাকোরের ভগবান দাসজী (শ্রীসম্প্রদায়) (৭) অযোধ্যার দাশরথী দাসজী (৮) উজ্জয়িনীর বৈষ্ণবদাসজী (নির্ব্বাণী)। (৯) সুপ্রসিদ্ধ মোহন্ত বিহারীদাসজী। (১০) ব্রজবাসী কিশোর দাসজী (নিমাইত)। (১১) আরার বাবুপুরের পিতাম্বর দাসজী। (মধ্বাচারী) (১২) গুজরাট বিশনগরের গোপাল দাসজী (বল্লভাচারী) ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বহু মূল্যবান নিশান ছিল। বড় এক একটী সম্প্রদায়ে ৫০। ৬০টা করিয়া নিশান ছিল। নিশানের কাপড়গুলি ৭।৮ হাত লম্বা হইবে; এবং সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট জরির কাজ করা। এই বৈষ্ণবদের ঐশ্বর্য্যও সন্ন্যাসিদের হইতে কোন অংশে কম ছিল না। ইহাঁদেরও বহু হাতী, ২।৩ শত উট, ঘোড়া, "আসাসোটা" ব্যাণ্ড বাদ্য প্রভৃতি সকলি ছিল। বৈকালে ইহাঁদের সকলেরই "পঙ্গত" বসিত। প্রধান কতকগুলি আখড়া ও ছত্রের বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত বহু সাধু সন্ন্যাসী ও মঠ আখড়ার মোহন্তগণ, মেলাস্থানে তাঁবু খাটাইয়া, কেহ বা খড়ের ঘর

বাঁধিয়া আপন আপন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ মেলা-স্থানের কোন স্থানই খালি ছিল না, সাধুদের কিম্বা গৃহিলোকের কুটিয়া বা তাঁবু, নয় ত দোকান পাটে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁবু অস্থায়ী ঘর, ভাড়াটীয়া বাড়ী কিম্বা বাগানবাটীতে যে সকল সাধু মহাত্মা আপন আপন সম্প্রদায় লইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন মহাত্মার নাম নিম্নে দেওয়া গেল; এতদ্ব্যতীত আড়ম্বরশূন্য এবং গোপনভাবে যে কত মহাত্মা বিরাজ করিয়াছিলেন, কে তাহার সন্ধান পাইবে ?

(১) জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধনমঠের মোহন্ত ১০৮ শঙ্করাচার্য মধুসূদন তীর্থমহারাজ।

(২) ঋষিকেশের মোহন্ত মণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলনাথজী।

(৩) ঋষিকেশের মণ্ডলেশ্বর পণ্ডিত প্রেমসিংজী

(৪) দেহরাদুনের মোহন্ত লছমন দাসজী। ইঁনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত; এবং একজন বড় পণ্ডিত। ইঁনি রৌপ্যমণ্ডিত হাওদা-সুশোভিত গজ আরোহনে বাদ্যভাণ্ড লইয়া সহর পরিভ্রমন করিতেন। ইঁনি অতীব সৌম্যদর্শন এবং মিষ্টভাষী।

(৫) দেহরাদুনের মোহন্ত জ্ঞানদাসজী,—

(৬) দেহরাদুনের মোহন্ত ওঁকারপ্রসাদজী।

(৭) দেহরাদুনের সন্ত অর্জ্জুনগিরিজী।

(৮) বিশ্ব-পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ স্বামী শঙ্করানন্দজী।

(৯) অমৃতসরের মোহন্ত হরিনাম সিংজী।

(১০) টিহরীর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ জী। ইঁনি হিমালয়ের একজন বিখ্যাত সাধু। ইঁহাকে দর্শন করার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত, ইঁনিও স্বভাবসুলভ বিনয়-বচনে উপস্থিত সকলকে উপদেশাদি দানে পরিতোষ করিতেন। একটী প্রকাণ্ড তাঁবুতে ইঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

(১১) মুরাদাবাদের মোহন্ত কৃষ্ণানন্দজী।

(১২) পাতিয়ালার সন্ত পরমানন্দজী।

(১৩) প্রয়াগের রামকৃষ্ণানন্দ গিরিজী।

(১৪) টেড়িনিমের মণ্ডলেশ্বর স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিজী। (১৫) আহাম্মদাবাদের স্বামী মুক্তানন্দজী। (১৬) পঞ্জাবের দয়ানন্দজী ও আত্মপ্রকাশজী। (১৭) কাশ্মীর মণ্ডলেশ্বর গোবিন্দানন্দজী। (১৮) সিন্ধি-সন্ত আত্মস্বরূপজী। (১৯) শিকারপুরের শ্যামানন্দ ভারতীজী। (২০) মথুরার গোপালদাসজী। (২১) রোড়ীর মোহন্ত বিশুদ্ধানন্দজী। (২২) পুষ্করের মোহন্ত গুলাবগিরিজী। (২৩) শ্রীমৎ ১০৮ পরম-হংস অনন্তানন্দ জী। ইঁনি সাধারণতঃ "নেপালী বাবা," বলিয়া পরিচিত। ইঁনি একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। এই মহাত্মার স্বভাব একেবারে বালকের মত হইয়া গিয়াছে। ইঁহার সরলতায় এবং বিনয়নম্রবচনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইঁহার চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে, মুখে দাড়িগোঁপ আদৌ হয় নাই; প্রথমদর্শনে ইঁহাকে স্ত্রী সাধু বলিয়া আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। ইঁনি অধিকাংশ সময়েই ঋষিকেশের সংলগ্ন তপভূমি "ঝাড়ীতে" বাস করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার আশ্রমটীও দেখিয়া আসিয়াছি। ছোট ছোট কুটিয়া বাঁধিয়া কয়েক জন শিক্ষার্থী তথায় বাস করেন। কত সাধু মহাত্মা

কুম্ভযোগে যোগ দিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলের পরিচয় সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে; আর এই বিরাট জন-সমুদ্রের মধ্যে কে কাহার খবর লইবে?

মিছিলের গতি।

কুম্ভের প্রথম স্নান উপলক্ষে হরিদ্বার, মায়াপুর এবং কণখলের সাধুগণের যে সব মিছিল বাহির হইবে, তাহার যাতায়াতের পথ সরকারবাহাদুর পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং কোন মিছিল কাহার আগে কোন সময়ে বাহির হইবে, তাহারও যথাযথ আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ-মতে হরিদ্বারের জুনা আখড়া এবং নিরঞ্জনী আখড়ার দশনামী সন্ন্যাসিগণের মিছিল ১লা চৈত্র সোমবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় নিজ নিজ আখড়া হইতে বাহির হইয়া হরিদ্বারের ষ্টেশনের রাস্তায় অগ্রসর হওতঃ ষ্টেশনের নিকট হইতে কণখলের রাস্তায় যাইবে, তৎপর সেই রাস্তায় অগ্রসর হইয়া হরিদ্বার ও কণখলের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার কাটা-খালের উপর সুবৃহৎ পাকা পুল পার হইয়া কণখল প্রবেশ করিবে; তৎপর উত্তর অভি-মুখে ঘুরিয়া ৮।৯ নং অস্থায়ী পুল পার হইয়া "বেলওয়ালা" দ্বীপে প্রবেশ করিবে এবং "বেলওয়ালা" দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্তের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া "রোরি" দ্বীপে পৌছিবে; তৎপর "রোরি" দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্তের রাস্তা অর্থাৎ গঙ্গার নীলধারার পশ্চিম তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ১১নং অস্থায়ী পুলের নিকট উপস্থিত হইবে; এখানে রক্ষিত (Reserved) সুবৃহৎ ময়দানে হস্তী, উষ্ট্র, ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া মিছিলের অবশিষ্ট অংশ ১১নং পুল ও মূল গঙ্গার উপর নির্ম্মিত ৩নং অস্থায়ী পুল পার হইয়া "হর কি প্যারী" দ্বীপের উপর দিয়া হরিদ্বারের কুশাবর্ত্ত ঘাটে উপস্থিত হইবে; সেখান হইতে ৫নং ফটক পার হইয়া ভীমগড়ার রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইবে। তৎপর ৪নং ফটক পার হইয়া ব্রহ্ম-কুণ্ডে পৌছিবে, এখানে স্নানাদি সমাপনান্তে মিছিল গঙ্গার বাঁধান চত্বরের (Platform) উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া কুশাবর্ত্ত ঘাটের নিকট নির্ম্মিত, গঙ্গার ৪নং অস্থায়ী পুলে গঙ্গা পার হইয়া "রোরি" দ্বীপে পৌছিবে; সেখানে পুনরায় হাতী, উষ্ট্র ঘোড়া, প্রভৃতি আরোহনে মিছিলের পূর্ণতা করিয়া "রোরি" এবং "বেলওয়ালা" দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা অর্থাৎ মূল গঙ্গার পূর্ব্ব তীর দিয়া মিছিল অগ্রসর হইয়া পুনরায় গঙ্গার ৮।৯নং অস্থায়ী পুল পার হইয়া কণখল পৌছিবে; সেখান হইতে পুনরায় কাটা গঙ্গার পাকা পুল পার হইয়া ষ্টেশনের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া আপন আপন আখড়াতে ফিরিবে।

হরিদ্বারের জুনা এবং নিরঞ্জনী আখড়ার মিছিলের পরই ১০ঘটিকার সময় কণখলের "নির্ব্বাণী" সন্ন্যাসিগণের মিছিল বাহির হওয়ার কথা। ইহারাও জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসিভুক্ত। ইহাঁদের মিছিল কণখল সহর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব মিছিলের মত ৮।৯ নং পুল পার হইয়া "বেলওয়ালা" ও "রোরি" দ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্ত হইয়া ১১নং পুলের নিকট রক্ষিত স্থানে হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া ১১নং ও ৩নং গঙ্গার পুল পার হইয়া কাশ্মীর

জন্য ঘাট, ৫নং ফটক ভীমগড়ার রাস্তা ও ৪নং ফটক হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে উপস্থিত হইবে। তৎপর স্নানাদি অন্তে পূর্ব্বোক্ত চত্বরের উপর দিয়া ৪নং পুলে গঙ্গা পার হইয়া হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইয়া ৮।৯নং পুল পার হওতঃ কণখল সহরে পুনঃ প্রবেশ করিবে।

কণখলের "নির্ব্বাণিগণের মিছিলের পর, কণখলের বড় উদাসিগণের মিছিল ১২ঘটিকার সময় বাহির হওয়ার ব্যবস্থা ছিল; ইহাদের মিছিলের যাতায়াতের পথও "নির্ব্বাণিগণের মিছিলের অনুরূপ। ইহারা নানকপন্থী "সঙ্গতিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত।

বড় উদাসিগণের মিছিলের পর কণখলের ছোট উদাসিগণের মিছিল ১ঘটিকার সময় বাহির হওয়ার কথা ছিল। ইহাদের মিছিলের যাতায়াতের পথও পূর্ব্ব মিছিলের অনুরূপ। ইহারা নানকপন্থী "ধুনিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত।

ছোট উদাসিগণের মিছিলের পর মায়াপুরের "নির্ম্মলা" সাধুগণের মিছিল ৩ঘটিকার সময় বাহির হওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাদের মিছিলের যাতায়াতের পথ "জুনা" এবং "নিরঞ্জনী" আখড়ার মিছিলের অনুরূপ। ইহারা নানকপন্থী দশমগুরু গোবিন্দসিংহের সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথম স্নানে এই পাঁচটী মূল মিছিল বাহির হওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

অস্থায়ী ফটক।

কুম্ভযোগে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য বহু লক্ষ লোক সমবেত হয়। এই সঙ্কীর্ণ কুণ্ডটীতে এবং তৎসংলগ্ন রাস্তায় এত ভিড় হয় যে, প্রতি কুম্ভেই বহুলোক ভিড়ে চাপা পড়িয়া এবং পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনাদি নিবারণার্থ সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মকুণ্ড সংলগ্ন মূল তিনটী রাস্তায় প্রত্যেকটীতে পর পর তিনটী করিয়া মোট ৯টী ফটক বা অবরোধ (Barrier) নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এই ফটকগুলি কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পাঠকের কৌতুহল জন্মিতে পারে; এজন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া গেল। সড়কের মধ্যস্থলে "হারিকাঠের" ন্যায় প্রকাণ্ড একটী কাঠ বসান হইয়াছে; এই কাঠটী এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে পর পর দুইটী কাঠ ইহার গাত্রে বসিতে পারে; আর ২টী কাঠের চড়ক সড়কের দুই পার্শ্বে বসান হইয়াছে; প্রত্যেক চড়কে দুইটী দুইটী কাঠ দড়ি দ্বারা ঝুলান রহিয়াছে, দড়ি ঢিল দিলেই এই কাঠগুলি, অর্থাৎ দুই দিক হইতে ৪টী কাঠ পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্ত্তী কাঠের মধ্যে পড়িয়া দুই সারি সুদৃঢ় কাঠের বেড়ার ন্যায় হইয়া যায় এবং দড়ি টানিয়া ধরিলে কাঠ ৪ খানা দুই দিকে উপরে উঠিয়া যায়; আর রাস্তা খোলা হইয়া যায়। হরিদ্বারের সড়ক রাস্তাতে এই প্রকার তিনটী ফটক অর্থাৎ ১।২।৩ নং ফটক, ভীমগড়ার রাস্তাতে ৪।৫।৬ নং ফটক এবং বাজারের রাস্তায় ৭।৮।৯ নং ফটক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই ফটকগুলিতে কিরূপে কার্য্য করা হইত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। এই ফটকগুলি দুই তিন শত হাত অন্তর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ফটকের

সংলগ্ন পাকা বাটীর ছাদে একটী করিয়া সাঙ্কেতিক পাখা (Signal) বসান হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী মঞ্চে একটী এবং কুণ্ডসংলগ্ন সর্ব্বোচ্চ ত্রিতল হর্ম্ম্যের ছাদের উপর ১টী, মোট ১১টী সাঙ্কেতিক পাখা বসান হইয়াছিল। প্রত্যেক পাখাতে উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী এবং নিম্নে প্রত্যেক ফটকেতে বহু মিলিটারী এবং সিভিল পুলিস নিযুক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মকুণ্ডের এবং তৎসংলগ্ন ত্রিতল হর্ম্ম্যোপরি পাখাটী স্বয়ং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ পরিচালনা করিতেন। ব্রহ্মকুণ্ডে একবারে যতগুলি যাত্রী স্নান করিতে পারে, ততগুলি পূর্ণ হওয়া মাত্রই ব্রহ্মকুণ্ডের পাখাতে সংকেত করা হইবে; তদ্দৃষ্টে ত্রিতল ছাদের পাখাটী উঠিবে, অমনি দেখাদেখি সবগুলি সাঙ্কেতিক পাখা উঠাইয়া দেওয়া হইবে, আর তৎসঙ্গে নয়টী ফটকই বন্ধ হইয়া যাইবে; যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকিয়া যাইবে; কাহারও অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। আবার ব্রহ্মকুণ্ডে সব লোকের স্নান হওয়া মাত্র তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইবে এবং সাঙ্কেতিক পাখা পড়িবে, অমনি অপর পাখাগুলি ফেলান হইবে; আর অমনি সবগুলি ফটক যুগপৎ খুলিয়া যাইবে, এবং লোক ফটকের পর ফটক পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আসিতে থাকিবে, আবার কুণ্ড পূর্ণ হওয়া মাত্রই ব্রহ্মকুণ্ডের পাখা উঠিবে, অমনি অপর সবগুলি পাখাও উঠিবে, সঙ্গে সঙ্গে সবগুলি ফটক পুনরায় বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ ভাবে ফটকগুলির কার্য্যের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

কুম্ভযোগে প্রথম স্নান।

কুম্ভের প্রথম স্নান উপলক্ষে শান্তিরক্ষার জন্য বহু সহস্র মিলিটারী ও সিভিল পুলিসের আগমন হইয়াছিল। হরিদ্বার ও কণখল সহরটী ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন আর গঙ্গার অপর পারে "রোরি" দ্বীপ এবং "বেলওয়ালা" দ্বীপ প্রভৃতি বিজনোর (Bijnore) মহারাজের রাজ্যের অন্তর্গত; সুতরাং বিজনোর রাজ্যের বহু পুলিশ এবং পুলিশ কর্ম্মচারীও শান্তিরক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাহারাণপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি এবং বিজোনোর রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিও শান্তিরক্ষার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কখনও হাতীতে চড়িয়া কখনও বা মটর গাড়ীতে চড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রথম স্নান উপলক্ষে বহুলক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। হরিদ্বার সহর, "রোরি" দ্বীপ, "বেলওয়ালা" দ্বীপ এবং ব্রহ্মকুণ্ডঘাট বিশেষরূপ বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল—নৈশ দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখাইত! স্নানের দিনের পূর্ব্ব রাত্রি হইতেই পুলিশের নানা প্রকার কুচ কাওয়াজ চলিতে লাগিল, ফটকগুলিতে বিশেষরূপ মিলিটারী পুলিশের বন্দোবস্ত হইল। সাঙ্কেতিক পাখাগুলি পুলিশ অফিসারগণ অধিকার করিয়া বসিলেন, রাস্তাগুলিতে যথাযথ শান্তি-পুলিশ স্থাপিত হইল। লক্ষ লক্ষ যাত্রিগণ ব্রহ্মকুণ্ড অভিমুখে আবেগভরে সানন্দে ছুটিতে লাগিল—রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় হইতে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান আরম্ভ হইল। সে কি আনন্দ—জল, স্থল, ব্যোমে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ

হইতে আগত যাত্রিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে স্নান করিতেছে। এত ভিড় সত্ত্বেও তাহারা যে স্নান করিতে সক্ষম হইয়াছে এজন্য যেন তাহাদের সমধিক আনন্দ। তাহারা যেন আনন্দে বিভোর হইয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে—তাহাদের আনন্দধ্বনিতে জল, স্থল, এবং গগনমণ্ডল মুখরিত! হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকগণ সমস্বরে গঙ্গামায়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া গান ধরিয়াছে, আর সেই সুবৃহৎ জনতা হইতে মধ্যে মধ্যে "গঙ্গামায়ী কি জয়" ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিক্‌-দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে;—এহেন দৃশ্য না দেখিলে ভাষায় বুঝিবার নহে বা বুঝাইবারও নহে। ব্রহ্মকুণ্ড এবং তৎসংলগ্ন স্থান যাত্রীতে পরিপূর্ণ হওয়া মাত্রই বংশীধ্বনি হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাঙ্কেতিক পাখাগুলি উঠিল, অমনি নয়টী ফটক বন্ধ হইয়া গেল; যাত্রিগণ যে যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিয়া গেল। এদিকে প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে কুণ্ডে উপস্থিত যাত্রিগণের স্নান শেষ হইল, তাহাদিগকে গঙ্গার বাঁধান চত্বরের দিকে সরাইয়া দেওয়া হইল; তাহারা সেখান হইতে কেহ কেহ গঙ্গা পার হইয়া, আর কেহ বা অন্য রাস্তা ধরিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিল। ব্রহ্মকুণ্ড জনশূন্য হওয়া মাত্রই আবার বংশীধ্বনি হইল, তৎসঙ্গে সবগুলি সাঙ্কেতিক পাখা পড়িয়া গেল, অমনি নয়টী ফটক যুগপৎ খুলিয়া গেল, যাত্রিগণ প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল, পাহাড়াওয়ালাদের অনুরোধ, নিষেধ (ধীরে ধীরে যাইবার জন্য,) কিছুতেই শুনিল না, দু'এক স্থানে কেহ বা চাবুকের আঘাত খাইয়াও ভ্রূক্ষেপ করিল না; ছুটিতে ছুটিতে ফটকের পর ফটক পার হইয়া ব্রহ্ম-কুণ্ডে পৌছিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ হাত ধরাধরি করিয়া হাসিমুখে ছুটিতে লাগিল, এইরূপে ৩।৪ মিনিটের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড আবার যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আবার বংশীধ্বনি হইল, তৎসঙ্গে সাঙ্কেতিক পাখা উঠিল, আর ফটকগুলিও বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে ক্রমাগত যাত্রিগণের স্নান চলিতে লাগিল। বেলা আট ঘটিকার সময় জুনা এবং নিরঞ্জনী আখড়ার মিছিল বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে মণ্ডলেশ্বর এবং মোহন্তগণ বসিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যস্থলে গেরুয়া রঙ্গের প্রকাণ্ড সাম্প্রদায়িক নিশান এবং সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত, স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত অপর দুইটী নিশান শোভা পাইতেছে। এই নিশানগুলি যাহাতে সোজাভাবে থাকে, এজন্য প্রত্যেক নিশানে ৩.৪টী করিয়া সুন্দর দড়ি বাঁধা হইয়াছিল, ঐ দড়িগুলির প্রত্যেক-টীতে এক একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা মাটিতে থাকিয়া বিভিন্ন দিক হইতে ঐ দড়িগুলি টানিয়া ধরিয়া নিশানগুলি ঠিক রাখিত, এবং হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিত। তৎপর রৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য দোলাতে শ্রীগুরুপাদুকা এবং গুরুর আসন বহির্গত হইলেন, চতুর্দ্দিকে সাধুগণ জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর ইংরেজী বাদ্য এবং সানাই প্রভৃতি দেশীয়বাদ্য বাজিতে লাগিল—সেই শব্দে যেন হরিদ্বার সহরটী কাঁপাইয়া তুলিল। তৎপর দিগম্বরবেশে নাগা সন্ন্যাসিগণ বাহির হইতে লাগিলেন, ইহাঁদিগকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল—ইহাঁরা লজ্জা সরমের অতীত

হইয়াছেন, আর লজ্জাই বা কিসের ? ইহাঁরা যে জগজ্জননীর আদুরে ছেলে ! মায়ের কাছে ছেলের আবার লজ্জা কিসের ! ইহরা ত আর প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ নন ! ইহারা যে একমাত্র ভগবানের নামে আত্মহারা হইয়াছেন, কাজেই কৌপীনের আবরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যথার্থই বালক সাজিয়াছেন ! বিরাগী বালকগণ ! তোমরাই ধন্য ! কবে তোমাদের মত সর্ব্বত্যাগী এবং সরল বালকের মত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জগজ্জননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিব ? হাতে হাতে ধরিয়া দুই দুইজন করিয়া নাগা সন্ন্যাসিগণ বাহির হইতে লাগিলেন, কিছুতেই আর শেষ হয় না, এইরূপে বহু সহস্র নাগা বাহির হইলেন, মুখে "গঙ্গেহর" এবং "হর-হর ব্যোম" রবে দিকদিগন্ত মুখরিত। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিমণ্ডিত—জটাজুটসমাযুক্ত এই বিরাট নাগা সাধুর দল দেখিয়া কত ভাবই মনে জাগিতে লাগিল; মনে হইল, যেমন সগর-সন্তানগণ উদ্ধার মানসে পতিতপাবনী গঙ্গা সাগরের নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্রেই উচ্ছ্বাসে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া, সাগরে মিলিত হইয়া সাগরসঙ্গম করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবাদিদেব মহাদেব যেন গঙ্গা বিরহে কাতর হইয়া আজ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ! গঙ্গাবিরহ যেন তাঁহার আর সহ্য হইতেছে না, তাই গঙ্গাকে নিকটে জানিয়া আবেগভরে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গঙ্গ-সঙ্গমে ছুটিয়াছেন ! কতক্ষণে গঙ্গাতে গিয়া বিরহ-বিদগ্ধ প্রাণের জ্বালা শীতল করিবেন, এজন্য ব্যস্তভাবে গঙ্গা ভোলা গঙ্গা নাম জপিতে জপিতে দিগম্বর বেশে যেন ছুটিয়া চলিয়াছেন ! নাগা সন্ন্যাসিগণের পরে কৌপীনধারী সাধুগণ চলিতে লাগিলেন, ইহাঁদের সংখ্যাও কম হইবে না। অতঃপর বহির্ব্বাসপরা এবং নানা প্রকার বেশধারী সাধুগণ চলিতে লাগিলেন, ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন মোহন্ত পাল্কীতে চড়িয়া চলিলেন। বলা বাহুল্য যে ইহারা সকলেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে বহু সহস্র সাধু মহাত্মা যাওয়ার পর আলেখিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ভৈরবী মা-গণ বাহির হইতে লাগিলেন। ইহাঁরাও দুই দুই জন করিয়া সারি বান্ধিয়া চলিতে লাগিলেন। ইহাঁরা বিভূতিমণ্ডিত, জটাজুটসমাযুক্ত, সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত; চিমটা হস্তে, বামাকণ্ঠে সুমধুর স্বরে "ব্যোম্ ব্যোম্ হর" রবে তালে তালে পা ফেলিয়া, চিমটার ঝন ঝন শব্দ করিয়া সানন্দে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে ছিলেন ! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ! ইহাদের সংখ্যাও তিনি চারি শতের কম হইবে না। এইরূপে এই মিছিল বাহির হইয়া পূর্ব্বকথিত রাস্তায় চলিতে চলিতে রক্ষিত ময়দানে হাতী ইত্যাদি রাখিয়া প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় ব্রহ্মকুণ্ডে পৌছিল। তৎপূর্ব্বেই ব্রহ্মকুণ্ডের সমস্ত যাত্রিগণকে সরাইয়া কুণ্ড জনশূন্য করা হইয়াছিল। ব্রহ্মকুণ্ডে মিছিল পৌছিলে সর্ব্বাগ্রে গুরু-পাদুকা সমারোহের সহিত স্নান করান হইল; তৎপর নাগা সাধুগণ স্নান করিলেন; অতঃপর যাঁহার যাহার ইচ্ছা তাঁহারা স্নান করিলেন; কেহ বা জল স্পর্শ করিয়াই স্নান সমাধা করিলেন। এইরূপে স্নানাদি শেষ হইলে মিছিল ক্রমে

গঙ্গা পার হইয়া রক্ষিত স্থান হইতে হাতী ইত্যাদি লইয়া আবার মিছিল সাজাইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার তীরে তীরে যাইতে লাগিল। অশ্বারোহী পুলিস মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এদিকে দশ ঘটিকার সময় কণখলের "নির্ব্বাণী" সন্ন্যাসিগণের মিছিল বাহির হইয়া গঙ্গার অপর তীরে পৌছিল। ইহাঁদের মিছিলেও সন্ন্যাসী আরোহী সহ কয়েকটি হাতী এবং সাম্প্রদায়িক নিশান প্রভৃতি ছিল; সুদৃশ্য কারু-কার্য্যখচিত দোলাতে শ্রীগুরু-পাদুকা প্রভৃতি ছিল; সুমধুর ব্যাণ্ড বাজনায় দিকদিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত বহু সাধু সন্ন্যাসী পাল্কি ও অশ্বারোহনে এবং পদব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। এই মিছিলের হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি রক্ষিত ময়দানে রাখিয়া, মিছিল ব্রহ্মকুণ্ডে পৌছিল—ইহারাও সর্ব্বাগ্রে গুরুপাদুকা স্নান করাইয়া পরে নিজেরা স্নান করিলেন, আর কেহ বা জল স্পর্শ করিলেন। তৎপর গঙ্গাপার হইয়া হাতী ঘোড়া দ্বারা মিছিলের পূর্ণতা সম্পাদন করতঃ গঙ্গার তীরে তীরে চলিয়া মিছিল কণখলে নিজ আখড়ায় চলিয়া গেল। ইত্যবসরে কতক যাত্রী স্নান করিয়া লইল। ওদিকে ১২ ঘটিকার সময় কণখলের বড় উদাসিগণের মিছিল বাহির হইয়া ১টার সময় গঙ্গার অপর পারে পৌছিল। এই মিছিলের ঐশ্বর্য্য খুব বেশী ছিল। হস্তী-পৃষ্ঠে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদাতে মোহন্তগণ বসিয়া ছিলেন, মিছিলে অনেকগুলি হাতী ছিল; এবং কারুকার্য্যযুক্ত স্বর্ণ-খচিত বহুমূল্য অনেকগুলি বৃহৎ নিশান ছিল। স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত গুরু-পাদুকায় দোলা, সুমধুর ব্যাণ্ড, বহুমূল্য ছত্র "আসাসোটা" প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ ছিল। সাধুগণের মধ্যে কেহ কেহ পাল্কীতে গিয়াছিলেন; আর সহস্র সহস্র জটজুট-সমাযুক্ত, বিভূতিমণ্ডিত কৌপীনমাত্রৈক-সম্বল উদাসী সাধু পদব্রজে মিছিলের সঙ্গে গমন করিয়া মিছিলের শোভাবর্দ্ধন করিয়া-ছিলেন। মিছিলের হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি রক্ষিত ময়দানে রাখিয়া মিছিলের অবশি-ষ্টাংশ গঙ্গাপার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইল। ইহারাও সর্ব্বাগ্রে গুরুপাদুকা স্নান করা-ইয়া পরিশেষে নিজেরা স্নান করিলেন; এইরূপে স্নান শেষ করিয়া মিছিল গঙ্গা পার হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে এক ঘটিকায় সময় রওনা হইয়া কণখলের ছোট উদাসিগণের মিছিল গঙ্গার অপর পারে দেখা দিল। বড় উদাসিগণ রক্ষিত স্থান হইতে হাতী প্রভৃতি লইয়া মিছিল পুনর্গঠন করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতক অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ছোট উদাসিগণ তাহাদের হস্তী প্রভৃতি রক্ষিত স্থানে রাখিয়া গঙ্গাপার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে পৌছিলেন। ইহাঁদের ঐশ্বর্য্যও নেহাৎ কম নহে,—ইহা-দের মিছিলেও কয়েকটা হাতী, বহুমূল্য নিশান, সুদৃশ্য মূল্যবান দোলা, ছত্র, ব্যাণ্ড বাদ্য প্রভৃতি সকলি ছিল। কয়েক সহস্র উদাসী সাধুও পদব্রজে গমন করিয়া মিছি-লের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সাম্প্রদা-য়িক রীতি অনুসারে ইহারাও সর্ব্বাগ্রে গুরু-পাদুকা স্নান করাইয়া পরে সকলে স্নান করিয়াছিলেন; আর কেহ বা জলস্পর্শ করি-য়াছিলেন।

এইরূপে স্নানাদি শেষ হইলে; ইহারা গঙ্গা পার হইয়া হস্তী ইত্যাদি দ্বারা মিছিল পুনরায় সজ্জিত করিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে আপন আপন আখড়ায় চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে যাত্রিগণের স্নান আরম্ভ হইল; কারণ মিছিলের জন্য কয়েক ঘণ্টা দরজাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। যাত্রিগণের কষ্টের আর পরিসীমা নাই। ভোর হইতে যাত্রিগণ ক্রমাগত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ক্লান্ত হইয়া অনেকে বসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক রাস্তায় যতদূর দৃষ্টি চলে অর্দ্ধ কি তিন পোয়া মাইল পর্য্যন্ত কেবল মানুষের মাথা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যাইতেছে না। সমস্ত দিন অনাহারে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বসিয়া আছে,—কেহ বা কচি ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, ছেলেমেয়ের আর্ত্তনাদে পাষণ্ডও বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যায়! তথাপি কাহারও মুখে অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সকলেরই বুকভরা আশা, আর প্রাণভরা বিশ্বাস যে, যত কষ্টই হউক না কেন, তাহারা একটী বার গঙ্গাতে স্নান করিয়া প্রাণের সকল জ্বালার অবসান করিবে; এই আশায় বুক বাঁধিয়া যেন সকলেই সময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। যখনই চকিতের মত কটকগুলি যুগপৎ খুলিয়া যাইতেছে, অমনি হাত ধরাধরি করিয়া হাসিমুখে উল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে! সিপাহীর নিষেধ বা তাড়ানায় ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না! ধন্য ধর্ম্মপ্রাণতা! এত কষ্ট সহ্য করিয়া সিপাহীর তাড়না খাইয়াও হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া যাওয়া ইহা হিন্দুতেই সম্ভবে—হিন্দু-নরনারিগণ ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন! নির্য্যাতন সহ্য করা ত তাহাদের পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। ব্রহ্মকুণ্ডে একসঙ্গে তিন চারি হাজার যাত্রীর অধিক একত্রে স্নান করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর স্নানের যে কত সময় দরকার তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। কিছুকাল যাত্রিগণ স্নান করার পর গঙ্গার অপর তীরে নির্ম্মলা সাধুগণের মিছিল দৃষ্ট হইল, ইহারা তিন ঘটিকার সময় মায়াপুর আখড়া হইতে রওনা হইয়া প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকার সময় গঙ্গার অপর পারে পৌছিয়াছেন। ইহাদের আগমনে যাত্রিগণ সরাইয়া আবার ব্রহ্মকুণ্ড জনশূন্য করা হইল। ইহাদের মিছিলটি সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইলব্যাপী হইবে। সর্ব্বাগ্রে ৫টী হাতীর উপর বহু সাধু মহাত্মা বসিয়াছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যস্থলে ৩।৪টী করিয়া বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড সাম্প্রদায়িক নিশান, এই নিশানগুলিও চারিদিকে দড়ি বাঁধিয়া মাটী হইতে বহুলোকে সেই সব দড়ি ধরিয়া সোজা রাখিয়া হাতীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তৎপর সুমধুর নানা প্রকার দেশীয় এবং ইউরোপীয় বাদ্য বাজিতেছিল। অতঃপর তিন চারি খানা স্বর্ণরৌপ্যখচিত বহুমূল্য দোলা এবং চৌকিতে গুরুপাদুকা, গুরু নানকজীর আসন, "গ্রন্থ সাহেব" প্রভৃতি বহুমূল্য আবরণে আবৃত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলা সাধুগণ স্তোত্রপাঠ এবং গান করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তৎপর একটী খুব উচ্চ সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদাতে মোহন্তজী বসিয়াছিলেন, তাঁহার উপরে বহুমূল্য ছত্র

ধরা হইয়াছিল এবং চামর ব্যজন করা হইতেছিল। অতঃপর বহু "আসাসোটা" ধারী সাধুগণ যাইতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত "রামশিঙ্গা" বাজিতে লাগিল। তৎপর কতকগুলি সুসজ্জিত পাল্কীতে কয়েকজন সাধু মহাত্মা গেলেন, বহু নির্ম্মলা সাধুগণ গান করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। এই সাধুগণের বেশভূষা অতিসুন্দর; প্রায় প্রত্যেকেরই গাত্রে সুরঞ্জিত আলখেল্লা, পায়ে নাগরাই জুতা, মস্তকে সুদৃশ্য পাগড়ী, হস্তে দীর্ঘ দণ্ড এবং আলখেল্লার উপর কাহারও সুন্দর চাদর শোভা পাইতেছিল। এই সম্প্রদায়ের সাধুগণ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সর্ব্বশেষে সুসজ্জিত উষ্ট্র এবং আরও চারিটী সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্টে বহু সাধু মহাত্মা বসিয়া মিছিলের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মিছিলের দশটী হস্তী ও উষ্ট্র প্রভৃতি রক্ষিত স্থানে রাখিয়া মিছিলের অবশিষ্ট অংশ গঙ্গাপার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌছিল। সর্ব্বাগ্রে গুরুপাদুকা স্নান করান হইল, মোহন্তগণ কেহ কেহ পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া কুণ্ডের গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন, কেহ কেহ বা স্নান করিলেন, তৎপর মিছিল গঙ্গা পার হইয়া হস্তী ইত্যাদি লইয়া পুনর্গঠন করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার তীরে তীরে চলিতে লাগিল। পুলিসসাহেব এবং কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাদের পশ্চাতে গমন করিলেন; প্রায় সন্ধ্যার সময়ে মিছিল নিজ আপড়াতে পৌছিল। এদিকে নির্ম্মলা সাধুগণ ব্রহ্মকুণ্ড পরিত্যাগ করামাত্রই যাত্রিগণের স্নানের ধূম পড়িয়া গেল, কারণ সাধুগণের স্নান শেষ হইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের, স্নানে গঙ্গা যেন আরও পবিত্র হইয়াছেন। পাপীতাপিগণের পাপভারে গঙ্গা যেন ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, আজ সাধুগণের স্নানে গঙ্গা যেন সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইলেন। এক্ষণে যাত্রিগণ এই পবিত্র জলে স্নান করিয়া জন্ম সফল করিয়া ধন্য হইবেন, তাই যেন তাহাদের সমধিক আনন্দ,—আনন্দ যেন আর গায়ে ধরিতেছে না! বিশেষতঃ সমস্ত দিন আশায় আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকার পর এই স্নান যে কি মধুর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে। ক্রমে রাত্রি হইল, ব্রহ্মকুণ্ডের বৈদ্যুতিক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল, কুণ্ডটী দিবালোকের ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল। ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী মঞ্চের চারিদিকে প্রায় একশত কি দেড়শত বৈদ্যুতিক আলোক বসান হইয়াছিল। এই সব সারি সারি আলোকমালায় সন্ধ্যার পর ব্রহ্মকুণ্ডের যে কি অপূর্ব্ব শোভা হইত তাহা বর্ণনাতীত। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত যাত্রিগণের স্নান চলিল; কেহই বাকী থাকিল না বা নিরাশ হইল না। এত রাত্রিতে স্নান করিয়াও তাহাদের আনন্দের অভাব নাই,—তাহারা যে স্নান করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাতেই তাহারা নিজকে ধন্য মনে করিতেছে। এইরূপে কুম্ভের প্রথম স্নান শেষ হইল। ব্রহ্মকুণ্ডে নিযুক্ত ইংরেজরাজকর্ম্মচারিগণ এবং শান্তিরক্ষক সিভিল ও মিলিটারী পুলিসগণের ধৈর্য্য এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়। ইহারাও সমস্ত দিন না খাইয়া কেহ বা সামান্য জল খাবার মাত্র খাইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। ইহাদের ব্যবহারও অতীব প্রশংসনীয় এবং ভদ্রজনো-

চিত। সাধু সন্ন্যাসীকে শান্তিরক্ষক পুলিশগণ "বাবা," কিম্বা "মহারাজ" ব্যতীত কখনও হীনভাবে সম্বোধন বা ব্যবহার করেন নাই; কোন বিষয়ে নিষেধ করিতে হইলে যোরহস্ত হইয়া অবস্থাটী বুঝাইয়া দিতেন। বাস্তবিক ইহারা সকলেই আদর্শ পুলিশ, ইহাদের দ্বারাই প্রকৃত শান্তিরক্ষা হয়। এই স্নান উপলক্ষে যে উপস্থিত সমস্ত সাধু সন্ন্যাসিগণই যোগ দিয়াছিলেন এবং সমস্ত যাত্রিগণই যে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। বহু সাধু মহাত্মা মিছিলে যোগদান না করিয়া কিম্বা ব্রহ্মকুণ্ডের ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খাইতে না আসিয়া, আপন আপন কুটিয়ার নিকটেই গঙ্গা স্নান করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা ত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া পুণ্যলাভের প্রয়াসী নন! কাজেই পাপপুণ্যের অতীত সেই মহাত্মাগণ আড়ম্বরের সহিত মিছিলে যোগদিয়া হৈ চৈ করিতেও চাহেন না, আর ব্রহ্মকুণ্ডে পুণ্য করিতে আসিয়া ভিড়ে দেহ নষ্ট করিতেও রাজী নন; কাজেই নীরব কর্ম্মী তাঁহারা নীরবেই আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করেন। ভিড়ের ভয়ে বহু যাত্রীও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান না করিয়া গঙ্গার অন্যান্য ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। কুম্ভযোগে প্রথম স্নানে প্রায় দুইলক্ষ সাধু সন্ন্যাসী এবং প্রায় আট লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। এই যাত্রিগণের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেই অধিকাংশ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। প্রথম স্নানের পর ২।৩ দিন মধ্যে অনেক যাত্রী আপন আপন বাসস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। প্রথম স্নান উপলক্ষে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয় নাই। এখানে আমরা কুম্ভের প্রথম স্নানের বিবরণ শেষ করিলাম। ক্রমশঃ।

জনৈক দর্শক।

---:0:---

আগমনী।

(১)

পুলকে পূরিত বিশ্ব আনন্দেতে আত্মহারা।
কি এক মোহন সুরে বাজিয়া উঠিল ধরা॥
কি এক অপূর্ব্ব স্রোত বহিয়ে সবার প্রাণে।
এক মুখে এক ভাবে নিতেছে সবায় টেনে॥
নাই আর কোলাহল, নাই আর হাহাকার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার॥

(২)

কি এক বিলুপ্ত আশা জাগিয়ে সবার প্রাণে।
কি এক অজানা দেশে নিতেছে সবায় টেনে॥
কি এক মোহন মন্ত্রে মোহিত সবাই আজ।
সবাই পরেছে আজ কি এক মোহন সাজ॥
বাজিয়া উঠিল আজ নীরব বীণার তার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার।

(৩)

স্থাবর জঙ্গম আদি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ।
সবাই ব্যাকুল আজ পাইতে সবার সঙ্গ॥
কাননে ফুটিছে ফুল উজলিয়া দশদিশি।
করিতেছে মধুপান শিলীমুখ হাসি হাসি॥

জগৎ জুড়িয়ে আজ ঝরিছে প্রীতির ধার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার॥

(৪)

মেঘমুক্ত নীলাকাশে অসংখ্য তারকারাজি।
হাসিতেছে বুকে লয়ে বিমল শারদ শশী॥
বিমল জ্যোৎস্না বাস পরিয়ে প্রকৃতি সতী।
গাইছে আপন মনে কি এক মধুর গীতি॥
প্লাবিয়ে বিপুল ধরা ছুটিছে প্রেমের ধার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার।

(৫)

ধবল কিরীট পরে অদূরে হিমাদ্রি হেসে।
বিশাল বিরাট তনু আবরি সুনীল বাসে॥
নীরব ভাষায় যেন ঘোষিছে আপন মনে।
"আসিছে প্রেমের ঢেউ ভাসাতে জগত জনে"॥
সেও আজ ঢেলে দিছে প্রীতি পুষ্প উপহার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার।

(৬)

ভাসায়ে দুকুল হের ওই ক্ষীণা স্রোতস্বতী।
কুলু কুলু নাদে ধায় গাইয়ে মিলন-গীতি॥
তুলিয়ে লহরমালা ধাইছে সাগর পানে।
অঙ্গে ভঙ্গে নেচে গেয়ে কি এক মধুর তানে॥
দুকুল ডুবায়ে তার ছুটিছে আনন্দ ধার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার॥

(৭)

ঢাকিয়ে হরিৎবাসে বিশাল প্রান্তর আজি।
সুন্দরী প্রকৃতি সতী পরিয়ে মোহন সাজ॥
সুগন্ধি কুসুম দিয়ে ভরিয়ে পূজার থালা।
করিছে প্রতীক্ষা কার সাজায়ে বরণ ডালা॥
প্রকৃতির শোভা দেখে আনন্দ ধরে না আর।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার॥

(৮)

নববেশে সেজেগোজে বালক বালিকা সবে।
নাচিছে গাইছে তারা "জয় মা" "জয় মা" রবে॥
আনন্দেতে আত্মহারা যুবক যুবতী যত।
ভক্তিভরে বৃদ্ধাগণ পূজায় হয়েছে রত॥
সবার মুখেতে হাসি, ম্লানমুখ নাহি কার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার॥

(৯)

সকলে মেতেছে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাবে।
কি এক প্রীতির সূতে গ্রথিত হয়েছে সবে॥
ভুলে গেছে দলাদলি, হিংসাদ্বেষ নাহি আর।
সবাই বলিছে আজ "তুমি মোর, আমি তোমার"।
শোভিছে সবার গলে অপূর্ব্ব মিলন-হার।
বুঝি বা আনন্দময়ী আসিতেছে মা আমার।

(১০)

মাগো, সবাই পুজিছে তোরে, যথাসাধ্য উপচারে।
কি আছে আমার মাগো, কি দিয়ে পুজিব তোরে?
আমি যে সম্বলহীন কি আর আছে গো বল!
ধুয়াতে চরণ তব আছে তপ্ত অশ্রুজল॥
তোর আগমনে যদি আনন্দে ভাসিছে সবে।
তবে এ অধম মাগো, কেন নিরানন্দে রবে?

(১১)

মাগো,
ষড়রিপু অত্যাচারে সদাই জ্বলিছে প্রাণ।
পারি না ছাড়িতে মাগো কাম, ক্রোধ, অভিমান॥

নিজ গুণে কৃপা করে রক্ষ গো জননী মোরে।
তুমি না করিলে কৃপা কে আর চাহিবে ফিরে?
দূর হোক কাম ক্রোধ, হিংসা দ্বেষ যাই ভুলে।
ধুয়ে পুছে মা আমার তুলিয়া লও গো কোলে॥

(১২)

এ শুভ মুহূর্ত্তে মাগো কর এ আশীষ দাসে।
পীড়ন করে না যেন কামক্রোধ, হিংসা দ্বেষে॥
পরের দুঃখেতে যেন যাই গো আপনা ভুলে।
পারি যেন দীন, দুঃখী তুলিয়া লইতে কোলে॥
তোমার নামেতে মাগো হই যেন আত্মহারা।
সুখে দুঃখে গাই যেন "জয় মা", "জয় মা তারা"॥

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:0:—

ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

এ জগতে বড়ছোট, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা, প্রজা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই সুখ শান্তির জন্য লালায়িত,—সকলেই সুখের আশায় কস্তূরী মৃগের ন্যায় ব্যর্থ ছুটাছুটী করিয়া সাধের অমূল্য মানব জীবন বিফলে ব্যয় করিতেছে;—তাহারা সুখের আশায় মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের ন্যায় দুঃখকে জড়াইয়া ধরিতেছে, অথচ তাহারা জানিতে পারিতেছে না যে সুখ কোথায়? কি ভাবে জীবন গঠন করতঃ জীবন যাপন করিলে প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহারা জানে না বা জানাইলেও বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, তাহারা প্রত্যেকেই সেই অনন্ত সুখের উৎস,—একবার সেই সুখ প্রস্রবণের সন্ধান লাভ করিতে পারিলে, তাহা হইতে স্বতঃই যে সুখ মন্দাকিনীর অনন্তধারা প্রবাহিত হইবে, সে ধারা শুধু তাহাকে কেন,—ত্রিতাপ-দগ্ধ রোগ-শোকক্লিষ্ট সমস্ত নরনারীর আকুল প্রাণে শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইবে, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না বা সেই সুখ প্রস্রবণের সন্ধান করিতে যত্ন চেষ্টা করিতেও ইচ্ছুক নহে। অথচ পিতা-মাতা, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক সুহৃদ, সকলেই সততই ইচ্ছা করেন, আমরা সুখী হই, আমাদের ছেলেমেয়ে, ভাই ভগ্নী, কন্যা জামাতা প্রভৃতি সৎ হউক; সুস্থ ও নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবনলাভকরতঃ সংসারে সুখের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করুক। আমরা তাহাদিগকে সুখী, সুস্থ ও নীরোগ দেখিয়া তাহাদের সম্মুখে হাসিতে হাসিতে ইহলোক হইতে প্রস্থান করি। কিন্তু হায়! তাহাদেরই দোষে,—শিক্ষা ও শাসনের অভাবে কালের গতি অন্যরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, অশীতিবর্ষবয়স্ক পিতামাতাকে রাখিয়া জনক-জননীর উপযুক্ত পুত্র ধরাধাম হইতে প্রস্থান করিতেছে। উপযুক্ত সন্তানহারা

হইয়া সন্তানবৎসল বৃদ্ধ জনকজননী কি দুঃখে কালাতিপাত করেন, তাহা সমাজের সকলেই দেখিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক স্বাস্থ্যবিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দিন দিন অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চোপাধি-ভূষিত হইয়া চসমাধারী জীর্ণ নরকঙ্কাল সমাজে প্রবেশ করতঃ অল্পদিন মধ্যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া সমাজের—দশের,—দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন॥

বর্ত্তমান সময়ে সমাজ উদ্ভ্রান্ত, নরনারিগণ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী! গৃহে গৃহে রোগ শোক, দারিদ্র্য ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে। কেন? ইহার কারণ কি কেহ অনুসন্ধান করতঃ তৎ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন? আমরা কেবল "হা হতোস্মি" ই করিতেছি; কিন্তু রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে বিন্দুমাত্রও প্রয়াস পাইতেছি না। এই অকালমৃত্যু, দুঃখ দারিদ্র্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও অশান্তির মূল অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন—ইহার মূল কারণ আমাদের ঘরের কোণে। বর্ত্তমান শিক্ষা বিভ্রাটই ইহার মূল কারণ। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ না হয়,—যে শিক্ষায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের বীজ নিহিত নাই, সে শিক্ষা সুশিক্ষা নামে অভিহিত হইবার অযোগ্য। যে শিক্ষা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত না করিয়া পশুত্বে অবনত করে, তাহাকে সুশিক্ষা বলিলে কুশিক্ষা আর কাহাকে বলিব? বাল্যকালই প্রকৃত শিক্ষার সময়; সে সময় কোমলমতি বালকবালিকাগণের মন কাচা মাটীর মত কোমল থাকে, তাহা দ্বারা যা খুসী তাই করা যায়, ইচ্ছা করিলে শিব গড়ান যায়; আবার বাঁদরও গড়ান যায়। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কোমলমতি বালকবালিকাগণের চিত্তনিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বীজগুলিও অঙ্কুরিত হইয়া কালে সুফল প্রসব করিতে পারে—তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া অভিভাবক ও শিক্ষকগণের অতি কর্ত্তব্য। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এতই হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, সেরূপ শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা, বরং কোন বালকের একটু ধর্ম্মভাব দেখিলে পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন কিম্বা শিক্ষকগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন এবং যাহাতে তাহার ধর্ম্মভাবের স্ফূরণ না হয় তদনুযায়ী সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে পশ্চাদ্পদ হন না!!! (এ আমাদের মনগড়া কথা নয়, পাঠকগণকে পরে বুঝাইতেছি।) যদি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত না হইল, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত হইয়াও সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ না হইল, তবে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস কণ্ঠস্থ থাকিলে,—গণিতে কি সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে এম, এ, ডিগ্রী পাইলে, কি হইবে? আমরা শাস্ত্রানুযায়ী চলিব না, বেদবেদান্ত মানিব না, অথচ নানা উপাধিতে ভূষিত হইয়া "পণ্ডিত" আখ্যা পাইলে কি হইবে? এরূপ উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, উন্মার্গগামী, উপাধিধারী শিক্ষিতগণ হইতে যে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, ভগবদ্বিশ্বাসী অশিক্ষিত চাষা যে সম্মানার্হ!!

কর্ম্মময় জীবনে বিদ্যার ক্রিয়া প্রকাশিত না হইলে,— শিক্ষা দীক্ষা নিজের জীবনে

প্রভৃতি স্ফুরিত করিতে না পারিলে, চিনির ভারবাহী বলদের স্থায় বিদ্যা বা উপাধি ব্যাধি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় !!!

অতি পুরাকালে আর্য্যঋষিগণ মানব-জীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন;—তন্মধ্যে প্রথমটীই ছিল "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন"। ইহাই ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। তৎকালে এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই ছোট, বড়, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের জীবন গঠন করা হইত। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সকলেই আপন আপন রুচি অনুসারে জীবনের পথ বাছিয়া লইতেন। কেহ বা দার-পরিগ্রহণাদি করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতঃ আদর্শ-গৃহীর জীবন যাপন করিয়া চরমে পরম পদে বিলীন হইতেন; আর কেহ বা চিরকুমার থাকিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজ হইতে "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" কথাটী একবারে উঠিয়া গিয়াছে; ইহা বড়ই অশ্লীল,—বড়ই লজ্জাকর কথা; ছেলে মেয়েদের কাছে একথা উচ্চারণ করিলে লজ্জায় মাথা হেট করিতে হয়। কিন্তু কেহ কি একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, এই লজ্জাজনক কার্য্যটীর উপরই ভগবানের সৃষ্টিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। যিনি "লজ্জা", "লজ্জা" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন,—এই লজ্জাজনক কার্য্যটী বাদ দিয়াই কি তাহার মত লজ্জাশীলের আবির্ভাব হইয়াছে? সুতরাং যে কাজ ভগবানের অভিপ্রেত,—যাহাতে তাঁহার সৃষ্টি-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা কখনই "কু" নয়, তাহার উদ্দেশ্য কখনই মন্দ হইতে পারে না। আমরা ব্যবহারের দোষে তাহা "কু" করিয়া ফেলিয়াছি,—"লজ্জাজনকরূপে" সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি। যতদিন ছেলেমেয়ে শিশু থাকে, সংসারের কলুষ-কালিমায় তাহাদের চিত্ত কলুষিত না হয়, ততদিন তাহারা লজ্জা বলিয়া কিছু জানে না,—বা বুঝে না; কিন্তু যখন হইতে আমাদের সাহচর্য্যে তাহাদের শুদ্ধচিত্তে পাপ-স্পর্শ করিতে থাকে, তখন হইতেই তাহারা সঙ্কুচিত, লজ্জিত ও কুটিল হইতে শিখে, তাহাদের সরল প্রাণে "কু"র ছায়া পড়িতে থাকে। যে সরল বালকবালিকা নিঃসঙ্কোচে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীকে হাসিমুখে সরল ভাবে কত কু-কথা (অবশ্য আমাদের বিচারে) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সে বালকবালিকা আজ আর সেভাবে সেকথা বলিতে পারিতেছে না; যদিও বলিতে বাধ্য হইল, সে মাথা নীচু করিয়া কত ভয়ে, কত লজ্জায় যেন সে কথা বলিতে বাধ্য হইতেছে। তার যেন কত যন্ত্রণা হইতেছে, তার মুখে আর হাসি নাই—তার সে সরলতামাখা মধুর দৃষ্টি আর নাই। কেন? কে তাহার সাদা প্রাণে কাদা মাখাইয়া দিল? শিশু ত কুটীলতা নিয়া—পাপ নিয়া আসে নাই! তার সুন্দর মুখের নিষ্কলঙ্ক হাসি দেখিয়া কত পাপী-তাপীর প্রাণেও ক্ষণিকের তরে স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! আজ সে অকলঙ্ক চাঁদে কে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিল? এজন্য আমরা (পিতামাতা, ভাইভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন) দোষী নই কি? আমরাই ত "আরে ছিঃ, লজ্জা" এ কথা বলতে নাই, প্রভৃতি বাক্যে ধমক দিয়া তাহাদিগকে সশঙ্কিত করিয়া দিয়াছি

যদি সরল ভাবে হাসিমুখে তাহাদিগকে এসব কথা বুঝাইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় সমাজের এত সর্ব্বনাশ হইত না। আমরা "লজ্জা", লজ্জা" বলিয়া চীৎকারকরতঃ সরলমতি বালকবালিকার যে কি ভীষণ অনিষ্ট সাধন করিতেছি, তাহা ভাবিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যদি পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি অভিভাবকগণ অতি শৈশবকাল হইতে সরলমতি বালকবালিকাগণকে "ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা" সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন বা দেন তাহা হইলে সমাজের এত অধঃপতন হইত না বা হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছে, বিশেষতঃ সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল,—বিদ্যালয়ের বালক ও যুবকগণের মধ্যে "ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার" ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে; ইহা সমাজের পক্ষে সু-সংবাদই বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বালক ও যুবকগণ যাহা বুঝিতেছে, হিতকাঙ্ক্ষী হইয়া সমাজের নেতা—পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি সুহৃদগণ বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা এসব স্কুল, কলেজের ছাত্রগণ হইতে অহরহ পত্রাদি পাইতেছি, সে সব পত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। নিম্নে ২১ খানা চিঠি হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতেই পাঠগণ বুঝিতে পারিবেন, "ব্রহ্মচর্য্য সাধন" শিক্ষাদান অভাবে, সমাজের কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। ভুক্তভোগী বালক ও যুবকগণের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক লিখিয়াছে—"এই অল্প বয়সে অশেষ প্রকারে শুক্রক্ষয় করিয়াছি। আজ প্রায় ছয়মাস হইল, আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি কিরূপ অপকর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু আর উপায় নাই, * * * আমি "ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের" ব্যবস্থানুযায়ী চলিতে চাই, কিন্তু আমার হিতৈষিণী মাতা ও আত্মীয় স্বজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। * * * আমাকে সদুপদেশ দানকরতঃ রক্ষা করুন।" আর একজন ২২ বৎসরের যুবক কি লিখিয়াছে, পাঠ করুন,—"নানা অত্যাচারে ও অবিচারে এবং কু-কার্য্যের ফলে আজ জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছি; তাই দুঃখে ও মনস্তাপে অধীর হইয়া শান্তি-লাভের আশায় আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাকে সদুপদেশ দানে সুখী করিবেন। * * * ও অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্যক্ষয় করিয়া এখন "পশু" সাজিয়াছি। কাজেই জীবনের আশা, ভরসা, উন্নতি সকল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। জীবন এখন দুর্ব্বিসহ ভার বলিয়া মনে হয়"। * * *

"ব্রহ্মচর্য্য অভাবে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ধারণাশক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। দীর্ঘ-কালব্যাপী অযথা শুক্রক্ষয়ে একেবারে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। পড়ায় মনো-যোগ নাই, সদাই উদাস ভাব। পরিশ্রমে অনাশক্তি। স্মৃতিশক্তির সম্পূর্ণ নাশ হইয়াছে বলিলে অযৌক্তিক হয় না। এখন উপায় কি? এবার এফ, এ, ক্লাসে পড়িতেছি, যদিও এবার পরীক্ষার বৎসর, কিন্তু পাঠে মন নাই, অথবা কিছুতেই পড়িতে পারি না; কারণ মাথা ঘুরে, মন হুহুকরে, চক্ষু ও হাত পা জ্বালা করে, খাদ্য পরিপাক হয় না। কখন কখন মস্তিষ্কে এরূপ বেদনা হয়, যাহাতে মাথা দাঁড় করিয়া রাখা যায় না। মূত্র-

মস্তে সময় সময় "অসহ্য প্রদাহ উপস্থিত হয়। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্বে রাত্রিতে শয়নকালে শুক্রক্ষয় হয়। কিছুতেই ইহার প্রশমন হইতেছে না। এখানকার প্রচলিত শিক্ষার অধীনে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যসাধনের নিয়ম পালন করা যায় না; অথচ ঐ নিয়ম পালন ব্যতীত আমার উদ্ধারের উপায় নাই। * * * কু-অভ্যাসের বিষময় ফলে আজ মূল্যবান জীবন নষ্ট হইতে বসিয়াছে। * * * হায়, শৈশবে যদি সৎ বন্ধু পাইতাম, তবে আজ এমন দশায় অধম হইয়া থাকিতে হইত না। ইত্যাদি।"

পাঠক ও অভিভাবকগণ দেখিলেন, শিক্ষা ও সংযমের অভাবে সমাজের কি ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। যে সমাজের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে, তাহা দ্বারা কি আশা করা যাইতে পারে? রোগী স্বমুখে রোগের অসহ্য যাতনা ব্যক্ত করতঃ সমাজের নেতা ও অভিভাবকগণের নিকট কাতরবচনে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে, ইহাতেও কি আপনাদের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হয় না? অভিভাবক, শিক্ষক, ও সমাজের নেতাগণ একবার মুখ তুলিয়া দৃষ্টিপাত করুন—অধঃপতিত সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ও অবলম্বনস্বরূপ আপন আপন বালকবালিকাকে অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবন গঠন করিতে,—তাহাদিগকে সংযমী হইতে শিক্ষা দিউন। যাহারা এ বিষয়ে উদ্যোগী তাহাদিগের সহায় হউন।

একথা নিশ্চয় জানিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা" সমাজ না বুঝিবে—যতদিন পিতামাতা, ভাই বন্ধু প্রভৃতি অভিভাবকগণ সংযমী না হইবেন, ততদিন সমাজের মঙ্গল কামনা দুরাশা মাত্র। এই যে ২০, টাকার কেরাণী ২০ বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করতঃ ২৫ বৎসর মধ্যে ৩।৪টী রুগ্ন সন্তানের পিতা হইয়া ৩০।৩৫ বৎসর মধ্যে মাতামহ কি পিতামহ সাজিয়াছে, ইহা অসংযমের ফল নয় কি? আজকাল যেস্থলে ২০ টাকায় দুইজন লোকের কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হয় না, সেইস্থলে ৬।৭ জনের ভরণপোষণ কিরূপে হইতে পারে? সমাজের নেতাগণ, পিতামাতা অভিভাবকগণ নিশ্চয় জানিবেন, যতই আমরা সংযমী না হইয়া অসংযমী হইতেছি,—যতই ন্যায় ছাড়িয়া অন্যায়কে জড়াইয়া ধরিতেছি, যতই ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া অধর্ম্মপথে পা বাড়াইতেছি; ততই দেশের দুঃখদারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ বাড়িয়া যাইতেছে,—দেশে হাহাকার রব উঠিতেছে!!!

সকলেই মনে রাখিবেন, সংযমী হওয়া, ধার্ম্মিক হওয়া কেবল সাধুসন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নয়—গৃহস্থের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধীত বিদ্যা জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে সে জীবনের কোনই মূল্য নাই।

অভিভাবকগণ, সমাজের নেতাগণ! যদি ভবিষ্যতের আশাভরসাস্থল বালকবালিকা ও যুবকগণের ভাবী জীবন মধুময় করিতে চান,—তাহাদিগকে সুস্থ, নীরোগ ও সুখী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যাহাতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ ভবিষ্যৎ জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করুন। লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে "ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা" সম্বন্ধে যথোচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হউন। নতুবা সমস্ত যত্ন চেষ্টা বিফল হইবে।

দীন—হরিদাস।

:0:

যোগানন্দ-লহরী ।

জয় জয়ন্তী । (১০) একতালা ।

নমস্তে মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,—
আনন্দরূপিনী জগতজননী ।
কেশরীবাহিনী অসুরমর্দ্দিনী
অভয়দায়িনী ত্রিলোকপালিনী ॥
জয় ত্রিনয়নী জয়ন্তী কল্যাণী
ওঁকাররঙ্গিনী সত্য সনাতনী
চৈতন্যরূপিনী অজ্ঞাননাশিনী, জয় মা ভবানী জগত-তারিণী ॥
সিংহের তাড়নে অসুর নির্জ্জিত,
শূলাঘাতে পুন বক্ষ বিদারিত,
শ্রীপদে দলিত পশুবল যত,
ত্রিভঙ্গে দাঁড়ায়ে অর্দ্ধেন্দু শোভিনী ;—
অতসীবরণা কমললোচনা,
পীন পয়োধরা নবীন যৌবনা,
সুচারুদশনা রতনভূষণা, বিরাজে গরবে ভুবনমোহিনী ॥
দশভুজ রাজে উজলি ভুবন,
তাহে কিবা শোভে দশ প্রহরণ,
দশ দিশি ব্যাপী রণের কারণ,
জয় দশভূজা সমর রঙ্গিনী ;—
দক্ষিণ করেতে ত্রিশূল ভীষণ,
খড়গ চক্র ক্রমে শক্তি আর বাণ,
বামেতে খেটক শোভে পূর্ণচাপ, পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা পরশু ধারিণী ॥
বিঘ্ন-বিনাশন শোভে গণপতি,
শুদ্ধজ্ঞানময় সর্ব্ব সিদ্ধিপতি,
শিখি আরোহনে বিজয় মূরতি,
রাজে কার্ত্তিকেয় শরধনুধারী ;—
দক্ষিনেতে লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যরূপিনী,

শোভে কমলাক্ষ বক্ষবিহারিণী,
বামে বীণাপাণি রজতবরণী, শুদ্ধ সত্বময়ী জ্ঞানপ্রদায়িনী ॥
ঊর্দ্ধে চিত্রপটে রাজে পশুপতি,
তেত্রিংশত কোটী দেবের সংহতি,
যা আসিলে আসে সর্ব্ব দেবতাদি
নমি মহাশক্তি বিশ্বরূপিনী ;—
যোগেন্দ্র মনন হেন সম্মিলন,
মানস নয়নে করি নিরীক্ষণ,
তব কোলে বসি প্রেমানন্দে ভাসি, অনন্ত সমাধি লভি গো জননী ॥

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(১৫)

মায়ার মহিমা কিরূপ ?

জলের উপর প্রস্তরখণ্ড, অগ্নির উপর জল অথবা শূন্য মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বস্তু বিশেষ স্থির-ভাবে অবস্থিত না হইয়া যেরূপ জল ও অগ্নি আদি পদার্থের বিক্ষেপকারক হয়, তদ্রূপ স্বতঃপ্রমাণ বেদাদি-শাস্ত্র বিচার-বিহীন ব্যক্তির নিকট স্থিরভাবে অবস্থিত না হইয়া অর্থাৎ দৃঢ় প্রমাণরূপে পরিগণিত না হইয়া "নানারূপ অযথাকল্পিত সংশয় দ্বারা" তাহাদের চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ হয়। পক্ষান্তরে ঐরূপ চিত্তবিক্ষেপই ভ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কদাচ প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না।

ইদানীন্তন হিন্দু ধর্ম্মের নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে কোন কোন স্বাধীন-চেতা মহাশয় উল্লিখিত চিত্ত-বিক্ষেপের পক্ষে দ্বিতীয় শ্রুতি "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মায়া শব্দটীকে বর্ত্তমান আলোচ্য সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করতঃ নিত্যবস্তু উপাধি প্রদান পূর্ব্বক মহানুভব আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বেদের ব্যাখ্যা যেন কোন কল্পনাকুশল কবির লিখিত কাব্য বিশেষ ;—তাই তাঁহারা গীতার "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম" স্থলে ব্রহ্ম শব্দকে প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করিতেও বিন্দু-মাত্র সঙ্কুচিত হন না।

কিন্তু স্থিরচিত্তে সহজেই যেরূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা এইরূপ যথা—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" কি না মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। মায়া সত্ব রজস্তমঃ স্বরূপা ; অজ্ঞান;

অবিদ্যা, বিকার, ভ্রম, বিকল্প, তমঃ প্রভৃতি ইহার কতকগুলি পর্য্যায় শব্দ প্রচলিত আছে। ইহাকে সৎ স্বরূপা বলা যায় না, যেহেতু জ্ঞানের বিরোধী। অসৎ পদার্থও বলা চলে না, যেহেতু জ্ঞান নিবারিত হইবার নহে; অভাব পদার্থও হইতে পারে না; যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব পদার্থ হইতে অত্যন্ত যে বস্তু, সেই অনুপলভ্যমান বস্তুর শক্তি, প্রতিবিম্ব, ভাব বা নিয়ামকত্বই মায়া উপাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। উপাধিশূন্য পদার্থই শান্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন এবং অচিন্তনীয়। তাঁহার মহিমায় এই নাম রূপ জগতের সত্ত্বাবোধ হইয়া থাকে বা জগতোন্মেষক বিকাশ সমুত্থিত হয়। অতএব যাহার উপাধি আছে বা যে বস্তু কোন না কোন নামে বা গুণে জড়িত আছে, সে বস্তু সেই বিকাশময় অবস্থার উন্মেষ মাত্র। সেই বিকাশময় অবস্থাই সূক্ষ্ম, মধ্য, স্থূল বা সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিবিধ কল্পনায় জগৎ আখ্যায় আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই গুণত্রয়ময়ী প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা ইত্যাদি নামে অভিহিতা করা হয়। এই মায়াই সংসাররূপ বিশাল সমুদ্রের বিশালতা বর্দ্ধিত করিয়া অনাদি অনন্তকাল স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর জীব, জন্তু, প্রাণিমণ্ডলীরূপ প্রবাহ ছুটাইতেছে। ইহার অপর পারেই অর্থাৎ মায়া রূপ সংসার সমুদ্রের পর পারেই উপাধিশূন্য পূর্ণ-পরব্রহ্মের পরমপদ।

সেই মায়াকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব নিহিত হইয়াছে। যেহেতু "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" স্থলে মায়াং পদটী উদ্দেশ্য, আর প্রকৃতিং—এই পদটী বিধেয়। অন্যথায় মায়া শব্দটী যদ্যপি সাংখ্যমতের নিত্যবস্তু প্রকৃতি হইত, তাহা হইলে "প্রকৃতিন্তু মায়াং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে—এইরূপ পাঠ থাকা উচিত হইত। কিন্তু বেদের শ্লোক বা শ্রুতিবাক্য স্থিতিস্থাপক বস্তু নহে যে,—নানা বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের ইচ্ছানুসারে টানিলেই বাড়িবে আর ছাড়িয়া দিলেই সঙ্কুচিত হইবে। অতএব "প্রকৃতিন্তু মায়াং বিদ্যাৎ" এইরূপ "নূতন ধরণের" পাঠ হইবে না; সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া মায়ার মায়াত্ব বা মায়ার বিধেয়ত্ব খাটিবে না, অথবা প্রাণান্ত চেষ্টা করিলেও মায়াবাদের বৈদিকতা লোপ পাইবে না। মায়ার বৈদিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শ্রুতিবাক্যের পৌনঃপুনিক বিচারই একমাত্র অবলম্বনীয়। শ্রুতি বলেন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর (ইন্দ্র) মায়া দ্বারা কিনা মায়া-কল্পিত বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, "পুরু রূপ" কিনা বহু আকারে প্রকাশিত হয়েন। এইরূপ বহু বহু শ্রুতিবাক্য দ্বারা মায়ার বৈদিকতা উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়; সুতরাং মায়াবাদ বেদবিগর্হিত নহে।

পক্ষান্তরে যে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" মন্ত্রের উল্লেখ আছে; যাহা বর্ত্তমান প্রকৃতিতত্ত্বের দ্বিতীয় শ্রুতি হইতেছে, সেই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যের "সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ যঃ"— "তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে" ইত্যাদি মন্ত্রের সার ভাবার্থ দ্বারা

অবগত হওয়া যায় যে,—পরাৎপর পূর্ণ পরব্রহ্ম যিনি জলের শীতলতা, অগ্নির উষ্ণতা, সংসার সমুদ্রের বিশালতা প্রভৃতি গুণ দিয়া পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকে স্ববশে রাখিয়া অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই অনন্ত জগৎকে নিয়মিত করিয়া সত্ব, রজঃ, তম গুণত্রয়কে বিনিয়োগ করিতেছেন। সেই সর্ব্বজ্ঞস্বভাব পূর্ণ পরব্রহ্মের আজ্ঞাতেই জগতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; সুতরাং তিনি ভিন্ন পৃথক নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর ব্যতীত পৃথক নিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকায়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মায়া, মহিমা, অবিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই অনিত্য উপাধির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল; কাজেই ইহাদের জগৎ-কারণত্বও দূর হইয়া গেল। এরূপ হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য দ্বারাই "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" মন্ত্রের মায়ারও অনিত্যত্ব আসিয়া পড়িল। এই অনিত্য মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে; এইরূপ অর্থই উপরোক্ত মন্ত্রের সার ভাবার্থ রূপে গণ্য হইয়া যায়। অতএব এই মায়া সাংখ্যমতের নিত্যবস্তু প্রকৃতি নহে বা দ্বিতীয় শ্রুতি "মায়ান্তু প্রকৃতিং-বিদ্যাৎ" মন্ত্র দ্বারা বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতিতত্ত্বের যিনি প্রকৃতি, তাঁহার নিত্যত্ব বা জগৎকারণত্ব সমর্থিত হইবার নহে।

মতান্তরে আমার ধন, আমার বাগান, আমার পুষ্করিণী, আমার ঘড়ি, আমার পুস্তক ইত্যাদি ব্যবহারিক বাক্যের আলোচনায় মনে হয় যে, আমা হইতে ধন, বাগান, পুষ্করিণী, ঘড়ি ও পুস্তকাদি বস্তুর অবয়ব পৃথক;-অর্থাৎ আমার অবয়ব একরূপ, আর ধন, বাগানাদি বস্তুর অবয়ব অন্যরূপ; আমি দ্রষ্টা আর ধন, বাগানাদি বস্তু দৃশ্য এইরূপ ভেদোপলব্ধি সর্ব্বত্রই প্রতীতিগোচর হইয়া ইহাদের স্বজাতীয় অবলম্বন অর্থাৎ অভেদভাব খণ্ডন করে। অতএব দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য পদার্থ ভিন্ন, বা দৃশ্য পদার্থ হইতে দ্রষ্টা ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেমন ঘট বা দুর্গা প্রতিমার দৃশ্য ছবি,—দ্রষ্টা বা দর্শক হইতে ভিন্ন;—দ্রষ্টা বা দর্শক নটবর বাবু, দৃশ্য বিষ্ণু-মন্দির হইতে পৃথক ইত্যাদি। এইরূপ "আমার দেহ" বলিলে আমা হইতে দেহ ভিন্ন বস্তু হইবে; যেহেতু দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভিন্ন ভাব তুলনায়,—আমি আমার দেহের দ্রষ্টা,—আর দেহ দৃশ্য বস্তু অবশ্যম্ভাবী হইতেছে, অতএব "আমি" দেহ নহি, বা আমার দেহ "আমা" হইতে পৃথক বস্তু, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ হইলে শ্রুতি বাক্যের "যস্য পৃথিবী শরীরং" স্থলে অর্থৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের শরীর পৃথিবী এই অর্থে পরমেশ্বর এক বস্তু আর তাঁহার শরীর "পৃথিবী" অন্য বস্তু; পরমেশ্বর দ্রষ্টা, তাঁহার শরীর "পৃথিবী" দৃশ্য;—অতএব পরমেশ্বর হইতে পৃথিবী পৃথক বস্তু যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু আমার দেহ, আমার ধন, আমার বাগান ইত্যাদিতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য" ভিন্ন বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং মুখের কথায় গোলমাল করিবার উপায় নাই। আবার সর্ব্ববাদিসম্মত ন্যায়বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল অবচ্ছেদে বিধেয় বস্তুর অন্বয় হইয়া থাকে। যেমন বালক

সদানন্দময়" এ স্থলে উদ্দেশ্য বালক; উদ্দেশ্য-তাবচ্ছেদক অর্থাৎ উদ্দেশ্যের সীমা নির্ণায়ক বা অনুপামক ইহতেছে বাল্যকাল; তৎকালাবচ্ছেদে অর্থাৎ বাল্যকালের সীমা পর্য্যন্ত তাহার সদানন্দময়ত্ব প্রতীয়মান হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যতকাল বালকের বাল্যাবস্থা বিদ্যমান থাকে, ততকাল সে সদানন্দভাবে অবস্থান করে বা সদানন্দময় উপাধির অধিকারী হয়। তদ্রূপ "দ্রষ্টা পরমেশ্বর—আর দৃশ্য পৃথিবী" (পরমেশ্বরের শরীর) এস্থলে উদ্দেশ্য দ্রষ্টা, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক হইতেছে দৃশ্য পৃথিবী; তৎকালাবচ্ছেদে "দ্রষ্টা পরমেশ্বরের" পরমেশ্বরত্ব প্রতীয়মান হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্য বস্তু না থাকিলে দ্রষ্টা থাকিতে পারে না বা কেহই দ্রষ্টা উপাধির অধিকারী হয় না; এইজন্য দৃশ্যবস্তু দ্রষ্টার নির্ণায়ক বা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। অর্থাৎ দৃশ্য পৃথিবী বা জগৎ আছে বলিয়াই দ্রষ্টার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। অতএব দৃশ্য পৃথিবী বা জগৎ যতকাল থাকিবে—ততকাল দ্রষ্টা রূপে "পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর" উপাধিদ্বারা জড়িত হইবেন,—এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ কল্পনাও নিষ্কণ্টক হইয়া দ্বৈত-বোধমূলক অজ্ঞানতা বাড়াইবে।

কিন্তু জগৎ অতিক্রম করিলে দ্রষ্টা, দৃশ্য, উদ্দেশ্য, বিধেয় ইত্যাদি উপাধির কোনরূপ জঞ্জাল থাকে না। অর্থাৎ আমরা যখন সুষুপ্তি অবস্থায় থাকি, তখন দ্রষ্টা, দৃশ্য, ইত্যাদি কোন বিষয়ের উপলব্ধি আমাদের থাকে না; ঘুম ভাঙ্গিলেই আমার, আমার শব্দে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভিন্ন ভাব, পাণ্ডিত্যাভিমান লইয়া তর্কস্থলে কলহ দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত, একে-একে সকল উপলব্ধি, অনন্ত ক্রিয়া ও অসীম অনুভূতি আসিয়া দেখা দেয়। তদ্রূপ জগৎ অতিক্রম করিলে যে স্থান মন, বাক্য ও কর্ম্মের অধিকার শূন্য হয়, সেই মনোবাণীর অতীত স্থানে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের কোনরূপ দীপ্তি থাকে না। সে স্থান সৎ-অসৎ, বিদিত-অবিদিত, নিরাকার-সাকার ও জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি ইত্যাদির অতীত। অর্থবোধ বা বোধসৌকর্য্যার্থে সেই স্থানের নাম "পূর্ণ জ্ঞান পরব্রহ্ম" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রকাশ বা বিকাশাবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্য ইত্যাদিতে নানাত্ব, ভেদত্ব, দ্বৈতত্ব সকল ভাবই প্রতীয়মান হয়। এইজন্যই মনোবাণীর অতীত পূর্ণ পরব্রহ্মকে দ্বৈত-তাদাত্ম্যাপন্ন বা দ্বৈতভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাইতেছে।

অন্যপক্ষে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা ও পরব্রহ্মের দ্বৈতভাবত্ব বিহিত বা প্রমাণিত হয়। "একম্ এব" ও অদ্বিতীয়ম্" বাক্যই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ ইহার দ্বিতীয় অন্য কোন বস্তু নাই। এইজন্য "একম্ এব" বাক্য দ্বারা "এক" অর্থ প্রতিপাদিত হয়, অর্থাৎ এক বস্তুই আছে, তাহার কার্য্য-ভাবাপন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা অন্য কোন বস্তু নাই। "অদ্বিতীয়ম্" বাক্য দ্বারা দ্বিতীয় বস্তু বা পদার্থের প্রতিষেধ হইতেছে;—অর্থাৎ লৌহকে ছুরী, কাঁচি ইত্যাদি আকারে পরিণত করিতে হইলে যেমন লৌহ হইতে ভিন্ন একজন "কর্ম্মকার"কে নিমিত্ত-কারণ রূপে প্রয়োজন হয় বা অপেক্ষা করে, তদ্রূপ

মনোবাণীর অতীত সৎ পদার্থকে প্রকাশাবস্থায় আনিতে হইলে, তাঁহার সহকারীরূপে কোন পদার্থ বিশেষের প্রয়োজন অসম্ভব নহে, এইরূপ যে ধারণা তাহা "অদ্বিতীয়ম্" পদ দ্বারা প্রতিষেধ অর্থাৎ নিষেধ হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই অর্থাৎ "একম্ এব," এই জন্যই তিনি অদ্বিতীয়। আবার এই "এক বাক্য দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুর বিদ্যমানতা প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তুর বিদ্যমানতা না থাকিলে "এক" এই উপলব্ধিই হইতে পারে না। এই জন্যই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—"নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন" "দেবাবব্রহ্মণোরূপে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মনোবাণীর অতীত পরম পদার্থকে অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্মকে দ্বৈতভাদাত্ম্যাপন্ন বা দ্বৈতভাবাপন্ন বলিয়া জানা যায়।

এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা অসম্ভব নহে যে, "মনোবাণীর অতীত স্থান" যেখানে মন, বাক্য ও কর্ম্ম কিছুই যাইতে পারে না, সেই স্থান দ্বৈতভাদাত্ম্যাপন্ন বা দ্বৈতভাবাপন্ন কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইবে? ভাল কথা;—যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে বা অনুকূল তর্কের সহিত বিচার করিলে এরূপ আশঙ্কা সহজেই নিবারিত হইবে। আমরা যখন স্বপ্নশূন্য গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি, তখন আমাদের মন, বাক্য ও কর্ম্ম সেখানে যায় না, অর্থাৎ কোন রূপ উপলব্ধি বা অনুমান আমাদের থাকে না, ঘুম ভাঙ্গিলেই সকল উপলব্ধি ও সমস্ত বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নিদ্রা ও জাগরণ যেমন এক এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ আমিই ঘুমাই আর আমিই জাগরিত হই, নটবর বাবু ঘুমান আর নটবর বাবুই জাগরিত হন,—তদ্রূপ যে স্থান মনোবাণীর অতীত তথায় "দ্বৈতভাদাত্ম্যাপন্ন, দ্বৈতভাববস্তু ইত্যাদি" স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের খেলা চলে না;—সেই স্থান প্রকাশ বা জাগরণ অবস্থায় আসিলে দ্বৈত, অদ্বৈত, স্ব-স্বামী, তাদাত্ম্য প্রতিপাদ্য, প্রতিপাদক, উদ্দেশ্য, বিধেয় ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধের আরোপ হইয়া থাকে। অতএব আমাদের নিদ্রা ও জাগরণের মত সেই মনোবাণীর অতীত স্থান "এক বস্তু" বলিতে হইবে।

আবার দেখিতে হইবে যে, মনোবাণীর অতীত স্থান আছে বলিয়াই, তাহার প্রকাশ বা জাগরণাবস্থা প্রকাশিত হইতেছে। সেই স্থানের অস্তিত্ব না থাকিলে প্রকাশ, বিকাশ, অভাব (যাহা জগৎ নামে অভিহিত হয়) কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব প্রকাশ শব্দটী স্বয়ং সিদ্ধ নহে, আপেক্ষিক শব্দ মাত্র; অর্থাৎ একটী অপ্রকাশ স্থান আছে, বলিয়াই তাহার প্রকাশ মাত্র বা তাহার বিজ্ঞাপক। সেই অপ্রকাশ স্থানই মনোবাণীর অতীত স্থান। আবার যাহা স্বয়ংসিদ্ধ নহে বা যাহাতে অপেক্ষাবুদ্ধিজনিত সংশয় থাকে, তাহা মুখ্যে অবান্তর বিধায়ে মহর্ষি জৈমিনী মতে "অপ্রামাণ্যবৎ"। অতএব প্রকাশাবস্থা স্বয়ংসিদ্ধ না হওয়ায় প্রমাণের অযোগ্য বা অপ্রামাণ্যবৎ হইল। মনোবাণীর অতীত স্থানের প্রকাশাবস্থা প্রমাণের অযোগ্য বা অপ্রামাণ্যবৎ হইলে,—সেই প্রকাশাবস্থায় যে দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন, দ্বৈত-ভাববস্তু ইত্যাদির আরোপ হইতেছে, তাহাও অপ্রামাণ্যবৎ

হইয়া পড়িল; অর্থাৎ যে উপায়ের সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম শূন্য প্রমা জ্ঞান জন্মিয়া "প্রমাণ" হয়, সেই প্রমাণের অযোগ্য হইল। অতএব প্রকাশাবস্থা এবং তদবস্থায় দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন, দ্বৈত-ভাববত্ব ইত্যাদি যে যে গুণের আরোপ হইতেছে, সমস্তই প্রমাণের অযোগ্য হইয়া ভ্রমশূন্য প্রমা জ্ঞানের বিরোধী হইল কিনা ভ্রমাত্মক উপাধির বিষয়ীভূত হইল।

এক্ষণে দ্বৈতভাব ভ্রমাত্মক হইলে, ভ্রমশূন্য প্রমা জ্ঞান দ্বারা দ্বৈতভাবশূন্য বা দ্বৈত-বিহীন অর্থাৎ যে ভাব দ্বৈত, অদ্বৈত, সৎ, অসৎ ইত্যাদি উপাধি শূন্য,-সেই ভাবকে বুঝিতে হইবে। সেই ভাবই'ত মনোবাণীর অতীত স্থান। তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা চলে না, অনুমানও সেখানে যায় না; সে ভাব সদামুক্ত ও অবিনাশী। কেবল মাত্র অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত সেস্থানের নাম "পূর্ণপরব্রহ্ম" রাখা হয়। সেই পরব্রহ্মের প্রকাশাবস্থায় যে দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ও দ্বৈত ভাববত্ব জানা যায় তাহা ভ্রমাত্মক অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী হওয়ায়, দ্বৈতবত্ত্ব কালেই ব্রহ্ম দ্বৈতাভাব সিদ্ধ হইল;—অর্থাৎ প্রকাশাবস্থায় "পূর্ণপরব্রহ্মে" যে দ্বৈত ভাব আরোপিত হয়, সেই দ্বৈতভাবই উপাধি-শূন্য অদ্বৈত অর্থের প্রতিপাদক হইল। এইজন্যই শ্রুতি বলেন যে,—"নিমিত্তমা-নিমিত্ত" অর্থাৎ অর্থোপলব্ধি বা যুক্তি প্রদর্শন হেতু অথবা ব্যবহারিক কার্য্য সমাধা হেতু বাহ্য প্রতীতি সনিমিত্তত্ব ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে সেই "নিমিত্তই—অনিমিত্ত হয়, দ্বৈত, অদ্বৈত হয়" ইত্যাদি। এই শ্রুতি বাক্য, উপরোক্ত জৈমিনী বাক্যের "অপ্রামাণ্যবৎ" সহিত এক ও অভেদ হইয়া গেল; সুতরাং ইহা মুখের কথায় উড়াইবার উপায় নাই। অতএব মনোবাণীর অতীত পূর্ণপরব্রহ্ম দ্বৈত তাদাত্ম্যাপন্ন ও দ্বৈত ভাববত্ব ইত্যাদি অর্থে কি বুঝিতে হইবে? এইরূপ বুঝিতে হইবে যথা—দ্বৈত তাদাত্ম্যাপন্নং ব্রহ্ম দ্বৈত কালাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাববৎ", অর্থাৎ দ্বৈতবত্ব কালেই দ্বৈতা-ভাব বা দ্বৈতশূন্য-"অদ্বৈত্যভাব", অথবা দ্বৈতাদ্বৈত অখণ্ডাকারে যে এক, একত্ব ভাব,—"যাহা ভিন্ন নহে" সেই ভাব বুঝিতে হইবে॥

আবার স্বার্থত্যাগে অপক্ষপাত ন্যায় বিচারের আশ্রয় লইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদ্দেশাবচ্ছেদে, যৎকালাবচ্ছেদে যাহার স্বত্ব তদ্দেশাবচ্ছেদে, তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অস-ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয় বা মিথ্যা উপাধির বিষয়ীভূত করা হয়। অতএব মনোবাণীর অতীত পূর্ণব্রহ্মকে যে সময়ে দ্বৈত তাদাত্ম্যা-পন্ন বা দ্বৈতভাবাপন্ন বলিয়া জানা যায়, সেই জানা রূপ বল "অর্থাৎ সত্ব" যখন নিজেই দ্বৈতভাবশূন্য অর্থ প্রতিপাদন করতঃ দুর্ব্বল হয় অর্থাৎ "নিজের বাক্য নিজে ভাঙ্গিয়া" অসত্বে পরিণত হয়, তখন দ্বৈত-তাদাত্ম্যাপন্ন বা দৈত ভাববত্ব ইত্যাদি বাক্য "অদ্বৈত অর্থের প্রতিপাদক হইয়া" মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত হইল। আর "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য যে ভাবে, যে সময়ে, যেরূপ অর্থে "পূর্ণ-ব্রহ্মে" দ্বৈত ভাবের আশঙ্কা আনিতেছে, ঠিক সেইভাবে সে, সময়ে সেইরূপ অর্থে "সেই শ্রুতিই" অদ্বৈত অর্থ প্রতিপাদন করতঃ

দ্বৈতভাবের মিথ্যাত্ব জানাইতেছে;—ইহাও উল্লিখিত বিচারে সাব্যস্ত হইয়া শ্রুতি বাক্যের সার ভাবার্থ রূপে গণ্য হইয়া পড়িল।

এরূপ হইলে "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ভাব দ্বারা পূর্ণব্রহ্ম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়িল। এই মিথ্যা দ্রব্যই মায়া। মতান্তরে এই মিথ্যাই অনিত্য উপাধি পাইয়া থাকে, অর্থাৎ মিথ্যা মায়া স্থলে অনিত্য মায়া হইয়া দাড়ায়। এই মিথ্যা বা অনিত্য মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। ইহাই "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" মন্ত্রের সার ভাবার্থ এবং জ্ঞানীর নিকট অভ্রান্ত। ঐ ভববন্ধনী মায়াই দৃশ্য জগজ্জাল বিস্তার করে; আত্মজ্ঞান-বিমূঢ় ব্যক্তিদিগের আস্পদ স্বরূপা হইয়া জীবকে অন্ধ করিয়া তুলে, নিজে সারবিহীনা হইলেও সারবতী হইয়া দাঁড়ায়। আন্তরিক যত্ন দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞান বলে উহার বিচার করিলে উহার কর্ত্তৃত্ব কোথায় যে বিলীন হইয়া যায়, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। তবে বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, দুরতিক্রমনীয় মায়া শক্তি মৃত্তিকায় ঘটের ন্যায়, দুগ্ধে ক্ষীরের ন্যায়, ইক্ষুরসে চিনির ন্যায়, সূত্রে পটের ন্যায়, বীজে বৃক্ষের ন্যায়, চিত্তে অনুমান শক্তির ন্যায়, জলে তরঙ্গের ন্যায়, সময় পরব্রহ্মেই অবস্থিত আছে; সেখান হইতে অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহার দশা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানদৃষ্টিতে ঐ ব্যবহার দশাই অনিত্য, মিথ্যা, কল্পনা, ভ্রম, অসৎ ইত্যাদি উপাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

অতএব ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা দ্বারা এ দিক, ও দিক, সে দিক, চারি দিকপানেই দেখা গেল যে, দ্বিতীয় শ্রুতি "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" মন্ত্র বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব অটুট রাখিবার পক্ষে অনুকূল হইতেছে না। পূর্ব্বে "অজামেকাং লোহিত কৃষ্ণ বর্ণাং" ইত্যাদি প্রথম শ্রুতির আলোচনায় ঐরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ সে মন্ত্র ও প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ কারণত্ব অটুট রাখে না। অতঃপর আর কয়েকটী মন্ত্র আলোচনা করিলেই অভ্রান্তরূপে জানা যাইবে যে, পরমাণু মিলনের পক্ষে প্রকৃতির আশ্রয় প্রকৃত কিনা? এই পরমাণু মিলনের উপরেই আমাদের মুখ্য বিষয় জ্ঞান ও ভক্তির অভেদত্ব প্রদর্শন নির্ভর করিতেছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যেরূপ সহজে এবং অনায়াসে সাধিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে আর পৃথক চেষ্টা, নূতন সাধ্যসাধনা, স্বতন্ত্র অভিসন্ধি অথবা কোনরূপ ভাবনা করিতে হয় না; তদ্রূপ বেদ বাক্যও পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম হইতে অনায়াসে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে কোনরূপ যত্ন, চেষ্টা, ক্লেশ বা প্রয়াস পাইতে হয় না, অথবা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি ইত্যাদির অপেক্ষাও করিতে হয় না। এবম্ভূত ঈশ্বর বাক্য "বেদ বা শ্রুতি" বিচার বিহীন ব্যক্তির নিকট ময়না পাখীর বুলি বলার মত হইলে, অথবা নাট্যমঞ্চের জয়দ্রথের মত উচ্চারণ বিদ্যায় পরিণত হইলে, কিম্বা নভেলপ্রিয় পাঠকগণের মত হাস্যকৌতুকের বিষয়ীভূত হইলে, কদাচ ভ্রমের অপনোদনে প্রমা জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে। সুতরাং পারত্রিক মঙ্গলের আশাও তথৈবচঃ। অতএব অনুকূল যুক্তির সহিত উল্লিখিত ভাবে বেদ বা শ্রুতি

বাক্যের বিচার ত্যাগ করতঃ যাহারা দুই এক ঘণ্টার বক্তৃতা মধ্যে ইংরাজী, বাঙ্গালা, ফার্সি ও উর্দ্দু ইত্যাদি ভাষা একত্রিত করিয়া দু'লাইন ইংরাজী, দেড় লাইন বাঙ্গালা, এক লাইন ফার্সি ইত্যাকার বাক্যশোভাবর্দ্ধক কথা দ্বারা অনন্ত বেদাদি শাস্ত্রকে পরিপাক করিয়া বসেন; তাঁহাদের সহিত উপরোক্ত শ্রুতি—সমন্বয় প্রদর্শনের চেষ্টা করা একরূপ বিড়ম্বনার নামান্তর নহে কি?

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে হিন্দু সন্তান বিচারের অর্থ ভুলিয়াছে অর্থাৎ যেদিন হিন্দু সন্তান ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়া বিলাসের দাসত্ব লইয়াছে, সবুট টেবিলে বসিয়া ভোজনবিলাসে স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে,—সেই দিন তাহারা বিচার ভুলিয়াছে। যে দিন হিন্দুসন্তান জাতিগত অধিকার ও কুলাচার ভুলিয়া একাকার হইয়াছে,—বেদ বাক্যের আলোচনা পরিত্যাগ করতঃ উপন্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছে, ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী, বন্দনাদিকে "হেঁয়ালী ও সাপের মন্ত্র" ইত্যাকার আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছে,—সেই দিন তাহারা বিচার ভুলিয়াছে। যে দিন হিন্দুসন্তান ব্রত, উপবাস, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি কর্ম্মকে কুসংস্কারজনিত "কচকচী" বলিয়া বাহবা লইতে শিখিয়াছে,—যে দিন হিন্দুসন্তান বেদবিহিত বিশুদ্ধতা, স্মৃত্যুক্ত পবিত্রতা, পরমার্থচিন্তনে নৈষ্ঠিকতা ইত্যাদি ধর্ম্মকে "বুড় বুড়ির" গল্প ইত্যাকার উপাধিতে আনিয়াছে,—সেই দিন তাহারা বিচার ভুলিয়াছে। হে হিন্দু ধর্ম্মের নানা বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণ! তোমরা একবার অকপটহৃদয়ে বল দেখি, তোমাদের মনোকল্পিত শাস্ত্র বা ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই উল্লিখিত অধঃপতনের মূল কারণ কিনা? যদ্যপি ভ্রমেও একবার এই চিন্তাকে অন্তরে স্থান না দাও,—তাহা হইলে বুঝিবে—তাহাই অর্থাৎ—সে-রূপই—"মায়ার মহিমা"। এই জন্যই—তৃতীয় শ্রুতি—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। ক্রমশঃ।

শ্রীরঙ্গলাল রায়।
সন্তোষপুর, হুগলী।

—:0:—

দেবতা।

(১)

প্রশান্ত গম্ভীর যাঁর বদন উজ্জ্বল।
করুণায় মাখা যাঁর নয়ন যুগল॥
সর্ব্বাঙ্গে করুণা যাঁর উছলিয়া পড়ে।
করুণা বিলায় যেবা পশু, পাখী, নরে॥
তাঁরেই দেবতা জেনো এই ধরাতলে।
এমন দেবতা কভু স্বরগে না মিলে॥

(২)

কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি ষড়রিপুগণ।
সাবহিতে করে যাঁর আদেশ পালন॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতি ক্ষমাময়।
পর দুঃখে নেত্রে যাঁর অশ্রুধারা বয়॥
তাঁরেই দেবতা জেনো এই ধরাতলে।
এমন দেবতা কভু স্বরগে না মিলে॥

(৩)

সর্ব্বভূতে যেই জন করে সমজ্ঞান।
সমান যাঁহার কাছে মান, অপমান॥
বিপদে অধৈর্য্য নাহি যেই জন হয়।
সুখে, দুঃখে যেইজন সমভাবে রয়॥
তাঁরেই দেবতা জেনো এই ধরাতলে।
এমন দেবতা কভু স্বরগে না মিলে॥

(৪)

সরল শিশুর মত খোলা যাঁর প্রাণ।
কুটিলতা হৃদে যাঁর নাহি পায় স্থান॥
হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি কিছু নাহি জানে।
ডুবিয়া রয়েছে যেবা বিশ্বহিত-ধ্যানে॥
তাঁরেই দেবতা জেনো এই ধরাতলে।
এমন দেবতা কভু স্বরগে না মিলে॥

(৫)

আত্মহারা হয় যেই অপরের সুখে।
পরকে আপন বলি টেনে লয় বুকে॥
পরার্থে করেছে যেই আত্ম-বিসর্জ্জন।
আপন সুখের চিন্তা করে না কখন॥
তাঁরেই দেবতা জেনো এই ধরাতলে।
এমন দেবতা কভু স্বরগে না মিলে॥

(৬)

এমন দেবের যদি পাই দরশন।
অশ্রুজলে ধুয়ে তাঁর যুগল চরণ॥
ভকতি চন্দন আর প্রেমপুষ্পভার।
দিয়ে পূজি শতযতনে চরণ তাঁহার॥

দীনা—কুমারী শৈলবালা॥

:0:

শারদীয়া।

সেই বসন্তকালে বঙ্গবাসী একবার দুর্গা-পূজার উৎসবে মাতিয়াছিলেন। কিন্তু সে উৎসবের তরঙ্গ মনে মনে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। বসন্তের অন্ত হইল, দারুণ বর্ষার ক্রন্দনে জগৎ ছাইয়া ফেলিল। মানব মায়ের কথা ভুলিয়া গেল। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। বর্ষার দুর্দ্দিন কাটিয়া গেল,—শরৎ আসিল। শরতের বিধুবদনের শুভ্রময় বিকাশ—বাহ্য জগতের চারিদিকে হাস্যময় প্রকৃতির প্রফুল্লবিকাশ দেখিয়া মানবহৃদয় আবার নাচিয়া উঠিল। শস্যপ্রধান বঙ্গদেশ আজি ধনধান্যে পরিপূর্ণ। বঙ্গবাসী সহস্র নয়নে শস্যপূর্ণ রজতকাঞ্চনময় প্রসারিত ক্ষেত্রের প্রতি তাকাইয়া পুলকিত হইতেছে। কৃষিবল—বঙ্গবাসী কত আশার উল্লাসে নাচিতেছে। এরূপ নৃত্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। হৃদয় যখন আনন্দে এইরূপে নাচিয়া উঠে, তখন এই হাস্যময়ী মহাশক্তির পদতলে হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আদ্র হইয়া আপনা আপনি প্রণত হইতে চায়। অন্তরে আপনা আপনি মহাশক্তির স্রোতে সঙ্গীত হইতে থাকে। অন্তরে শঙ্খ ও ঘণ্টারোল বাজিয়া উঠে। সাধারণ সর্ব্বজন-হৃদয়ে এক বাজনা বাজিয়া উঠে। যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহা এক করুণ সুরে কাঁদিয়া উঠে—চিত্তের একান্ত

ব্যাকুলতা জন্মে। তাই শরতের সুখ-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে ভক্তের আবার মায়ের কথা মনে পড়িল। দূর প্রবাসে মায়ের কথা মনে পড়িলে সন্তানের যেরূপ আকুলতা জাগিয়া উঠে, ভক্তেরও তাহাই হইল। কিন্তু মাকে ত জাগান হয় নাই; শক্তি যে জীবাত্মাকে ক্রোড়ে করিয়া আধারে নিদ্রিতা।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা সর্ব্ব শক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিরূপিনী তাহাই ভগবতী দুর্গা। আমরা পূর্ব্বে বাসন্তী বা দুর্গাতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়াছি।* দুর্গাপূজা আর কিছুই নহে, তাহা মহাশক্তির উপাসনা মাত্র। জগতে শক্তি যে কতিপয়রূপে বিকাশপ্রাপ্ত করিয়াছেন, দুর্গাপূজা সেই সকল শক্তির মিলিত পূজা মাত্র। দশভুজা দশবাহু দ্বারা আমাদের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত, অগ্নি, বায়ু, উর্দ্ধ, অধঃ এই দশ দিক রক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতির ঘোর মহিষাসুরকে পাশে আবদ্ধ করিয়া, তাহার বক্ষস্থলে ভীষণ শূল আবদ্ধ করিয়া কেশে ধরিয়া রাখিয়াছেন। পশুরাজ সিংহ ভীষণ বিক্রমশালী ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃ-সিংহ তাঁহার বাহন। দক্ষিণে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাতা জ্ঞানগুরু গণপতি; তৎপরে ধর্ম্মৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী লক্ষ্মীদেবী। বামে বিপুল বলবিক্রমশালী দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়; তৎপরে বাগ্‌বাদিনী বাণী। সর্ব্বদেবতা—সর্ব্বাশ্রয় তাঁহার পশ্চাতে,—চালে চিত্রিত। এই দুর্গাপূজার প্রতিমা কল্পনাও কবিত্ব। যে দিন ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ছিল, সে দিন ভারত সেই শ্রীবৃদ্ধিতে দিব্য চক্ষু পাইয়া দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যখন মানব মস্তক অবনত করে, তখন তাঁহার পূজা হয়।

কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বকল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশভুজারূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। প্রতিকল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্তা হন, এবং রাবণ, রাক্ষস ও রামও প্রতিকল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। এই রূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে। সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও স্বয়ংই নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য।"

রাম শব্দে অদ্বৈত পরমাত্মাকেই বুঝায়, যোগিগণ যে অমূর্ত্ত ব্রহ্মেতে ইন্দ্রিয়-নিরোধপূর্ব্বক রমণ করেন, তিনিই রাম। যথাঃ—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

শ্রুতি।

অতএব রাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা; আর শ্রীরামের সান্নিধ্যবশতঃ জগতের আনন্দদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূতা সীতাদেবী মূল প্রকৃতি। দশেন্দ্রিয়রূপী দশানন রাক্ষস। ইন্দ্রিয়লালসা; সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসবৎ। সেই রাক্ষস, সর্ব্ব

*৭ম বর্ষ—১ম সংখ্যা "আর্য্য-দর্পণ" দ্রষ্টব্য। লেখক।

প্রকৃতিরূপিণী সীতাকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। সেই দেবত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই রামায়ণ ও যোগ। সংযমে—সাধনায় যুদ্ধজয়ী হইলে রামের সহিত সীতার মিলন হয়। রামচন্দ্র এই বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া একদা দুর্গাশক্তির আরাধনা করেন, যখনই সেই শক্তির আরাধনা করেন, তখনই দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপূজা যোগশক্তির সাধনা। যোগী এই ফলাভিলাষী হইয়া যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখনই তিনি শক্তিতে উদ্বোধিত হন। তাঁহার চিত্তে যোগশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যোগ-সাধনায় দৃঢ়ব্রত হয়েন। যখন সেই মহাশক্তিতে সাধক অনুপ্রাণিত হন, তখনই তাঁহার উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনই দুর্গোৎসবের বোধন।

বসন্তকালের দুর্গাপূজা মাতৃভাবে পূজা, কিন্তু শারদীয়া পূজা কন্যাভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবী ভক্তের নিকট বসন্তোৎসবে প্রথম উদয় হইয়াছিলেন, ছয়মাস পরে ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্দ্ধিতা ভক্তির নিকট চিরযৌবনা উমা তাই কন্যাভাব ধারণ করিলেন। সন্তান বৃদ্ধ হইলে মাতা যেমন কন্যাস্থানীয় হয়েন, বৃদ্ধা ভক্তির নিকট উমা সেইরূপ কন্যাভাবে আসিলেন। সন্তানের পালনীয়া মাতা, সন্তানকে যে ভাবে দেখেন, আজি উমা বৃদ্ধ ভক্তকে সেইভাবে দেখিতেছেন। ভক্তও সেইজন্য বাৎসল্যরসে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। এক দিন মাতৃভক্তিতে উদ্বোধিতা হইয়া যাহাকে পূজা করিয়াছিলেন, আজি বন্ধু-বাৎসল্যে তাহাকে আদরে হৃদয়মন্দিরে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান অতি মধুর। সেই মধুর আহ্বানরবে আগমনী ধ্বনিত হয়। আগমনী হৃদয়ের আহ্বানগীতি—দেবীকে ভক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে। দেবীও ভক্ত-হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই পরস্পর আকর্ষণের মিলন-ছবি বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব। আগমনী সেই আকর্ষণ শক্তি। বোধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা ও ঘটস্থাপনা; আর মিলনের ফল দশভুজা প্রতিমা ভক্তিজগতে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। তাই তাহা প্রতিবৎসরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ বলিয়া বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করে।

দুর্গাদেবীর আরাধনা-প্রসঙ্গে রাম-রাবণের যুদ্ধব্যাপার লইয়া পুরাণে যাহা কথিত আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ সাধনা প্রণালী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকে জ্ঞানপথ বলা যাইতে পারে। দশেন্দ্রিয়ধারী মন-দশাননের কবলিত আত্মশক্তিকে মহাশক্তির কৃপায় উদ্ধার করতঃ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই উক্ত রূপকের তাৎপর্য্য; সুতরাং এতদ্বারা জ্ঞানপথই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু উমা ও মেনকা লইয়া পুরাণকার যে উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধাভক্তির কুসুমাস্তৃত কোমল পথ। যাহা বসন্তের বিমল সৌন্দর্য্যে ভক্ত মাতৃভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই আজ চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বাৎসল্যভাবে পরিণত হইয়াছে। সেই বাৎসল্যভাবের আদর্শ গিরিরাণী—মেনকা। যে স্নেহে লোকে পুত্রকে ভালবাসে, সেই স্নেহে আর্য্যঋষি ঈশ্বরকে ভালবাসিতেন। যে বাৎসল্যোদয়ে পাষাণীও গলিয়া যায়, সেই বাৎসল্যে ঋষি ইষ্টদেবকে হৃদয়-পুরী

মধ্যে স্থাপিত করিতেন, ক্ষীর ননী খাওয়াইতেন, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। পুরাণ শাস্ত্রে যশোদার বাৎসল্য এইরূপেই চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু যে বাৎসল্য কন্যাতে স্থাপিত, সেই বাৎসল্য-রসে নিমগ্ন হইয়া আর্য্যঋষি ভগবান্‌কে আরও ঘনিষ্টভাবে দেখিলেন। তখন তাঁহার যশোদার ভাব গিয়া মেনকার ভাব উদয় হইয়াছে। মাতা যেমন পুত্রকেও লুকাইয়া কন্যার স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া তাহার তৃপ্ত্যর্থ নিজ গোপনীয় সমস্ত ধন বিতরণ করেন, ভক্তও তেমনই ভাবে ভগবানকে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করিলেন। শারদীয়োৎসবের আগমনীতে ভক্তের এই প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকটিত।

যদি বল, পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? পুত্র অপেক্ষা কন্যার হৃদয় অতি কোমল। সেই কোমল হৃদয়ে কন্যা শিশুকালে জনক জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া রাখে। কন্যার আচরণ, ব্যবহার তাহাদের একান্ত মনোহরণ করে। তাহারা জানে, কন্যা দু'দিন পরে পরগৃহে যাইবে, তাই সে তত মায়াবিনী হয়। কন্যা বড় হইলে সর্ব্বদা পরগৃহেই থাকে। চক্ষের অন্তরালে থাকাতে কন্যার জন্য মাতা অধিকতর ব্যাকুলা। তিনি কন্যার নিমিত্ত যেন সতত অন্যমনস্কা। তাই মধ্যে মধ্যে কন্যাকে নিজপার্শ্বে আনিয়া বিশেষরূপে যত্ন করেন। যাহাকে এতদিন যত্ন করিতে পারেন নাই, তাহাকে পাইয়া মনের সাধে যত্ন করেন। সেই যত্নে কন্যা মাতার বিশেষ আদরিণী। কন্যারও হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। তিনি শ্বশুর-গৃহের সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট মাতাকে জানান। দু'জনে একত্র বসিয়া চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দেন। যখন মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া সেই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, তখন মাতার সমুদায় হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। আবার যে স্থলে কন্যার অবস্থা তত সুখের নহে, সে স্থলে মাতার কাতরতা দেখে কে? তাঁহার কাতরতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। কন্যা রাজরাণী হইলে মাতার যে একেবারে কাতরতা নাই, এমত নহে, তবে তাঁহার হৃদয়-ব্যথার অনেকদূর শান্তি হয়। কন্যা রাজরাণী হইলে যে পরিমাণে সেই ব্যথার শান্তি হয়, কন্যা ভিখারিণী হইলে তাঁহার ততোধিক অশান্তি ঘটে; কাতরতার আর ইয়ত্তা থাকে না। আর গৃহে সতীন থাকিলে ত কথাই নাই, মাতা অহরহঃ অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন। পুরাণকার ঋষি উমাকে মেনকার তদ্রূপ কন্যারূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। উমার গৃহ নাই,—অন্ন বস্ত্র নাই, স্বামী পাগল; সতীনকে আদর করিয়া মাথায় তুলিয়াছেন। কাজেই উমার জন্য মেনকার কাতরতা ততদূর অশান্ত ছিল। সেই কাতরতায় পাষাণও গলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার একমুহূর্ত্তও সুখ ছিল না। অহরহঃ উমার চিন্তায় হৃদয়ে চিতানল জ্বলিত। মেনকা অবশ্য রাজরাণী, সেইজন্য তাঁহার আরও কষ্ট। ঘর বাড়ী, অন্নবস্ত্র, মণি-মুক্তার তাঁহার অভাব ছিল না, এই পরিবারের একমাত্র আদরিণী কন্যা ভিখারীর ভার্য্যা, মাতা সে বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন কিরূপে? তাই তিনি ধনরত্ন-বসনভূষণ, আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া কন্যার চিন্তায় আপনা ভুলিয়া দিন-

যাপন করিতেন। ভগবানের জন্য মানব-হৃদয় এরূপ কাতরতা এইরূপ হওয়া চাই। মেনকাকে আদর্শ করিয়া এই রাগের ছবি বাঙ্গালী ভক্ত আগমনীতে অঙ্কিত করিয়াছেন।

আশ্বিনের আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছ্বসিত। ভগবানের জন্য চিত্তের এই কাতরতা কিসের সহিত তুলনা হয়? মাতৃভক্তি এ ব্যাকুলতা নয়, বহুকাল কন্যাহারা মাতার বাৎসল্য। এক পলকের বিরহ তাহা বুঝি সহ করিতে পারে না। ভক্তির এই ঐকান্তিকতা প্রতি বৎসরে উদ্বোধিত করিবার জন্য আগমনীর গান বঙ্গধামে সঙ্গীত হইয়া থাকে। তাই যখনই আগমনীর সুর শরতে বঙ্গবাসীর শ্রবণে প্রবেশ লাভ করে, তাঁহার হৃদয় তখনই অনন্ত উদ্বেলিয়া উঠে দুর্গোৎসবের জন্য বঙ্গবাসী অধীর হইতে থাকেন।

পাতঞ্জল-দর্শনশাস্ত্রের মতে মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততানিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারমূঢ় হইয়া ক্রোধাদি বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। সেই মূঢ়াবস্থাই দৈত্য-দানবের অবস্থা। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখদুঃখজনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। তাহাই রক্ষ-পিশাচের অবস্থা। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে। এই অবস্থা দেবতাদিগের অবস্থা। সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থা জন্মে। তখন স্বরূপ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। জাত জীবমাত্রেই প্রথমতঃ তমোগুণাধিক্য হইয়া থাকে। কাজেই জীব মূঢ়াবস্থায় পশুর ন্যায় কার্য্যাকার্য্য বিচার না করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, চিত্তভূমি দৈত্যদানবের ক্রিয়া-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন একবার মহাশক্তি মাতৃ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া দৈত্য-দানবের সংহার করেন। অর্থাৎ মায়ের কৃপায় চিত্তের তমোগুণ—মূঢ়াবস্থা ধ্বংস হয়। তখন চিত্ত দেবতারা অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু রজোগুণ উদ্রিক্ত হওয়ায় চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থায় জীব রাক্ষসের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। আত্মসুখানুসন্ধানে পরপীড়ন তাহার নিত্য-কার্য্য হইয়া উঠে। তখন জীব সাধনার বলে দ্বিতীয়বার মহাশক্তির কৃপায় স্বাংশে রজোগুণের ধ্বংস সাধন করেন। জীব সত্ত্বগুণে বিক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তখন আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু শক্তি ভিন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠা করা যায় না—তাই মহাশক্তির নিকট "মা মা" করিয়া সন্তানের ন্যায় শক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। কিন্তু শক্তি অনন্তভাবে, অনন্ত আধারে ক্রিয়া করিতেছেন, একটী পাইতে অন্যটীর অভাব বুঝিতেছে, সেটী চাহিতে অপরটীর অভাব অনুভব করিতেছে—এদিকে পুনঃ পুনঃ মহাশক্তির আরাধনায় সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধতা হইয়া চিত্ত একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতেছে। তখন সাধক বুঝিতেছে, আর কত চাহিব, অনন্তকাল ধরিয়া চাহিলেও যে তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রাপ্ত হইব না; সুতরাং মহাশক্তিকে না পাইলে কখনই এ অভাব মিটিবে না। সাধক এবার সকল বাসনা কামনা

ছাড়িয়া মহাশক্তি—মাকে পাইবার জন্য,—মায়ের কোলে উঠিবার জন্য, শিশুবালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ফলকামনায় যাহারা ঈশ্বরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ফলই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর ফলদাতা মাত্র। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বরের অর্চনা করেন, তাঁহারা আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই লাভ করিয়া থাকেন। আর যাহারা ঈশ্বরকে কামনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই প্রাপ্তহন। কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে অন্য সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিতে হয়। ততদূর ঈশ্বরপরায়ণতা বড় সহজ কথা নহে। তাহা ঈশ্বরানুরাগের পরিপূর্ণতা। ঈশ্বরানুরাগ অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর জীব সর্ব্বকামনা-পরিত্যাগী হইয়া কেবল ঈশ্বরের অভিলাষী হইতে পারেন না। চিত্তের যখন এই অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত কেবল ঈশ্বরানুরাগী হয়, তখনই চিত্তের একমাত্র স্বপ্ন ঈশ্বর। আর এইরূপ নিষ্কামী পরিণত ভক্তের নিকট মাও কন্যাভাব ধারণ করেন। বৃদ্ধ সন্তানের নিকট মাতা যেমন কন্যাস্থানীয়া হয়েন, চিরযৌবনা উমা সেইরূপ সাধকের, ভক্তের নিকট কন্যাভাব প্রাপ্তহন। তখন ভক্ত প্রেম-কারুণ্যকণ্ঠে বলিতে পারেন, এস গৌরি মনোময়ী দেবী আমার! প্রকাশিত হও—একবার প্রত্যক্ষ করি। সাধনার সাধ পুরাও গো! আমার অন্তরে অন্তরে প্রকাশিত হও, আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। আর আমার ভার নিতে ভয় পেতে হবে না, এবার আমি তোর ভার নিব। প্রেমময়ি! আমার মনোময়ী মেয়েটীর বেশে হৃদয়াসনে এসে—নিত্য নৃত্য কর; আমি আত্মহারা—পাগলপারা হইয়া তোমায় দেখি, এই আমার ভিন্ন ব্রহ্মপদও যে আমার নিকট বেণু-দণ্ডের ন্যায় হেয়।" এইরূপ সর্ব্বকামনা-ত্যাগী যোগী আর মুহূর্ত্তও মায়ের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাকে পাইবার জন্য তখন চিত্ত একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, যেরূপ ব্যাকুলতায় গিরিরাণী গিরিরাজকে গলাইয়াছিলেন। তখন শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে চিত্ত উমাময় হইয়া উঠে।

"কুস্বপন দেখিছি গিরি! গৌরী আমার এসেছিল",

বলিয়া ভক্ত গিরিরাণীর ন্যায় স্বপ্ন-ঘোরে কাঁদিয়া উঠেন। বাস্তবিক অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিক এইরূপ ভাবই ঘটিয়া থাকে। যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহা গিরিরাণীর সুরে কাঁদিয়া উঠে। এক পলকের বিরহ বুঝি আর সহ্য করিতে পারেন না। তখন কৈবল্যদায়িনী ভগবৎ শক্তিকে ভক্ত স্বপ্নে প্রতীয়মান দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি এইরূপে প্রকটিত হয়। বিরহে ভক্তি এইরূপেই স্বপ্নময়ী হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতী রাধিকা শতবৎসর ধরিয়া শ্যামস্বপ্নে জীবিতা ছিলেন। মাতা যশোমতীও—"ওহে ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়া গোপাল কোথায় লুকাল" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বপনকথা ব্যক্ত করিতেন। মেনকাও স্বপ্নময়ী ভক্তি বিরহেই ভক্তির প্রকৃত রূপ প্রকটিত হয়। বিরহে সাধকের ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবার জন্য যেন উন্মুখ হয়। তাঁহার হৃদয়ে দুর্গোৎসব আইসে।

তখন সাধক বুঝিতে পারেন, হৃদয়ের

সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া শরতের শুভ্রময় সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতেছে। আশা অনাহত সুরে গাহিতে থাকে "গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী"।

অমনি সাধকের অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। ক্রমশঃ দশদিক আলো করিয়া মহাশক্তির সকল মূর্ত্তিতে দুর্গোৎসব উদয় হয়। তখন সাধক আপনা ভুলিয়া তাহারই অন্তরের ভগবৎ শক্তি ভগবতী মূর্ত্তিতে, অন্তরের সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী মূর্ত্তিতে, অন্তরের দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা সরস্বতী মূর্ত্তিতে; অন্তরের যে অদম্য বীরত্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাপাসক্তিরূপ মহিষাসুর বিজিত হয়, যে সংযম বীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, তাহা কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিতে, আর ভগবৎ-শক্তিপ্রসূত সিদ্ধিকে গণেশের অগ্নিবৎ উজ্জ্বল প্রতিমায় প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার চারিদিকে শোভার ভাণ্ডার বিকীর্ণ হইয়া উঠিল। তখন হৃদয় দৃঢ়াভক্তি ও অহেতুক প্রেমসম্পন্ন হয়। তখন দিব্যজ্ঞান জন্মে, বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, দারা, পুত্র, ধনৈশ্বর্য্য কিছু নহে, ঘট পট, আমি আমার কিছু নহে, সবই তিনি; সেই আদি অন্তহীনা, চরাচর বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বেশ্বরী সত্য। সত্যস্বরূপ সনাতনীর সত্যজ্ঞানে অসত্য দূরে যায়, অচঞ্চল আলোকাধার-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সেই নিত্যা ও লীলাময়ীর প্রেমলীলা-মাধুর্য্যে সাধক অনন্ত কালের জন্য ডুবিয়া যান। মা—ছেলে বা ভগবান্—ভক্ত আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যান। এইরূপে শারদীয়োৎসবের বিজয়া প্রতিষ্ঠা হয়।

পাঠক! শারদীয়োৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধনার ফলে ভক্তহৃদয়ে ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। আর্য্যঋষি বুঝিয়াছিলেন, সাধনা ও সিদ্ধির এ আদর্শ নয়ন-ছবি রূপে জাগরূক রাখা আবশ্যক। তাই প্রতি বৎসর শরতের শুভ্র সৌন্দর্য্যে দুর্গোৎসবের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা ভক্তহৃদয়ের সেই আভ্যন্তরিক ব্যাপারের বাহ্য-বিকাশ মাত্র। নহিলে পূজা অন্তরেই হয়। সকলে মিলিয়া একত্র আমোদ ও পূজা করিব বলিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বাহিরে ঢাক ঢোল বাজাইয়া দেওয়া হয়।

এস ভাই! শারদীয়োৎসবের শুভ মুহূর্ত্তে ভায়ে ভায়ে আবার মিলিত হইয়া আমরা আমাদের হৃতশক্তি ও দৃঢ়া ভক্তি পাইবার জন্য সেই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবারাধ্যা ব্রহ্মস্বরূপিনী মহাশক্তির অতুল রাতুল শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম করি—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

:0:

ভক্ত-কথামৃত।*

[মানকরের সিদ্ধ ভক্ত, প্রেম-পাগল শ্রীল রাধামাধব দাস মহাশয়ের সদুক্তি-সংগ্রহ]

তত্ত্ব-কথালাপ।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত নব-বিধি বা অনুরাগের বিধি।

প্রশ্ন। (রসিক),—বৈধী দেহ, অনুরাগ প্রাণ। প্রাণহীন বৈধী দেহ দিয়া কি হইবে? বৈধীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। বেদ-বিধি জাতিধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম উত্তরোত্তর ঘুচিয়া যাইবে। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

উত্তর। (পাগল),—বৈধী দেহ, অনুরাগ প্রাণ, ইহা সত্য বটে; বৈধী-আচরণ ব্যতীত অনুরাগ হয় না, ইহাও ঠিক্

দেশ কাল পাত্রভেদে যুগে যুগে বিধির পরিবর্ত্তন ঘটে; তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভু, প্রভুপাদ সনাতনগোস্বামী দ্বারা ভক্তি-স্মৃতি দিয়া ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞান দিয়াছেন এবং স্বয়ং, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম, সার্ব্বজনীন বৈধী ও ভক্তিশাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী ভিন্ন সর্ব্ববর্ণের অধিকার নাই; উহা দ্বাপরযুগের যুগধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ।

কলিযুগের যুগধর্ম্ম স্থাপন জন্য স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ; হরিভক্তিবিলাস সত্য-যুগ হইতেই ছিল, তাহার জন্য অবতারের প্রয়োজন ছিল না।

কলিযুগের যুগধর্ম্ম সর্ব্বাংশে নূতন। এইজন্যই শ্রীনবদ্বীপ ধাম,—নবলীলা, নব সঙ্গ; পুরাতন বিধির সহিত ইহার বিপরীত ভাব; প্রেমের গতি কুটীল, সকলই উল্টা ব্যাপার। কলিযুগে আশ্রম বর্ণের ভেদ নাই, সকল জাতিই পতিত এবং সকল বর্ণের এক প্রকার ধর্ম্ম।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং।
বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং।"

ইহাই সর্ব্ব বর্ণ ও সকল আশ্রমের বিধি। ইহাতে তিলক মালার কোন উল্লেখ নাই।

"*ভক্ত-কথামৃত" নিয়মিত রূপে "আর্য্য-দর্পণে" প্রকাশিত হইবে। কতদিনে শেষ হইবে, বলিতে পারি না; প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার,—ভক্ত পাগলের এ অমিয় মধুর বাণী। ক্রমে ঝলকে ঝলকে সুধা ক্ষরিত হইবে। রাগ মার্গের উচ্চতম সাধক প্রেম-পাগল আমাদের এই "পাগল"-ভক্ত এখনও সশরীরে বর্ত্তমান; কাহারও কোন কথা জিজ্ঞাস্য থাকিলে আমাদিগকে রিপ্লাইকার্ডে পত্র লিখিতে পারেন।

"তামা কাঁসা রূপা; সোণা, রত্ন চিন্তামণি
কেহ যদি কাঁহা পোঁতা পায় একখনি॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু, রাম রায়।"

আমাদের এই আলোচ্য প্রসঙ্গেও ভক্ত পাঠক-মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে উত্তম বস্তু পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করিবেন। এইরূপ আশা করি। ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধ পাঠ করুন।

সোণামুখী পোঃ (বাকুড়া জেলা) } দীন—রসিকলাল দে, সোণামুখী, গরীব ভাণ্ডার

পতিত জাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাগত হইয়া নিরপরাধ নাম সংকীর্ত্তন করুন। ইহাও বাহ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুসরণে নাম-সংকীর্ত্তন করিলেই বৈধীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইবে। অন্যথা ঘোর অপরাধ। বেদবিধি জাতি-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ছাড়িয়া নাম সংকীর্ত্তন করা মহাপ্রভুর আদেশ। তিনি স্বয়ং উহা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। উত্তরোত্তর ঘুচিবে কি প্রকারে?

"সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ছাড়ি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সর্ব্ব সাধি শেষ এই আজ্ঞা বলবান্॥
সেই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

এই সকল উক্তি হইতে কি বোধ হয়? গোপীভাবামৃত পাইবার লোভ উৎপাদনের পূর্ব্বে পতিত শরণাগত হইয়া নিরপরাধ নাম-সংকীর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহাই অনুরাগের বিধি বা রাগে উঠিবার প্রথম সোপান বা সহজ পথ।

রাগ ধর্ম্মের গুহ্য ও বাহ্য ভাব।

প্রশ্ন। "কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

উঃ। যখন মহাজন বাক্য, তখন রাগমার্গ যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে, এ আশা বাতুলতা মাত্র

উত্তর। রাগমার্গ বলপূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রচার করাই যুগধর্ম্ম। গোস্বামী-প্রভুগণ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত চারি লক্ষ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি প্রচার জন্য বহু কষ্ট করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর নানা যাতনা পাইয়াছেন। বাহ্য সংকীর্ত্তন বিধি প্রচারিত হইতেছে। নিগূঢ় ভাব, সহজ বস্তুর সহজ বা নিত্য দেশে নিত্য স্থিতি, উহা প্রচারের দ্রব্য নহে। যখন বিধি দেখিলেই লোকের ভয় হইবে; তখন অনুরাগ হইবে। জগতে ধর্ম্ম স্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশ মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরোপকার প্রধান ধর্ম্ম। জ্ঞানদান ও পথ পরিষ্কার করা মহাজনের স্বভাব

"মহান্ত স্বভাব হয় তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥" স্বয়ং ভগবানকে অনুরাগী ভাগ্যবান ভিন্ন কেহ দেখিতে পান না। দেখিলেও চিনিতে পারেন না। রাগমার্গ সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, সাধুসঙ্গ ব্যতীত অলভ্য, তবে বাহ্য সংকীর্ত্তন প্রচারই যুগধর্ম্ম স্থাপন।

দীন—রসিক।

যাত্রী।

আমি যাত্রী, চলিছি পূজিতে জগদ্ধাত্রী।
তোরা কে কে যাবি আয়,
মাধব মাঝির নায়;
হরিনামের তরী তাঁর ভবপারে যায়॥

পিতা মাতা বন্ধু ছাড়ি
বিদেশেতে ছিনু পড়ি,
কাঙ্গাল বলি দয়াল হরি নিল তুলে নায় ।
তরী প্রেমে ভেসে যায়
তোরা ত্বরা করে আয়
চেয়ে দেখ আয়ু-সূর্য্য অস্তাচলে ধায় ॥
শ্রীহরি কাণ্ডারী করি
ভবনদী দিয়ে পারি
তোরা কে কে যাবি নিজ ধামে এই বেলা
আয় ।
করিতে সার্থক জন্ম সেবি বাপ-মায় ॥

শ্রীমোহিনীমোহন বসু ।

ধ্যানযোগ ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর ।)

অষ্টাঙ্গ-যোগ ।

ঋষি পাতঞ্জল যোগসাধনকে আট ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । যথা :—

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার,
ধারণা ধ্যান সমাধি যাষ্টাবঙ্গানি ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ । যম হইতে সমাধি পর্যন্ত প্রত্যেকটী অঙ্গ তাহার পূর্ববর্ত্তী অঙ্গের সাধনে কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভর করিতেছে ।

প্রথম হইতেই যাহাতে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, তাহাই যোগের অঙ্গ রূপে ক্রমে কথিত হইতেছে । প্রথমতঃ যম কি ? তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ।

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ ।
পাতঞ্জল দর্শন ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ । এইগুলি যম অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত । ইহার যে কোন একটী গ্রহণ করিয়া জীবনে সাধন দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, তৎপরবর্ত্তিটী ক্রমে আপনিই প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহাদের সাধন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

অহিংসা ।

কাহারও প্রতি হিংসা অর্থাৎ অপকার চেষ্টা না করার নাম অহিংসা । হিংসা নানা প্রকারে সাধিত হইতে পারে । মন, বাক্য বা হস্তপদাদির দ্বারা হিংসার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে । লগুড়াঘাতে জীবদেহের বিনাশ সাধন না করাকেই শুধু হিংসা বলে না ; কটুবাক্য বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া অপরের প্রাণে যে বেদনার সৃষ্টি করা হয়; তাহাও এই হিংসারই অন্তর্গত । তদ্ব্যতীত মনে মনেও হিংসা করা যায় । কাহারও হৃষ্টপুষ্ট দেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার পতন জন্য মনে যদি ইচ্ছার উদ্রেক হয়; তাহাও হিংসা । কারণই

কায়মনোবাক্যে পরাপকার চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন কাহারও প্রতি কোন অনিষ্টের ইচ্ছা উদয় না হয়, (কার্য্যে বা বাক্যে প্রকাশ দূরে থাকুক) এবং সকল বিষয়েই উদারভাব প্রাণে জাগিয়া উঠে, তখন "অহিংসা" সাধনায় সিদ্ধির পথে অগ্রসর বুঝিতে হইবে। হিংসা প্রাণে জাগরিত হইলেই চিত্ত চঞ্চল হয়, মন অপবিত্র হয়, কাজেই যোগের বিঘ্ন হয়।

দুই এক কথায় অহিংসা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, উহা কার্য্যে পরিণত করা কিন্তু সহজ নহে। পরম মঙ্গলময় জগৎপিতা জগদীশ্বরের শরণাগত না হইলে, তাঁহাকে না জানিলে, অহিংসা সাধন কথার কথা হইয়া উঠে। যাহার আমি ও তুমি, আপন ও পর ভেদজ্ঞান রহিয়াছে, তাহার অহিংসা সাধন হইবে কিরূপে? ভেদজ্ঞান থাকিতে অভেদজ্ঞান হইতে পারে না, তাহাতে স্থিতিস্থাপকতা দোষ হয়। তবে কি অহিংসা সাধন হইবে না? অবশ্য হইবে। আমরা সকলেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পিতার সন্তান, আমরা সকলে ভাই ভাই, এই ভাব প্রাণে লইয়া এবং তাঁহার রাজীব চরণে শরণাগত হইয়া এই সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। তবেই তিনি সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা রূপে সাধকের সহায় হইবেন।

কেবল এক অহিংসা সাধন করিতে পারিলেই সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অপর অঙ্গগুলি তখন একে একে আপনিই জীবনে ফুটিয়া উঠিবে। চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদকুল হাস্যমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত করে, তেমনি অহিংসার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বপ্রেমরূপ চন্দ্রের কিরণে সাধনার স্তরগুলি ফুটিয়া উঠে ও সুগন্ধে জীবন মধুময় করিয়া তোলে, নরদেহে দেবত্ব লাভ হয়।

সত্য।

সত্যই ভগবানের স্বরূপ। সত্য লাভ হইলে, জীবের বাঞ্ছনীয় বস্তু সংসারে কিছুই থাকে না এবং সত্যস্বরূপ, করুণানিধান সাধকের সর্ব্ব কার্য্যে সহায় হন।

যিনি সত্যবাদী, তাহার কথার মূল্য কত? তাহার আদর কত? এই সব দেখিয়া প্রথম হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করা উচিত। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা আচরণ করা, এ সমস্তই মানবের উন্নতির বিরোধী। সংসারে মানবের এমন কোন বিষয় নাই, যাহার জন্য বাধ্য হইয়া মিথ্যা কথা বলিতে হয়। অনেকে সময় সময় হয়তঃ বিশেষ কোন বিপদের ছায়া দেখিয়া মিথ্যাদ্বারা সেই বিপদ মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ চেষ্টাও করে; কিন্তু এবম্বিধ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এমন শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে সত্যবাদী, সে শত অপরাধ করিয়াও কেবল মাত্র সত্যের বলে সর্ব্বদাই রক্ষা পাইয়াছে।

সত্যসাধন করিতে হইলে প্রথম সত্য কথা বলা অভ্যাস করা, সত্য বিষয়ে চিন্তা ও সত্যবাদী মহাত্মাগণের জীবনী ও কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে হয়। আলোচনা করিতে করিতে মিথ্যার মায়াময় আবরণ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যায়। তখন আর মিথ্যাকথা বলিতে স্পৃহা থাকে না,

এমন কি মিথ্যাবাদীর মুখ দেখিলেও ক্রোধ হয়। সত্যের বিমল আলোকচ্ছটায় হৃদয়-মন মত্ত হইয়া থাকে। সত্যবাদী সদা নির্ভীক, নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে অবস্থান করে। সত্যে স্থির হইয়া সাধকের সকল চঞ্চলতা দূর হয়।

মিথ্যাবাদী ভীরু, কাপুরুষ ও লজ্জাশীল হয়, সর্ব্বদা সশঙ্কভাবে অবস্থান করে। মনে সর্ব্বদাই ভয় হয় কখন বা তাহার মিথ্যার বিষয় প্রকাশ হয়, এবং সেই এক মিথ্যা গোপন করিবার চেষ্টায় শত শত মিথ্যার সৃষ্টি করে। মন সর্ব্বদা অশান্ত ও চঞ্চল থাকে। মিথ্যাবাদী কোন বিষয়েই সম্যক সুখী হইতে পারে না। সদাই সন্দিগ্ধ-চিত্তে অবস্থান করে এবং মিথ্যাদ্বারা প্রবঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে; এবং এইরূপে মিথ্যার অপাতঃমধুর ছটায় মুগ্ধ হইয়া সে চিত্তের সমস্ত স্থির-ভাব নষ্ট করিয়া ফেলে। কাজেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করিতে হইলে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; সত্যকে জীবনের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাতে চিত্তের স্থির ভাব জাগিয়া উঠিবে ও যোগ-সাধনও সহজ হইবে।

অস্তেয়।

পরের বস্তু অপহরণ না করাকে অস্তেয় বলে।

পরের দ্রব্য না বলিয়া লইয়া আসিলে ত অপহরণ হয়ই, মনে মনেও যদি কাহারও বস্তু গ্রহণ, করিবার মতলব করা যায়, তাহাও অপহরণ রূপেই গণনীয় হয়।

অভাবের অনুভব ও তাহার পরিপূরণের ইচ্ছা হইতে এই অপহরণ বৃত্তির উৎপত্তি। যাহার কোন বিষয়ের অভাববোধ নাই, তাহার কাহারও কোন বস্তু চুরি করিতেও ইচ্ছা হয় না। কোনরূপ অভাবের কথা মনে হইলেই চিন্তা করিতে হয় যে, উহা আমার প্রকৃত অভাব কিনা? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে আমাদের কোন অভাবই নাই। আমরা যে দিবা-নিশি অভাব বলিয়া চীৎকার করি, উহা আমাদের মনঃকল্পিত এবং পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিলেও চলে।

কত লোক শাকান্ন খাইয়া সুস্থ ও সবল দেহে সুখে তাহার পর্ণ-কুটীরে নিদ্রিত রহিয়াছে, আর কেহবা কালিয়া পোলাও খাইয়া কবাব হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে। ইহাতে দেখা যায়, মনের পূর্ণতা ও তৃপ্তিই সুখ এবং অভাববোধই মনের অশান্তির মূল কারণ। যাহাতে প্রকৃত ও শাশ্বত সুখ লাভ হয়, তাহাই জীবের অবশ্য প্রার্থনীয় বস্তু। কাজেই মনগড়া কতকগুলি অভাবের অনুসরণ না করাই সর্ব্ব সুখের নিদান। যদি অভাববোধই না থাকিল, তবে আর চুরি, পরস্বাপহরণ, চিত্তের কোথায় স্থান পাইবে? পরস্বাপহারীর কত ভয়। তাহাকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে থাকিতে হয়। গাছের পাতাটী নড়িলে তাহার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। লোকসমাজে তাহার দুর্ণাম রটিয়া যায়। কাহারও নিকট সে মুখ দেখাইতে পারে না। সদা অস্থির ও অসুস্থ চিত্ত লইয়া সে দিন কাটাইতে থাকে। কাজেই ইচ্ছা করিয়া কাহারও চুরিদ্বারা সুখ-লাভেচ্ছা মনে স্থান

দেওয়া উচিত নহে। যখন যাহার অভাব-বোধ দূর হইল, তাহার পরস্বাপহরণ বৃত্তিও রোধ হইল, তখন সে আত্মারাম হইল। তাহার কোনও অভাব নাই। তিনি তখন পূর্ণ। পূর্ণ হইয়া পূর্ণানন্দের অধিকারী। বিষয়-বিষ আর তখন তাহাকে জ্বালা দিতে পারে না। তাহার চিত্ত স্থির হইয়া পরমানন্দময় সাগরে লীন হয়। কাজেই চিত্তস্থির করিতে হইলে অস্তেয় সাধন করিতে হয়। অস্তেয়-সাধন সিদ্ধ হইলে সংসারে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

ব্রহ্মচর্য্য।

বীর্য্য-ধারণম্-ব্রহ্মচর্য্যং।
বীর্য্যধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে ॥

আবার ব্রহ্মে বিচরণ করাকেও ব্রহ্মচর্য্য বলে। তবে অগ্রে বীর্য্যধারণ ও তৎপর ব্রহ্মে বিচরণ। বীর্য্যধারণশক্তি যে জীবের স্বাভাবিক, তাহা ইতর প্রাণী কুকুর, শৃগালাদির বৎসরে একবার নিয়মিতরূপে কোন এক সময়ে জগতে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষাবিধান জন্য বীর্য্যত্যাগ হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে মানব আজকাল কুকুরাদি হীন জন্তুগণ অপেক্ষাও হীনতর হইয়া পড়িয়াছে। অনিয়মে অপর্য্যাপ্ত শুক্রক্ষয় করিয়া,—কাম-কুকুরের সেবা করিয়া,—আপাতঃ-মধুর সুখ লোভে মত্ত হইয়া শাশ্বত সুখের পথ চিরকণ্টকাকীর্ণ করতঃ ক্ষয়ের পথে—সংহারের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে পুরাকালের ব্রহ্মচর্য্য সাধনের নিয়মগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালন সুকঠিন। স্কুল কলেজে বালকগণের ব্রহ্মচর্য্য পালনের কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। সংযমের পরিবর্ত্তে ভোগবিলাসের দিকেই বালকগণের একনিষ্ঠা দেখা যায়। পূর্ব্বের নিয়মানুসারে প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত গুরু গৃহে, একাহারী, ভূশয্যাশায়ী ও সাত্ত্বিকাহারী হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। তাহাতে জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়-সংযম উভয়ই লাভ হইত। এবং জীবনও সংসারাশ্রমের উপযোগী হইত। সংসারাশ্রম বা গার্হস্থ্যাশ্রম সংযমীর স্থান,—কামকামনা, বিষয়বাসনা-মুক্ত ব্রহ্মচারীর আবাস স্থান। ইহা কাম-কুকুরের লীলাস্থল নহে, বিষয়ভোগলালসার বিলাসস্থল নহে। হায়, আজ এই পবিত্র গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রকৃত সংযমী ব্রহ্মচারীর অভাব হইয়া, ইহা কাম কুকুরের ক্রীড়াস্থল হইয়াছে। দেবতার আসনে অজ্ঞ পশুগণ বিচরণ করিতেছে। দেশও কাজেই ধ্বংসমুখী হইয়া উঠিতেছে। এই ধ্বংসমুখী দেশের ও জাতির রক্ষার ভার যুবক ও বালকগণের উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাহারা না জাগিলে বা তাহাদের না জাগাইলে—তাহারা ভোগ-লালসা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ত্যাগের উচ্চ শিখরে,—সংযমের ক্রোড়ে বিরাজিত না হইলে, শুধু কথার কথায় আবেদন, নিবেদন বা বক্তৃতায় ফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বড় দেখা যায় না।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে দৃঢ়তাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাসের বলে সংযমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সময়োপযোগী বিষয়াদি অনাসক্ত ও নিয়মিতরূপে ভোগ করিয়া সংযম অভ্যাস

করিতে হয়। বিবাহান্তে ছাগছাগীর মত জীবন অতিবাহিত করিয়া—কতকগুলি তদনুরূপ সন্তান সন্ততির সৃষ্টি করতঃ—সংসারে পাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত না করিয়া, দেশের, দশের, নিজ পরিবার ও নিজ দেহের উন্নতিমানসে সংযমী হইতে হয়, জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যাহারা এইরূপ জীবন অতিবাহিত না করিয়া, বিবাহিতা ধর্ম্ম-পত্নীকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করায় এবং তাহাকে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের যন্ত্র স্বরূপ মনে করে, তাহারা আত্মদ্রোহী, স্বজনদ্রোহী এবং মায়ের কুসন্তান। তাহারা ক্ষীণবীর্য্য, অল্পায়ু, চিররোগী সন্তান উৎপাদন করতঃ দেশ, সমাজ ও জাতিকে অধঃপাতিত করিতেছে।

ভুক্ত দ্রব্য হইতে আমাদিগের দেহে প্রথমে রক্ত প্রস্তুত হয়, রক্ত হইতে মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রের সৃষ্টি হয়। এই শুক্র সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া শক্তিরূপে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবস্থান করে। ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই মানব ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মানবের দেহে একমাত্র শক্তি-কেন্দ্ররূপে শুক্র অবস্থান করিতেছে। ইহার অভাব বা অল্পতাই মানবকে নানাবিধ ব্যাধির করালগ্রাসে পাতিত করিতেছে। ইহা দেহে বলের আকরস্বরূপ বলিয়া বীর্য্য নামে কথিত হয়। বীর্য্যহীন ব্যক্তির মলিন মুখখানি দেখিলেই হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। অপরিপক্কাবস্থায় অনিয়মিতরূপে বীর্য্যক্ষয় হইলে মানুষকে ক্রমে মরণের পথে লইয়া যায়। বীর্য্যহীন ব্যক্তির চিত্তের স্থিরতা থাকে না, কখন কি বলে, কি করে, কিছুরই স্থিরতা থাকে না, দিনে শতবার প্রতিজ্ঞা করিয়া শতবার তাহা ভঙ্গ করে। এইরূপ মানবই প্রকৃতপক্ষে দেশের শত্রু। লোকে চেষ্টা করিয়া আত্মরক্ষা করে—অপরকে হত্যা করিয়াও নিজকে রক্ষা করে, আর ইহারা নিজে চেষ্টা করিয়া কামাগ্নিতে নিজকে আহুতি প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করে।

কুসঙ্গে মিশিয়া কু-রঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল চিন্তা করিলে, কিম্বা যেরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে, বা দৃশ্য দেখিলে, অথবা গল্প শুনিলে ইন্দ্রিয়ের বিকলতা জন্মে, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সদা সৎ ও সাধুগণের সহিত একত্রে অবস্থান করিতে হয়। ইহাতে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ক্রমে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় এবং কামের উত্তেজনা হ্রাস হইতে থাকে। নিজকে বীর্য্যবান করিতে হইলে,—মানব-জনমের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে,—নিজকে পবিত্র করিতে হইলে,—সেই সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্ব শক্তির আধার শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে চলিতে হইবে। তবেই ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ ও নর-দেহে দেবত্ব লাভ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

মনকে যেরূপ চিন্তায় ডুবাইয়া রাখা যায়, মন সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। কুৎসিৎ চিন্তায় ও কুভাবে পূর্ণ থাকিয়া মন এরূপ দুর্ব্বলতাই প্রাপ্ত হয় যে, তখন আর নিজের যুবতী ভগ্নিটীর প্রতি পর্য্যন্ত সরল, সহজ ও পবিত্রভাবে তাকাইবার শক্তি থাকে না।

ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় বা অধঃপতনের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কাজেই সকলেরই প্রথম হইতে সতর্ক হইয়া অলীক ও ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক দেখিলেই নিজের স্নেহময়ী জননীর কথা মনে করিতে হইবে; রমণী মাত্রেই যে জননীর অন্যতরা মূর্ত্তি। তাঁহাদের স্নেহময় ক্রোড়েই যে প্রসূত ও প্রতিপালিত হইয়াছি। এবম্বিধ পবিত্রতা-পূর্ণ উচ্চভাবে মন সর্ব্বদা ভরপুর রাখিতে হইবে। ক্রমে জগজ্জননীর দয়া হইবে, পাপের আবরণ আপনিই খসিয়া পড়িবে। জ্যোতির্ম্ময়ের ভাস্বর জ্যোতিঃ দেহ মন প্রাণ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়ব্রত, সাধক জীবদেহে দেব-দেহ প্রাপ্ত হইবেন। নরত্বে অমরত্ব লাভ করিবেন।

অতএব দেখা যায়, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী না হইতে পারিলে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতভাবে সময় ক্ষেপন করিতে হয় ও চিত্তের স্থিরতা নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই চিত্ত স্থির করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

অপরিগ্রহ।

কেহ কোন বস্তু দান করিলেও তাহা গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। অপরিগ্রহ সাধনায় নিখিল জগতের ঐশ্বর্য্য সাধকের হস্তগত হইয়া থাকে। অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া মানব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে ও নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। যখন অন্যের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা যায়, তখন উপকৃত হইলাম বলিয়া তাহার সহিত কিছু বাধ্য-বাধকতার সৃষ্টি হয়। ক্রমে যতই গ্রহণ করা যায়, ততই এই ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ক্রমে দাতার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে দাতার মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। কখন কি হয়, এই-ভাবে অবশীকৃত চিত্ত লইয়া সদা ব্যাকুল-ভাবে থাকিতে হয়। কাজেই চিত্তের স্থিরতা নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্ব বর্ণিত পাঁচ প্রকার সাধনের নাম যম। ইহার প্রত্যেকটীরই উদ্দেশ্য একমাত্র চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন। চিত্ত স্থির হইলে তখন সেই নির্ম্মল চিত্তহ্রদে জ্ঞান সূর্য্যের দর্শন হয় ও সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

নিয়ম।

ঋষি পতঞ্জলীর মতে নিয়ম পাঁচ প্রকার যথাঃ—

> শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।
>
> পাতঞ্জল দর্শন।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণি-ধানকে নিয়ম বলে। ইহারা প্রত্যেকেই অমৃত ফল প্রসবকারী। সাধক ইহার যে কোনটীর সাধনা আরম্ভ করিলে অপরগুলি আপনিই লাভ করিবেন। এগুলি যোগের প্রধান সহায় এবং চিত্তস্থির করিবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। কোনটি কি ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে ও কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। সিদ্ধিকামী সাধক সদ্-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই নিয়মগুলি কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে পারিলে যোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরমানন্দের অধি-কারী হইবেন সন্দেহ নাই। যম যেরূপ

প্রধানতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে শৃঙ্খলায় স্থাপিত করে এবং চিত্তকে সমাহিত করিবার সহায়তা করে, তদ্রূপ নিয়মও প্রধানতঃ অন্তরেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধের সহায়তা করে।

শৌচ।

যে প্রকার ক্রিয়াদি দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হয় ও মনের শুদ্ধতা সম্পাদিত হইয়া সৎবিষয়ক চিন্তা হৃদয় অধিকার করে, তাহাই শৌচপদ বাচ্য। চিত্ত-মল দূর করিতে হইলে বহির্ভাগ অর্থাৎ দেহও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। কিন্তু আজ কাল কার্য্যতঃ ঠিক তাহার বিপরীত ভাব আচরিত হইতেছে। আতর, গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, সোপ, পোমেটাম, আদি দ্বারা কেবল বাহিরের সাজসজ্জা বাড়াইয়া দেহের চাকচিক্য সম্পাদনের দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, একশ্রেণীর লোক মল মূত্র ত্যাগ করিয়াও জল দ্বারা তত্তৎ স্থানগুলি প্রক্ষালন করিয়া বহিঃ-শুচি রক্ষা করা দরকার বোধ করেন না।

বহিঃশুচির প্রতি যখন এত অবহেলা, তখন অন্তঃশুচির বিষয় হৃদয়ে উদিত হওয়া একরূপ অসম্ভব। হৃদয়ে একরাশি মলা রহিয়াছে;—কাম ক্রোধাদি হিংস্র জন্তুগণ বসতি করিয়া চিত্তক্ষেত্রে ঘোর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তাহাদের পীড়নে মলিন চিত্তে শত শত বেদনার সৃষ্টি হইয়া মানুষ পশুত্বে পরিণত হইতেছে, কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। চিত্তের এই মলরূপ জঙ্গল দূরীভূত না করিতে পারিলে, কাম ক্রোধাদি হিংস্র জন্তুগণের বাসস্থান ভাঙ্গিতে না পারিলে চিত্তরূপ নিবাসে সদ্বাসনারূপ দেবতার বাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? চিত্তশুদ্ধির খোঁজ নাই, অথচ কেবল বাহিরের অঙ্গ মার্জ্জনায় ব্যস্ত! ইহাপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় আর কি হইতে পারে? পায়খানার ময়লা দূর না করিয়া যদি বারবার কেবল তাহার দেওয়ালে চুণকাম করা যায় ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা তাহার দুর্গন্ধ দূর করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে পায়খানা যেমন পুতিগন্ধময় ও ব্যবহারের অযোগ্য থাকে; তদ্রূপ বহিরঙ্গ মার্জ্জনশীল ব্যক্তির দেহ বা মন নিজের বা জগতের কোনও মঙ্গলকর কার্য্যের উপযোগী হয় না, বরং তাহাদ্বারা তাহার ত নিজের বটেই, অপর লোকেরও দুঃখের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অশুদ্ধ চিত্তে সদা পাপ-বাসনা, পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রীগমন, পরাপকার, হিংসা, দ্বেষ জাগিতে থাকে এবং সে এই সকল বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া লম্বাসাট-পটাবৃত হইয়া আতর, গোলাপ, ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ছড়াইয়া অপরের সর্ব্বনাশের জন্য প্রস্তুত হয়। বাহিরের লোকে দেখিয়াও বুঝিতে পারে না যে, সে কেমন লোক।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

জন্মোৎসব।—গত ৭ই ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস-দেবের জন্মতিথি-উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা সংবাদ পাইয়াছি, ঐ দিনে তদীয় বগুড়াস্থ শিষ্য ও ভক্তগণ মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-ব্রহ্মের পূজা, ভোগ, আরতি, গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিয়াছিলেন; এবং ভোগান্তে প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও কথক দ্বারা শ্রীশ্রীভাগবত পাঠ করতঃ মহানন্দে জন্মোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসবে ভিন্ন স্থান হইতে কোন কোন ভক্ত যোগদান করায় বগুড়াস্থ ভক্তগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছেন।

———0———

ঝুলন পূর্ণিমা।—কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—এবারে চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী থানান্তর্গত মির্জ্জাপুর গ্রামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র নামক আশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর জিউর ঝুলনোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেবালয়ের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত সীতারাম মোহান্ত বাবাজী এবং শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র মহাজনের সদয় ও শিষ্টজনোচিত ব্যবহারে যাত্রিগণ বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন। এবার অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

———0———

দুর্ভিক্ষে দান।—বাঙ্গলার স্বনাম-ধন্য দেশনায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর জন্য ২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মিঃ এ, কে, এস, জামাল রেঙ্গুণপ্রবাসী মুসলমানগণের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। তিনি আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ প্রবাসী মুসলমানদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। শুনা যায় তিনি নাকি বিপন্নের সহায়তাকল্পে শীঘ্রই আসামের কমিশনার বাহাদুরের নিকট ৬২০০৲ টাকা পাঠাইবেন। আর ইতিপূর্ব্বে মিঃ জামালসাহেব অন্নকষ্টপীড়িত, পূর্ব্ববঙ্গবাসী-দিগের সাহায্যার্থ স্বয়ং ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। উপরোক্ত উদারচরিত্র মহোদয় দ্বয়ের সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের দেশবাসী হিন্দু মুসলমান ভ্রাতাগণের অনুকরণ করা উচিত নয় কি? দেশে হাহাকার রব উঠিয়াছে, এখনও কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত? দেশগত, জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে দুই চারি, দশজনের যত্ন, চেষ্টা সমুদ্রে বিন্দুপাতের ন্যায় হইবে!!

———0———

বন্যার্ত্ত-সেবাসংবাদ—অত্র মঠ হইতে শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ তিনজন সেবক প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীহট্ট জেলায় কাজ করিতেছেন।

———0———

ওঁ তৎসৎ ।

আর্য্য-দর্পণ ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, { অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা ।

ধ্যানযোগ ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

মানবের এরূপ জীবন সর্ব্বথা হেয় । এবং এরূপ মানবে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ নাই; আমাদের পবিত্রতার জন্য ভগবদ্দত্ত যে স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে, ভগবানের নাম গুণগান ও শ্রবণ করিয়া,—সাধুসঙ্গ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবার যে বাসনা রহিয়াছে, তাহাই আমাদের মনুষ্যত্ব এবং সেইজন্য মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অন্যথায় কোন পার্থক্য নাই । শ্রীভগবান উত্তরগীতায় অভিমন্যু-শোক-মুহ্যমান অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন :—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ ।
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম ।
জ্ঞানং নরানামধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ।

আহার নিদ্রা ও মৈথুন—এসকল কার্য্য মানব ও পশুগণ কর্ত্তৃক সমানভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু মানবের জ্ঞান (বিবেক) থাকায় সে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতএব যাহার জ্ঞান নাই, তাহাতে ও পশুতে কোন পার্থক্য নাই ।

কাজেই নিজের মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে হইলে, পশুত্ব হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে, জ্ঞান খড়্গ দ্বারা পশুর সমতুল্য বৃত্তিগুলিকে ছেদন করিতে হইবে । ইহাতে ক্রমে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া শৌচে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিবে ।

সর্ব্বদা সৎ বিষয় আলোচনা, সৎসঙ্গ ও সচ্চিন্তা দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি লাভ হয় । সর্ব্বদা পরের উপকার ও উন্নতি চিন্তা করিতে হয় । কার্য্যতঃ সকল সময় না পারিলেও মনে প্রফুল্লচিত্তে সেবা করিতেছি, এরূপ ভাব প্রাণে পোষণ করিতে হয়—ইহা দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হয় । চিত্ত শুদ্ধ হইলেই স্থির হয় এবং এই স্থিরতাই যোগাভ্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য ।

এই অন্তঃশৌচ সাধনের আর একটী খুব সরল ও সহজ উপায় বর্ত্তমান আছে। উহা কোন রূপ শ্রমাদি সাধ্য নয়। ইহা অবলম্বন করিলে অতি অল্লায়াসে চিত্তশুদ্ধি হইয়া সর্ব্ব-যোগের অধিপতি যোগেশ্বরের পরম পদ পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। এই সহজ উপায়টী শ্রীহরির নামকীর্ত্তন ও শ্রীহরি-গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ। ইহা দ্বারা মনের সর্ব্ববিধ মল দূরীভূত হইয়া পরম আনন্দের উৎপাদন করে। এই তারক ব্রহ্মনাম আশ্রয় করিলে জীবের আর কোন ভাবনা থাকে না। সংসারে থাকিয়াই মানব হরিনাম সুধারস পান করিয়া মাতোয়ারা হইয়া যায়। শৌচ লাভের এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পন্থা। যথানিয়মে নাম জপ ও কীর্ত্তন করা অতি সহজ কার্য্য। একটু ইচ্ছা থাকিলেই হয়।

সাধু, মহা-পুরুষ ও অবতারগণের শ্রীমূর্ত্তি-চিন্তা দ্বারা বা কোন প্রিয় দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা দ্বারাও এই চিত্তমল বিদূরিত হইয়া অতি সহজে শৌচ প্রতিষ্ঠিত হয়। শৌচসিদ্ধি হইলে আর কি হয় ?

শৌচাৎ স্বাঙ্গ জুগুপ্‌সা পরৈরসঙ্গশ্চ।
সাধনপাদ পাতঞ্জল ॥

শৌচ সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ যখন বাহ্য ও অন্তর এই উভয় শৌচ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজের দেহের প্রতি আসক্তি দূর হয় এবং অপরের সঙ্গলাভ ইচ্ছাও দূর হইয়া যায়।

বাহ্য ও অন্তঃশৌচ আরম্ভ করিলে দেখা যায়, শরীর মল মূত্রাদি হেয় বস্তুর আধার এবং ইহা অন্নাদি ভোজ্য বস্তুর পরিণাম বিশেষ এবং নাশশীল; কাজেই শরীরের প্রতি আসক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং অপরের দেহের প্রতিও লালসা থাকে না। তখন সাধক প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া যোগে মনোসংযোগ করিতে পারেন। ইহাই শৌচের তাৎপর্য্য।

সন্তোষ।

যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকে এবং কোনরূপ অভাবাদি দ্বারা বিচলিত হয় না, তাহাই সন্তোষ। এই সন্তোষ রূপ অমৃত-পানে যিনি তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার সংসারে চাহিবার আর কিছুই নাই।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।
সাধনপাদ পাতঞ্জল।

সন্তোষ সিদ্ধি হইলে অতি উত্তম সুখলাভ হয়। সে তৃপ্তি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; কেবল মাত্র অনুভবগম্য।

কামকামনা, বিষয়বাসনা-সেবাপরায়ণ মনই এই সন্তোষের বিঘ্নকর। কাজেই যিনি কামরূপ দুরাসদ রিপুকে জয় করিতে পারেন, কামনাকে নিজ বশীভূত রাখিতে পারেন, তিনিই এই সন্তোষ বা শান্তির অধিকারী। চিত্তে সন্তোষ রক্ষা করিতে হইলে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে সংসারে কার্য্য করিয়া যাইতে হয়। "ইহা হইল না, ইহা পাইলাম না, ইহা না হইলে চলিবেই না" ইত্যাদি অভাবের ভাব-গুলি চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া, রিপুগণকে পূর্ণরূপে সংযত করিয়া অবস্থান করিলে সন্তোষ তাহার নিত্য সহচররূপে থাকিয়া মানবদেহে দেবত্বের অপূর্ব্ব সুখলাভের অধি-কারী করিয়া দেয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে শান্তির অধিকারী নির্ণয় করিবার সময় বলিয়াছেন :—

আপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

যেমন নদী সকল পরিপূর্ণ স্থির-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ যাঁহার চিত্ত ভগবচ্চরণে মিলিয়া সকল প্রকার কামনা বাসনা স্থির হইয়াছে, তিনিই শান্তি লাভ করেন; কামকামনা-তাড়িত ব্যক্তি কথনও এরূপ শান্তি লাভ করিতে পারে না।

আরও বলিয়াছেন—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্
পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কার স
শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

যিনি কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই শান্তি ও সন্তোষ একই বস্তু।

এই সন্তোষ লাভের জন্য জগজ্জীব লালায়িত। এই শান্তির শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রার্থী হইয়া যোগী গিরিগহ্বরে ধ্যান-নিরত।

সন্তোষ লাভেচ্ছু সাধক সদা নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করিবেন এবং সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে সেই করুণাময়ের করুণা-কণার বিকাশ দেখিতে থাকিবেন। দেখিবেন—তাঁহাকে আর দুঃখের ত্রিসীমানায়ও যাইতে হইবে না। চিত্তের স্থিরতা ভিন্ন এইরূপ সন্তোষ লাভ হইতেই পারে না।

তপ।

তপঃ বা তপস্যা—ব্রত নিয়মাদি পালন এবং বেদবিহিত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান, যাহা চিত্তশুদ্ধির জন্য আচরিত হয়—তাহাই তপ নামে খ্যাত।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় তিন প্রকার তপের উল্লেখ আছে ; যথা,—শারীর, বাঙ্ময় ও মানস।

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে ॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীর তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং
প্রিয়হিতঞ্চযৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং
তপ উচ্যতে ॥

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য ও শাস্ত্রাদিপাঠকে বাঙ্ময় তপস্যা বলা যায়।

আর—

মৌনঃ প্রসাদঃ সৌমত্বং
মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো
মানসমুচ্যতে ॥

মনের প্রসন্নতা, অক্রুরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও চিত্তের ভাব সংশোধন এইগুলি মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।

গীতোক্ত ত্রিবিধ তপের অন্তর্গত বিষয়-গুলি সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যম নিয়মাদির-বর্ণনাকালে একরূপ মোটামুটী বলা হইয়াছে।

ঋষি পতঞ্জলি এগুলিকে তপ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; তপদ্বারা কি লাভ হয়, এইমাত্র তিনি বলিয়াছেন। যথা—

কায়েন্দ্রিয় শুদ্ধিরশুদ্ধি ক্ষয়াত্তপসঃ।

তপস্যাদ্বারা অর্থাৎ বেদোক্ত ব্রত নিয়মাদি যথাযথ প্রতিপালন দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হয় এবং অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে বহিরিন্দ্রিয়গুলির অন্তর্নিহিত সুক্ষ্ম শক্তিগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকে। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি শক্তি ইহা দ্বারাই লাভ হয়। এগুলি বহিরঙ্গ শক্তি। তপপূতঃ বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবদ্দর্শন হয়। অশুদ্ধি ক্ষয় জন্য চিত্ত শান্ত ও মন স্থির হয় এবং যোগী যোগে সিদ্ধকাম হয়েন।

স্বাধ্যায়।

বেদ বেদান্তাদি ভগবত্তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থপাঠ এবং প্রণবাদি মন্ত্রের উচ্চারণকে স্বাধ্যায় বলা যায়।

অনেক সময় সৎসঙ্গের অভাবে যোগসাধনরত ব্যক্তির খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সৎসঙ্গের আংশিক ফল ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সদগ্রন্থাদি পাঠ করিলে আলোচিত সৎ, সাধু ও ভক্তগণের পূত জীবনী ও ভগবত্তত্ত্বকথা সাধকের প্রাণে তত্তৎ অবস্থা লাভের জন্য উগ্র আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেন, ইহাতে সাধুসঙ্গের ফল লাভ হয়। এইরূপ পাঠ দ্বারা মনের বহুবিধ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া চিত্তের স্থিরতা লাভ হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মতের ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠকরা প্রথমাবস্থায় কখন উচিত নহে; তাহাতে বুদ্ধির অল্পতাহেতু ঋষিগণের মতে অনৈক্য দেখিয়া চিত্তের স্থিরতা লাভের পরিবর্ত্তে চিত্তবিক্ষেপই জন্মিয়া থাকে।

গুরুদত্ত মন্ত্র নিয়মিতরূপে জপ করিলে ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়। ইহাতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই ইষ্টলাভ হয়। এইজন্যই সর্ব্বদেশেই দীক্ষা-কার্য্যটী কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেশে গুরুকরন ও মন্ত্র-গ্রহণ জীবনের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম-রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ।
সাধনপাদ, পাতঞ্জল।

স্বাধ্যায় দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-প্রণিধান।

সংসারে সর্ব্ববিধ বিষয় হইতে মনকে অপসৃত করিয়া ভগবানে সমর্পণ করিলে তাহাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। ঈশ্বর প্রণিধানের প্রধান সহায় ভক্তি। প্রাণের ঐকান্তিক অনুরক্তি লইয়া ভগবচ্চরণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে মন অতি সহজেই স্থির হইয়া যায় এবং সমাধি লাভ হয়।

সমাধি ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ।

ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিলে সমাধি লাভ হয়। এই সমাধি অবস্থা যোগের চরম ফল। এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের অন্তরেন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

আসন।

আসন বহু প্রকার। দেহাভিমানী সাধক-গণ বহু আসন অভ্যাস করেন এবং তদ্বারা

দেহকে বহুকাল স্থির রাখিতে প্রয়াস পান। যে সকল আসনের উল্লেখ শাস্ত্রে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে পদ্মাসনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সহজ। এই আসন অভ্যাস করিলে তাহার ফল হাতে হাতে লাভ করা যায়। ব্যায়ামাদি দ্বারা যে রূপ সমস্ত শরীরে রক্ত প্রবাহ চালিত হইয়া দেহ ধৌতকরতঃ নির্ম্মল করিয়া ফেলে, এই আসনের ক্রিয়াও তদ্রূপ। ইহাতে দেহের বায়ুপ্রবাহ সরল করে ও চিত্তের ইতস্ততঃ ধাবিত বৃত্তিগুলিকে স্থির করিয়া আনে। কিছুদিন এই আসন অভ্যাস করিলেই ইহার সুফল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা শরীরের অযথা আলস্যভাব দূর করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মায়। ইহাতে সুনিদ্রা হয় ও মেধা বৃদ্ধি হয়, কখনও বাতব্যাধির আক্রমনের আশঙ্কা থাকে না। যখন আসন করিয়া বসিলে চিত্ত স্থির ও প্রফুল্ল বোধ হইবে এবং কোন প্রকারের অসুখ বা অসুবিধা বোধ হইবে না, তখন আসন সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই আসনে ধ্যান অভ্যাস করা খুব প্রশস্ত।

এই পদ্মাসন খুব সহজ এবং সর্ব্বজনবিদিতজন্য ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল না। আসনাদি উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করা উচিত।

পদ্মাসন দুই প্রকার। বদ্ধ ও মুক্ত পদ্মাসন। বদ্ধ পদ্মাসন যথা—বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ সংস্থাপন করিয়া উভয় হস্ত পৃষ্ঠ দিক দিয়া বাম হস্ত দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেন এবং হৃদয়ে চিবুক সংস্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন করার নাম বদ্ধ পদ্মাসন। * আর হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশে পদাঙ্গুষ্ঠ না ধরিয়া দুই উরুর উপর হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া রাখিয়া উপবেশন করাকে মুক্ত পদ্মাসন কহে।

এই দুই প্রকার পদ্মাসনের যে কোন প্রকার আসন অভ্যাস করিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। আসন-সাধন অল্প বয়স হইতে (যখন হাড় কোমল থাকে) আরম্ভ করিতে হয়। বয়স বেশী হইলে ক্রমে হাড়গুলি শক্ত হইয়া যায় এবং সহজে অভ্যাস করিতে পারা যায় না। যাঁহাদের বয়স অধিক, মুক্ত পদ্মাসন তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বথা উপকারী ও সহজসাধ্য।

প্রাণায়াম।

তস্মিন সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়ো
র্গতি বিচ্ছেদ প্রাণায়ামঃ।

শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া নিয়মাধীন করাকে প্রাণায়াম বলে। ইহা সর্ব্বদা গুরূপদেশগম্য। গুরুর উপদেশ ও সান্নিধ্য ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে যাওয়া কখনও উচিত নহে। ব্রহ্মচর্য্য হীন ব্যক্তির পক্ষে প্রাণায়াম কাল স্বরূপ। অতএব প্রাণায়াম অভ্যাস বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

---

* বামোরুপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা।
দক্ষোরুপরি তথৈব বন্ধনং বিধিং কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং
তৎ পৃষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে।
এতদ্ব্যাধি বিকার নাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥
গোরক্ষ-সংহিতা।

প্রত্যাহার।

স্ব স্ব বিষয় সম্প্রয়োগাভাব চিত্ত
স্বরূপ মুকারৎতীন্দ্রিয় নাম প্রত্যাহার।

যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম প্রত্যাহার।

চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। উহাকে ঐরূপ বিষয়ান্তর গ্রহণ হইতে বিরত করিয়া কোন এক বস্তু বিশেষে স্থির রাখার চেষ্টাই প্রত্যাহারের সাধনা।

ধারণা।

দেশ বন্ধ চিত্তস্য ধারণা।

চিত্তকে (মনকে) কোন এক বিশেষ বস্তুতে নিবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা। ধারণাই ক্রমে ধ্যান পরিণত হয়।

ধ্যান

তত্র প্রতৈকতানতা ধ্যানম্।

যখন ধারণ দ্বারা চিত্ত কোন বস্তু বিশেষে স্থির থাকে, তাহাকে ধ্যান বলে। এই অবস্থা মানবের স্বাভাবিক। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই মনুষ্য, মানুষ বলিয়া জগতে দণ্ডায়মান হয়। এই যোগাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা মনের দাসত্ব করিতেছি। তাহার বিশ্বগ্রাসী শত ইচ্ছার হুতাশনে আপনাকে আহুতি প্রদান করিতেছি। যত সাধনা বা ভজনা, আর এই সকল যোগাঙ্গের অবতারণা এই ধ্যানাবস্থা লাভের জন্য। এই অবস্থার নামান্তরই সমাধি। সর্ব্ব সন্তাপহর সমাধি লাভ করিতে হইলে একমাত্র এই ধ্যানকে আশ্রয় করিতে হইবে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা যাইবে।

সমাধি।

তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং
স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ।

ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের যে তন্ময়তা তাহার নাম সমাধি। সমাধি দ্বিবিধ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধি অবস্থায় সাধকের ধ্যেয় ও ধ্যাতা-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধক আপনা ভুলিয়া ধ্যেয় বস্তুতে মিশিয়া যায়। এ অবস্থা আমি কি, আমার, এরূপ জ্ঞান থাকে না; এই অবস্থা লাভ করিবার পর অনেকের দেহ নষ্ট হইয়া যায়।

যোগে—ধ্যানাবস্থা।

ঋষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে যোগ অষ্ট ভাগে বিভক্ত। এই অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ অঙ্গ সমাধি অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে কোন ভেদভাব অনুভূত হয় না। যোগ-সাধনের চরম এই পরমানন্দময় অবস্থা লাভ করিতে হইলে, ধ্যানাভ্যাস ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। ধ্যানাবস্থাই ক্রমে পরিপক্ক হইয়া সমাধিতে পরিণত হয়। অতএব যোগে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ধ্যানই সাধকের লক্ষ্য-স্থল হইবে। যম হইতে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত বর্ণিত যোগের ছয়টী অঙ্গই একমাত্র চিত্ত-স্থির করিয়া ধ্যানাবস্থা আনয়নের সহায়ক; প্রকৃত ধ্যানাবস্থার উদাহরণ "তৈলধারাবৎ", তৈল ধারায় যেরূপ কোন বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না, অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ যে অবস্থায় চিত্তের গতি অবিরাম ধ্যেয় বস্তুতে লাগিয়া থাকে—সেই অবস্থাই প্রকৃত ধ্যানা-বস্থা। এই ধ্যানাবস্থা আশ্রয় করিয়াই মানব জগতে কাজ করিয়া যাইতেছে এবং ইহার

বলেই সংসারে খ্যাতি প্রতিপত্তি আদি অর্জ্জন করিতেছে। এই অবস্থা আমাদের ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক অবস্থা। কাজেই ইহা লাভ করাও অতি সহজ। অন্য কোন প্রকার কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া, অন্য কোন কঠিন সাধন-মার্গের অনুগমন না করিয়া একমাত্র এই ধ্যানযোগ সাধন করিলেই চিত্তের লয় হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কোন শাস্ত্র পাঠ করিতে হইলে স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহার তত্ত্বোদ্ধার করিতে হয়। এই স্মরণ, মনন নিদিধ্যাসনও ধ্যানেরই অবস্থান্তর মাত্র, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য মূলতঃ দৃষ্ট হয় না। ইহা ধ্যানেরই ত্রিবিধ অংশ বিশেষ।

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে হইলে, ধ্যান-যোগ আশ্রয় করিতে হইবে। যথা :—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।
অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মানি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ।
অথৈ তদপ্য শক্তোঽপি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান।
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।

ভগবান্ বলিতেছেন, "হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্মপরায়ণ (নিষ্কাম কর্ম্মী) হও। কেবল মাত্র আমার জন্য কর্ম্ম করিলেও সিদ্ধি লাভ করিবে। যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ কর! এইরূপ অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। এই ধ্যান হইতেই শান্তির উৎস "কর্ম্ম-ফলত্যাগ" লাভ হয়।

অতএব দেখা যাইতে যে, পরা-শান্তি লাভ করিতে হইলে, জরামরণশীল সংসারে শাশ্বতসুখের অধিকারী হইতে হইলে, ধ্যান-যোগ আশ্রয় করিতে হইবে। ধ্যানাভ্যাস অতি সহজ ও সুখকর; কাজেই সর্ব্ববিধ সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্য কোনরূপ সাধনা না করিয়া যদি কেবল মাত্র ধ্যান অভ্যাস করা যায়, তাহাতেই সকল মঙ্গলের উদয় হইবে যে বস্তুর চিন্তা করা যায়, চিত্তও তদাকার-কারিত অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর অনুরূপ হয় এবং এমনকি ক্রমে স্থুল দেহও ধ্যেয় বস্তুর সদৃশ হইয়া উঠে। যেমন কাঁচপোকা তৈল-পায়িকাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তৈল-পায়িকা ভীতিবিহ্বলচিত্তে অহর্নিশি কাঁচপোকার চিন্তা করিয়া করিয়া ক্রমে নিজ অঙ্গাবরণ ত্যাগ করে ও কাঁচপোকার দেহ লাভ করে; তেমনি ধ্যানাভ্যাস দ্বারা সাধক ও ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপা প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক অহর্নিশি আনন্দে ডুবিয়া থাকেন। এই অবস্থার নাম সমাধি। এই অবস্থায় চিত্তের বিকার সম্পূর্ণ নাশ হয় এবং প্রাণে প্রশান্তির উদয় হয়। কামনার বীজ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায় সাধক জীবন্মুক্ত হন। সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া এই সমাধি অবস্থা লাভ হইলে, এ জরা মরণশীল জগতে অমরত্ব লাভ হয়। সমাধি হইতে প্রত্যাবৃত্ত সাধক ধ্যানাবস্থায়ই কালাতি-পাত করেন। এই ধ্যানাবস্থা তাহার কিছুতেই ভঙ্গ হয় না। কাজেই সমাধি লাভের পরেও

ধ্যানের প্রয়োজন আছে দেখা যাইতেছে।

যোগের যেসকল অঙ্গের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, এগুলি অতি বিস্তৃত এবং সংসারে পরিবার মধ্যে অবস্থান করিয়া সাধন তৎপর হইলেও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। বিষয় বিষে জর্জ্জরিত মন দ্বারা যোগ সাধন করিতে অগ্রসর হওয়া এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া একরূপ অসম্ভব।

যোগসাধনে সফলকাম হইবার জন্য ধ্যানাভ্যাসের একটী সহজ ও সুখকর প্রণালী নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এতদনুসারে কার্য্যে ব্রতী হইলে ক্রমে হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার হইবে এবং সাধনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে। তৎপর সদ্‌গুরু লাভ হইলে আর যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
গীতা।

যোগী সর্ব্বদা আপন মনে, একাকী, সংযত, চিত্ত আশাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্ত স্থির করিবেন। পবিত্রস্থানে স্থির অনতি উচ্চ, অনতি নীচ আসনে * পদ্মাসনে পূর্ব্ব কিংবা উত্তরাস্য হইয়া প্রশান্তচিত্তে ভক্তিপূর্ণ মনে উপবেশন করিবেন। সাধনের স্থানটী যেন বেশ নির্জ্জন হয়। ধূপ, গুগ্‌গুলাদি প্রজ্বালন ও সুগন্ধি পুষ্পাদি নিকটে রাখিলে চিত্তের প্রশান্তভাব সহজেই উপস্থিত হয় এবং দেবভাবে দেহ মন প্রাণ মত্ত হইয়া উঠে। এইরূপে উপবেশন করিয়া দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে রক্ষা করতঃ নাভিতে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, ও ভ্রূযুগল মধ্যে প্রত্যেক স্থলে ১৫।২০ মিনিট কাল নিয়মিতরূপে বিমল, স্নিগ্ধ শ্বেত জ্যোতি (শ্বেত চন্দ্র সদৃশ) ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে এইরূপে জ্যোতি ধ্যান করিতে হইবে। আনন্দপ্রদ, প্রিয়দর্শন যে কোন দেবমূর্ত্তি অথবা পিতা কিম্বা মাতার মূর্ত্তি ভ্রূযুগল মধ্যে জ্যোতির অভ্যন্তরে ধ্যান করিলেও চলিতে পারে। এইরূপে ভক্তির সহিত কিছুদিন ধ্যানাভ্যাস করিলেই ক্রমে চিত্তমল বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের অনুভব হইবে এবং আরও অধ্যবসায়ের সহিত সাধন করিয়া সত্যলাভের সুতীব্র ইচ্ছার উদয় হইবে। সাধনবলে প্রকৃতি দেবীর অঞ্চল-আড়ালস্থিত বহু গুপ্ত রত্নরাজী সাধকের আয়ত্বাধীন হইবে *

সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে প্রথমেই সাধক বুঝিবেন, মন বশে রাখা কত কঠিন! যাহা আমাদের ব্যবহারের জন্য ভগবান প্রদান করিয়াছেন, সেই মনকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেওয়ায় এক্ষণে কতদূর তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু মনের এরূপ চঞ্চলতার জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই। দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা ক্রমে মন স্থির হইয়া আসিবে এবং জ্যোতিদর্শন হইবে। এইরূপে যোগসাধনে সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। প্রাণে অমৃতের ধারা প্রবাহিত

*প্রথম কুশাসন, তদুপরি ব্যাঘ্র বা মৃগচর্ম্মের আসন ও তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া আসন করিবে। গীতা।

* যোগ-বিভূতি বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হইবে। হৃদয়ের পরতে পরতে বিশ্বপ্রেমের প্রবাহ উৎসারিত হইবে। আধি-ব্যাধি দূর হইবে। শান্তির হিল্লোলে প্রাণ, মন মুগ্ধ হইবে। মানব দেহে দেবত্ব লাভ হইবে। ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া ভবজ্বালা দূর হইবে। এইরূপে ধ্যানযোগে সাধনের ধন লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইবে।

ওঁ শ্রীগুরু সমর্পিতমস্তু ওঁম।

দীন—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

—:0:—

সান্ত্বনা।

মা—খোকা!

পূর্ণ আজ একবর্ষ,
গেছ মোরে ছেড়ে;
জানি না কেমনে তুমি,
আছ কোন পুরে?
কে তোরে আদরে আজ,
বুকে বুকে রাখে;
ক্ষুধার-বেদনা বল,
কাকে 'মা' 'মা' ডেকে?
দুদিনের তরে বাছা,
কি উদ্দেশে এসে;
কাঁদায়ে দুঃখিনী মায়ে,
গেলে কোন দেশে?
অভাগিনী মাকে তোর,
আছে কি স্মরণে;
মিলন হবে কি খোকা,
আবার চরমে?

মৃতপুত্র—

কোথা যাব মা আমার,
বল তোরে ছেড়ে?
অজর, অমর; আমি,
আছি বিশ্ব যুড়ে?
"অনিত্য সংসার" ইহা
বুঝাবার তরে;
এসেছিনু মা আমার,
মায়া রূপ ধরে।
অজর, অমর, আত্মা,
মৃত্যু কারো নাই।
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল,
ভুগিছে সবাই।
বিশ্বের আধার আমি
আছি বিশ্ব জুড়ে।
শত কণ্ঠে অহর্নিশ
ডাকি মা তোমারে।
তুমি মা আমাকে ভুলে
খেলা নিয়ে থাক,
ডাকিলে না সাড়া দেও
দেখিয়ে না দেখ;
তাই মা তোমাকে আমি
কাঁদাবার তরে;
অভিমানে পুত্ররূপে
এসেছিনু ঘরে;
মায়া মোহ পরিহরি
ভালবাস মোরে;
জ্ঞান আঁখি খুলে যাবে
পাইবে "আমারে"।

শ্রীমতি ননীবালা বসু।

—:0:—

জগদ্ধাত্রী।

বঙ্গবাসীর দুর্গাপূজার উৎসব ফুরাইতে না ফুরাইতে পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ভগবৎ-শক্তির ঐশ্বর্য্য ও শ্রীরূপিনী লক্ষ্মীদেবীর এবং কার্ত্তিক-সংক্রান্তি দিবসে শৌর্য্য-বীর্য্যরূপী কার্ত্তিকের পূজা হইয়া গেল। আবার অমাবস্যার ঘোরান্ধকারে কালভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তির পূজা করিয়া আজ নবমীর অর্দ্ধ জ্যোৎস্নালোকে দেবপরায়ণ বঙ্গবাসী জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসবে মাতিয়াছেন। সম্বৎসর ধরিয়া এইরূপে হিন্দুরা শক্তি ও শক্তিমানের পূজা করিয়া থাকেন।

যিনি পৌত্তলিকতা ভাবিয়া এই সকল উৎসবে মিশেন না, তিনি অতি ভ্রান্ত। হিন্দুর দেশে পৌত্তলিকতা নাই, সব হৃদয়ের ব্যাপার। হিন্দুর পৌত্তলিকতা হৃদয়ের প্রতিরূপ, গুণগরিমার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। হিন্দুর পূজা, ধ্যান, স্তব ও স্তুতি যাহা, তাহা সর্ব্বদেশের সর্ব্ব জাতির মধ্যে কোন না কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অতুল ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান যে সকল রত্ন আহরণ করিয়া হৃদয়রাজ্যে আনয়ন করে, অনুরাগ, প্রীতি, দয়া ও ভক্তি অমনি তাহা দেখিতে পায়। কল্পনা জাগরিত হইয়া উঠে, শোভার উপর শোভার সৃষ্টি করে, সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তিমান করে; অনুরাগ, প্রীতি ও ভক্তির সামগ্রীকে মূর্ত্তিমতী করে। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার অলীক স্বপ্ন নহে; আন্তরিক ব্যাপার প্রতিক্ষণে প্রতি লোকে হইতেছে। কল্পনা যে মূর্ত্তি দেয়, তাহা বাস্তবিক জ্ঞানোপলব্ধির সামগ্রী। কল্পনা যখন ভক্তির আদেশক্রমে এই মূর্ত্তি সকল গড়িতে থাকে, তখন হৃদয় দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হয়; হৃদয়ে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। সেই হৃদয়-প্রতিমার বাহ্যবিকাশ মাত্র দুর্গোৎসব, সরস্বতী ও লক্ষ্মীপূজা-কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজা। হৃদয়ে যে মূর্ত্তি আগে কল্পনা স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়াছে, ভক্তি আগে যে মূর্ত্তিকে ফুল ও চন্দনরসে চর্চ্চিত করিয়াছেন, বাহিরে, পরে আমরা সেই প্রতিমাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া পূজা করি। একি ভ্রান্তি? একি পৌত্তলিকতা? একি পুতুল পূজা, ছেলে খেলা? যে একথা বলে, সে মহাভ্রান্ত। প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা সেই আভ্যন্তরিক ব্যাপারের বাহ্যবিকাশ মাত্র। বাস্তবিক এ আদর্শ প্রতিদিন নয়ন-ছবিরূপে জাগরূক রাখা আবশ্যক। তাই হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ। নতুবা প্রকৃত পূজা অন্তরেই হয়। সকলে মিলিয়া একত্রে আমোদ-আহ্লাদ করিব বলিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বাহিরে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া দেওয়া হয়।

এজগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই পূজা হয় না। বিকট মূর্ত্তিতেও শক্তি, অতি মোহিনী মূর্ত্তিতেও শক্তি। শক্তি ভয়ংকরী, শক্তি মোহ-করী, শক্তির এই হরি-হর মূর্ত্তি। শক্তিকে শুদ্ধ ভয় করি না, তাঁহার প্রভাবে মোহিতও হইয়া যাই। শক্তি কখন ভয় দেখাইতেছেন, কখন চমকিত করাইতেছেন, ধীরে ধীরে হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কখন হৃদয়কে নাচাইতেছেন, কখন ভক্তির উৎস উৎসারিত করিতেছেন। যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে

যাহা সর্ব্ব শক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিরূপিনী, তাহাই ভগবতী দুর্গা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে শক্তিরূপিনী ভগবতীর এইরূপ বুৎপত্তিগতার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "শক্" শব্দ ঐশ্বর্য্য ও "তি" শব্দ পরাক্রমবাচক; যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিনী হইয়া তাহা দান করেন, তিনিই শক্তি বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হয়েন। "ভগ" শব্দে সমৃদ্ধি, সম্পত্তি ও যশঃ বুঝায়, এই অর্থ-ত্রয়বিশিষ্টা হইয়া শক্তি ভগবতী নামে কথিতা হইয়াছেন। যে বিশ্বশক্তি জগৎব্যাপিনী, তাঁহাই মহাশক্তি, তাঁহাই শক্তির সমষ্টি! সেই শক্তি শতরূপিনী হইয়া জগতে বিকাশ হইয়াছেন। সেই শক্তিরই উন্নত বিকাশ চেতনা, চেতনার উন্নত বিকাশ বিদ্যা ও বুদ্ধি। বুদ্ধিজীবী প্রাণী-সমাজের বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য, শৌর্য্য এবং বীর্য্য। সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্যসম্বলিত মহাশক্তি পাপ ও যথেচ্ছাচারিতার পশুবলস্বরূপ মহিষাসুরকে শাসনে রাখিয়াছেন। এই হিন্দুজাতির শক্তিপূজা। এই শক্তি পূজা হিন্দুজাতি একবার করেন না, একবার করিয়া তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হয় না, বার বার তাঁহারা এই শক্তি পূজা করিয়া থাকেন। একবার সকল শক্তিকে মিলিয়া পূজা করা, আবার তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে পূজা করা। একবার একত্রিতভাবে মহাশক্তির পূজা, আবার তাঁহার স্বতন্ত্রভাবে পূজা। সেই শক্তি পূজা,—লক্ষ্মী, শ্যামা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। যাঁহারা একত্র সর্ব্ব শক্তির পূজা করিতে না পারেন, তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পূজা করিয়া থাকেন। যাহার প্রীতি যে শক্তিতে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাঁহার প্রীতি সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। তাই আজ মহাশক্তির জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির পূজায় হিন্দু আনন্দে মাতিয়াছেন। সুতরাং জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি সম্বন্ধে অদ্য আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্ম যখন নির্গুণ ও নিস্‌ক্রিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম; আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই বাসনা বা ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহামায়া। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। পুরুষ নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না; পরম প্রকৃতিরূপিনী মহামায়া সৃজনাদির সময়ে সগুণা; আর সমাধিকালে নির্গুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারণ রূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্য্যরূপ হয়েন না। তিনি যখন কারণরূপিনী হয়েন, তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাহেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নির্গুণা হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণ সমুদায় দিবারাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে কারণ রূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্য রূপে পরিণত হইয়া ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না। অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটী পরহস্তারূপ সৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটী মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই সেই পরহস্তা সৎপদার্থরূপিনী; বিচারতত্ত্বনিপুণ পণ্ডিতগণ সেই পরহস্তারূপা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অবিহিত করিয়া থাকেন, অতএব প্রকৃতিই জগতের কারণ, অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য্য

প্রকৃতি তাহাকে ত্রিগুণসমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্য সাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরহন্তা (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব) হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ। পরন্ত, মহত্তত্ব-জাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চ তন্মাত্রের সাত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজসাংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই প্রপঞ্চ সমুদায়ের কারণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তি।

কিন্তু এই মহাশক্তি কি প্রকার, তাহা বুঝিবার বা স্বরূপ তত্ত্ব জানিবার শক্তি সাধারণ মানবের নাই। জড় শক্তিতত্ত্বে যত পাণ্ডিত্যই থাকুক, জড়াতীত জ্ঞান-শক্তির বিশিষ্ট উন্নতি না হইলে, কেহই এই মহাশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। এই মহাশক্তিই সমুদায় বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। অতএব সাধকের এই মহতী মায়া শক্তিকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই মহাশক্তিকে জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন।

নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ।
দেবী ভাগবতম্।

সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তিকে ব্রহ্মবাদি-মনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সংসারাসক্ত সকাম সাধকগণ তাহার সগুণ ভাব, আর বাসনাবর্জ্জিত জ্ঞান-বৈরাগ্য পূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ তাহার নির্গুণভাব সমাশ্রয় পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন। কারণ মূল প্রকৃতি মহাশক্তি অব্যক্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা। সাধারণ মানুষ উহা ধারণাও করিতে পারে না। মানুষের নিকট উহা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত। স্ত্রী-অণু যেমন পুংঅণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শক্তি ও পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া স্থুল প্রকৃতিতে পরিণত হয়। জড়বিজ্ঞানের মতে জড় পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ যেপ্রকার জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, মহাশক্তিও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণাম বিকার ও বৈষম্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদিও পরাশক্তি হইতে এই অপরাশক্তি পৃথক, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরাশক্তি পুরুষের যোগে ক্রমে বিবর্ত্তনের পথে অপরা শক্তি হয়েন।

প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড যখন কারণার্ণবে প্লাবিত, ঈশ্বর সমস্ত পদার্থের কর্ম্মবীজ বা জীব-বীজ নিজ অঙ্গে সংন্যস্ত করিয়া, সেই কারণবারিতে শায়িত থাকেন, তখন এই পরা-শক্তিও নিশ্চেষ্ট থাকেন এবং উহার গুণক্ষোভও হয় না, কাজেই পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। সে সময়ে ঐ গুণস্পন্দন রহিত ও মৃতবৎ থাকে, তৎপরে, সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন পুরুষের তেজ, পরাশক্তিতে সংক্রামিত হয়, তখনই উহার গুণক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমবিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করে।

সত্ত্বং রজস্তমো ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।

মূল প্রকৃতি মহাশক্তি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমো গুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই তিন গুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। এক কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রকট ঈশ্বরের তিনটী গুণবিভাগ। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, ঐ দেবতাত্রয়কেই জানিতে হইবে। তিন গুণকে না জানিতে পারিলে, সগুণ অর্থাৎ পূর্ণগুণাভিব্যক্ত ঈশ্বরকে জানিবে কি প্রকারে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, মূলে ঈশ্বরের বিকাশিত গুণের স্বতন্ত্র পূর্ণ-ভাবময় শক্তির স্বতন্ত্রবিকাশ ত্রিমূর্ত্তি। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপ ঈশ্বরের তিনটী গুণ তিনটী শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছেন। এই গুণ- ও শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্তলোকের সৃজন পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। ঐ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মগুণ ও শক্তিত্রয় ক্রমে স্থূল হইতে আমাদের স্থূলতর জগৎ পর্য্যন্ত আসিয়া এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মা পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে চৈতন্য-প্রবাহ-বস্তু সংগ্রহ করিয়া, জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মাংশ কল্পের নাম পালন;—বিষ্ণু পরম চৈতন্যাবস্থা হইতে জীব বা আত্মরূপে মায়া মধ্যগত হইয়া মায়ার সকল বিভূতিকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আত্মবশ করিতেছেন। আর শিব ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্যরূপী জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্য ও সৎকে প্রয়োজন মতে অংশ করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন।

এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বা সৎ, চৈতন্য ও কাল এই তিনটী চৈতন্যময় বস্তুর ক্রিয়াপর অবস্থাই তিনটী শক্তি। ঈশ্বরের উপাধি অমূর্ত্ত মহামায়া; সেই মহামায়া কেবল ত্রিগুণ-ময়ী সূক্ষ্ম শক্তি পুঞ্জীকৃতা। সূক্ষ্ম সেই মহাশক্তিই সৃজন, পালন ও লয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে কিঞ্চিৎ স্থূল যে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাই দান করেন। তাহা লইয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব স্ব স্ব কার্য্য করেন। ক্রম-বিকাশেই শক্তির বিকাশ—বিবর্ত্তবাদেই প্রকৃতির প্রকাশ; সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানিতে হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে এবং তাঁহাদের ক্রিয়াপর তিনিটী শক্তিকেই জ্ঞাত হইতে হইবে। কারণ সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ এক এক করিয়া জানিয়া এবং তাহা দিয়া উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তবে পূর্ণতার দিকে যাইতে হয়। তাই ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা উপাসনায় সগুণ ব্রহ্মের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তির সহিত ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী দেবীর ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান-ধারণার ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও মহাশক্তির এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা বিধিবদ্ধ আছে। যথাঃ—

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীচ বৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তি স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥
৪ পঃ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে মহাশক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান অথবা গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিভক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। সাধকের হৃদয়ে মহাশক্তির এই তিনটী গুণই দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী মূর্ত্তিতে বিকাশ প্রাপ্ত। বৈদিক ঋষির যে কল্পনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা, সেই কল্পনাই দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী মূর্ত্তির সৃষ্টিকারিণী। মহা-

শক্তি একাধারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ধারিণী। জন্ম, মৃত্যু ও পালন প্রকৃতির ধর্ম্ম; প্রাণি-জগৎ জন্মিতেছে, পালিত ও ধ্বংস হইতেছে; মহাশক্তি প্রভাবে বিশ্ব আপনি আপনাকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে এবং আপনিই রক্ষিত হইতেছে! কিন্তু ইহাদের মূলে রহিয়াছেন সেই ব্রহ্ম ভগবান্। তাই ব্রহ্মস্বরূপ সদাশিবের জায়া সংরূপা দুর্গা, চৈতন্যরূপিনী জগদ্ধাত্রী ও কালরূপিনী কালী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একই পুরুষ, জগতের একই মূলতত্ত্ব; সেই মূলতত্ত্ব মহাশক্তি প্রভাবে প্রকৃতিরূপে প্রকটিত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে! যখন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহা শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। সেই দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী হইতে এই জগৎ-ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে! রজোরূপিনী জগদ্ধাত্রী হইতে জগতের সৃষ্টিকার্য্য, সত্ত্ব রূপা দুর্গা হইতে জগতের পালন ও রক্ষা কার্য্য এবং তমোরূপিনী কালী হইতে জগতের সংহার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরিণাম-রূপিনী প্রকৃতি—উৎপত্তি পালন ও প্রলয় মূর্ত্তিতে নিয়তই দেখা দিতেছেন; তাই প্রতিবৎসর হিন্দু, দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিতেছে। সম্বৎসর ধরিয়া এরূপে হিন্দুরা শক্তিকে পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুঋষি যে শক্তিপূজা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, একদিন তাহা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। জগৎ যখন হিন্দুর ব্যবস্থা ও পূজাপদ্ধতির প্রকৃত অর্থ ও গূঢ়তত্ত্ব গ্রহণ করিবে, তখন জগৎ সেই পদ্ধতিতে নিশ্চয় মাতিবে, এই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

পাঠক! মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির রহস্য বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী রজোরূপিনী ব্রাহ্মীশক্তি। তাই তিনি রক্তবর্ণা এবং রক্তবস্ত্র পরিহিতা। রজঃগুণ রক্তবর্ণা, সেই রজোগুণান্বিতা সৃষ্টিকারিণী শক্তি পরিণাম-রূপিনী; তাহা ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, জ্ঞানে সম্পন্ন এবং শৌর্য্য ও বীর্য্য তাহার অন্তর্নিহিত মহাবল। এই ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও শৌর্য্য-বীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া প্রাকৃতিক ব্যভিচার রূপ পাপকে তাহা নিয়তই বিনাশ করিতেছে। সেই পশুবলকে বশ করিয়া জগদ্ধাত্রী সিংহ-বাহিনী। চারি প্রকার সৃষ্টি, তাই তিনি চতুর্হস্তা। সৃষ্টি বিঘ্ন নাশের জন্যে দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ। তাঁহার সৃষ্টি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাই এক হস্তে চক্র শোভা পাইতেছে এবং যে আকাশতত্ত্ব হইতে প্রথম সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ, সেই আকাশের গুণ শব্দ; তাই তাহার নিদর্শনস্বরূপ অন্য হস্তে শঙ্খ রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ তাঁহার ত্রিনয়ন। আশ্চর্য্য কল্পনা! হিন্দুঋষি ভিন্ন কবিত্বের তুলিতে কে আর অধ্যাত্ম জগতের এমন চিত্র আঁকিতে পারিয়াছে?

পাঠক শক্তি পূজা বুঝিয়াছেন কি? এরূপ শক্তি পূজার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সাধন হইবে না। শক্তিপূজার প্রাণ ছাড়িয়া ভারত এখন বাহির লইয়া আনন্দ উল্লাস করিতেছে। তাই ভারতের আজ এই শোচনীয় দশা। আইস, আমরা এক প্রাণমনে ভারতবাসী সকল হিন্দু মিলিয়া আজ আবার জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রকৃত পূজা করি এবং প্রাচীন হিন্দুরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই ও তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হই। এস ভাই! মহা-শক্তির প্রকৃত পূজা আরম্ভ করিয়া দেশের

মঙ্গলের জন্য তাঁহার হরি-হর বিধিবাঞ্ছিত, শমন লাঞ্ছিত রাঙ্গা পা দুখানির উদ্দেশে প্রণাম করিঃ—

জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা জগদানন্দদায়িনী।
মহিষাসুর সংহন্ত্রী প্রণমামি নিরন্তর॥

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

আমিত্ব।

(১)

অনন্ত বারিধি বক্ষে বুদ্বুদের গায়,
আমার "আমিত্ব" খুঁজে পেয়েছি তথায়!

(২)

নিশীথ নীলিমা বক্ষে দীপ্ত উল্কা রেখা (য়)
আমার "আমিত্ব" আমি দেখিয়াছি লেখা।

(৩)

দাবদগ্ধ বিপিনের ভস্মরাশি মাঝে।
আমার "আমিত্ব" খানি গরবে বিরাজে।

(৪)

আবর্ত্ত পীড়িত তৃণে খর দরিয়ায়।
আমার "আমিত্ব" টুকু দেখেছি তথায়।

(৫)

উর্দ্ধোত্থিত শিলাবক্ষে তুলি উচ্চ শির।
আমার "আমিত্ব" থাকে হইয়া গম্ভীর।

(৬)

আমাবস্যা-প্রতিপদমহাসন্ধিস্থলে,
আমার "আমিত্ব" প্রভো! দিও তুমি দ'লে'

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

—:0:—

ছি! ছি! ছি!

শির মোর সদা নত ধনীর চরণে।
মস্তিষ্ক. নিয়ত ব্যস্ত অসৎ চিন্তনে॥
নেত্র চায় দেখিবারে সৌন্দর্য্য নশ্বর।
নাসিকা পার্থিব গন্ধ লোভেতে তৎপর॥
কর্ণ, শুনিবারে ব্যগ্র অসত্য বচন।
রসনা, প্রকৃত রসে মগ্ন অনুক্ষণ॥
কর দ্বয় প্রসারিত কামিনী কাঞ্চনে।
চরণ সদাই ধায় অস্থানে কুস্থানে॥
তুচ্ছ ক্ষণসুখে মত্ত ইন্দ্রিয় আমার।
ছি. ছি, ছি, এ দুঃখ বল, বলি কাছে কার॥

দীন-শ্রীরসিকলাল দে।

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(১৬)

ঈক্ষণ বৃত্তি প্রকৃতির কি না ?

নিম্ব যেমন তিক্তগুণের আধার—আমলকী যেমন কষায়ের প্রতিমা,—পিপুল যেমন 'কটুগুণে' ত্রিকটুর একাধার, চক্ষু যেমন রূপের এক মাত্র আধার,—কর্ণ যেমন শব্দের প্রধান আশ্রয়, নাসিকা যেমন সর্ব্বগন্ধের মুখ্য স্থান, জিহ্বা যেমন সর্ব্ব রসের নিকেতন, ত্বক যেমন স্পর্শের আশ্রয়, সমুদ্র যেমন জলের আধার;—তদ্রূপ তৃতীয় শ্রুতি "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" মন্ত্রটী নির্ম্মল জ্ঞানের পবিত্র নিকেতন স্বরূপ; অজ্ঞান-তিমির তাড়াইবার তারাপীড়বিশেষ। স্থিরচিত্তে বিচার করিলে ঐ মন্ত্র দ্বারাই "আমি কে, জগৎ কি,—এবং ঈশ্বর কাহাকে বলে", প্রশ্ন ত্রয়ের সুন্দর রূপ মিমাংসা হইয়া যায়; তত্ত্ব-জ্ঞানের পিপাসাও দূরে পলায়ন করে। বর্ত্তমানে সে সকল গভীর বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। সহজ বিচারে "উপরের প্রশ্নালোচনায়" দেখিতে হইবে যে—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" 'তৎ' ও 'ঐক্ষত' শব্দ লইয়াই তদৈক্ষত পদ নিষ্পন্ন হয়। এখানে 'তৎ' শব্দটী পূর্ব্বকালবাচী পদ;—'ঐক্ষত' শব্দটী "অক্ষিবৃত্তি অর্থে"—দর্শন, অবলোকন, ও ঈক্ষণ ইত্যাদি অর্থের প্রতিপাদক; অর্থাৎ সেই (পূর্ব্বোক্ত) সৎপদার্থ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন বা দর্শন করিয়াছিলেন, অথবা আলোচনা করিয়াছিলেন যে;—আমি বহু হইব, অনেক হইব, প্রভূত হইয়া জন্মিব; অর্থাৎ "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।"

হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী ধর্ম্ম-প্রচারকগণ এই-"ঈক্ষণ-বৃত্তি-" লইয়াই-প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক, লম্বা লম্বা প্রবন্ধ, এবং নানা স্থলে নানা রকম বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ করেন যে;—সাংখ্যমতে অব্যক্ত প্রকৃতি নিত্যবস্তু ও সৎপদার্থ। অতএব "তৎ+ঐক্ষত" (তদৈক্ষত) শব্দে সেই সৎপদার্থ প্রকৃতির ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হইল বুঝিতে হইবে। এই-ঈক্ষণ-বৃত্তি-কেই মহত্তত্ত্ব বলা যায়;—যেহেতু কঠ-শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"মহতঃপরমব্যক্তম্" অর্থাৎ মহৎ বা মহান্ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অতএব অব্যক্ত কিনা সাংখ্যমতের প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ বিধায়ে উর্দ্ধে স্থান পাইতেছে;-অর্থাৎ পূর্ব্বে হইতেছে। আর মহৎ শ্রেষ্ঠ না হওয়ায় তাহার নিম্নে অর্থাৎ পরে হইতেছে; সুতরাং যাহা নিম্নে বা পরে তাহাই মহৎ বা মহান বস্তু হইয়া পড়িল। অতএব "ছান্দোগ্য-শ্রুতির" তদৈক্ষত শব্দে—"প্রকৃতির ঈক্ষণ-বৃত্তি দ্বারা" প্রথমে প্রকৃতি, তাহার পরেই ঈক্ষণ-বৃত্তি প্রতিপন্ন হইতেছে;—অধুনা কঠ-শ্রুতি দ্বারা উর্দ্ধে, বা প্রথমে প্রকৃতি তাহার পরেই মহৎ বা মহান্ জানা যাইতেছে,—সুতরাং উভয় শ্রুতির মিমাংসায় দাঁড়াইল যে;—ঈক্ষণ ও পরে,—আর মহৎ বা মহানও পরে। অতএব যাহা ঈক্ষণ-তাহাই মহান্ বা মহত্তত্ত্ব;—কেবল নামের বিভিন্নতা মাত্র। ছান্দোগ্য-শ্রুতির এই ঈক্ষণ বৃত্তির পর "বহুস্যাং-" অর্থাৎ আমি বহু হইব, অনেক হইয়া জন্মিব, এই-অহং ভাবের উল্লেখ থাকায়;—ঈক্ষণ-কিনা মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার, তাহার পরেই তেজের সৃষ্টি; অর্থাৎ-"তত্তেজোহসৃজত" ইত্যাদিতে জগৎ সৃষ্টি বিহিত হইতেছে।

সুতরাং ছান্দোগ্য-শ্রুতির "তদৈক্ষত বহুস্যাং" মন্ত্র দ্বারাই যখন প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে,—তখন সন্দেহের কি কথা ?

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,—সন্দেহ বস্তুটী স্বতঃসম্ভুত পদার্থ। উহা কাহার অনুরোধে ভুলে না, উপরোধও শুনে না, কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় ; ইহাই যত-অনর্থের মূল। অন্যথায় সন্দেহ পদার্থটীর নিরাকরণ বা অভাব হইলে,—আমি আজ ধর্ম্মপ্রচারক সাজিবার অভিসন্ধিতে যে বাক্য বলিতেছি, তাহা বাস্তবিকই সত্য ও অভ্রান্ত হইত ; তুমি ধর্ম্মপ্রচারকের সাম্‌লা (পাগড়ী) পরিয়া শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অর্থসঙ্কোচে যেরূপ মনগড়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছ,—তাহাও ধ্রুব ও অকাট্য হইত;-তিনি বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া শ্রুতিবাক্য বা মন্ত্রের আদ্য অক্ষর কয়েকটী লইয়া শেষ অক্ষরগুলি ত্যাগকরতঃ বা শেষেরগুলি লইয়া প্রথমগুলি প্রচ্ছন্ন করতঃ যেরূপ "মাথা আছে ত মুখ নাই" আকারে ব্যাখ্যার ছবি আঁকিতেছেন,—তাহাও সর্ব্বোপরি সুঠাম হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই; যেহেতু জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদাই সন্দেহ (বিরুদ্ধ জ্ঞানজনিত সংশয় বা অজ্ঞান) বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব বিচার দ্বারা প্রমাজ্ঞান লাভ করতঃ সকল সন্দেহ দূর করিতে হইবে। অন্যথায় মুখের কথায় "সন্দেহের কি কথা" বলিলে চলিবে কেন ? সুতরাং বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে :—

কঠ শ্রুতিতে বলিয়াছেন; "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ মহৎ বা মহান হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে পরমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নাই। তিনিই সমস্ত পার্থিব পদার্থের গন্তব্য স্থান এবং সমস্তের পর্য্যাবসান স্বরূপ; অর্থাৎ "সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদি। এরূপ হইলে কঠ শ্রুতি দ্বারাই পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়া অব্যক্ত পদার্থটীর অনিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। সুতরাং যে অব্যক্ত পদার্থকে "নিত্যবস্তু ও সৎ" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া সাংখ্যমতের প্রকৃতি নির্ণয় করতঃ "তাহার ঈক্ষণ বৃত্তি দ্বারা" শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করা হয়, বা যাহার জন্য সর্ব্বত্রই বাদানুবাদকারিদের এতদূর আগ্রহ দেখা যায়, তাহা এক কথাতেই অর্থাৎ এক কঠশ্রুতি দ্বারাই পণ্ড হইয়া যায়। উপমারহিত সচ্চিদানন্দ পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বৃথা কলহ দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ বাসনাও বিফল হয়। অন্যথায় একটু প্রণিধানপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে বিচার করিলেই জানা যাইবে যে:—

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কেবল মাত্র "ঐক্ষত" শব্দ দ্বারা ঈক্ষণ বৃত্তির উল্লেখ আছে; আর "তৎ" শব্দটী পূর্ব্বোক্ত সৎ বস্তুর বিজ্ঞাপক হইতেছে। এই পূর্ব্বোক্ত সৎবস্তু বা শব্দ দ্বারা যে সাংখ্যমতের নিত্যবস্তু প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয় অর্থবাদ ঐ শ্রুতির পূর্ব্ব মন্ত্র দ্বারা সমর্থিত হয় না। যেহেতু পূর্ব্ব মন্ত্রে উল্লেখ আছে যে; "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ হে সৌম্য ! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বা প্রথমে এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রই ছিল; নাম;রূপ আকৃতি-

বিশিষ্ট কোন পদার্থই ছিল না। এইজন্য (সং ও এব) "সদেব" পদের সহিত "আসীৎ" পদের সম্বন্ধ হইতেছে। "সৎ" শব্দ দ্বারা দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য, অচিন্তনীয়, বিজ্ঞানময় কোন বস্তুর বিদ্যমানতা বা সত্ত্বা প্রকাশ পাইতেছে; আর 'এব' শব্দ দ্বারা অবধারণ বুঝাইতেছে। এই অবধারণ বা নিশ্চয়করণ-কার্য্য মনের বৃত্তি বিশেষ। অর্থাৎ মন না থাকিলে অবধারণ, নিশ্চয়করণ বা নির্ণয়-করণ ইত্যাদি কোন কার্য্যই করা চলে না। অতএব শ্রুতিতে যখন "এব" শব্দ দ্বারা অব-ধারণ করিবার উপদেশ বুঝাইতেছে, তখন মনের অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হইতেছে। অন্যথায় মন না থাকিলে কে অবধারণ করিবে? আবার এই মনই "কামনা বাসনা দ্বারা" জগৎরূপে পরিণত হয়। মন লোপ পাইলে আর জগৎ থাকে না। এইজন্য মনকে জগতের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বলা যায়। অতএব মনোবৃত্তি বিশেষ "এব বা অবধারণ" শব্দটী নাম রূপাদি পরিশূন্য মনোবাণীবর্জ্জিত স্থানের বিজ্ঞাপক নহে; উহা নাম রূপাদিযুক্ত জগতের অনুমাপক হইয়া বর্ত্তমান প্রতীতিগোচর জগৎকে বুঝাইতেছে; অর্থাৎ বর্ত্তমান নাম,রূপ আকৃতি-বিশিষ্ট জগৎ যাহা প্রতীতিগোচর হইতেছে,—ইহা (ইদং) অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তি বা প্রকাশের পূর্ব্বে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রই ছিল (ইদমগ্র আসীৎ)।—এইরূপে "সদেব" পদের সহিত "আসীৎ" পদের সম্বন্ধ হইতেছে। (এই "আসীৎ" শব্দ লইয়াই কোন কোন নাস্তিক বলেন যে,—জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল;—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে অসৎ বা অভাব হইতে সতের উৎপত্তি ইত্যাদি) অতএব ছান্দোগ্য শ্রুতির পূর্ব্ব মন্ত্র "অর্থাৎ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", ইত্যাদি দ্বারা উল্লিখিত সৎ পদার্থটী,—অর্থাৎ জগতোৎপত্তির পূর্ব্ব-ভাবটী যে সাংখ্যমতের নিত্য বস্তু প্রকৃতিকে বুঝাইবে বা প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে,—এরূপ কোন নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। পরন্তু জগতোৎপত্তির পূর্ব্ব ভাব অর্থাৎ যেখানে নামরূপ আকৃতিবিশিষ্ট জগৎ ছিল না,—সেই মনোবাণীর অতীত "ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান স্থানে" এমন সাক্ষী কেহ ছিল না, যাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে,—সেস্থান সাংখ্যমতের প্রকৃতি কিম্বা পুরুষ,—তুমি কিম্বা আমি,—তিনি কিম্বা সে,—দিগম্বর কিম্বা নটবর ইত্যাদি নিরুক্ত শব্দের নির্দ্দেশ্যই। সে স্থান অবিনাশী ও অপরিণামী;—কেবল মাত্র সচ্চিদানন্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম। পূর্ণ পরব্রহ্মই সংসার দুর্গের অন্তঃসাক্ষী স্বরূপ হইয়া, সেখানে চিরবিরাজমান। এরূপ হইলে ঈক্ষণ বৃত্তী যে সাংখ্যদর্শন পরিকল্পিত প্রকৃতির হইবে,—এরূপ কথা বলাই চলে না, বা "তদৈক্ষত বহুস্যাং" মন্ত্র দ্বারা বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ কারণত্ব অটুট থাকে না।

পক্ষান্তরে ঈক্ষণ, দর্শন, অবলোকন বা আলোচনাদি কার্য্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিশেষ মাত্র; অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ঈক্ষণ, দর্শন বা আলোচনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; আর মনের দ্বারা আলোচনা, বিবেচনা ও অনুশীলনাদি কার্য্য সমাধা হয়। আকার

এই মনই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্তি কার্য্যে মনই একমাত্র সহায়,—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যেক কার্য্যেও মনই একমাত্র সহায়, আর মনের কার্য্যেও মনই একমাত্র সহায়। মন শান্ত ও নিরীহ হইয়া নির্লিপ্ত হইলে, সমস্ত জগৎই নির্লিপ্ত হইয়া যায়, সংসারবাসনা দূর হইয়া হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া ক্রমশঃ জগদ্ভাব লোপ পায়। অতএব মনের সাহায্য না পাইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় কদাচ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও কদাচ কর্ম্ম সাধনে সক্ষম হয় না; আর মন না থাকিলে মনের ক্রিয়ার ত কথাই নাই। এইজন্যই মনকে "জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়" উভয় ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ বা উভয়াত্মক বলা হয়; যথা "একাদশস্থ ইন্দ্রিয়েষু মধ্যে মন উভয়াত্মকং।" আর ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের আত্মীয় বিশেষ বা বিনির্গম পথ স্বরূপ। সুতরাং প্রকাশধর্ম্ম ইন্দ্রিয় ব্যতীত কদাচ প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্যমতের প্রকৃতি অচেতন বস্তু ও অব্যক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে যে বস্তু অচেতন ও অব্যক্ত, অর্থাৎ যাহার চৈতন্য ও নাম রূপ, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, তাহার ঈক্ষণ, দর্শন বা অবলোকন ইত্যাদি ক্রিয়া কি প্রকারে সমর্থিত হইবে? পাড়াগ্রামের লোকেরাও জানে যে, ঈক্ষণ, দর্শন ও অবলোকন ইত্যাদি ক্রিয়া চেতন পদার্থের ধর্ম্ম, অচেতন জড় বস্তুতে কদাচ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচ্য অচেতন প্রকৃতির ঈক্ষণ, দর্শন, অবলোকন বা আলোচনা, বিবেচনা ইত্যাদি চেতনোচিত জ্ঞান একবারেই অসম্ভব। এরূপ হইলে অচেতন প্রকৃতির "জগৎ-কারণত্ব ও নিত্যত্ব" ইত্যাদি বাক্য অপসিদ্ধান্তপাত দোষ-দুষ্ট হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়; শ্রুতি বা বেদ বাক্যের হীনত্ব দূরে পলায়ন করে।

মতান্তরে ইন্দ্রিয়গণ ধর্ম্মতৎপর-বিধায়ে ইহাদিগকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলা যায়; অর্থাৎ "সাত্ত্বিক একাদশকঃ" ইত্যাদি। আবার যে বস্তুর অবয়বে যে গুণ থাকে, অবয়বীতেও সেই গুণ দেখা যায় বা অবয়বের গুণ হইতে অবয়বীর গুণ উৎপন্ন হয়। যেমন কাল লোমে নির্ম্মিত কম্বল কালবর্ণ হইয়া থাকে, সাদা সুতায় নির্ম্মিত কাপড় সাদা হইয়া যায় ইত্যাদি। তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে অবয়ব, তাহার অবয়বীতেও ঐ সকল গুণ থাকিবে; অর্থাৎ যাহা সত্ত্বগুণ প্রধান, তাহার অবয়বী বা উপাদানও সত্ত্বগুণ প্রধান হইবে। যেমন লৌহ দ্বারা ছুরী প্রস্তুত হয়, মৃত্তিকা দ্বারা ছুরী হয় না; কাচ দ্বারাই শিশি বা বোতল প্রস্তুত হয়, কাষ্ঠ দ্বারা শিশি হয় না ইত্যাদি। তদ্রূপ সত্ত্বগুণের দ্বারা সাত্ত্বিক ক্রিয়া, রজঃ গুণের দ্বারা রাজসিক ক্রিয়া ও তমোগুণের দ্বারা তামসিক ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হইবে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অতপর নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে,—বাদানুবাদকারিদের বাকবিতণ্ডায় প্রকৃতির যে ঈক্ষণ, দর্শন বা অবলোকনাদিবৃত্তি উদিত হইতেছে—এই ঈক্ষণ বা দর্শনবৃত্তিটী কোন গুণ সম্ভূত? ইহা গুণ সম্ভূত নহে বা ঈক্ষণ, দর্শন ও অবলোকনাদি কার্য্য—কার্য্য মধ্যেই গণ্য নহে,

এরূপ কথা মুখে আনিবার উপায় নাই। যেহেতু ঐ সকল কার্য্য সত্ত্ব, রজঃ, ও তম ত্রিগুণাতীত নহে। সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈক্ষণ, দর্শন বা অবলোকনাদি কার্য্য সত্ত্ব, রজঃ, ও তম গুণত্রয়ের স্পন্দনাবস্থারই পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ স্পন্দিত না হইলে কদাচ ঈক্ষণ, দর্শন ইত্যাদি কার্য্য-হইতেই পারে না। কিন্তু এইমতে "অর্থাৎ বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতিতত্ত্বের মতে" সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিস্পন্দাবস্থা বা সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতির ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হইলে, তাহাকে স্পন্দিত হইতে হইবে। অর্থাৎ নিস্পন্দাবস্থা বা সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া স্পন্দনাবস্থা বা বৈষম্যা-বস্থায় আসিতে হইবে। এরূপ হইলে, সৎ-পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতির "ঈক্ষণ বৃত্তি" উদিত হইল, এরূপ কথা বলাই চলে না —যেহেতু ঈক্ষণ বৃত্তি, স্পন্দনাবস্থা বা বৈষম্যাবস্থারই চিহ্নবিশেষ মাত্র। অতএব "ঈক্ষণ-বৃত্তি উদিত হইল" এই বাক্যই অব্যক্ত নামের প্রতিকূল হইয়া পড়িল। অন্যথায়—"অব্যক্ত প্রকৃতির ঈক্ষণ-বৃত্তি"—বাক্যটী নিরাকারের দশভুজা,—আকাশে গোলাপ ফুল,—অন্ধের দৃষ্টিনিক্ষেপ, বন্ধ্যার স্যুতটী পুত্র, অমা-বস্যার পূর্ণিমা ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় স্ববিরোধী বাক্য হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় যদি উল্লিখিত বিচার ত্যাগ করা হয়, তাহাহইলে বর্ত্তমান আলোচ্য প্রকৃতির স্বভাবটী কি? অর্থাৎ "প্রকৃতি" প্রবৃত্তিস্বভাবা কি নিবৃত্তিস্বভাবা ,বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। প্রবৃত্তি-স্বভাবা হইলে মোক্ষ লাভ ভুলিয়া যাও,—যেহেতু স্বভাব অনপায় বস্তু, স্বভাবের বিনাশ অব-শ্যম্ভাবী নহে; অর্থাৎ স্বভাবস্যানপায়াৎ।" অতএব স্বভাব অবিনাশী বস্তু হইলে, প্রবৃত্তি দ্বারা যে স্বভাব গঠিত—বা প্রবৃত্তি যে স্বভাবের অবয়ব, তাহাও অবিনশ্বর হইবে;—অর্থাৎ প্রবৃত্তি বস্তুটীও অবিনাশী হইয়া পড়িবে। প্রবৃত্তি-(কামনা বাসনা ইত্যাদি) অবিনাশী ও অক্ষয় বস্তু হইয়া চিরবিরাজমান থাকিলে, মুক্তি বা মোক্ষলাভ মুখে আনিও না,— একবারেই ভুলিয়া যাও; অর্থাৎ "আদো অনির্মোক্ষঃ"। এইরূপ প্রকৃতিকে নিবৃত্তি-স্বভাবা বলিলে বিশ্বসৃষ্টি বা সংসারকল্পনা ছাড়িয়া দাও;—যেহেতু নিবৃত্তি নষ্ট হইয়া প্রবৃত্তি না হইলে ত আর বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু উল্লিখিত বিচারে স্বভাব অবিনশ্বর বস্তু হওয়ায়, নিবৃত্তি বস্তু বা ধর্ম্মটীও অক্ষয় ও অবিনশ্বর হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বিশ্ব সৃষ্টি বা জগৎ সৃষ্টির কল্পনা চিরদিনের মত ছাড়িয়া দাও;—অর্থাৎ "দ্বিতীয়ে সংসারোহস্তমিয়াৎ"। পক্ষান্তরে উল্লিখিত—"প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি" স্বভাবই বৈষম্যাবস্থা ও সাম্যাবস্থার নামান্তর মাত্র। অতএব প্রকৃতির বৈষম্য ও সাম্য উভয়াবস্থাই মুক্তি ও জগৎসৃষ্টির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ অবস্থায় প্রকৃতির "বৈষম্য বা সাম্য" কোন্ অবস্থা হইতে ঈক্ষণ, দর্শন ইত্যাদি বৃত্তি উদিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি হইবে এবং তদ্দ্বারা কি উপকার সাধিত হইবে,— নির্ণয় না হওয়ায়, প্রামাণ্যবিষয় নিরর্থক হইয়া পড়ে। পরন্তু "অনিশ্চিতস্য সত্ত্বমেব মূলত্বমিতি" ইত্যাকারে অর্থাৎ অনিশ্চয়ের

সত্ত্ব সর্ব্বথা দুর্ল্লভ ইত্যাদিতে প্রাঞ্জল্য ও দস্ত জলাঞ্জলিক হইয়া উঠে।

অন্যপক্ষে যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে, প্রকৃতরই ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হইতেছে, তাহা হইলে এরূপ আপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইবে যে;—অব্যক্ত প্রকৃতির সাম্যাবস্থা না ভাঙ্গিলে কদাচ ঈক্ষণ, দর্শন, বা অবলোকনাদি বৃত্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রকৃতি যে মতে অভ্যুত্থিত, সেই মতে সাম্যাবস্থা নাশক বা ছেদক কোন পৃথক বস্তু স্বীকৃত হয় না। পুরুষের নিকট যাইবার উপায় নাই; যেহেতু বর্ত্তমান প্রকৃতি-তত্ত্বের মতে তিনি কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন, গুণময়ও নহেন, সাধারণও নহেন, ভোগাও নহেন। শক্তিহীন, গুণহীন, ক্রিয়াহীন, অকর্ম্মণ্য, উদাসীন বস্তু বিশেষ মাত্র। সুতরাং তাঁর বিশ্ব বা জগৎ, সৃষ্টি বা সংসার, শক্তি বা খেলা, হিন্দু বা অহিন্দু, ধর্ম্মপ্রচারক বা নাস্তিক ইত্যাদির প্রয়োজন কি? কাজেই তিনি কাহার সাম্যাবস্থা নাশক বা ছেদক নহেন। আর প্রকৃতি তিনি নিজেই অচেতন, "তাঁর পেটে ক্ষুধা থাকিলেও মুখে বলিবার উপায় নাই" অর্থাৎ শক্তি থাকিলেও শক্তির ক্রিয়া নাই। কাজেই তিনি নিজের সাম্যাবস্থা নিজে নষ্ট করিতে পারেন না। যদি কোন উপায়ে তিনি (প্রকৃতি) নিজের সাম্যাবস্থা নিজেই নষ্ট করিতে সক্ষমা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে (প্রকৃতিকে) সৃষ্টি-কার্য্যে পুরুষের সাহায্য কেন লইতে হইবে, বা প্রকৃতিপুরুষের মিলনে জগৎ সৃষ্টিই কেন বিহিত হইবে? তিনি স্বয়ংই বিশ্বনির্ম্মাণে সক্ষমা হইবেন; ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্যথায় প্রকৃতি পুরুষের সহবাসে চৈতন্যময়ী হইলেও,—অপেক্ষাবুদ্ধি-জনিত দোষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া স্বয়ংসিদ্ধ শক্তিসম্পন্নার অভাব হেতু নশ্বর বস্তু হইয়া পড়িবে। কাজেই নিত্যত্ব লোপ পাইবে, জগৎ কারণত্বও—"তথৈবচঃ"। আবার কখন সাম্য,—কখন বৈষম্য, কখন নিষ্ক্রিয়, কখন সক্রিয়,—কখন নিরাকার,—কখন সাকার,—কখন নির্গুণ,—কখন সগুণ,—কখন অপরিণামী—কখন পরিণামী ইত্যাকার হইলে,—মিশ্র পদার্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া বিকারী ও বিনাশশীল হইবে। সুতরাং নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব একবারেই-"বৈয়র্থ্যাৎ"।

অতএব বাদানুবাদকারিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়োদ্ভাবনে নানারূপ চেষ্টা স্বত্বেও অব্যক্ত প্রকৃতির ঈক্ষণত্ব সমর্থিত হইতেছে না।

তবে উল্লখিত মতে বাদানুবাদকারিদের একটী আপত্তি গ্রহণ করা যায়; যথা-"নদীকুলং পিপতিষতি" অর্থাৎ নদীর কুল বা কিনারটী পতনোন্মুখ বা শীঘ্রই পড়িবে, পড়িতে আর বিলম্ব নাই, এইরূপ ব্যবহার লোক মধ্যে প্রচলিত আছে; (বন্যার সময় যখন নদীর জল, দুকুল বহিয়া যায় অর্থাৎ কানায় কানায় যায় তখন নদীকুল পতনোন্মুখ হয়, পড়াগ্রামে তাহাকে "ধসি খাওয়া" বলে)। কিন্তু নদীকুল অচেতন পদার্থ "সে পড়িবে বা তাহার পড়িবার ইচ্ছা হইতেছে" ইত্যাদিতে তাহার ইচ্ছা থাকা কদাচ সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐরূপ প্রয়োগকে যেমন উপচার বলা যায়'—তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন পদার্থ হইলে উপচিত হইয়া চেতন পদার্থের ন্যায় যথানিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই নিমিত্তে প্রকৃতির ভাবী

কার্য্যের প্রশংসা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে "তৎ ঐক্ষত" বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ঐ আপত্তির উত্তরে "মঞ্চাঃক্রোশন" ন্যায়টি ব্যবহার করিলেই সব পণ্ড হইয়া যায়। "মঞ্চাঃক্রোশন, কিনা মাচার শব্দকরণ, কিন্তু মাচা অচেতন বস্তু বিধায়ে কদাচ শব্দ করিতে পারে না। এমত অবস্থায় মাচাকে সূত্র বা উপলক্ষ্য করিয়া মঞ্চস্থ ব্যক্তিরা শব্দ করিলেও "মঞ্চাক্রোশন্তি" কিনা মাচাগুলি শব্দ করিতেছে বলা যায়। এখানে মাচা শব্দ করিতেছে, এই বাক্য দ্বারা যেমন অচেতন বিশিষ্ট মাচার শব্দ না বুঝাইয়া মঞ্চোপলক্ষিত মঞ্চস্থ চেতন মনুষ্যকে বুঝাইতেছে—অর্থাৎ অচেতন মাচাটী উপলক্ষ্যবিশিষ্ট হইয়া চেতন মনুষ্যলক্ষণাক্রান্ত হইতেছে, অচেতন মাচা হেতু হইয়া চেতন মনুষ্য সাধ্য,—বা অচেতন মাচা বিধেয় হইয়া চেতন মনুষ্য উদ্দেশ্য হইতেছে,—তদ্রূপ "নদীকূল পড়িতেছে, "প্রকৃতির ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হইতেছে" বাক্য দ্বারা অচেতন নদীকূল ও অচেতন প্রকৃতি উপলক্ষিত হইয়া ইহাদের অন্তরস্থ সত্ত্বা যিনি সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ চৈতন্যময় বস্তু, তাঁহাকে বুঝাইবে না কেন? এবং অচেতন বস্তু নদীকূল ও প্রকৃতি উপলক্ষণাক্রান্ত হইয়া হেতু, বিধেয় ইত্যাদি দ্বারা ইহাদের সাধ্য ও উদ্দেশ্য বস্তু পূর্ণ চৈতন্যময় পদার্থের সহিত,—"যদ্দেশাবচ্ছেদে, যৎ কালাবচ্ছেদে, যাহার সত্ত্ব তদ্দেশাবচ্ছেদে, তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যা বলা হয়।" ইত্যাকার ন্যায়বিচারে (গতবার দেখান হইয়াছে) মিথ্যা বা অনিত্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত না হইবে কেন? সুতরাং আপত্তি খাটিল না; পরন্তু নগণ্য হইল। অধিকন্তু ঐ সকল বাক্য (নদীকূল পড়িতেছে, প্রকৃতির ঈক্ষণ বৃত্তি ইত্যাদি) হুঁকা বা গড়গড়া ডাকিতেছে, কাঁটা ফুটিতেছে, রৌদ্র উঠিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে, গাড়ী চলিতেছে, বর্ষা আসিতেছে চাঁদ ভুলিতেছে, রেল বা নৌকার আরোহী যেমন বলে, বৃক্ষ ছুটিতেছে, ইত্যাদি লৌকিক বা ব্যবহারিক কথারই নামান্তর হইয়া পড়ে। অধিকন্তু পারমার্থিক বিষয়ের উপচারিক শব্দবিন্যাস মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ঐ সকল উদাহরণে প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎকারণত্ব লোপ পায়।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, ঈক্ষণ বৃত্তি ধর্ম্মটী কদাচ অচেতনপ্রধান প্রকৃতির নহে। এই জন্যই তৃতীয় শ্রুতির শেষাংশ "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"।

শ্রীরঙ্গলাল রায়।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী ।

আলাইয়া　　(১১)　　একতালা ।

কেশরীবাহনে গজবিমর্দ্দনে বিরাজে জগত জননী ।
স্বতণ ভূষণে কমল আসনে বিহরে হরের কামিনী ॥
প্রফুল্ল নয়নে উছলে করুণা,
অরুণবসনা প্রেম-ফুল্লাননা,
চিন্ত নিরবধি মধুর মূরতি, অজ্ঞান-তামস-নাশিনী ॥
অনঙ্গলাঞ্ছিত অমরবাঞ্ছিত,
সে রূপ মাধুরী তুলনা রহিত,
বিশ্ব বিমোহিত প্রেমে পুলকিত, হেরিয়ে জগত ধারিণী ॥
নাশি মোহ তম শোভে জ্যোতির্ম্ময়ী,
ভাবিতেছে গরবে চিদানন্দময়ী,
পাশবিক বলে দলি অবহেলে, রাজিছে ত্রিলোকপালিনী ॥
মঙ্গল আরতি গাও সব জনে,
প্রেমানন্দেভরে পুলকিত মনে,
জয় "মা মা" রবে ললিত সুতানে, উঠাও মধুর রাগিনী ॥
অলক্তরঞ্জিত অভয় শ্রীপদ,
ক্ষরিছে অমিয় করুণা নিয়ত,
"যোগেন্দ্র" লুণ্ঠিত হৃদয়ে সতত পূজিতে কমলবাসিনী ॥

:0:

রমণী না জননী ?

ভারতের সেদিন গিয়াছে, যেদিন রমণিগণ হিন্দুর ঘরে ঘরে দেবীর ন্যায় পূজ্যা ও বরণীয়া ছিলেন। যেদিন তাঁহাদিগেরই সুখ সম্মান, সন্তোষ, তৃপ্তির উপর গৃহীর শুভাশুভ নির্ভর করিত। শাস্ত্রকারগণ বুঝিয়া ছিলেন, রমণীর আদর না করিলে,—তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য, প্রাপ্য সম্মান প্রদান না করিলে, কুলের বা বংশের কল্যাণ নাই; সে বংশে বা কুলে দেবতারা অভিসম্পাত করেন। সেজন্য ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

> পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা ।
> পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥
> যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।
> যত্রৈ তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃক্রিয়া ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্‌।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তস্মাদেতাঃ সদাপূজ্যাভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥
ভূতি কামৈর্নরৈর্নিত্যং সংকারেষূৎসবেষুচ॥

মনুসংহিতা ৩।৫৫-৫৯

"অর্থাৎ স্ত্রীলোককে বহুমানপূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা, বহু কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। যে কুলে নারিগণের সম্যক সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় বৃথা হইয়া যায়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই দুঃখিতা থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকগণ অসৎকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাৎ করেন, সেই কুল অভিচারাহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অশন, বসন, ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানকালে, বিংশ শতাব্দীর নব্যালোকে উদ্ভাসিত সুসভ্যযুগে পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাভিমানি জনগণ মধ্যে হয়তঃ কেহ কেহ বলিতে পারেন,—কেন আমরা ত রমণিগণকে অনাদর, অযত্ন করিতেছি না; বরং সাধ্যানুসারে তাহাদেরই সেবায় দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি; আমাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য,—তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু এ উত্তর কি ঠিক? ইহাই কি শাস্ত্রের অর্থ? ইহাই কি আদর্শ হিন্দু গৃহীর লক্ষণ? শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন; তাঁহারা সমাজের কল্যাণের জন্য যে সকল শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একদেশদৃষ্টিদোষযুক্ত নহে, তাঁহাদের উদারমত কখনই সঙ্কীর্ণতার বা স্বার্থপরতার স্থান হইতে পারে না। আমরা আপন আপন সুখ সুবিধা বুঝিয়া, শাস্ত্রের কোন অংশ বাদ দিয়া, কোন স্থলে বা কষ্ট কল্পনাপূর্ব্বক আপনার মনের মত অর্থ বা ব্যাখ্যা করতঃ শাস্ত্রবিধি উলঙ্ঘন করি নাই বলিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদানকরতঃ নিজে নিজেই বিজ্ঞ সাজিয়া সুধিজনগণসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকি।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমরা রমণিগণকে দেবীর আসন হইতে নামাইয়া দানবীর সিংহাসনে বসাইয়া তাহাদেরই পদার্চ্চনায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। দানবীর মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া দিন দিন পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছি, আমার নব সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া অশিক্ষিত বৃদ্ধ পিতাকে বাড়ীর চাকর, গর্ভধারিণী জননীকে ঝি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হই না, বা দ্বিধা বোধ করি না। সুসভ্য সমাজের রীতি অনুসারে পিতামাতা, ভাই ভগ্নী প্রভৃতি পোষ্যবর্গ আত্মসুখ-সম্ভোগপথের কণ্টক বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখি! যে পিতামাতা হইতে এ অমূল্য মানবদেহ পাইয়াছি, যে

জননীর কৃপায় আজ আমি শিক্ষিত সমাজে সুশিক্ষিত, সভ্যসমাজে সুসভ্য, আদৃত ও পূজিত হইয়া, সুনাম, সুখ্যাতির জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া ধরাকে সরা-জ্ঞান করিতেছি; আজ আমরা সেই জননীকে গুদামভাড়া বাবত কিছু অর্থ সাহায্য করতঃ স্থানান্তরে রাখিয়া পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছি !! যে ভাই, আমার একই পিতার ঔরসে, একই মাতার গর্ভে জন্মিয়াছে,—যে ভাইএর প্রতি ধমনীতে ধমনীতে, প্রতি শিরায়, শিরায় একই পিতামাতার শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে কিনা আজ আমার পর হইল !! ঊর্দ্ধতন পুরুষানুক্রমে, যে বৃহৎ অথচ উন্নত পরিবার একান্নভুক্ত ছিল,—যেখানে প্রতিদিন কত অনাথের অন্নসংস্থান হইত, কত উপায়হীন নিরাশ্রয় পোষ্যবর্গ প্রতিপালিত হইত,—হিন্দুর অবশ্য অনুষ্ঠেয় নিত্যকর্ম্মগুলি যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া বার মাসে তের পার্ব্বণ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইত,—যেখানে পূজাপার্ব্বণে, আনন্দোৎসবে দেশের দুঃখী কাঙ্গালী একমুঠা অন্ন পাইয়া কর্ম্মকর্ত্তার জয়গান করতঃ দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিত, আজ সেই পরিবার আমাদের সুশিক্ষায়,—সুব্যবস্থায় ছিন্নভিন্ন, আমরা ভাই ভাই, ঠাই ঠাই। আমরা আত্মতৃপ্ত-লালসায় মাকড়সার ন্যায় আপন আপন স্ত্রীপুত্র-কন্যার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া উদারতার স্থানে সঙ্কীর্ণতার, আত্মত্যাগের স্থানে স্বার্থপরতার প্রশ্রয় প্রদান করতঃ সরলমতি বালকবালিকাগণকে আমাদেরই শিক্ষায় সু[illegible]ভ্যতার উচ্চ আদর্শ সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। যে সংসারে উৎসব পর্ব্বোপলক্ষে গৃহিণিগণ অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণা হইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতঃ স্বহস্তে পক্কান্ন শত শত নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও ক্ষুধিত জনগণকে পরিবেশন করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেন,—যে সংসারে গৃহিণী নিজে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করতঃ পতি পুত্র, শ্বশুড় শাশুড়ী, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতি সমস্ত পরিজন ও পোষ্যবর্গকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইয়া সকলের আহারান্তে নিজে, স্বামী বা শ্বশুড় শাশুড়ী গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করতঃ তৃপ্তিলাভ করিতেন, আজ আজ কিনা সেই গৃহিণী পর্ব্বোৎসবে পাককরা কিম্বা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করা দূরে থাকুক, তাহাদিগদ্বারা স্বামী পুত্রের প্রীত্যর্থে দৈনন্দিন পাক করাই ঘটিয়া উঠে না। পূর্ব্বে যে স্থলে পত্নী বা জননী বসিয়া নানারূপ গল্পপ্রসঙ্গক্রমে স্বামী বা পুত্র কন্যাকে অন্যমনস্ককরতঃ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন, আজ সেস্থানে দশটাকা বেতনের পাচক নিযুক্ত হইয়া যেন তেন প্রকারে বেগার শোধ দিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে। গৃহকর্ম্মের জন্য ঝি ও সন্তানপালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছে !! অতিথি অভ্যাগত কি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ত দূরের কথা, সহর-নগরপ্রবাসী শিক্ষিত, সুসভ্য গৃহে অসময়ে আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হইলে, তাহাকে বাজার হইতে দোকানের পবিত্র ও সুস্বাদু আহার্য্য ক্রয় করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে !!!

যে রমণী স্বামীর সঙ্গে একযোগে শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতঃ সহধর্ম্মিনী আখ্যা পাইয়াছিলেন,—যাহার প্রত্যেক কর্ম্ম স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মার্থে যুক্ত ছিল,—যে রমণীকে শাস্ত্রকারগণ জগদম্বার বিশেষ শক্তির বিকাশ ভাবনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, স্ত্রী-মূর্ত্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং রহিয়াছেন; সুতরাং একথা ভুলিয়া রমণিগণকে ভোগ্যবস্তু বিশেষ বলিয়া সকামভাবে স্ত্রী-শরীর দর্শন করিলে শ্রীশ্রীজগন্মাতার অবমাননা করা হয়, এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয়। যত স্ত্রীমূর্ত্তি সকলই সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তি,—সকলেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ বিকাশ; তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতাগণ বলিয়াছেন :—

"বিদ্যা সমস্তা স্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ—
কাতে স্তুতিঃ স্তব্য পরাপরোক্তি ।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

"অর্থাৎ হে দেবি ! তুমিই জ্ঞানরূপিনী জগতে উদ্ভাবিত যত প্রকার বিদ্যা আছে, যাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে, সে সকল তুমিই তত্তংরূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তি-রূপে বিদ্যমানা, তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা, স্তব করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে ? কিন্তু হায়, আজ কি না আমরা জগজ্জননীর বিশেষ বিকাশ সেই রমণীকে বিলাসবাসনের উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছি। হিন্দুর সে রমণীর আদর্শ-জননীত্ব অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছি। রমণী এখন আমাদের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়াছে,—হিন্দুর আদর্শ দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিবাহ ছাগছাগীর সম্মিলন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? একদিন যে রমণী দয়া-দাক্ষিণ্যে, আচারনিষ্ঠায়, ত্যাগবৈরাগ্যে, লজ্জাশীলতায়, উদারতায়, সরলতা ও পবিত্রতায় হিন্দুর ঘরে ঘরে মূর্ত্তিমতী দেবীরূপে বিরাজিতা থাকিয়া, প্রতি আদর্শ হিন্দুর গৃহ, কুল, বংশ উজ্জ্বল ও পবিত্রকরতঃ পতি পুত্রের মঙ্গল সাধন করিতেছিলেন, আজ সেখানে মূর্ত্তিমতী দানবীর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে,—আজ সেখানে দয়ার স্থলে নিষ্ঠুরতা, আচারনিষ্ঠার স্থলে ব্যভিচার, ত্যাগবৈরাগ্য স্থলে স্বার্থপরতা ও আসক্তি, লজ্জাশীলতার পরিবর্ত্তে নির্লজ্জতা, উদারতার স্থলে সঙ্কীর্ণতা, সরলতার স্থলে কুটিলতা ও পবিত্রতার স্থলে কলুষকালিমা প্রবেশ লাভ করায় স্বর্গের নন্দনকানন, শিবশক্তির আবাসভূমি পবিত্র কৈলাসধাম মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে !!

এই দোষ কার ? কে ইহার জন্য দায়ী ? কে আনন্দময়ী, প্রেমস্বরূপিনী, হিন্দুর কুললক্ষ্মী-গৃহলক্ষ্মী, অশেষ গুণালঙ্কার ভূষিতা, শোকতাপনাশিনী, শান্তি-দায়িনী, জননী-রূপিনী দেবীকে দানবীর সাজে সাজাইয়াছে ? যে জননী দেবীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে তদীয় বরাভয়প্রদায়িনী

মুখমুকর উত্তোলন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করতঃ নন্দনকাননের পথ দেখাইয়া দিতেন,—আজ কা'র অভিশাপে,—কা'র প্ররোচনায়, সেই জননী কুহকিনী, মায়াবিনী সাজিয়া মানবকে নরকের পথ দেখাইয়া দিতেছে,—নরকের পথে টানিয়া নিতেছে? একদিন যে জননীর বাৎসল্যরসযুক্ত সুধামাখা বাণী শ্রবণ করতঃ তাঁহার সন্তানগণ মাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইয়া,—মাতৃভাবে বিভোর হইয়া, মা, মা, রবে দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়াছিলেন,—গরিয়সী, মহিয়সী, প্রেমময়ী জননীর চরণে-শির লুটাইয়া অশ্রুজলে তাঁহার রাজীব চরণ-যুগল ধৌত করিয়াছিলেন,—অশীতিপর বৃদ্ধও শিশুবালকের ন্যায় আকুলকণ্ঠে, ব্যাকুলপ্রাণে 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে মায়ের আচল জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন,—প্রতি রমণীতে জগজ্জননীর বিকাশ দেখিয়াছিলেন, আজ কোন পাপে জগৎ সেই জননীকে কামুকীর রূপে দর্শন করিতেছে? মাতৃভাবে বিভোর হইয়া চরণে শির লুণ্ঠনের পরিবর্ত্তে আসঙ্গ-লিপ্সার অদম্য তাড়নে উত্তেজিত হইয়া কাম-ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছে? যে ভারতে একদিন সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ জননিগণ লীলা করতঃ তাঁহাদের পাতিব্রত্য, সতীত্ব, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পবিত্রতার ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্য, সরলতার ও উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ত্রিলোক স্তম্ভিত করিয়াছিলেন,—আজ কিনা তাঁহাদেরই অধস্তন সন্ততি-গণ স্বার্থপরায়ণা, সঙ্কীর্ণহৃদয়া, হিংসুকা, কলহ-প্রিয়া প্রভৃতি বিশেষণে যুক্তা হইয়াছেন। একদিন এমন ছিল, জননী সন্তানকে বিষ দিলেও অমৃত হইয়া যাইত; তাই হিন্দুসমাজে চলিত আছে, জননী সন্তানকে স্বহস্তে ঔষধ খাইতে দেন না, কি জানি যদি পাছে মায়ের অমৃত হস্তের পরশে বিষাক্ত ঔষধও আপন ক্রিয়া ভুলিয়া যায়! হায় রে পোড়াকপাল, আজ কিনা আমাদের কপালে দোষে বিষ ত দূরের কথা, জননী অমৃত দিলেও বুঝি বিষ হইয়া যায়!! এর চেয়ে আমাদের আর কি অধঃ-পতন হইতে পারে? কেহ কি বলিতে চান, এদোষ জননীর? এদোষ রমণীর? কখনই নয়। সমাজের নেতা, গৃহকর্ত্তা, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি অভিভাবকগণই এজন্য সম্পূর্ণ দায়ী; কেননা রমণীর কোনদিনই স্বতন্ত্রতা নাই; তাঁহারা চিরকাল পরাধীনা; তাঁহাদিগকে বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন থাকিতে হয়। অভিভাবকগণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারা সেইভাবে শিক্ষিতা হইয়া থাকেন, সুতরাং অভিভাবকগণের এ দোষ নয় ত, কাহার দোষ বলিব? তাঁহারা (অভিভাবকগণ) আর্য্য-ঋষিগণের পরিণাম-সুখকর, কষ্টসাধ্য নির্দ্ধারিত পন্থাগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাতঃ-মধুর স্বকপোলকল্পিত নূতন পন্থা ধরিয়াছেন,—পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া অমৃতবোধে গরল পান করিতেছেন। ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থাদি কুসংস্কারবোধে পরিত্যাগ-করতঃ দেবী গড়াইতে গিয়া দানবী গড়াইয়া হাতে হাতে তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেছেন।

রমণী চিরকালই আপন গরবে গরবিনী সাজিয়া জননীর আসনে আসীনা। রমণী কল্পতরু, তাঁহাকে যে যে ভাবে পাইতে

ইচ্ছা করে, তিনি সেই ভাবে তাহার বাসনা পূর্ণ করিতেছেন। তাই একই রমণী কাহারও পত্নী সাজিয়া মধুরভাবে পতি সহ মিলিত হইয়া পতির তুষ্টি সম্পাদন করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই জননীরূপে সন্তানকে বুকে করতঃ বাৎসল্যরসের পূর্ণাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। কখন বা কন্যারূপে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, আবার কখন বা ভগ্নীরূপে ভ্রাতৃপ্রেমের নিখুত চিত্র জগতের সম্মুখে ধরিতেছেন। আবার রমণী কখন বা সতীসাধ্বী গৃহলক্ষ্মীরূপে আদর্শ গৃহিণী সাজিয়া অসংযমীকে সংযম শিক্ষা দিতেছেন,—মোহান্ধকে পথ দেখাইয়া স্বর্গের পথে টানিয়া নিতেছেন। আবার কখন বা বারবনিতা সাজিয়া কামুকের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এ দোষ রমণীর নয়, তিনি চিরকালই জননী,—সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষিণী। বাঘিনী অপরের কাছে হিংস্রা, শোণিতলোলুপা কিন্তু আপন শাবকের নিকট স্নেহময়ী, আনন্দময়ী জননী, বাৎসল্য রসের জীবন্ত প্রতিমা!! জগজ্জননী কালী অসুরের পক্ষে করালবদনা, ত্রিশূল-খড়্গধারিণী ও ভয়ঙ্করী; কিন্তু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানের নিকট মহামহিমাময়ী হাস্যমুখী, করুণাময়ী, স্নেহরূপিণী প্রেমানন্দময়ী, বরাভয়দায়িনী জননী। রমণীকে যে, যে ভাবে, যেরূপে পাইতে ইচ্ছা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপে, সেইভাবে প্রকটিতা হন।

শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন, স্ত্রীলোককে দেবতা স্বরূপ, জীবন স্বরূপ এবং ভূষণ স্বরূপ জ্ঞান করিবে। কুৎসিতা, ভ্রষ্টা, এমন কি দুষ্টা রমণীকেও দর্শন করিলে নমস্কার করতঃ ইষ্ট দেবতা স্বরূপ ভাবনা করিবে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব, ব্রহ্মা শক্তি, বিষ্ণু শক্তি, চন্দ্র শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, গ্রহগণ শক্তি-স্বরূপ, অধিক কি সমস্ত চরাচরই শক্তির স্বরূপ, সুতরাং কুৎসিত ভাবে কখনও স্ত্রীদর্শন করিবে না। স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রেই আপন স্নেহময়ী জননীর কথা মনে করিবে, মনে মনে "মা," "মা," মন্ত্র জপিতে থাকিবে, তাহা হইলে আর কুভাব হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কামভাবে স্ত্রী-অঙ্গ দর্শন করিলে জগজ্জননীকে অপমান করা হয়। কারণ—

"যস্যাঃ অঙ্গে মহেশানি সর্ব্ব তীর্থানি সন্তি বৈ"।
পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র।

"নারীর অঙ্গে সর্ব্বতীর্থ বসতি করে, সুতরাং নারী শরীর পবিত্র তীর্থস্বরূপ।"

আর আমরা কিনা, শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করতঃ রমণীকে কুৎসিত ভাবে দর্শন করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ প্রকাশের আধার স্বরূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তিকে হীনবুদ্ধিতে, কলুষিত নয়নে নিরীক্ষণ করতঃ দিনের ভিতর শত সহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিতেছি। আমাদের মধ্যে কয়জনে দেবীবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া,—যথাযথ সম্মান দিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবার ও কৃতার্থ হইবার উদ্যম করিতেছি? পশুবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করিয়া আমরা দিন দিন অধঃপাতের চরমসীমায় যাইতেছি।

"মাতৃবৎ পরদারেষু" চাণক্যের এই মহাবাক্য কে না জানে? কিন্তু আমাদের মধ্যে কয় জনে এই মহাবাক্য পালন করিয়া থাকি? সুন্দরী পর-স্ত্রী দেখিলে কয় জনের মনে পশুভাবের পরিবর্ত্তে মাতৃভাব জাগিয়া

থাকে ? সকলেই জানেন, এ জগতে মায়ের মত সুন্দরী কেহই নাই,—সরল শিশুই তাহার একমাত্র প্রমাণ। কুৎসিতা রমণীর সন্তানকে অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী ও তাহার জননী এই উভয়ের মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন, সে সুন্দরী রমণীর দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবে না, আপন জননী, কুৎসিতা রমণীরই গলা জড়াইয়া ধরিবে।

আর্য্যঋষিগণ কখনও রমণীকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের উপকরণ মনে করিতেন না। তাঁহারা হিন্দুর বিবাহকে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ মনে করিতেন। হিন্দুর প্রত্যেক কর্ম্মই ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিবাহ ত বিশেষ কথা, হিন্দুর অতি সামান্য কাজও ধর্ম্মের অঙ্গীয় ছিল। তাহারা স্ত্রীকে কখনই ভোগ বিলাসের উপকরণ মনে করিতেন না, স্ত্রীসহধর্ম্মিণী, জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, জীবন মরণে, তাঁহাদের বন্ধন-অচ্ছেদ্য মনে করিতেন। তাঁহারা আত্মতৃপ্ত র্থে বা প্রয়োজনসিদ্ধি কিম্বা কামবশতঃ স্ত্রীগমন করিতেন না তাহার প্রমাণ যথাঃ—

"অর্থাদ্ধ কামতো বাপি সৌখ্যাদাপি চ যো নর,
লিঙ্গ যোনি রতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
কুমারী তন্ত্র।

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, সুখের নিমিত্ত বা কামবশতঃ স্ত্রীসংসর্গে নিরত হয়, তাহর রৌরব নরকে পতন হইয়া থাকে। প্রজাসৃষ্টির জন্য তাহাদের বিবাহ, প্রজাসৃষ্টির জন্য তাহাদের স্ত্রীসংসর্গ নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সুসভ্য যুগে আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ধর্ম্মার্থে বিবাহ, ধর্ম্মার্থে স্ত্রীসংসর্গ আমরা একথা স্বীকার করি না। বর্ত্তমান সময়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া আত্মেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ও তাহার স্বাভাবিক পরিণতি-শূকর, শাবকের ন্যায় অগণিত সন্তানসন্ততির আবির্ভাবই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ?

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন,—"কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর," এই কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জননী পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। কেন না জননীকে পরিত্যাগ করিলে, আমারই যে অস্তিত্ব থাকে না। তিনি সকলকেই মাতৃমন্ত্রের সাধনা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে মাতৃমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি মায়ের ছেলে ছিলেন। তিনি মা ভিন্ন কিছু জানিতেন না,—মা ভিন্ন কিছু বুঝিতেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ঐ যে শঙ্খসিন্দুরশোভিতা, পতিপুত্রসমন্বিতা গরিয়সী রমণী, গৃহলক্ষ্মী-রূপে গৃহীর গৃহ আলো করিয়া আপন গরবে আপনি দাড়াইয়া আছেন, তিনিও মা,—আবার ঐ যে সোণাগাছীর দ্বিতালায় নানালঙ্কারে ভূষিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, নানা হাবভাব পরায়ণা কুহকিনী দাড়াইয়া জলন্ত অগ্নিতে পতনোন্মুখ পতঙ্গবৎ মোহান্ধ মানবকে পাপের জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে ইঙ্গিত করিতেছেন,—তিনি ও তা।" যেদিন মথুর বাবু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উলঙ্গ ও অৰ্দ্ধোলঙ্গ বেশ্যাগণ সমীপে ছলপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন ? মা, মা রবে ক্রন্দন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহার ফলে এই হইয়াছিলে,—বেশ্যাগণ বাবা বলিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর মথুর বাবুও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া-

ছিলেন। পরমহংসদেব মাকে চিনিয়াছিলেন,—মাকে বুঝিয়া ছিলেন; তাই সর্ব্বত্র মায়েরই বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন—তাই তিনি রমণী মাত্রকেই জননী মনে করিতেন।

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বুঝিয়াছিলেন যে, বেদ-পুরাণানুযায়ী উপদেশ মত রমণীর আসঙ্গ-লিপ্সা পরিত্যাগ করা জীবের দুঃসাধ্য; সে নেশা,—সে আকুল তৃষা জীব মনে করিলেই ছাড়িতে পারে না, কারণ জীব মাত্রেই রমণীর আবিষ্ট শক্তিতে অনুপ্রাণিত। তাই কৌশলে রমণীর পরিচর্য্যা করিয়া,—তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার সহিত আত্ম সংমিশ্রণ করতঃ প্রকৃতির কোমল বাহুবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। মায়ারূপিনীকে জয় করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। জীবের সাধ্য নাই যে, ঘৃণা বা অন্য উপায়ে রমণীর আকর্ষণ হইতে নিজকে রক্ষা করে। কেবল দেখিতে পাই, শিশু বালকেই একমাত্র রমণীকে আপন আয়ত্বে রাখিতে পারে। বালকের কাছে রমণীর সমস্ত মায়ার কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। রমণী শিশুর দাসী হইয়া সর্ব্বদা তাহার সুখ স্বচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য ব্যস্ত। জননী সন্তান বুকে করিয়া জগৎ ভুলিয়া যায়,—সন্তান দেখিলেই স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া সযত্নে কোলে তুলিয়া লয়। সেখানে কোন রূপ অভিমান বা আব্দার খাটে না। একমাত্র জননী ভিন্ন, সুন্দরী, যুবতী বা রসবতী কোন অংশেই বালকের নিকট আদরণীয় নহে। তাই শাস্ত্রকারগণ রমণীকে ঘৃণা না করিয়া জননীর আসন দিয়াছেন,—রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুর্গম রাস্তার প্রধান বিঘ্ন অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম,—রমণীকে ঘৃণা কিম্বা ভয় করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া নিজের দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিও না। দূরে দূরে সরিয়া থাকিলে তোমার জীবনে পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। রমণীকে দানবী-জ্ঞানে ঘৃণা করিও না,—দেবীজ্ঞানে গ্রহণ করতঃ জগজ্জননীর সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তি পুষ্পে পূজার্চ্চনা করিতে যত্নশীল হও। রমণী সুরূপাই হউক,—আর কুরূপাই হউক, যুবতীই হউক, আর বালিকা বা বৃদ্ধাই হউক, সতীই হউক, আর বেশ্যাই হউক, রমণী মাত্রই জগজ্জননীর অংশ ভাবিয়া,—মা, মা, বলিয়া তাঁহার আচল জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা কর,—আকুল কণ্ঠে, ব্যাকুল প্রাণে "মা," "মা," ডাকিতে ডাকিতে আত্মহারা হও,—দেখিবে রমণীর সকল কুহক, সকল মায়া,—সকল আবরণ দূর হইয়া গিয়াছে। জগজ্জননী তোমার মনোময়ী মূর্ত্তিতে তোমার হৃদয় কুটীর আলো করতঃ জননীরূপে তোমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার স্তন্য-পীযূষধারা তোমার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন, মায়ার স্থানে মা আসিয়া দাড়াইয়াছেন। তোমার সকল দুঃখ, সকল জ্বালা, সকল শোক তাপ দূর করিতে বদ্ধপরিকরা হইয়াছেন। যদি অমূল্য মানব জীবন সফল করিতে চাও,—যদি ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে সিদ্ধি-লাভ করতঃ জগতে অসাধ্য সাধন করিতে চাও,—তবে রমণীকে ঘৃণা বা ভয় করিও না। রমণীকে জননী বলিয়া গ্রহণ করতঃ প্রত্যেক রমণী হইতে জননীত্বের তোমার

প্রাপ্য অংশ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া নিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইও না। বানর-ছানার ন্যায় রমণী মাত্রকেই জননী বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধর, কোন প্রলোভনেই লুব্ধ হইয়া আপনার অমূল্য দাবী নষ্ট করিও না। দেখিবে তুমি মেঘমুক্ত রবির ন্যায় দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া আপন স্থানে দাঁড়াইয়া আছ,—আর জগজ্জননী দাসীর ন্যায় তোমার সেবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সতত ব্যাকুলা, আরও দেখিবে জননী বৎসহারা গাভীর ন্যায় সর্ব্বদা সংকিত দৃষ্টিতে তোমার পানে তাকাইয়া আছেন। তুমি জগজ্জননীর অভয় ক্রোড়ে স্থান লাভ করতঃ পরাশান্তির অধিকারী হইয়াছ, মরদেহে অমরত্ব লাভ করিয়াছ !!!

দীন—উমেশচন্দ্র।

:0:

মিলন-কামনা।

শত দুখের মাঝারে
সুখে ভাসে হিয়া
যবে নয়ন আসা'রে
আকুল হইয়া
করি নিষিক্ত তোমার চরণতল,
কিবা নবীন হরষে
পরাণ আমার
কার মোহন পরশে
নাচে বারবার
নিভে শোকদুঃখজ্বালা নিরাশানল ?
হয় রোমাঞ্চিত কায়
আহা ! কি পুলকে
নাথ ! ক্ষণতরে হায় !
পাই তোমা বুকে
কেন ধরা দিয়ে যাও পলায়ে দূরে ?
আহা ! কেন নাহি হয়
জনমের মত
হেন যোগ মধুময়
কাঁদে পোড়া চিত্ত
সেই অমৃতময় মিলন তরে !
তা' হ'লে—
পুনঃ দহিত না আর
দুখ দাবানল
কিম্বা আশা নিরাশার
কঠিন শিকল
মোরে বাঁধিত না আর যাতনা দিতে।
বুঝি জুড়াইত কায়
জনমের তরে
ভেদ রহিত না হায়
দুয়ের মাঝারে
মোর সদা তাই এই বাসনা চিতে।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

:0:

প্রার্থনা।

আমি যারে চাহি,
তাহে যদি প্রভো,
কেবলই তোমার অধিকার,
আমার আকাঙ্ক্ষা,
হবে যদি প্রভো,
কেবলই বিফল হাহাকার,
তবে এই কর,
তোমার বিলাস-
ক্ষেত্র করহ আমার হৃদয়,
সকল আনন্দে,
করহ সম্ভোগ,
নব যৌবনরসে রসময়,

আমার তাহারে,
তোমার দেখিয়া,
হই যদি মত্ত আনন্দে মাতি,
হয় যেন লয়,
স্বাতন্ত্র্য আমার,
কেবল কুটুক যুগল-ভাতি;

তখন হে প্রভো,
বিনা তোমাদের,
সত্তা যদি আর না থাকে মোর,

তোমার সত্তায়,
হ'য়ে স্বত্ববান্,
রহি যেন প্রভো তাহায় ভোর;

যদি বা ভাবহ,
ভাঙ্গে ভবহাট,
অধিকার-তন্ত্র-বিরুদ্ধ কাজে,
আমি যেন প্রভো,
হই মম সে-ই,
তোমার মানস-মোহন সাজে;

সারা অঙ্গে অঙ্গে,
পাইব তাহারে,
সারা প্রাণ জুড়ি লভিব তায়,
দেখিব আমার,
সেই এই প্রাণ,
তোমারেই শুধু তোমারে চায়;
তুমি ভোক্তা হ'য়ে,
আমি ভোগ্য হব,
সর্ব্ব গর্ব্ব মম করিবে চুর,
ঘুচিবে সকল,
সঙ্কোচ আমার,
আর না দেখিব তোমারে দূর।
(আর) তোমার ইঙ্গিতে,
খেলি যেন খেলা,
জননী হইয়া রাখিও কোলে,
পিয়ে স্তন্য-সুধা,
নাচব মাতিয়া,
হরি হরি হরি মধুর বোলে।

শ্রীশ্রীচরণ-ভরসা-সম্বলাকাঙ্ক্ষী।

দীন—যোগেশ্বর।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক উৎসব—আগামী ২৬ শে অগ্রহায়ণ রবিবার (১২ইডিসেম্বর) তারিখে অত্র সারস্বতমঠে "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের" ৫ম বার্ষিক উৎসব হইবে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে উক্ত উৎসবে যোগদানার্থে সাদরে আহবান করিতেছি।

———0———

অন্নকষ্ট—আমরা ইতিপূর্ব্বে "আর্য্য-দর্পণের" গ্রাহকগণকে স্থানীয় অবস্থা (জলপ্লাবন) জানাইয়াছি; তাহার পরিণামফল বর্ত্তমানে আসামের ও বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে অন্নকষ্টে পরিণত হইয়াছে। শত শত বুভুক্ষিত নরনারী ও বালকবালিকা অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে। যোরহাটের অন্তর্গত কোন কোন স্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; আমরা "যোরহাট সার্ব্বজনিক সভার" সঙ্গে মিলিত হইয়া খাটোয়াল গ্রামে একটী কেন্দ্র খুলিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে চাউল বিতরণ করিতেছি। সম্প্রতি ১২ খানা গ্রামে চাউল বিতরণ করা হইতেছে। আরও অধিক সংখ্যক গ্রামে চাউল বিতরণ ও ২।১ টী কেন্দ্র খুলিবার কথা হইতেছে। আশাকরি সহৃদয় জনগণ বুভুক্ষিত দেশবাসীর ক্ষুন্নিবারণার্থে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

———0———

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কুম্ভযোগে প্রথম স্নানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, শেষ স্নান প্রায় একমাস পরে হইবে, এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; ইতিমধ্যে বহু সভাসমিতি ও সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল; সুতরাং কুম্ভের শেষ স্নানের বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে, এই এক মাস মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর উল্লেখ করা এস্থলে বিশেষ আবশ্যক।

গঙ্গাতীরে সম্মিলনঃ—গঙ্গার সুবিস্তৃত বাঁধান চত্বরের (Platform) উপর প্রতিদিন অপরাহ্নে সাধুদিগের অপূর্ব্ব মিলন, এক অভিনব দৃশ্য। সুপ্রশস্ত এই বাঁধান স্থানটী,—ব্রহ্মকুণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে সিকি মাইলের উপর হইবে। সুপ্রসিদ্ধ কুশাবর্ত্তঘাট এই বাঁধান স্থানের অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানটী অতীব প্রিয়দর্শন—বিশাল চত্বরের একদিকে সুদৃশ্য সোপানশ্রেণী—সুশোভিত রহিয়াছে;—পূত-সলিলা জাহ্নবীর একটী ধারা * ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই বাঁধান সোপানাবলী ধৌত করতঃ

---

* হরিদ্বারে গঙ্গা ত্রিধারাতে বিভক্ত হইয়াছেন, একটী ধারা ব্রহ্মকুণ্ড এবং কুশাবর্ত্তঘাট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; দ্বিতীয় ধারাটী "হরকিপ্যারী" দ্বীপের পূর্ব্ব তীর ধৌত করত সুবিশাল বক্ষে প্রবাহিত এবং তৃতীয় ধারাটী সুপ্রসিদ্ধ "চণ্ডীর পাহাড়ের" পাদদেশ প্রক্ষালন করত সবেগে প্রবাহিত। এই শেষোক্ত ধারাটী "নীলধারা" নামে খ্যাত। তিনটী ধারাই কনখলে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

সবেগে ছুটিয়াছে এবং উক্ত ধারার কত-কাংশ এই বাঁধান স্থানের নিম্নে সুকৌশলে নির্ম্মিত সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে! অপর পার্শ্বে অভ্রভেদী চূড়াসমন্বিত বহু দেবমন্দির সগর্ব্বে বিরাজিত; আবার পাণ্ডাদিগের সুদৃশ্য প্রাসাদতুল্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই স্থানের শোভা আরও বর্দ্ধন করিয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পরই এই স্থানটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, কারণ কুশাবর্ত্ত ঘাট এই স্থানের অন্ত-র্ভুক্ত থাকায় এখনেও সর্ব্বদা যাত্রিগণ স্নান, আহ্নিক, পূজা, দান এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এইসব ঘাটে অসংখ্য মৃতাস্থি উৎসর্গ করা হইত। হিন্দুস্থানী, সিন্ধি এবং পাঞ্জাবী লোকেরা এক এক জনে ১০।২০ কিম্বা ততোধিক মৃতের অস্থি সুদৃশ্য থলের ভিতর পুরিয়া আনিত এবং যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐসকল অস্থি জলে নিক্ষেপ করিত। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে এবং কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি ঘাটে এত অস্থি পড়িয়াছিল যে, প্রবল স্রোতেও রাশিকৃত অস্থি সরাইয়া শেষ করিতে পারে নাই। গভীরতা কম এবং জল অতিশয় স্বচ্ছ থাকায়, ঘাটের নিম্নদেশ অস্থিময় দেখাইত। স্নান করার সময় অনেক সময়ে অতি সন্তর্পণের সহিত পা ফেলিতে হইত, কারণ ভগ্ন অস্থির টুকরা পায়ে বিঁধিয়া যাইবার সম্ভাবনা; ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারস্থিত "হর কি প্যারী" দ্বীপের সহিত এই স্থানটী একটী সুদৃশ্য এবং সুবৃহৎ পুল দ্বারা সংযোজিত হওয়ায় এই স্থানের দৃশ্য আরও মনোরম হইয়াছিল। সরকার পক্ষ হইতে এই সুদৃশ্য স্থানের নাম Esplanade রাখা হইয়া-ছিল। প্রতিদিন বিকালে এই চত্বরে বহু সহস্র সাধুর সমাগম হইত। এই স্থানটী যেন বিভিন্ন বেশধারী ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সাধুগণের অপূর্ব্ব মিলন স্থান। এখানে প্রতিদিন যেন আনন্দের হাট বসিত—কোথাও নানকপন্থী সাধু সমস্বরে গান করিতেছেন, কোথাও বা রামাইত বৈষ্ণব-গণ ঢোল এবং করতাল বাজাইয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করতঃ রামভজন গাহিতেছেন; কোথাও কোন কোন সাধু ধর্ম্মবিষয়ে অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিতেছেন, শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা ২।৩টী বালক সাধু সুললিত স্বরে চিমটা বাজাইয়া গুরুমুখী ভাষায় গুরু নানকজীর উপদেশ সম্বলিত দোহাবলী গান করিয়া উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। আবার কোথাও বা সেতার, পাখোয়াজ, হারম-নিয়ম প্রভৃতি সংযোগে সুমধুর তাল লয়ে ভগবৎ সঙ্গীত হইতেছে—অসংখ্য নরনারী মন্ত্র মুগ্ধবৎ স্থিরভাবে বসিয়া তাহা শুনিতেছে; কোথাও কোন সাধু গোরক্ষা বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। "ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের" পক্ষ হইতে প্রতিদিন এখানে বক্তৃতা দেওয়া হইত, একটী উচ্চ মঞ্চে দাঁড়াইয়া মহামণ্ডলের পণ্ডিতজী—জলদগম্ভীর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, বহু শ্রোতা মনোনিবেশ করতঃ তাহা শুনিত। পাঞ্জাবের আর্য্য-সমাজের পক্ষ হইতেও প্রায়ই বক্তৃতা হইত। এই সুদীর্ঘ এবং বিস্তৃত স্থানের কোন অংশ খালি পড়িয়া থাকিত না। নৃত্যগীত এবং ভজনে এই স্থানটী মুখরিত থাকিত, যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত! এখানে আসিলে কেহই নিরানন্দে থাকিতে পারিত না, সকলের মুখেই আনন্দ ফুটিয়া উঠিত। একদিগকে গঙ্গার সুমধুর কুলু-কুলুধ্বনি, অপর দিকে ভজন-সঙ্গীত ও আনন্দ

কোলাহল—এই অপূর্ব্ব আনন্দের সমাবেশে সকলেরই মন প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিত ! ভুক্তভোগী ব্যতীত এই আনন্দের ভাব সম্যক ধারণা করা সম্ভবপর নহে। এই সুদৃশ্য স্থানের একাংশে অসংখ্য খাদ্য দ্রব্যের দোকান এবং মনোহারী জিনিসের দোকানও অস্থায়ীভাবে বসিত। এই স্থান সম্পর্কে অরুণাচল আশ্রমের স্বামী দয়ানন্দের দলের বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কীর্ত্তনের এক অভিনব পন্থা বাহির করিয়াছেন; খোলের পরিবর্ত্তে জয়ঢাক প্রভৃতি বাজাইয়া ইঁহারা কীর্ত্তন করিতেন—ইঁহাদের কীর্ত্তনের মূলমন্ত্র "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ"। প্রতিদিন উষাকালে ইঁহারা হরিদ্বার সহরে টহলের সুরে প্রভাতী গান করিতেন এবং বৈকালে পূর্ব্বোক্ত স্থানে আসিয়া কীর্ত্তন করিতেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই গেরুয়া রঙ্গের "হাফ পেণ্ট" পরিতেন; এবং গায়ে সুরঞ্জিত আলখেল্লা থাকিত। কীর্ত্তনে ইঁহাদের মধ্যে অনেকের ভাবাবেশ হইত এবং কেহ কেহ অঙ্গভঙ্গীসহ তাণ্ডব নৃত্য করিতেন। বহু পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী সাধু ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন; এইরূপে কিছুদিন ইঁহাদের কীর্ত্তনে বেশ লোক হইত। কিন্তু কিছুদিন পরে কয়েকটী "মা" আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন এবং তাঁহারাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া একসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এই দৃশ্য যেন অনেকের চক্ষে ভাল বোধ হইত না ! এইসব কারণে অনেক সময়ে বাঙ্গালীর নিন্দা শুনিতে হইত। এইস্থানে প্রতিদিন স্বামী মুক্তানন্দজীর বাঙ্গালী শিষ্যগণ আগমন করিতেন। ইঁহারা বিনয়ী এবং ইঁহাদের প্রকৃতি সরল এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল। ইঁহারা সাধারণতঃ তপোভূমি হৃষিকেশে থাকিয়া সাধনাদি করিয়া থাকেন—ইঁহারা বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ

ভীমকুণ্ড—কুম্ভ উপলক্ষে সমাগত যাত্রিগণ এই ভীমকুণ্ডেও স্নান করিতেন, এই কুণ্ডে স্নানেরও নানা প্রকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই কুণ্ডটীতে ভীমেশ্বর মহাদেব নামক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় লোকে এই কুণ্ডটীকে "ভীমগোদা", "ভীমগড়া", "ভীম ঘোড়া" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকে। এখানে এইরূপ প্রবাদ যে, মধ্যম পাণ্ডব ভীমই এই ভীমেশ্বর মহাদেব স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলে যে, ভীমের অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এই কুণ্ডটীর উৎপত্তি হইয়াছিল; আবার, কাহারও মতে "স্বর্গারোহন" কালে ভীম এস্থানে গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই আঘাতেই এই কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক কুণ্ডটী যে অতীব প্রিয়দর্শন এবং পবিত্র এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কুণ্ডের এক পার্শ্বে সুদৃশ্য অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে এবং পর্ব্বত গাত্রে সুনির্ম্মিত মন্দির বিরাজিত থাকায়, এই স্থানের আরও শোভা বর্দ্ধন হইয়াছে; কুণ্ডটীর ব্যাস প্রায় ৪০ হাত হইবে। ইহার নিম্নদেশ ব্রহ্মকুণ্ডের ন্যায় বাঁধান রহিয়াছে, কোন স্থানেই বুক জলের অধিক হইবে না। কুণ্ডের তিনদিকে সুন্দর সোপান শ্রেণী এবং কুণ্ডের উপরিভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দররূপে বাঁধান রহিয়াছে। এই কুণ্ডটীর বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বদাই কুণ্ডের নিম্নদেশ হইতে জল উত্থিত হইতেছে এবং সেই উচ্ছ্বসিত জল দিবারাত্রি এক খানি পাথরের উপর দিয়া ঝর ঝর শব্দে একটী নালাতে পড়িয়া গঙ্গায়

গিয়া মিশিতেছে। এই কুণ্ডটী সর্ব্বদাই যাত্রীতে পরিপূর্ণ থাকিত—যাত্রীগণ এখানেও সানন্দে স্নান, দান ও পূজাদি করিতেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে এক মাইল উত্তরে ঋষিকেশে যাইবার রাস্তায় পর্ব্বত পাদমূলে এই সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডটী অবস্থিত।

সত্যযুগ—পাঞ্জাবে "সত্যযুগী মণ্ডলী" নামক একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য (১) ঐশ্বরিকভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করা এবং অসত্য ও পাপাচরণ পরিত্যাগকরতঃ সকলেই পবিত্র জীবন গঠন করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-প্রতিষ্ঠা করা। (২) আপন আপন ধর্ম্ম ভাব বজায় রাখিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সদ্ভাব এবং পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করা। (৩) ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া জগতের সকলে ভ্রাতৃ ও প্রেমের ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং যাহাতে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পরস্পর ভালবাসা, সহৃদয়তা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যাহাতে একে অন্যের সহায়তা করিতে ব্যাকুল হয়, এরূপ উচ্চ শিক্ষা দেওয়া। (৪) ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্রই একটা নূতন জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সত্যযুগের পুনরায় আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ বিশ্বাস করা—যাহাতে কলিকালের দোষ দিয়া লোকে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করতঃ অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে না পারে ইত্যাদি। এই সমিতির সভাপতি স্বামী শিবানন্দজী, সহকারী সভাপতি মিস্ এল, হুইটন হাম (মুণ্ডরী), ভারতীয় শাখার সেক্রেটরী শ্রীমতী ভেরোবাই।* সহকারী সেক্রেটরী—মিস জে, জি, ওয়েদারলি (মুণ্ডরী)। বৈদেশিক শাখার সেক্রেটরী—মিস মার্টি আরেঞ্জেল। কোষাধ্যক্ষ—লালা বলদেবসিংহ (রইস) ও লালা নন্দলাল মোহরসিংহ (দেহরাদুন)। এই মণ্ডলীর সভাপতি স্বামী শিবানন্দজী কুম্ভ উপলক্ষে হরিদ্বার আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছে এ সম্বন্ধে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও সাধুবেলা ছত্রের মোহন্ত শ্রীহরিনাম দাসজী প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মঠধারী মোহন্তগণের মতামত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এ সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে কুম্ভ উপলক্ষে এই মতের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেমতে ২৩শে চৈত্র মঙ্গলবার দিন প্রাতে শুভ সত্যযুগের নিশান প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সাধুগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া নির্দ্ধারিত হয়। এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মোহন্তগণ-স্বাক্ষরিত হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় বহু বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। ২৩শে চৈত্র প্রাতে ভীমগড়ার উত্তরে মোহিনী আশ্রমের প্রাঙ্গনে ৮ঘটিকার সময় সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার সভা হইল, বহু সাধু

---

* ইনি লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ ভাই মঙ্গলদেবের কন্যা। ইনি ইংরেজী, হিন্দি, উর্দ্দু এবং পাঞ্জাবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না। পূর্ব্বে পিরোজপুর এবং জম্মু হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। বর্ত্তমানে কাশ্মীর মহারাণীর শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি নৈতিক এবং ধর্ম্মজীবনে উন্নতা এবং চিরকুমারী। সত্যযুগের প্রচার কার্য্যে ইনি বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

মহাত্মা ও অন্যান্য লোক যোগদান করিলেন; সভার এক পার্শ্বে সুবৃহৎ কাষ্ঠদণ্ডে লাল কাপড়ে সজ্জিত করিয়া রাখা হইল; ইহার অগ্রভাগে "সত্য যুগ" লেখা প্রকাণ্ড নিশান লম্বিত ছিল। প্রথমে হিন্দুস্থানী ভজন হইল, তৎপর স্বামী দয়ানন্দের শিষ্যগণ কীর্ত্তন করিলেন। ইহার পর স্বামী শিবানন্দজী সভার পক্ষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। পরে লালা বলদেবসিংহ, স্বামী শিবানন্দজী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন; তৎপরে বৈদিকমন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিশানটী সভার সকলেই স্পর্শ করিলেন। উপস্থিত বহুলোক মিলিত হইয়া নিশানের নিম্নভাগ একটী গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া নিশানটী দাঁড়া করান হইল এবং গর্ত্তটী মাটী দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। নিশানটী সমুন্নত বক্ষে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া, ফুর ফুর করিয়া উড়িতে উড়িতে যেন সত্যযুগের মহিমা প্রচার করিতে লাগিল। নিশানটী তুলিবার সময় "পিতাজী সব আপকে ভকত বন্ যাবে", এই প্রার্থনা আবেগভরে বারম্বার উচ্চৈস্বরে বলিতে বলিতে স্বামী শিবানন্দজী বালকের মত কাঁদিতেছিলেন; তাঁহার এই প্রেমভাব দর্শনে সভায় সকলেই পুলকিত হইয়াছিলেন; পরিশেষে কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—পঞ্জাবের স্বামী দয়ানন্দজী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজীদের এই বিদ্যালয়টী দর্শনীয় এবং উল্লেখযোগ্য। কনখল সহর হইতে দুই মাইল দূরে স্বভাব-সৌন্দর্য্যপূর্ণ কাঙ্গরী নামক মনোহর স্থানে একটী পার্ব্বত্য নদীতীরে ইহা প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা মুন্সীরামের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে ১৯০১ সনে বহু অর্থব্যয়ে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, প্রাচীন রীতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দান, গুরুগৃহে শিক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং তৎসহ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞানও কতক পরিমাণে শিক্ষা প্রদান করা। এই সুবৃহৎ বিদ্যালয়ে মন্দির, ছাত্রাবাস, পুস্তকাগার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার, শিল্পালয়, চিকিৎসালয়, সুদৃশ্য খেলার ময়দান, ফলফুলের উদ্যান, ছাপাখানা প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে যথাযোগ্যভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এখানে আড়াই শতের উপর ব্রহ্মচারী বাস করিতেছে। আর্য্য-সমাজগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন না এবং "শুদ্ধিকরন" প্রক্রিয়া দ্বারা খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি যে কোন জাতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। ২০ শে চৈত্র হইতে ২৩ শে চৈত্র পর্য্যন্ত উক্ত মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব অতীব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

ঋষিকুল মহাবিদ্যালয়ঃ—সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ বহু অর্থব্যয়ে গুরুকুলের অনুকরণে 'ঋষিকুল মহাবিদ্যালয়' নামক এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ১৯০৭ সনে স্থাপিত করিয়াছেন। বহু অট্টালিকা পরিশোভিত এই আশ্রমটী হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে জ্বালাপুর রোডের উপর সুদৃশ্য স্থানে অবস্থিত। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রহ্মচারী বালকগণকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে সুশিক্ষিত করিয়া প্রাচীন রীতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা। এখানকার ব্রহ্মচারীর সংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে;

ইহারা সকলেই মুণ্ডিত মস্তক । ব্রাহ্মণ বালকগণ শুভ্র বর্ণের, ক্ষত্রিয় বালকগণ রক্তবর্ণের এবং বৈশ্য বালকগণ পীত বর্ণের রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে । ব্রহ্মচর্য্যের বিমল জ্যোতি ইহাদের সকলের মুখেই যেন পরিস্ফুট হইয়াছে । কুম্ভের সময় এই আশ্রমেরও উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন । ২৮ শে চৈত্র রবিবার দিন এই আশ্রম হইতে অতীব সুন্দর শোভাযাত্রা বাহির হইয়া হরিদ্বারের প্রধান রাস্তা দিয়া গমন করিয়াছিল । সর্ব্বাগ্রে সুসজ্জিত কয়েকটী হস্তীপৃষ্টে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদায় আসীন কয়েকজন সাধু মহাত্মা গমন করিলেন; তৎপর ব্রহ্মচারী বালকগণ বেদগান করিতে করিতে দণ্ডহস্তে দুইজন করিয়া সারি বাঁধিয়া যাইতে লাগিল—তাহাদের ললাটদেশ চন্দনে চর্চ্চিত ছিল । পরিশেষে বহুমূল্য দোলাতে, "আসাসোটা" ও নানাপ্রকার অস্ত্রধারী প্রহরীগণ বেষ্টিত হইয়া দ্বারবঙ্গের মহারাজা গমন করিয়াছিলেন । সুকুমার ব্রহ্মচারী বালকগণ পরিশোভিত এই শোভাযাত্রাটী বড়ই প্রীতিকর এবং সুদৃশ্য হইয়াছিল ।

সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসভা ঃ— কুম্ভ-উপলক্ষে ২৬শে ও ২৭শে চৈত্র এই সভার প্রাথমিক অধিবেশন হরিদ্বারে সম্পন্ন হইয়াছিল । এই অভিপ্রায়ে হরিদ্বারের কন্যাপাঠশালার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে একটী সুবৃহৎ পটমণ্ডপ ও উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল । এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য (১) বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপনকরা (২) হিন্দু সম্প্রদায়ে নূতন প্রণালীতে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা (৩) হিন্দু সমাজের সামাজিক, নৈতিক এবং শারীরিক উন্নতি বিধানকরা এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা (৪) হিন্দুসমাজের স্বার্থ সর্ব্বত্র রক্ষা করা (৫) ব্রহ্মচর্য্য, যম, নিয়ম প্রভৃতি সাধনার প্রচার করা (৬) রাজভক্তি সহকারে গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্যকরা এবং ভারতীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনা করা (৭) দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে অবস্থানুযায়ী কার্য্য করার জন্য সেবাসমিতি গঠন করা (৮) গবাদি পশুর উন্নতি বিধান করা ইত্যাদি । ২৬ শে চৈত্র শুক্রবার প্রাতে উপরোক্ত মণ্ডপে ৯ ঘটিকার সময় উক্ত সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল । এই সভায় কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন । মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দজী, দেহরাদুনের মোহন্ত শ্রীমৎ লছমনদাসজী, বিশ্ব-পর্য্যটক স্বামী শঙ্করানন্দজীপ্রমুখ বহু সাধু মহাত্মা, পণ্ডিত দীনদয়াল, পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রমুখ বহু পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত করমচান্দ গান্ধী, লালা বলদেবসিংহ, লালা মুরলীধর, সভার সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত মাননীয় সুপবীরসিংহ, শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী, শ্রীমতি সরলা দেবী প্রভৃতি দেশসেবক ও সেবিকাগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন । সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চারি পাঁচশত লোক সভায় সমবেত হইয়াছিল । পাঞ্জাবী, মারওয়ারী এবং হিন্দুস্থানী স্বেচ্ছা-

সেবগণ সভার শান্তিরক্ষা এবং সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথমে স্বস্তিবাচন ও "হবন" কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর ঈশ্বর-স্তুতি, প্রার্থনা এবং ভজন হইল। তৎপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ লছমন দাসজীর পক্ষে প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করা হইল। এই সময়ে মিরাট ডিভিসনের কমিশনার অনারেবল মিঃ স্যাণ্ডারস, সাহারাণপুরের জেলা মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মটর গাড়ীতে আগমন করিলেন—তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া সভায় বসান হইল। অতঃপর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারত-সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী ও তৎপারিষদবর্গকে আশীর্ব্বাদ প্রদান কার্য্য সুসম্পন্ন করেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রীটিশ রাজ্যের বিজয় কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপর সভাপতি মহারাজা বাহাদুর একটী সারগর্ভ সুন্দর মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। এই বক্তৃতাতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ, হরিদ্বারের প্রাচীনত্ব ও পবিত্রতা ব্যাখ্যা, মঠধারী ধনী মোহন্তগণের সম্পত্তির সুব্যবস্থা করতঃ ধর্ম্মের উন্নতি বিধান করা, প্রাচীন মঠে বিভিন্ন ভাষার হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে রক্ষা এবং প্রচার করা, হিন্দু-সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি বিধান করা, তীর্থ স্থানগুলির আবর্জ্জনা দূর করতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা, ভারত সম্রাটের মঙ্গল কামনা করা প্রভৃতি বহু সারগর্ভ বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তদনন্তর কমিশনার সাহেব একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন এবং প্রস্তাব করেন, "যে সমস্ত ভারতীয় বীর সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, আহত হইয়াছে, এবং ব্যাপৃত আছে, তাহাদের মঙ্গলার্থ—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হউক," এই প্রস্তাবটী অতীব আনন্দ কোলাহলের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। বেলা ১২ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইলে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় সভার অধিবেশন হয়, এই সভাতে উপরোক্ত হিন্দু সভাকে চিরস্থায়ী করিয়া এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে উহার শাখাসমিতি স্থাপনা করিয়া হিন্দুজাতির এবং সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি বিধান করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং সভার নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী ধার্য্য করা হইয়াছিল। সভাতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

২৭শে চৈত্র শনিবার ঋষিকুলের নিকটে একটী সুসজ্জিত সভাবাসে উপরোক্ত হিন্দু-সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী আলোচনার্থে এবং সনাতন ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে, দ্বারবঙ্গের মহারাজার সভাপতিত্বে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভাতে কাশ্মীর-জম্মুর মহারাজাবাহাদুর, পণ্ডিত-মণ্ডলী এবং বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে একটী সুরক্ষিত সিংহাসনে বসিবার জন্য কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুরকে অনুরোধ করা হইলে, তিনি যে উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন "মিথিলাধিপতি (দ্বারবঙ্গের মহারাজা) এই সভায় সভাপতি, অদ্য আমি কিছুতেই

তাঁহার সমান আসনে বসিতে পারি না; কারণ ইহা ধর্ম্মসভা—আমি ক্ষত্রিয়, আর তিনি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ এই সভায় বহু সাধু-সজ্জন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সাধারণ আসনে বসিবেন, আর আমি সিংহাসনে বসিব, ইহা আমার পক্ষে শোভা পায় না" এই বলিয়া তিনি সাধারণের সহিত একাসনে বসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে মহত্ত্ব এবং ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠারই পরিচায়ক বটে। দ্বারবঙ্গের মহারাজা এই সভায় অন্যান্য আলোচনার সহিত রাজভক্তি সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কন্যাপাঠশালার প্রাঙ্গনস্থিত মণ্ডপে হিন্দু সভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর অনুপস্থিত থাকায় ঋষিকেশের মোহন্ত মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎস্বামী মঙ্গলনাথজী সভাপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিনের মত অদ্যও বহু সাধু-মহাত্মা, পণ্ডিত এবং অন্যান্য লোক সমবেত হইয়াছিলেন। প্রথমে স্বস্তিবাচন, প্রার্থনা এবং সঙ্গীত শেষ হইলে সভার সেক্রেটরী মাননীয় শ্রীযুক্ত সুখবীর সিংহ সভার উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব সভাতে উত্থাপন করেন, এই প্রস্তবগুলি বহু বাদানুবাদ হইয়া এবং কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া সভায় গৃহীত হইয়াছিল। তৎপর সভার কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের উপস্থিত, অনুপস্থিত, ৪০।৫০ জনের নাম সমিতির তালিকা ভুক্ত করা হয়। এই সভাতে স্বামী শিবানন্দ, মাননীয় সুখবীর সিংহ, লালা বলদেব সিংহ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। একটী বাঙ্গালী স্ত্রী-সাধু গোরক্ষা সম্বন্ধে হিন্দিভাষাতে অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন; পরিশেষে শ্রীমতি সরলা দেবী হারমনিয়ম সংযোগে সুললিত স্বরে একটী সংস্কৃত এবং একটী বাঙ্গলা গান করার পর বেলা ১২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকার সময় সভার শেষ অধিবেশন হয়। এই সভাতে, চোর ডাকাতের অত্যাচার হইতে দেশবাসীকে রক্ষাকরার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক গঠন করা, গ্রামবাসী সৎলোকের হস্তে অধিক সংখ্যক অস্ত্র প্রদানের জন্য সরকার বহাদুরের নিকট প্রার্থনা করা প্রভৃতি কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করার পর, সভাপতিকে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সভাভঙ্গ করা হয়। সভায় প্রত্যেক অধিবেশনেই বহু পর্দ্দানিশীন স্ত্রীলোক সভায় আগমন করত সভার কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন; মণ্ডপসংলগ্ন পট্টাবসের পরদার ভিতরে ইহাঁদের সকলেরই বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের কেহ কেহ এই হিন্দু সভার প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাদের মত এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য "ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল" প্রতিষ্ঠিত থাকায় মহামণ্ডলের উন্নতির জন্যই সকলের যত্নবান হওয়া উচিৎ, এরূপ অবস্থায়

হিন্দু সভার ন্যায় একটী স্থায়ী সভার কোন আবশ্যকতা নাই। (ক্রমশঃ)।

জনৈক দর্শক।

———:0:———

শ্রীগৌরাঙ্গ।

(১)

গোপনে গোলোকে ছিল, অপরূপ প্রেমসুধা।
জগতে বিলায়ে কেবা মিটা'ল জীবের ক্ষুধা॥
(কার) সুবলিত অঙ্গ সদা, করে প্রেমে টলমল।
পুলকে পূর্ণাঙ্গ কেবা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল॥
কেবা হরিনামে হরিপ্রেমে মাতা'ল বিশ্বের প্রাণ,
(সে যে) শচীমায়ের স্নেহের নিমাই ভক্তগণ ধন প্রাণ॥

(২)

আচণ্ডালে নাম বিলা'ল (কেবা) সেই দয়াল এমন।
পতিত জনে বুকে ধরে দেয়রে ঘন আলিঙ্গন॥
(কেবা) রাধাভাবে বিভোর হয়ে মেখে গায়ে ধুলারাশি।
বৃন্দাবনের পথে পথে খুঁজেছিল গোকুলশশী॥
(কে বা) হরিনামে হরি প্রেমে মাতা'ল বিশ্বের প্রাণ।
(সে যে) শচীমায়ের স্নেহের নিমাই ভক্তগণ ধন-প্রাণ।

(৩)

জীবের তরে কোমল প্রাণে বাজ্‌ল কার দারুণ ব্যথা।
তাই ধনৈশ্বর্য্য তেয়াগিয়ে গলে নিল ছেঁড়া কাঁথা॥
(কার) ভুবনমোহন নৃত্য দেখে পাষাণ হৃদয় গলে ছিল।
রাজ্য ত্যজি গজপতি কার পায়ে শরণ নিল॥
(কেবা) হরিনামে হরিপ্রেমে মাতা'ল বিশ্বের প্রাণ।
(সে যে) শচীমায়ের স্নেহের নিমাই ভক্তগণ ধনপ্রাণ॥

(৪)

(কেবা) দন্তে তৃণ লয়ে সবায় সেধেছিল বল্‌তে হরি।
না বলিলে ভূমিতলে কেঁদে দেয় কে গড়াগড়ি॥
(কার) রাঙ্গা পায়ে শরণ নিল "প্রকাশ" জ্ঞান অহঙ্কারী।
(কেবা) নৈয়ায়িকের শিরোমণি "সার্ব্বভৌমের দর্পহারী॥
(কেবা) হরিনামে হরিপ্রেমে মাতা'ল বিশ্বের প্রাণ।
(সে যে) শচী মায়ের স্নেহের নিমাই ভক্তগণ ধনপ্রাণ॥

(৫)

(কেবা) রাধার ভাবে "গম্ভীরাতে" বার বছর কর্‌ল রোদন।
"স্বরূপ," "রামানন্দ" সনে কর্‌ল ব্রজরস-আস্বাদন॥

ওরে ভ্রান্ত মুগ্ধ জীব ! প্রাণ কি তোদের এতই পাষাণ।

এত করুণ ক্রন্দনেতেও গলে নাই কি তোদের প্রাণ ?

(সে যে) কেঁদে ফিরে তোদের তরে কেন তোরা হলি এমন ?

(শুধু) শচীমায়ের নয় ত রে সে তোদেরও যে নিজধন ॥

দীনা—শৈলবালা।

—:0:—

জন্মান্তর ও দৈবাদেশ।

জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। জন্মান্তর না থাকিলে ধর্ম্মের বা সাধন ভজনের কোনরূপ আবশ্যকতা দেখা যায় না। খাও, দাও আমোদ আহ্লাদ কর; কোন মতে দেহটী পাত হইলেই হইল। সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম কিছুতেই কিছু হইবে না। হিন্দুধর্ম্মের দ্বিতীয় ভিত্তি দেবদেবীর অস্তিত্বে বা প্রতীকোপাসনায়। ভারতের সর্ব্বত্রই দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। হিন্দুর প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েই কোন না রূপ একটী মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল মূর্ত্তিগুলি কেবল মাত্র মৃত্তিকা, প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়াই ইহাঁদের এত আদর হয় নাই। স্থান বিশেষে এবং মূর্ত্তি বিশেষে সেই সেই দেবতার আবির্ভাব থাকে বলিয়াই লোকে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া দেহপাত করিয়াও এই সকল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে। জন্মান্তর ও প্রতীকোপাসনা হিন্দুমাত্রেরই মজ্জাগত। যাঁহার এই দুইটীতে বিশ্বাস নাই, তিনি হিন্দুনামে অভিহিত হইতে পারেন না। এই সকল তত্ত্ব পুরাণের কথা বলিয়া অলীক নহে। এখনও ভক্তিমান ও বিশ্বাসী মানবের নিকট মূর্ত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রকট হন, জন্মান্তর রহস্য প্রকাশিত হয়। কোনরূপ পুস্তকগত বা বক্তৃতাগত তত্ত্বকথার সত্যে বিশ্বাস না করিয়াও যদি জাগতিক নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক ঘটনাগুলি সর্ব্বদা ধীরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলেই প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা অবিশ্বাসের ক্ষণভঙ্গুর আবরণ মুহূর্ত্ত মধ্যে খসিয়া পড়ে; আর শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বকথা ও সাধুমুখ বিনিসৃত উপদেশাদির সত্যতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নতুবা দুইচক্ষু মুদ্রিত করিয়া "অন্ধকার, অন্ধকার" বলিয়া চীৎকার করিলে এ অন্ধকার দূর না হইয়া ক্রমে ঘনীভূত হইবে।

জগতে কত আশ্চর্য্য ও অমানুষিক ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে; কিন্তু আমরা অনিচ্ছায় বা সময়াভাবে তাহাতে মনোযোগী হইতে না পারায় অনেক বিষয় আমাদের জ্ঞানের অগোচর থাকিয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ সংকীর্ণ জ্ঞান লইয়া যাহা না বুঝিতেছি, তাহাই ভিত্তিহীন বা অবিশ্বাসের বস্তু বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু বিশ্বাস না করিলেও তাহার সত্যানুসন্ধান কিছুই করিতেছি না। পুরাণাদিতে

বা জ্ঞানগরিষ্ঠ বৃদ্ধগণের প্রমুখাৎ জন্মান্তর, দেবদেবীর অস্তিত্ব বা দৈবশক্তি সম্বন্ধে বহু গল্প বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিলেও কালের কেমন এক নূতন হিল্লোলে সে-গুলি যেন আর প্রাণ তেমন বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে চায় না। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও যদি বিশেষ কোন ঘটনা হঠাৎ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই অতি পুরাতন সত্য কথাগুলি বিশ্বাসের সহিত প্রাণে জাগিয়া উঠে, এবং বাল্যের সেই শ্রুত গল্পগুলির সত্যতা অনুভব করিয়া মন পুলকে নাচিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর উন্নত শির পুরাণকার অমর ঋষিগণের চরণে ভক্তিভরে নমিত হয়। তাই আমিও আজ সেই পুরাতন ঘটনার একটী পুনরাবৃত্তি দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি ও ইহাতে হিন্দুর সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে বলিয়া এই ঘটনাটী "আর্য্যদর্পণের" পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় যুবক। বয়স প্রায় ৩০। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি মৃগী ও রক্তস্রাব রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। নানা প্রকার চিকিৎসায় কোন রূপ সুফল না হওয়ায়, তিনি এই যৌবনে জীবনে হতাশ হইয়া উঠেন এবং শেষ একবার দেবতার শরণাপন্ন হইয়া রোগ-মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হন। মানুষের স্বভাবে এই একটী বিশেষত্ব দেখা যায় যে, যতক্ষণ সে তাহার নিজের বা অপরের শক্তির পরিচালনা দ্বারা কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করে, ততক্ষণ আর সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানকে তাহার মনে হয় না। বিপদে আপদে পর্য্যুদস্ত হইয়া যখন আত্মম্ভরিতায় আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং নিজবলে কোন ফল হইল না বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন সে বিপদে পড়িয়া "আর্ত্ত ভক্ত" সাজিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়। এ ভদ্র লোকটীরও ঠিক তাহাই হইল। ইনি শ্রীশ্রীতারকেশ্বরে "ধরণা" দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তারকেশ্বরে গমন করিয়া যথাবিধি ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানান্তর সর্ব্বসন্তাপ-হর ভোলানাথের মন্দির দ্বারে পড়িয়া রহিলেন; দিনান্তে একটু চরণামৃত ও কিছু ফল মূল দ্বারা সামান্য রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মন্দির প্রান্তে অহর্নিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন ও দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন গভীর নিশীথকালে হঠাৎ মন্দির দ্বার খুলিয়া গেল এবং মন্মথবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন, জটাজুট সমন্বিত, ভস্মাচ্ছাদিতবপু, দিব্যকান্তি এক মহাপুরুষ মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই সময় জলদ গম্ভীর স্বরে মন্দির মধ্য হইতে ধ্বনিত হইল, "বৎস! তুমি পূর্ব্ব জন্মে ... গ্রামের ... গোস্বামীর পুত্র ছিলে। তোমার পিতামাতার প্রতি তুমি যথেষ্ট অত্যাচার, উৎপীড়ন করিয়াছিলে এবং তাহাদের সেবার প্রতি কোনরূপ মনোযোগী ছিলে না। সেই দুষ্কর্ম্মের ফল স্বরূপ তোমার এই দুরারোগ্য

ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে তোমার সেই পিতা মাতা বগুড়া সহরে মালতীনগরে বাস করিতেছেন। তাহাদের এবার তন্তু-বায় কুলে জন্ম হইয়াছে। তোমার পিতার নাম হইয়াছে শ্রীগিরিধারী বসাক এবং তোমার মাতাও তাঁহার পত্নী হইয়াছেন। গিরিধারীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে, তাহার নাম গৌরনাথ। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া সেইস্থানে গমন কর এবং তোমার পিতার উচ্ছিষ্ট ভোজন কর। তাহাতেই তোমার ব্যাধি নিবৃত্তি হইবে। দূরদেশ বলিয়া ভীত হইও না*। পথে আমি তোমার সহায় হইব।" এরূপে ভগবৎ করুণা লাভ করিয়া মন্মথবাবু নিরাপদে মালতীনগর আগমন করিলেন। তিনি মালতীনগরে তিনি দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। গিরিধারী প্রথমতঃ তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে কিছু কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু সন্তানের আর্ত্তি দেখিয়া তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়ে ব্যাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া মন্মথবাবুকে তাহার ইচ্ছানুরূপ উচ্ছিষ্ট দান করিয়াছিলেন। মন্মথবাবু মালতীনগরে অবস্থান কালে প্রত্যহ স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে ভক্তিভাবে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিতেন। এই সময় তাহার ব্যাধির কোনরূপ প্রকোপ দেখা যায় নাই। তিনি সুস্থ ও নিশ্চিন্ত মনে এই স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্দেশে এরূপ ঘটনা যদিও নূতন বা বিরল নহে, তথাপি ইহা এই ঘোর অবিশ্বাসের দিনে আমাদের প্রাণে আমাদের পিতৃ পিতামহ-গণ পরিসেবিত দেবদেবীর ও তীর্থস্থানের মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে কিঞ্চিত সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। জন্মান্তর ও দৈবাদেশের এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অথচ আমরা সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিয়া অন্ধকার হইতে অন্ধকার তম প্রদেশে প্রবেশ করিতেছি—এই যা দুঃখ।

দীন—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

*বলা বাহুল্য মন্মথ বাবুর বগুড়া জেলার মালতী-নগর গ্রাম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না এবং এরূপ দূরদেশের নাম শুনিয়া তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া ছিলেন। লেখক।

—:0:—

শ্রীরাধা-ভাব।

রাধাভাব ত্যেয়াগের মহিমা উজ্জল।
রাধাভাব পীরিতির কণক কমল॥
রাধাভাব জগতের সুষমার সার।
রাধাভাব লাবণ্যের পূর্ণ স্তুপাধার॥
রাধাভাব সোহাগের চন্দন শীতল।
রাধাভাব ধীরতার যেন হিমাচল॥

রাধাভাব ঔদার্য্যের বিশাল গগন।
শুদ্ধতায় শারদীয়া শশীর মতন॥
রাধাভাব শুদ্ধ হৃদে স্বতঃ স্বপ্রকাশ।
রাধাভাব কি মধুর কৌমুদীর রাশ॥
রাধাভাব হৃদয়ের অতি গোপ্যধন।
গুরু বিনা যার মূল্য না হয় গ্রহণ॥

কমলার আকাঙ্ক্ষিত মধুর এ ভাব।
নিষ্কাম হৃদয় যার প্রকাশে প্রভাব ॥
রাধাভাব পেতে চাই রাগ ভক্তসঙ্গ।
ঘোর প্রতিকূল যার বিষয়-প্রসঙ্গ ॥
রাধাভাব চাই ? ছাড় ধন জন আশ।
রাধাভাব চাই ? কর মনে ব্রজ বাস ॥
রাধাভাব, ব্রজভাব, অতুল, অতুল।
বাক্য যারে ফুটাবারে নাহে পায় কুল ॥
রাধাভাব-সাগরের কণিকা পাইলে।
জীবন কৃতার্থ হয় সর্ব্বাভীষ্ট মিলে ॥

রাধাভাব, ভাব শ্রেষ্ঠ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।
কান্তি ল'য়ে গোরা হ'ল মহাভাবাবিষ্ট ॥
রাধাভাব দ্যুতিময় রূপ কি মধুর !
প্রাণারাম ভাবে হিয়া হ'ল ভরপুর ॥
রাধাভাব সুধা কণা ল'ভেছে যে জন।
আশ্রয় হউক মোর তাঁহার চরণ ॥

দীন—রসিকলাল দে।

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(১৬)

আমি বহু কিনা ?

সৎ পদার্থের ঈক্ষণ বৃত্তি (তদৈক্ষত) অর্থে গতবারে আলোচিত হইয়াছে যে, ঈক্ষণ বৃত্তি ধর্ম্মটী সাংখ্যদর্শন পরিকল্পিত—প্রকৃতির নহে। কাজেই পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি ও সৎ পদার্থ বাচ্য হয় না, বা "তৎ" শব্দটী (পূর্ব্বোক্ত সৎপদার্থ শব্দটী) প্রকৃতি অর্থে বিবক্ষিত নয়; সুতরাং সৎ-পদার্থ বলিতে অতঃপর পূর্ণ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আর কি বিবক্ষিত হইবে ? অতএব "তদৈক্ষত অর্থে" অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই পূর্ব্বোক্ত সৎপদার্থ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, আলোচনা করিয়াছিলেন, বা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে,-আমি বহু হইব, অনেক হইব, প্রভূত হইয়া জন্মিব ইত্যাদি। অর্থাৎ আলোচ্য শ্রুতির শেষাংশ—"বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"।

যিনি বলিতেছেন, আমি বহু হইব, সেই সৎপদার্থ পূর্ণ পরব্রহ্ম আলোচনা বা ইচ্ছা করিয়া যদ্যপি বহু হন, ভালই; তাহাতে আর আপত্তি কি আছে ? তিনি অবশ্যই বহু বা প্রভূত হইতে পারেন, ঈক্ষিতা বা দ্রষ্টাও হইতে পারেন। প্রতিবন্ধকবলে 'অনেকের মতে' ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া দ্বৈতত্বেও আসিতে পারেন; অর্থাৎ "ভেদেনমন্দ দৃষ্টিনাং দৃশ্যতে প্রেরকোহপিসন্"।

কিন্তু বিষ যেমন জীবননাশের হেতু হইলেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনুকূল উপায়োদ্ভাবন দ্বারা বিষত্বের স্থলে অমৃতত্বের কার্য্যকারী হয়; অপাতরম্য বাসনার বন্ধন দুরতিক্রমণীয় বিধায়ে পৌনঃপুনিক গর্ভবাসের কারণ হইলেও ঐকান্তিক যত্নের সহিত বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য মীমাংসায়

সত্যস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, অক্ষয় আত্মতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশে যেমন সকল বন্ধন ছিন্ন হয়; জ্ঞান সন্তাপ সম্পর্কে হিম বিন্দুবৎ যৌবনোল্লাস চিরদিনের মত যেমন লোপ পায়;—তদ্রূপ সৎ পদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম বহু হইবেন, অনেক হইবেন, প্রভূত হইয়া জন্মিবেন ইত্যাদিতে তাঁহার বহুত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা ভ্রমান্ধকারের ঐশ্বর্য্যময়ী বিভূতি মাত্র হইলেও বেদ বা শ্রুতি এবং তদনুকূল যুক্তির সাহায্যে প্রমেয়গত সন্দেহ বিনিবৃত্ত হইলে, সকল ভ্রমের অপনোদনে শান্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে? অতএব বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে:—

যে সৎপদার্থস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মের ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হইতেছে, বা যিনি আলোচনা করিতেছেন যে,—আমি বহু হইব, অনেক হইয়া জন্মিব; তিনি কদাচ বহু বা অনেক নহেন। অর্থাৎ "বহু হইব" এই বহুবচনান্ত পদটী বহু বচনে অবিবক্ষিত; উহা এক বচনেরই বোধক। অন্যথায় তিনি (পূর্ণ পরব্রহ্ম) যদ্যপি নিজে বহু হইতেন, বা তাঁহাতে বহুত্ব থাকিত, তাহা হইলে "বহু হইব," "অনেক হইব," এরূপ আলোচনা বা ইচ্ছা কদাচ করিতেন না। যেমন "দিগম্বর বাবু," কখন বলিতে বা আলোচনা করিতে পারে না যে;—"আমি দিগম্বর হইব," "আমি দিগম্বর হইব।" যেহেতু সে নিজে "দিগম্বরই আছে, আবার তাহাকে নূতন ভাবে "দিগম্বর হইব," "দিগম্বর হইব" আলোচনা করিতে হইবে কেন? তদ্রূপ সত্যস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম বহু হইলে, তাঁহার বহু হইব, অর্থাৎ "বহুস্যাং" আলোচনা কদাচ উদিত হইত না। কেন না তিনি নিজে বহু ভাবে থাকিলে (দিগম্বর বাবুর মত) নূতন ভাবে "বহু হইব" এরূপ ভবিষ্যমান আলোচনা করিতে পারেন না।

যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে, তিনি (পূর্ণ পরব্রহ্ম) বহুত্বের গুণের আধার বা আস্পদ; সুতরাং নানারূপ অর্থ যোগ দ্বারা—একত্বের উপপত্তি নিরাকৃত হয়। অতএব তিনি বহুত্বের গুণের—আস্পদ বিধায়ে,-বহু হইব, অনেক হইব ইত্যাদি আলোচনা করিলে কোনরূপ আপত্তি বা বিরোধাশঙ্কা থাকে না। ভাল কথা; কিন্তু এরূপ হইলে নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ দিগম্বর, নটবর, উপেন্দ্র ও বগলা নামক ব্যক্তিগণ নামোচিত দিব্যদেহসম্পন্ন সাধু থাকিয়া, পুনরায় যদ্যপি তাহারা প্রত্যেকে দিগম্বর, নটবর, উপেন্দ্র ও বগলা নামের অধিকারী হইবার জন্য সর্ব্বত্রই আলোচনা করে; তাহা হইলে যেমন তাহাদের নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন, অকারণে কারণ, অহেতুতে হেতু ইত্যাদিতে,—প্রয়োজন নাই, আবার আছে,—কারণ নাই, আবার আছে,—হেতু নাই, আবার আছে, এইরূপ একটা "যাহা কিছু নয় তাহা কিছু"—চতুষ্কোণ গোলক ইত্যাদি'—বাক্যের ন্যায় ব্যাঘাতযুক্ত—"স্ববিরোধী" ভাব আনিয়া দেয় তদ্রূপ হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত না হইয়া বাক্যার্থ প্রতিপাদনে অসমর্থ হয়। তদ্রূপ সৎ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম "বহুত্বের গুণের আস্পদ হইয়া" পুনরায় বহু হইব, আলোচনা করিলে ঐরূপ বিরোধ যুক্ত ভাবের আরোপ অবশ্যম্ভাবী

হইবে; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরন্তু বস্তু আছে, আবার নাই, ঘট আছে আবার নাই, এরূপ সমাবেশ দ্বারা সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বিরোধ ঘটিয়া—বাক্যার্থ প্রতিপাদন দূরের কথা, নিষ্প্রয়োজন পুনরুক্তি দোষ দ্বারা প্রামাণ্য-নিশ্চয় নিরর্থক হইবে। অর্থাৎ বাক্য একবারেই অপ্রমাণ হইয়া প্রয়োজন সিদ্ধি পরাহত হইয়া উঠিবে,—"প্রয়োজনং ন সিদ্ধ্যেদিতি"। অতএব "বহু হইব" পদটী বহুবচনান্তসূচক হইলেও উহার বহুত্ব ভাব বা সংখ্যা এখানে বিবক্ষিত নয়; 'এক' একত্বই বিবক্ষিত।

যদি বল শাস্ত্রে আছে "গ্রহং সংমার্ষ্টি",—অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্র মার্জ্জন করিবে। এখানে 'গ্রহ' পদটী একবচনান্ত হওয়ায়, একটী মাত্র যজ্ঞপাত্র সম্মার্জ্জন করিতে হইবে—বুঝা যায়। কিন্তু তাহা না হইয়া যতগুলি যজ্ঞপাত্র থাকে, সমস্ত পাত্রেরই সম্মার্জ্জন করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ বোধ করিতে হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে,—গ্রহ একবচনান্ত পদ হইলেও উহাতে একবচন অবিবক্ষিত;—বহুবচন অর্থাৎ বহুত্ব সংখ্যা বিবক্ষিত। অতএব শাস্ত্র বাক্যেই যখন এক বচনান্ত পদ বহুবচন-বোধক হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে;—তখন "আমি বহু হইব" এই বাক্যের আমি এই একবচনান্ত পদটী, একবচনে অবিবক্ষিত হইয়া বহুবচনবোধক অবশ্যই হইবে। অর্থাৎ—"আমি" বহুত্ব সংখ্যা-বোধক হইয়া বহু বা অনেক কেন না হইব ? কিন্তু এরূপ আপত্তি বা আশঙ্কা করা যায় না। যেহেতু যজ্ঞীয় পাত্র সম্মার্জ্জন বিষয়ে "গ্রহং সংমার্ষ্টি" মন্ত্রের পূর্ব্বে "গ্রহৈর্জুহোতি" মন্ত্রে দশটী যজ্ঞীয় পাত্র দ্বারা হবন করিবে, এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায়,—গ্রহ পদটী এক-বচনান্ত হইলেও উহা পূর্ব্বোদ্দেশ্যের বোধক হইতেছে। পরন্তু সম্মার্জ্জনের প্রতি যজ্ঞ-পাত্রের প্রাধান্য জানা যাইতেছে। সুতরাং যজ্ঞ পাত্র মাত্রেরই সম্মার্জ্জন পাইবার অধিকারী হওয়ায়, দশটী যজ্ঞ পাত্রেরই সম্মার্জ্জন বিহিত হইবে। এইজন্যই "গ্রহং সংমার্ষ্টি" এই বাক্যের 'গ্রহ' পদটী একবচনান্ত হইলেও উহাতে একবচন বিবক্ষিত হয় নাই;—উহা বহুবচনবোধক;—বা বহুত্ব সংখ্যার অনুমাপক। কিন্তু "আমি বহু হইব" এই বাক্যের পূর্ব্বে সৎ পদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মের কোনরূপ অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন বা প্রয়াস ইত্যাদি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব পূর্ব্বোদ্দেশ্যবিহীন স্থলে "গ্রহং সংমার্ষ্টি" বাক্যের তুলনায় তিনি (পূর্ণ পরব্রহ্ম) বহু হইতে পারেন না। অথবা যে স্থান সদসতের অতীত, অক্ষয়, সত্যস্বরূপ,—সেই "অনুপলভ্যমান" স্থানে হবন-কর্ত্তা, যজ্ঞীয় পাত্র, একবচন, বহুবচন, ইত্যাদির অবস্থিতি একবারেই অসম্ভব; কাজেই "গ্রহং সংমার্ষ্টি" উদাহরণ দ্বারা বহুত্ব স্থাপন কদাচ সম্ভবপর নহে।

পক্ষান্তরে স্পন্দন, ঈক্ষণ বা আলোচনাদি বৃত্তি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম স্মরণ শক্তির অধীন। এইজন্যই শ্রুতি বলেন, স্মরণ বস্তুটী আকাশা-পেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (ভূয়ান্) অর্থাৎ "স্মরো বাবাকাশাদ্ ভূয়স্তস্মাদ্"। স্মরণশক্তির অবিদ্যমানে পাঞ্চভৌতিক পদার্থনিচয় ভোগ্য হইতে পারে না, এবং তাহাদের অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা অনুভবে আসাও

সম্ভব নহে। কাজেই পদার্থগুলি,—"অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক—বস্তু সমূহ" অপ্রয়োজনীয় বা অসার্থক হইয়া যায়। এজন্যই আকাশাপেক্ষা স্মরণের শ্রেষ্ঠত্ব। আবার স্মরণ বস্তুটী "আশা" দ্বারাই উদ্দীপিত হয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় আশার সাহায্যে স্মরণ পথে আসে। আশা দ্বারা উৎসাহিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াই স্মরণ পদার্থটী, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রোচ্চারণ, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায়ভূত বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিবিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়। এইজন্য "শ্রুতি মন্ত্রানুসারে" স্মরণাপেক্ষাও আশার শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা অভিলাষ, ইচ্ছা, কাম এগুলি "আশার" পর্য্যায় বা সমানার্থক শব্দ। মহানুভব আনন্দ গিরি বলেন "আশায়া ভূয় স্মাকাঙ্ক্ষা দ্বারা বৃৎপাদয়তি"। মতান্তরে অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা বা অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষের নাম আশা। শ্রুতি বলেন "আশামুপাযস্বেতি" ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা কর। আশার উপানায় অভিলষিত বিষয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত শ্রুতি বাক্যানুসারে দুইটী বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথম, আশাকে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করা হইলে অর্থাৎ "আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে" হইলে, আশাপেক্ষা ব্রহ্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হওয়া যায়। এরূপ হইলে অর্থাৎ আশাপেক্ষা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থিত হইলে,—আশা এবং আশা দ্বারা উদ্দীপিত "স্মরণের" অধীন অন্তঃকরণবৃত্তিসম্ভূত স্পন্দন, ঈক্ষণ ও আলোচনাদি বৃত্তিগুলি ব্রহ্ম অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা অধম হইয়া পড়ে। আবার ঈক্ষণ ও আলোচনাদি বৃত্তি ক্ষুদ্র বা অধম উপাধির বিষয়ীভূত হইলে বা উহাদের অবয়ব ক্ষুদ্র বা অধম হইলে সেই ক্ষুদ্র বা অধমাবয়বসম্পন্ন ঈক্ষণ বা আলোচনা বৃত্তি দ্বারা যে "বহু হইব", "অনেক হইব" প্রভৃত হইয়া জন্মিব, ইত্যাদি বিষয় উদিত হইতেছে তাহাও ক্ষুদ্র বা অধম উপাধির অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেহেতু "ঈক্ষণের" অবয়ব ক্ষুদ্র বা অধম হইলে, উহার অবয়বী ও এক জাতীয় রূপ ও গুণে তথৈবচঃ হইবে। অতএব "আমি বহু হইব" এই বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, সারভূত পদার্থ, অবিনাশী স্বভাব, সর্ব্বোত্তম পূর্ণ পরব্রহ্ম ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বহু হইব কিনা "কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিবৎ" ক্ষুদ্র বা অধম হইব। এযুক্তি উত্তম যুক্তি। কেননা এরূপ যুক্তিই ঈশ্বরত্ব লোপ করে; প্রকারান্তরে নূতন তার্কিক দলের আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু শ্রুতির অভিপ্রায় তাহা নহে। অতএব উল্লিখিত প্রাথমিক বিচারে "আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে" শ্রুতি বাক্য দ্বারা সৎপদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মের বহুত্ব সমর্থিত হয় না।

দ্বিতীয় মতে—শ্রুতি যখন আশাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার আদেশ করিয়াছেন, তখন "আশা" বস্তুটীর বিদ্যমানতা, সত্তা বা অবস্থিতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু বেদ বা শ্রুতিবাক্য সর্ব্বদা প্রতিপালনীয়। অতএব আশার বিদ্যমানতা বা সত্তা অস্বীকারের উপায় নাই। এরূপ হইলে আশার উদ্দীপনায় স্মরণশক্তির সাহায্যে "পাঞ্চভৌতিক পদার্থনিচয়" যাহা ভোগ্য হইতেছে, সেই ভোগ্য বস্তুগুলির সত্তা

বা বিদ্যমানতাও অবশ্যম্ভাবী হয়। অন্যথায় "আশা" বস্তুটী ভাব পদার্থও নহে, অভাব পদার্থও নহে, ভাবাভাব পদার্থও নহে, ভাবাভাব ব্যতিরিক্ত পদার্থও নহে; অর্থাৎ তার্কিকগণের মতে "চতুষ্কোটী বিনির্মুক্ত" কদাচ হইতে পারে না। যেহেতু ঐরূপ বস্তু বা পদার্থ হইতেই পারে না; সুতরাং তাহার উদ্দীপনা, তদ্বারা "স্মরণের" অধীন অন্তঃকরণবৃত্তি-সম্ভূত স্পন্দন, ঈক্ষণ ও আলোচনাদি কার্য্য কস্মিনকালেও সম্ভবপর নহে। অতএব সৎ পদার্থের ঈক্ষণ বৃত্তি স্বীকার করিতে হইলে, "আশার" সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কাজেই পাঞ্চভৌতিক ভোগ্য পদার্থাদির বিদ্যমানতাও অবশ্যম্ভাবী হয়।

আবার দেখিতে হইবে যে, ভোগ্য পদার্থ থাকিলেই ভোক্তা, দৃশ্য বস্তু থাকিলেই দ্রষ্টা, কার্য্য থাকিলেই কারণ, জন্য থাকিলেই জনক, হেতু থাকিলেই সাধ্য ইত্যাদির প্রসক্তিও অস্বাভাবিক নহে। অতএব ভোক্তা, দ্রষ্টা, কারণ, জনক বা সাধ্য নির্ণয় করিয়া অনবস্থার হাত এড়াইতে হইলে, অর্থাৎ ভোক্তার আবার ভোক্তা কে? বা জনকের আবার জনক কে? আবার তাহার ভোক্তা বা তাহার জনক কে? তারপর আবার তাহার ভোক্তা কে? ইত্যাদি অবস্থা ত্যাগ করিতে হইলে, শেষে জ্ঞানের তৃপ্তি ও সংশয়ের নিবৃত্তি জন্য এমন এক বস্তুর আশ্রয়ে দাড়াইতে হইবে যে, যে বস্তু সকলকে ভোগ করে, তাহাকে কেহ ভোগ করিতে পারে না; সে সকলকেই দেখে, কিন্তু ঊর্দ্ধ, মধ্য, অধঃ—কিম্বা আদি, মধ্য, অন্ত কোন দিকে, কোন স্থানে, কোনকালেই তাহাকে দেখিবার কেহ নাই; সকলেরই কারণ,- সর্ব্বকারণাধিপতিরও অধিপতি, কিন্তু তাহার কারণ বা অধিপতি কেহ নহে; সকলেরই জনক, কিন্তু তাহার জনক বা অধীশ্বর কেহ নাই; সকলেরই সাধ্য, তাহার সাধ্য কেহ নহে। অর্থাৎ সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বজনক ও সর্ব্ব-সাধ্য ইত্যাদি। সেই বস্তুর নামই সৎ পদার্থ-স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম। তাঁহারই ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হইয়াছিল যে,—"আমি বহু হইব", অতএব সেই আমি ভোক্তা, বহু ভোগ্য; আমি দ্রষ্টা, বহু দৃশ্য; আমি কারণ, বহু কার্য্য, আমি জনক, বহু জন্য; আমি সাধ্য, বহু হেতু ইত্যাদি অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল। সেই আমি (অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম) ভোক্তা হওয়ায়, "আমি" শব্দটী হইতেছে সৎপদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মবাচক। আর ভোগ্য বস্তু হওয়ায় "বহু" শব্দটী হইতেছে পাঞ্চ-ভৌতিক পদার্থবোধক, বা জগৎবাচক। অতএব দ্বিতীয় মত্তে বুঝা গেল যে, আমি বহু হইব কিনা পূর্ণ পরব্রহ্ম পাঞ্চভৌতিক জগৎ "ইত্যাকার" হইবেন।

ভাল কথা। কিন্তু উপরে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতি বাক্যের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে, আশা ও আশার উদ্দীপনায় স্মরণশক্তির সাহায্যে পাঞ্চভৌতিক ভোগ্য বস্তুর বিদ্য-মানতা,—অথবা সৎ পদার্থের ঈক্ষণ বৃত্তি স্বীকার করা হইলে "আশার" বিদ্যমানতা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব উভয়াবস্থায় যখন "আশার" বিদ্যমানতা অবারিত হইতেছে; তখন পাঞ্চভৌতিক ভোগ্য পদার্থের বিদ্য-মানতা মুখের কথায় উড়াইবার উপায় নাই,

অর্থাৎ অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে। এরূপ হইলে, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চের বিদ্যমানতা প্রতিজ্ঞাত হইলে,—সৎ পদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মকে আবার ঈক্ষণ বৃত্তি বা আলোচনা দ্বারা বহু অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক পদার্থ বা জগৎ হইতে হইবে কেন? পাঞ্চভৌতিক পদার্থ বা জগৎ-ত বিদ্যমানই রহিয়াছে। পক্ষান্তরে এই জগৎ যদ্যপি মিথ্যা বা অনিত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে অবিনাশী স্বভাব, অক্ষয়, নিত্যবস্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম মিথ্যা বা অনিত্য হইবার আলোচনা করিবেন কেন? যদ্যপি জগৎ সত্য ও নিত্য পদার্থই হয়,—তাহা হইলে তিনি ত (পূর্ণ পরব্রহ্ম) পরম সত্য ও পরম নিত্য বস্তুই আছেন; আবার তাঁহাকে নূতন ভাবে সত্য বা নিত্য হইতে হইবে কেন? যদ্যপি জগৎ সসীম বস্তুই হয়,—তাহা হইলে অনাদি, অনন্ত, অসীম বস্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম গণ্ডীবদ্ধ "খাঁচার পাখীর মত" হইবার আলোচনায় আসিবেন কেন? এইরূপ জগৎ যদ্যপি অনাদি, অনন্ত বস্তুই সাব্যস্ত হয়,—তাহা হইলে তিনি ত (পূর্ণ পরব্রহ্ম) অনাদি, অনন্তরূপেই চিরবিরাজমান; আবার সেরূপ ধরিবার জন্য তাঁহার আলোচনা কেন? আর যদ্যপি জগৎ অভাব পদার্থ মধ্যেই গণ্য হয়, তাহাহইলে তিনি (পূর্ণ পরব্রহ্ম) তদ্রূপ হইবার আলোচনা করুন। অতএব উপরোক্ত বিচারে তাঁহার (পূর্ণ পরব্রহ্মের) বহুত্ব এবং ঈক্ষণত্ব বা আলোচনাত্ব কোন মতেই সমর্থিত হয় না।

অন্য পক্ষে উল্লিখিত বিচারে পূর্ণ পরব্রহ্ম যদ্যপি সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বজনক ইত্যাদি উপাধির অধিকারী হন, আর জগৎবাচক "বহু" শব্দটী যদ্যপি ভোগ্য, দৃশ্য, কার্য্য ও জন্য বস্তু হয়; তাহা হইলে বৃক্ষ ও বীজের তুলনায়, অর্থাৎ অগ্রে বৃক্ষের উৎপত্তি, কি বীজের উৎপত্তি উদাহরণে" অগ্রে ভোক্তার উৎপত্তি, কি ভোগ্যের উৎপত্তি, অগ্রে দ্রষ্টা কি দৃশ্য, অগ্রে কারণ কি কার্য্য, অগ্রে জনক কি জন্য, ইত্যাদিতে ভোক্তার জন্য ভোগ্য, কি ভোগ্যের জন্য ভোক্তা, দ্রষ্টার জন্য দৃশ্য, কি দৃশ্যের জন্য দ্রষ্টা; কারণের জন্য কার্য্য, কি কার্য্যের জন্য কারণ; জনক উপাধির নিমিত্ত জন্য, কি জন্যের নিমিত্ত জনক নির্ণয় না হওয়ায় উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। কাজেই প্রামাণ্য নিশ্চয় নিরর্থক হইয়া "প্রমাণ" অপ্রমাণ মধ্যে গণ্য হয়। অতএব ভোক্তা, দ্রষ্টা, কারণ ও জনকভাবে পূর্ণ পরব্রহ্মকে বিশেষিত করিলে, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমজনিত আশঙ্কা অনিবার্য্য হইয়া ব্রহ্মত্ব লোপ পায়। সুতরাং জ্ঞানের তৃপ্তি ও সংশয়ের নিবৃত্তি জন্য, আবার এমন এক স্থানে দাড়াইতে হয়;—যে স্থান ভোক্তা ভোগ্য, দ্রষ্টা দৃশ্য, কারণ কার্য্য, জনক জন্য, ঈক্ষণ আলোচনা, তুমি আমি, তিনি সে, বহু অনেক, ইত্যাদি স্বর ও ব্যঞ্জনাদি লেখার অতীত। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়, অবর্ণনীয়, অতুলনীয় ও ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান। এরূপ হইলে আমি ও আমিত্ব বহু ও বহুত্ব সমস্ত লোপ পায়। কাজেই "আমি বহু হইব" বা "আমার বহুত্ব" ইত্যাদি বাক্য দূরে পলায়ন করে। তিনি (পূর্ণ পরব্রহ্ম) চির দিন যাহা আছেন, তাহাই থাকেন। অতএব "আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে"

শ্রুতি বাক্যের বিচারে কোন মতেই সৎ পদার্থের ঈক্ষণত্ব বা বহুত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

মতান্তরে অর্থোপলব্ধি বা বোধসৌকর্য্যার্থেই উল্লিখিত অনির্ব্বচনীয় ও অনুপলভ্যমান স্থানের নাম সৎপদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম রাখা হয়। এইরূপ ভাবে ঐ স্থানকে সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বজনক স্বরূপ বা আমি, তিনি, সে, এক, দুই, বহু ইত্যাদি "প্রবৃত্তি রূপ অর্থ ভাবনার দ্বারা" নিরুক্ত শব্দের নির্দ্দেশার্হ হইলে কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু কল্পিত বস্তু হইয়া সকলের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য, আমি, তিনি, এক, বহু ইত্যাদি বাক্য ও তদ্বোধক জ্ঞান সমস্তই জগতের অন্তর্ভূত হইয়া উহাদের কল্পনা-গৌরব-প্রসক্তি এক হইয়া যায়। এরূপ হইলে আমিও যে জগতের বস্তু, বহুও সেই জগতের বস্তু হইয়া উহাদের স্বাজাত্যবন্ধন এক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আমিও যেখানের যেমন বস্তু, বহুও সেখানের তেমন বস্তু হইয়া,—আমিও যাহা, আর বহুও তাহা,—বা আমার অবয়বও যাহা,—বহুর অবয়বও তাহা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং "আমি ও বহু একাবয়ব যুক্ত হইলে" আমাকে আর বহু হইতে হয় না,—বা "আমিও বহু হইব" আলোচনা নিষ্প্রয়োজনবোধে বাক্যার্থ সমর্থন করে না। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,—বহু শব্দটী বহুবচনান্ত হইলও উহাতে বহুবচন অবিবক্ষিত,—উহা এক বচনেরই বোধক। অতএব এমতেও "আমি বহু হইব" বাক্য দ্বারা আমার বহুত্ব সমর্থনীয় নহে।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে, তৃতীয় শ্রুতির শেষাংশ "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" মন্ত্র দ্বারা সৎ পদার্থ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মের বহুত্ব প্রতিপাদিত হয় না। কাজেই তাঁহার বোধক আমি, "কদাচ বহু নই"। পরন্তু আলোচ্য বিষয় (বহুত্বভাব) প্রতিপাদিত বা সমর্থিত না হওয়ায়, তজ্জন্য তাঁহার (পূর্ণ পরব্রহ্মের) ঈক্ষণ বৃত্তি বা আলোচনার উদয় কখন বাঞ্ছনীয় নহে।

পূর্ব্ববারে "তদৈক্ষত" বাক্যদ্বারা প্রকৃতির ঈক্ষণ বৃত্তি উদিত হওয়া,—বা শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করিয়া তাহার (প্রকৃতির) নিত্যত্ব ও জগৎ কারণত্ব অটুট থাকা ইত্যাদি বিষয় প্রতিপাদিত হয় না। বর্ত্তমানে পূর্ণ পরব্রহ্ম সৎ পদার্থ স্বরূপ নিত্যবস্তু হইলেও,—"বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" বাক্য দ্বারা তাঁহার বহুত্ব ও ঈক্ষণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না। এরূপাবস্থায় "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" শ্রুতি বাক্যের ব্যর্থ.শঙ্কা অবশ্যম্ভাবী হয়।

কিন্তু "ন চ বাচ্যম্,"—অর্থাৎ এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু সনাতন বেদাদি শাস্ত্রেই আশঙ্কা নিবারণের মহৌষধ আছে। বর্ত্তমানে সে সকল ঔষধ প্রয়োগ অসম্ভব;—কেননা প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সুতরাং কর্ত্তব্যানুরোধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন মীমাংসা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা জ্ঞান ও ভক্তির অভেদত্ব প্রদর্শন মানসে,—"সহায়সম্পদ্‌বিহীন" পরমাণুগুলির মিলনাকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতির আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াছি। আশা আছে প্রকৃতি নিত্যবস্তু ও সর্ব্বশক্তিমান উপাধির অধিকারী হইলেই, তাঁহার দ্বারা

পরমাণু-মিলন অবশ্যম্ভাবী হইবে। এই জন্যই প্রকৃতির মূলভিত্তি অন্বেষণার্থে শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করিতে গিয়া দেখা গেল যে;—আলোচনাধীন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও আংশিকভাবে পঞ্চম শ্রুতির আলোচনায় প্রকৃতির—নিত্যত্ব, জগৎকারণত্ব বা সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রতিপাদিত হওয়া দূরের থাকুক, বিষয় ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। তথাপি ভীত হইবার কারণ নাই;-যেহেতু এখনও আশা আছে যে, প্রকৃতির নিত্যত্ব, জগৎকারণত্ব বা সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রমাণিত হইতে পারে; এই-জন্যই—চতুর্থ শ্রুতি "পৃথিবী চ পৃথিবী মাত্রা"—ইত্যাদিনাং।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।
সন্তোষপুর, হুগলী।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী।

ঝিঁঝিট (১১) একতালা।

নমস্তে জননী সত্যসনাতনি,
চিদানন্দময়ী জগত-তারিণী।
কলুষনাশিনী পতিতপাবনি,
আনন্দদায়িনী ব্রহ্ম স্বরূপিণী॥
ব্রহ্মানি রূপে মা তুমি সৃষ্টি কর,
বৈষ্ণবী মায়াতে পালন তৎপর,
রুদ্রানির বেশে তুমি মা সংহার, সত্ব-রজস্তম ত্রিগুণধারিণী॥
ক্রিয়া শক্তিধরা সৃষ্টির কারণে,
ইচ্ছাশক্তি রূপা তুই মা পালনে,
জ্ঞান শক্তি পুন মোহ বিনাশনে, (তুমি) কৃপাপরায়ণী প্রেমদায়িনী।
তুমি কালী তারা ত্রিতাপহরা,
বরাভয়করা, ভক্ত-মনোহরা,
ষোড়শী ত্রিপুরা জয় ভবদারা, পরমা প্রকৃতি প্রণব রূপিণী।
ভুবনেশ্বরী মা ভৈরবী ছিন্নমস্তা,
তুমি. ভয়ঙ্করী ধূমাবতী রূপা,
তুমি মা বগলা মাতঙ্গী কমলা, দশমহাবিদ্যা মহেশমোহিনী।

ভকতি জ্ঞানদা অন্নদা ভবানী,
কুলকুণ্ডলিনী ঈশানী ইন্দ্রানী,
অজ্ঞাননাশিনী তুই মা কল্যাণী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদায়িনী।
সগুণেতে মাগো তুমি যে সাকারা,
নির্গুণেতে তুমি হও নিরাকারা,
বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত জগত আকারা, তোমাতে সকল (আবার) সকলি তুমি।
তোমারি তত্ত্ব মা কে পারে জানিতে,
তন্ত্র বেদাদিতে না পারে বর্ণিতে,
দর্শনে পুরাণে না মিলে সন্ধানে, সেই জানে যারে জানাও ত্রিনয়নী।
যোগেন্দ্রের সাধ হৃদয়কমলে,
পূজিবে মা পদ দিয়ে প্রেমফুলে,
আনন্দে মাতিয়ে "জয় মা" বলিয়ে মিশে যাবে তব শ্রীপদে জননী।

———:0:———

জীবের শিবত্ব লাভের উপায়।

তৎ ত্বম্ অসি—সেই তুমি এই হও।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! আপনারা আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন;—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। এই পুরুষের স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন।

"ইহাঁকে জানা ভিন্ন পরমপদ প্রাপ্তির অপর দ্বিতীয় পন্থা নাই"।

হে মর্ত্ত্যধামবাসী আত্মবিস্মৃত ভ্রাতৃগণ! তোমরা আপন স্বরূপ জান, আর না জান, আমি জানি তোমরা "ভগবানের সন্তান"। রাজার রাজা মহারাজার তোমরাই উত্তরাধিকারী। "একোহহং বহুস্যাম"—"আমি এক আছি, বহু হইব" এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভগবান্ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, শিবস্বরূপ তোমরা জীব সাজিয়া শিক্ষার জন্য জগতে আসিয়াছ ও স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তিজন্য নিয়ত সংসারচক্র পরিভ্রমন করিতেছ। পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি তোমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু ভোগ করাইয়া ও দর্শনীয় পদার্থ দেখাইয়া তোমাদিগকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইতেছেন। বিশ্বনিয়ন্তার এই

বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণ আর কর্ম্মের বিভাগানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিয়া ধর্ম্মের বর্ণ পরিচয়; অর্থাৎ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজাকরা হইতে "তত্ত্ব জ্ঞান" পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ম স্তরের অধিকারিগণ সত্ত্বগুণপ্রধান; শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ইহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন একমাত্র ধর্ম্ম। ২য় স্তরের অধিকারিগণ সত্ত্বরজঃপ্রধান; শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুত্বভাব এবং ভোগাসক্তির পরিবর্জ্জন ইহাদের প্রকৃতিজাত কর্ম্ম এবং রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও সমাজরক্ষা একমাত্র ধর্ম্ম। ৩য় স্তরের অধিকারিগণ রজস্তমঃপ্রধান; কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও দান ইহাদের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং ধনোপার্জ্জন ধর্ম্ম। ৪র্থ স্তরের অধিকারিগণ তমঃপ্রধান; অগ্রজগণের পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবাই ইহাদের ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম। ভ্রাতৃগণ! তোমরা যে যে শ্রেণীর উপযুক্ত অর্থাৎ যে যেরূপ লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, সে সেরূপ লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। স্বাভাবিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসসম্পন্ন হও এবং স্বীয় স্বভাবজাত কর্ম্মে নিরত থাক; সহজে ও সত্বরে উন্নতি লাভ করিতে পারিবা।

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

ভ্রাতৃগণ! তোমাদের আত্মায় অনন্ত জ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। তোমরা স্বধর্ম্ম পালন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে আরোহণ কর।

ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তিতে দুঃখসঙ্কুল সংসারচক্র পরিভ্রমণ পরিসমাপ্তি বা জীবের শিবত্ব লাভ"॥

১। ভাই! নিজকে অসহায়-ভাবিও না।

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

ভাই তুমি আত্মবিস্মৃত। "কে তুমি"? একবা চিন্তাকর। তৎ ত্বম্ অসি—সেই তুমি এই হও। তোমার আত্মায় অনন্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে। তুমি শিবস্বরূপ! স্বইচ্ছায় জীবসাজিয়া জগতে অভিনয় করিতে আসিয়াছ। তোমার জগৎ তুমি নিজ কর্ম্মদ্বারা নিজেই রচনা করিয়াছ ও করিতেছ। তোমার সাধের সংসার-অভিনয় তুমি নিজে না ভাঙ্গিলে অপর কেহ তাহা ভাঙ্গিতে পারে না। তুমি গুটী পোকার ন্যায় স্বকর্ম্মগঠিত জালে আবদ্ধ রহিয়াছ এবং জ্ঞানান্ধ বলিয়া মুক্তির জন্য অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ক্রন্দন করিতেছ। ভাই তুমি নিজে মুক্ত না হইলে অপর কাহারও তোমাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ভগবানের সন্তান। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ হও এবং কর্ম্মজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হও এবং শিবত্ব লাভ কর।

২। কাহার ধনে লোভ করিও না।

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

ভাই ! তুমি ভগবানের সন্তান ! তুমি যাহা কামনা করিবে তাহাই হইবে। এজন্মে পূর্ব্ব জন্মের বাসনার অনুরূপ শরীর পাইয়াছ। পরজন্মে এ জন্মের কামনানুযায়ী দেহ ধারণ করিবে। তুমি নিজেই নিজের অদৃষ্টের নির্ম্মাতা। তোমার সুখ দুঃখের জন্য তুমি নিজেই দায়ী। সকলকেই কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্মনা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মনা। জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মাণোবশাৎ।

৩। কখনও ঋণগ্রহণ করিও না।

যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥

ভাই ! তুমি ভগবানের সন্তান ! প্রেমময় পিতা যখন তোমাকে যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিও। তুমি অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন কর। তোমার কিসের অভাব ? তোমার কি প্রয়োজন, সে বিষয় কি ভগবান অবগত নন ? শিশু সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ দিবার কথা কি মাকে বলিয়া দিতে হয় ? প্রেমময় পিতার আদেশে পরমা হিতৈষিণী ধাত্রী প্রকৃতি অহর্নিশি তোমার অভাব মোচনের জন্য নিযুক্ত আছেন। যাহা ব্যতীত তুমি বাঁচিতেই পার না, তাহাই তোমার প্রকৃত অভাব। বিলাসিতার দরুণ কাল্পনিক অভাব সৃষ্টি করিয়া অযথা ঋণগ্রস্থ হইয়া পিতার নিকট অপরাধী হইও না।

৪। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিও না।

ন প্রজয়া ধনেন ন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব-মানশুঃ ॥

অমৃতত্ব লাভের উপায় পুত্র নয়, বিত্ত নয়, যজ্ঞ নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়। পিত্রালয়ে অবস্থিত পতিব্রতা রমণীর ন্যায় সংসারে অবস্থান কর। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন কর। সদাচার ও সদালাপ তোমার অঙ্গের ভূষণ হউক। সতীনারী পতির সহিত মিলনের জন্য যেরূপ ভাবে পিত্রালয় পরিত্যাগ করে, তুমিও প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য সেরূপভাবে সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও। যদ্ হরেব বিরজেৎ তদ হরেব প্রব্রজেৎ।

৫। ভিক্ষুকজ্ঞানে অবহেলার সহিত কাহাকেও ভিক্ষা দিওনা।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥

সকল প্রাণীকে বহুমান সহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে। কারণ তাহাদের মধ্যে ভগবান্ জীবভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক নর নারীর মধ্যে ভগবানের সজীব রূপ উপলব্ধি কর। কৃপার দ্বারা নয়—শিক্ষার দ্বারা, সংযমের দ্বারা ও সম্ভ্রমের দ্বারা জীবের সুপ্ত আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর। কর্ত্তব্যবোধে, আত্মীয় জ্ঞানে, শ্রদ্ধার সহিত প্রকৃত অভাব-গ্রস্থ জনের অভাব মোচনের জন্য যত্নবান হও। ভগবান তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ ও পরীক্ষার জন্যই নানাবেশে দর্শন দিয়া থাকেন। মানবকে সাহায্যরূপ ঈশ্বরো-পাসনা করিতে পাওয়া কি তোমার মহা সৌভাগের বিষয় নয় ? পিতামাতার সেবা করিয়া সন্তান যেমন মনে করে না আমি পিতা মাতার উপকার করিলাম, সেইরূপ নররূপী নারায়ণের সেবা করিয়া তুমি তাহার উপকার করিলে মনে এরূপ ধারণা রাখিও না।

শ্রদ্ধার সহিত জীবের সেবা করিলে নিজেরই কল্যাণ সাধন করা হয়।

৬। ভাই তুমি তোমার প্রেমময় পিতার অর্চ্চনার ভার অপরের উপর অর্পণ করিও না।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

বিশ্বনাথকে সেবা পূজা ও ভক্তি করিবার সকলেরই অধিকার আছে। ভাই তুমি তোমার নিজ বাটীতে "বিশ্বনাথের পূজার মন্দির" নির্ম্মাণ করিয়া তোমার প্রকৃতিগত অভিরুচি অনুসারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দ্বারা প্রত্যহ "প্রেমময় পিতার পূজা কর।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

৭। উপবাস বা বনবাস দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না।

আত্মানং পরম বেত্তি যোগযুক্তং সমাধিনা।
যুক্তাহার বিহারস্থ যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

পরিমিত আহারবিহারসম্পন্ন ও নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মে তৎপর যোগী ব্যক্তিই সমাধি যোগদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। সন্তানের উপবাসে অথবা বনবাসে পিতার পরিতোষ জন্মে না। রসো বৈ সঃ— তিনি রস স্বরূপ। পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভাইবন্ধু, অথবা স্বামী, যেভাবে ইচ্ছা প্রেমময়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ভালবাস ও অকপটে প্রাণের কথা নিবেদন কর। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। ইষ্ট মন্ত্র উচ্চারণে হৃদয়ে যদি ভাব না খেলে ও আনন্দ না জন্মে তবে তোতার ন্যায় শুধু মন্ত্র জপে কি ফল ফলিবে? সখ্যেরিরাধয়—সখ্যদ্বারা সেই পরম পুরুষকে ভজনা কর। ভগবান প্রেমাধীন। ভাই! তুমি তোমার জীবনের সকল ভার তাঁহার উপর অর্পণ কর এবং অন্তর্নিহিত প্রেমশক্তি বিকাশের জন্য প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞ কর।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবো বলি ভৌতো নৃযজ্ঞ অতিথিপূজনং॥

যদি তুমি নিজ হৃদয়ে ও জীবিত প্রাণিগণের মধ্যে "দীনবন্ধুকে" দেখিতে না পাও, তবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও তাঁহাকে খুজিয়া পাইবে না।

৮। তীব্র ব্যাকুলতা ও ভালবাসা ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হয় না।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়। তুমি যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন মনুষ্যরূপেই তোমাকে ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি—জীব ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হন। ভাই ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং তোমাকে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। যাঁহার প্রতি তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মে, তাঁহাকেই তোমার জীবনের আদর্শ ও বিশেষ উপাস্য স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরপ্রতীকজ্ঞানে অর্চ্চনা কর। এই জন্মেই ভগবানকে লাভ করিব এইরূপ দৃঢ় আশা ও বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

৯। জনক জননীকে ঈশ্বর-প্রতীক-জ্ঞানে প্রত্যহ পূজাকর ও বিশ্ব-বাসীকে ভ্রাতৃভাবে দর্শন কর।

ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাং তপঃ॥

ভাই সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে এক অন্তরাত্মা রহিয়াছেন। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। কাহারও প্রীতির জন্য কেহ কাহার প্রিয় হয় না, কেবল আপনার প্রয়োজন অর্থাৎ আত্মার প্রীতির জন্যই পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইয়া থাকে। যত্রমনো যাতি তত্র তত্র পরং পদং। ভাল-বাসার পাত্রকে অর্থাৎ সন্তান জননীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে ঈশ্বর-প্রতীক-জ্ঞানে সেবা, পূজা ও ভক্তি করিলে সহজে ঈশ্বর দর্শন ঘটিয়া থাকে।

১০। ভগবৎ কৃপার উপর নির্ভর কর।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম॥

সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও মৎ-পরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। ভাই প্রাণ খুলিয়া মা দয়াময়ী, মা প্রেমময়ী বলিয়া ডাকিতে থাক, কাঁদিতে থাক, অজ্ঞান সন্তান কাতরস্বরে মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে জননী কতক্ষণ তাহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারেন? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। যাঁহাকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারেন না, সেই স্বপ্রকাশ ভগ-বানকে তাঁহার করুণা ভিন্ন বিদ্যাবুদ্ধি, জপ তপ, যোগ যাগ, তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা লাভ করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্॥

ওঁ শান্তিরেব শান্তি ওম্॥

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

———:0:———

আত্মোপদেশ।

[লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল্, মহাশয় আমাদের পরিচিত। তিনি যুক্ত-প্রদেশের বান্দা জেলার সরকারী উকিল ছিলেন, অল্প বয়সেই তাহা ছাড়িয়া ৺কাশীধামে নিজবাটীতে বসিয়া অধ্যাত্মচর্চ্চা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে লিখিত বিষয়গুলি তাঁহারই সুধ্যানের ফল। প্রবাসী লেখকের হিন্দুশাস্ত্র অনুশীলনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল না, সুতরাং ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলিরই আলোচনা হয় নাই,—লেখকের শুদ্ধ চিত্তের সুচিন্তিত তত্ত্ব সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে ইহা যে কখন পুস্তক বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না; নিজের জন্যই লিখিয়া রাখিতেন মাত্র। গৃহস্থ নিত্য-ভোজন ব্যাপার অবস্থানুরূপ সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন করেন, কিন্তু কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতে হইলে

বিশেষভাবে স্তোত্রের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধোক্ত বিষয়ও লেখকের নিত্য আহার্য্য—নিজের জন্যই তাঁহার আয়োজন, তাই চলতি কথায় লিখিত;—কিন্তু কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা বর্জ্জিত, এবং স্বভাবের মধুরতা ও সত্যের পবিত্রতা মণ্ডিত। লিখিত বিষয়গুলির অধিকাংশই মর্ম্মস্পর্শী;—আমরা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাই "আর্য্য-দর্পণের" ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকগণের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল। আশা আছে, সাধুজন মাত্রেরই ইহা হৃদয় স্পর্শ করিবে। সঃ আঃ দঃ]

(১)

মহামায়া—শাম্ভবী শক্তি।

যে শক্তির দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়, সত্য মিথ্যাবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং মিথ্যা সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, যদ্বারা এক অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্ম, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব রূপে অথবা জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তিনিই পরমাত্মার শাম্ভবী শক্তি বা মহামায়া॥

বিবর্ত্তই হউক, আর পরিণামই হউক নিরাকার, নির্ব্বিকার অবস্থা হইতে, ক্ষিত্যাদি স্থূলরূপে (অনুভব পথে) উপস্থিত হওয়া ক্রিয়ার (ইচ্ছার) ক্রম যোগেই হয়॥

এই মহামায়া ভগবতীকে কেহই চেনে না, তাঁহার ক্ষমতাকে কেহই ইয়ত্তা করিতে পারে না। তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর; কখন কোথায়, কি কারণে, কোন বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন করিবেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই দেবী অনন্ত সংস্কারবতী। পরন্তু তিনি সংস্কারগুলি গোপনে রাখেন। এই বিশ্ব-সংসারে যত সংখ্যক ও যত প্রকার ইচ্ছা উদিত হয়, সকলই সেই দেবীর ইচ্ছাভাণ্ডার বা সংস্কার-ভাণ্ডার হইতে আসে।

অভ্যাস।

এই জগৎ অভ্যাসবশতঃ দৃশ্য হয়। আমরা যদি অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় সেই অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্মের ধ্যান করি, তাহা হইলে উহাই আবার প্রত্যক্ষ হয়, এবং জগৎ অলক্ষ্য হইয়া যায়।

ভয়, ক্রোধ, কাম, লোভ, হিংসাদি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই চিত্তে সতত উদয় হয়—যদি পূর্ব্বাভ্যাস না থাকে, এ তরঙ্গগুলি কখনই উদয় হয় না।

তুমি পূর্ব্বে ভয় করিয়াছ বলিয়াই এখনও ভীত হও।

তুমি যদি চৈতন্যের ধ্যান অভ্যাস কর, তাহাহইলে সব তরঙ্গগুলি অভ্যাস বিহনে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, আর উঠিবে না।

তুমি চিত্ত ও চৈতন্যের পার্থক্য সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, কদাপি বিস্মৃত হইও না।

জীবের আসল সত্ত্বা বা সারই চিদ্‌বস্তু, উহা সদাই স্থির, আনন্দময়, নির্ভীক, অমর, পরন্তু উহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে।

যাহা দৃশ্য, উহা চিত্তজনিত, পরিণামী, উহা অসার, উহার উপর নির্ভর করিও না।

ভক্তি।

তুমি চিন্ময়ী দেবীকে সততই ভক্তি করিতে অভ্যাস কর আপন, পর ভেদ করিও না; পরন্তু সতত পরিবর্ত্তনশীল দেহরূপ পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য রাখিও না, যাহার দেহই হউক না কেন, এবং যেরূপ দেহই হউক না কেন, তাহা না করিলে ভক্তি কখনই দৃঢ় হইবে না এবং মুখের কথায় অভ্যাস যাইবে না। তুমি চিন্ময় তত্ত্বকেই ভক্তি ও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ কর। বহির্দৃশ্যকে বিশ্বাস করিও

না, নিজের অন্তরে বিশ্বাস কর। তোমার অন্তরাত্মাই বিশ্বাসের পাত্র। তিনি অদৃশ্য হইলেও আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন; পরন্তু দেহাদি দৃশ্য হইলেও থাকিবে না।

অভ্যাসের পরিবর্ত্তন ।

অভ্যাসের পরিবর্ত্তন বড়ই আবশ্যক হইয়াছে, নহিলে পূর্ব্ব সংস্কারগুলি কিছুতেই ক্ষয় হইবে না এবং কিছুতেই সত্য প্রত্যক্ষ হইবে না।

উদ্ভূত ।

তুমি উদ্ভূত মূর্ত্ত্যাদি বা দৃশ্যাদির দ্বারা স্তম্ভিতজ্ঞান না হইয়া সেই হৃদস্তরস্থিত, পরাৎপর, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, ইচ্ছাময়ী, যিনি নিরাকার হইয়াও বিশ্ব উদ্ভব করেন, তাহার আরাধনা কর। তুমি নিরাকারা চিৎ বস্তুকেই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে, ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে ও ধ্যানকরিতে শিখ॥

উপায় ।

যখন পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ সংযোগ বিয়োগ সন্ধিস্থলে (ত্রিগুণের উদয়াস্ত সন্ধি) অনবধানতাপ্রযুক্ত, ভয়, কাম, ক্রোধাদি বা দুঃশ্চিন্তার তরঙ্গ, পরিলক্ষিত হয়, তখন ব্রহ্মময়ীর ধ্যানে, চিত্তকে লয় করিতে চেষ্টা করিবে; এবং আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় নিঃশঙ্ক ও সুরক্ষিত বিবেচনা করিবে।

অভ্যাস-স্বরূপ ।

মনুষ্যেরা আত্মশক্তিকে, যেরূপভাবে পরিচালিত করে বা ক্রিয়া করিতে শিখায়, শক্তি তত্তৎ স্পন্দনগুলিতে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া, তৎস্বভাববতী হয়। কারণ শক্তি পরতন্ত্র এবং পুরুষার্থসাধন বা পুরুষের অভিলাষ পূরণ ভিন্ন উহার অপর কোন কার্য্যই নাই।

(২) সুতরাং যে ব্যক্তি যে কর্ম্মপ্রিয় বোধ করিয়া সাধন দ্বারা একবার নিষ্পন্ন করে সেই কর্ম্ম সূক্ষ্মভাবে পুনঃ পুনঃ আবার স্মৃতিতে উদিত হইতে চেষ্টা করে।

(৩) তুমি মনকে যাহা চিন্তা করিতে শিখাইবে, মন তাহাই চিন্তা করিবে; যে আচরণ শিখাইবে, মন সেই আচরণ শিখিবে পরন্তু যাহা শিখাইবে না, তাহা কখনই শিখিবে না।

শুভাশুভফল ।

যাহা "আরম্ভ" উহার পরিপুষ্ট অবস্থাই "ফল"। শুভারম্ভেই শুভফল ফলে। আরম্ভে দোষ থাকিলে ফল দুষ্ট হয়। আরম্ভই বীজ এবং এই বীজাভ্যন্তরস্থ গুণই ক্রিয়ার ক্রমযোগে পরিপুষ্টরূপ ধারণ করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই আরম্ভ। এই আরম্ভ হইতে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, উহাই ধারণা বা ভাবনা; যাদৃশী ভাবনা যস্যসির্দ্ধিভবতি তাদৃশী॥ আরম্ভফলেই পরিণাম সিদ্ধি। যাহারা মহাযোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা আরম্ভ ও পরিণামের মধ্য কোন কাল বা বিঘ্নাদির ব্যবধান দেখিতে পান না। যে আরম্ভে ব্রহ্মতেজ পূর্ণভাবে বিরাজিত, সেখানে সিদ্ধি অব্যর্থ এবং অদৃশ্য হইলেও প্রত্যক্ষ। আরম্ভের মূর্ত্তি দেখিলেই, পরিণামের মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাড়ায়। ফল কথা উহার হাতেই পরিণাম।

মন ।

মন কিয়ৎকাল বহির্ম্মুখ হইয়া, সংসার

বা চিত্তত্ব ভোগ করে এবং উহাতে বিরাগ হইলে অন্তর্মুখ হইয়া, চিত্ত লয় করিয়া কৈবল্য বা পরমপদে প্রবিষ্ট হয়। মন কখন চিত্তত্ব এবং কখন কৈবল্য ভোগ করে।

সুখ কাহাকে বলে।

সর্ব্বজ্ঞতা* বা সর্ব্বসন্দেহের অবসানই প্রকৃত সুখ। প্রকৃতি ও পুরুষ বা স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি। চাঞ্চল্যই যে শক্তির স্বভাব, সেই শক্তিকেই স্ত্রীশক্তি বা প্রকৃতি বলা হয়। পুংশক্তি নিয়তই অচঞ্চল ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:0:—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

উখী মঠ।

শীতের ছয়মাস শ্রীকেদারনাথের পূজা ভোগ ও আরতি এই উখীমঠেই হইয়া থাকে। এখানে কেদারনাথের মোহান্তের প্রসিদ্ধ গদি আছে। মোহান্তকে রাওল সাহেব কহে। বাড়ীটী বেশ চকমিলান। দরজাতেই ডাকঘর। বাটীর মধ্যে অনেক ঘর ও দেবালয় আছে। তন্মধ্যে কেদারনাথের মন্দির খুব বৃহৎ। এই মন্দিরের সম্মুখভাগে কেদারনাথ, বদরীনাথ, প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। পার্শ্বভাগে ও দালানে দ্রৌপদী, কুন্তী ও ভীমার্জ্জুনাদির অনেকের মূর্ত্তি আছে। বৃহৎ মন্দিরের মধ্যে ওঁকারনাথ আছেন। তাঁহার রৌপ্য নির্ম্মিত পঞ্চমুখ। শ্বেত প্রস্তরের পিনেট পার্শ্বে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা শিবের ধ্যানে মগ্ন। দেবতার সিংহাসন, সাজসজ্জা সকলই সুন্দর কারুকার্য্যময়। অন্য প্রকোষ্ঠে কেদারনাথের গদি আছে। এই স্থানে পঞ্চানন মহাদেবের অধিষ্ঠান, তাঁহার তিনিমুখ রজতময় ও দুইটী স্বর্ণময়। কেদারনাথের ৬ মাসের পূজা ঐ পঞ্চাননের নিকটই হইয়া থাকে, এখানে যাত্রীদিগকে নাম লিখাইয়া ভেট দিতে হয়। আমরাও দিলাম। ইহার পর্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখাদি উষার সহচরিগণ এবং কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। উখীমঠ স্থানটী বেশ গুলজার। এখানে সকল দ্রব্যই মিলে। ডাকঘর, থানা, হাসপাতাল, ছাপাখানা, কিছুরই অভাব নাই।

ইহার নিকটেই শোণিতপুর; বাণরাজার রাজধানী। বাণাসুর প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ও বিখ্যাত শিবভক্ত ছিলেন। তদীয় কন্যা উষাও এই স্থানে মহাদেবের উপাসনা করিতেন। উষার নামানুসারে, তাহার এই তপস্যা স্থানের নাম উষী বা "উখী" মঠ হইয়াছে। মূর্দ্ধণ্য "ষ" কারের "খ" য়ের উচ্চারণ ভারতের অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ উক্ত বাণরাজার কন্যা উষা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া এই রাজপুরীতে আসিয়া গন্ধর্ব্ববিধানে তাহাকে বিবাহ করেন; ইহা পুরাণ প্রসিদ্ধ। ঐ সকল ঘটনার নিদর্শন স্বরূপ এই মঠে উষা, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণাদির প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

৯ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। প্রভাতে আমরা দরাচটী হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ১২ টার সময় পোখীবাসা চটীতে উপস্থিত হইলাম এবং কিছু ফলমূল ভক্ষণ করিয়া মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিলাম। তথা হইতে চোপাতা চটীতে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে তুঙ্গনাথ দর্শনকরিতে যাইতে হয়। কোন কারণ বশতঃ আমাদের তুঙ্গনাথ যাওয়া হইল না। আমরা তথা হইতে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম এবং বেলা ১২॥ টার সময় জঙ্গল চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় অহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রি বিশ্রাম করিলাম।

তুঙ্গনাথ।

উত্তরাখণ্ডে পঞ্চ কেদার আছেন। তুঙ্গনাথ তাঁহার অন্যতম। ১ম কেদারনাথ, ২য় মদমহেশ্বর বা মধ্যমেশ্বর, ৩য় তুঙ্গনাথ, ৪র্থ রুদ্রনাথ, ৫ম কুলেশ্বর।

রুদ্রনাথ লালগঙ্গায় পছিবার ৮৷৯ মাইল পূর্ব্বে এক ফাড়ি রাস্তায় ১০৷১২ মাইল যাইতে হয়।

কুলেশ্বর, লালগঙ্গা ও বদরীনারায়ণের প্রায় অর্দ্ধপথে স্থিত। কুমারচটী হইতে ফাড়িপথে ৩৷৪ মাইল যাইতে হয়। তুঙ্গনাথ পঁহুছিলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ সকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত ও তদূর্দ্ধে কেবল নীলাকাশ আর কিছুই দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় না। সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুঙ্গনাথের মন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরের অনতিদূরে আকাশ গঙ্গা। এই গঙ্গাজলে যাত্রীরা সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকেন। তুঙ্গনাথের মন্দিরের ভিতর তুঙ্গনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি ভিন্ন পার্ব্বতী, গণেশ, ভৈরব প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্যেরও মূর্ত্তি আছে।

১০ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—অদ্য প্রভাতে জঙ্গল-চটী হইতে রওনা হইয়া ক্রমান্বয়ে পথ চলিয়া বেলা ১১টার সময় গোপেশ্বর চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় মধ্যাহ্ন আহারাদি সমাধা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে বেলা ২টার সময় মান্ধাতা রাজার স্থাপিত ৺ গোপেশ্বর মহাদেব, পার্ব্বতী-মায়ী, অন্যান্য দেবতা ও মান্ধাতা রাজার গদী দর্শন করিয়া লইলাম। পথিমধ্যে পালশাঙ্গা হইয়া সন্ধ্যায় মঠ-চটীতে পহুছিয়া তথায় বিশ্রাম করিলাম।

১১ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।—অদ্য ভোর ৬ টার সময় মঠচটী হইতে রওনা হইয়া বেলা ১১ টার সময় পিপল চটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক দোকানদারের বাসায় আশ্রয় লইয়া মধ্যাহ্ন আহারাদি সমাধা করা গেল। এখানকার বাজার বেশ গুলজার। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রায় সমস্তই মিলে। এখানে উৎকৃষ্ট চামর যথেষ্ট পাওয়া যায়। চামর সেরদরে বিক্রয় হয়। প্রতি সেরের মূল্য ৬।৭ টাকা। পর্ব্বতোৎপন্ন শিলাজতু এখানে সুপ্রাপ্য। পিত্তলের থালা, যাহা গরুড়গঙ্গায় উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা এখানে পাওয়া যায়। বদরীনাথকে দিবার জন্য ফলমূল এখানেই সংগ্রহ করিতে হয়। এখানে একটী ডাকঘর আছে। এখানে ঝরণা ও বিস্তৃত ময়দান আছে। আমরা বেলা দুইটার সময় পিপলচটী হইতে রওনা হইলাম। কিছু দূর আসার পর অত্যন্ত

বৃষ্টি ও বরফ প'ড়িতে লাগিল। মধ্যে এক-স্থানে পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া অনেকস্থান যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিল। এমত অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কাজেই সকলে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময়ে একজন সাধু অপর দিক হইতে আসিলেন ও আমাদিগকে সাহস প্রদান করিলেন। আমরা তাঁহার কথামতে সাহসে নির্ভর করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে চলিতে লাগিলাম। প্রথমেই তৃণ লতা বৃক্ষাদিশূন্য রথচুড়ার ন্যায় ক্রমসূক্ষ্ম ও অতি উচ্চ কয়েকটী পর্ব্বত দৃষ্টিপথে পতিত হইল। স্থানে স্থানে পথের নিকটবর্ত্তী গভীর খাদে অলকনন্দা প্রবাহিত দেখিতে পাইলাম। এইরূপে পিপলচটী হইতে অতিকষ্টে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা গরুড়গঙ্গা নামক চটীতে উপনীত হইলাম। তথায় একটী দোকানে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

গরুড় গঙ্গা।

১২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।—অদ্য প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া গরুড়গঙ্গায় স্নানতর্পণাদি করিলাম। তৎপরে উপরে আসিয়া গরুড় মহারাজের পূজা ভোগ ইত্যাদি দেওয়া হইল। তথাকার পাণ্ডাজীকে থালা সহিত পেড়া দেওয়া হইল। ঘাটের উপর একটী ছোট মন্দিরে গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। গরুড়গঙ্গায় স্নানের সময় গঙ্গার মধ্য হইতে কয়েক খানি প্রস্তরখণ্ড পাণ্ডা বালকের দ্বারা উঠাইয়া লইলাম। কারণ, শাস্ত্রে আছে, উক্ত পাথর ঘরে থাকিলে সর্পভয় থাকে না, এমন কি সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঐ প্রস্তর ঘসিয়া জল পান করাইলে বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

পক্ষিরাজ গরুড়, ভগবানের বাহন হইবার নিমিত্ত এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এখানকার নদীর নাম গরুড়গঙ্গা। ভীষণ পার্ব্বত্য পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেবদর্শন করিতে হইলে গরুড়ের তুল্য বেগবলেরই প্রয়োজন; তাই, যাত্রীরা যে পর্য্যন্ত গরুড়চটীতে উপনীত না হন, প্রত্যহ গরুড়ের পূজা ও ভোগ দিয়া থাকেন। আমরাও প্রত্যহ দিতাম। গরুড়গঙ্গার চটী খুব ছোট, অথচ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। অতিকষ্টে আমাদের স্থান সঙ্কুলান হইল। এইরূপ কষ্টের মধ্যে আবার রাত্রিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হাত পা সঙ্কুচিত করিয়া কোনরূপে উদ্বিগ্ন অবস্থায় প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক উৎসব—গত ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার অত্র সারস্বতমঠান্তর্গত "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের" ৫ম বার্ষিক উৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বপ্নাদেশে মায়ের পূজা—কলিকাতা হইতে শ্রীযুত অমূল্য চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—৺বিশ্বনাথ রক্ষিতের বাসস্থান ১২৩নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। বহুদিন হইল

তিনি একমাত্র কন্যা কুসুমকুমারী দাসীকে বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। উক্ত কুসুমকুমারী ২২ বৎসরে বিধবা হন, এখন তাহার বয়স ৫০ বৎসর। তাহার স্বামীর পরলোক গমনের পরবর্ত্তী বর্ষে তিনি মা জগজ্জননী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দুর্গাপূজা করেন এবং শ্যামাপূজার পূর্ব্বে পুনরায় শ্যামা-পূজা করিতে ও ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হন। ঐ শ্যামামূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান এবং নিত্য পূজা হইতেছে। শ্যামামূর্ত্তি স্থাপিত থাকায় পরবর্ত্তী বৎসর দুর্গাপূজার কোন আয়োজন উদ্যোগ না করায় পুনরায় এই আদেশ হইয়াছিল যে, পূজার তিনদিন মা দশভুজারূপে অধিষ্ঠিতা থাকিবেন; কাজেই আদেশানুসারে যথারিতী পূজা সম্পন্ন হইল। এবার অষ্টমী পূজার দিন অতি প্রত্যুষে এই স্বপ্নাদেশ হইল যে "এবার প্রতিমা বিসর্জ্জন না করিয়া সম্বৎসর রাখিয়া পূজা কর। উক্ত ভক্তিমতী বিধবা গুরু-পুরোহিতের নিষেধ সত্ত্বেও কেবল মার আদেশের উপর নির্ভর করিয়া এখনও পূজা করিতেছেন!!

গবর্ণমেণ্টের দান—যোরহাট রিলিফ কমিটীর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নিরন্ন কৃষক-বর্গের সহায়াকল্পে সদাশয় আসাম গবর্ণমেণ্ট যোরহাট সর্ব্বজ্ঞানিক সভার সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত কুলধর চলিহা মহাশয়ের হস্তে ২০০৲ দুইশত টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

—:0:—

যোরহাট রিলিফ কমিটীর কার্য্য বিবরণী।

আয়।

(১) যোরহাট সর্ব্বজ্ঞানিক সভার পক্ষ হইতে ৩৫৪৴১০

আসাম সারস্বত মঠের পক্ষ হইতে ২৪৬৷০

৫৯০৷৴১০

ব্যয় ৫৯০৷৴১০

ব্যয়।

কার্ত্তিক মাসের ১ম ও ২য় সপ্তাহে থাটোয়াল কেন্দ্রে বিতরিত ২৯৷৬৷৷ সের চাউলের দাম ও গাড়ী ভাড়া ১৯৩৮৴৫

৩য় সপ্তাহে বিতরিত ২০৴১৮ সের চাউলের দাম ও গাড়ীভাড়া ১২৩৴১০

৪র্থ সপ্তাহে বিতরিত ২০৴ মণ চাউলের মূল্য ও গাড়ীভাড়া ১২৩৮০

৫ম সপ্তাহে বিতরিত ২৪৷৭৷ সের চাউলের মূল্য ও গাড়ীভাড়া ১৪৬৴৫

হাতে জমা—৩৲১০

(২) মোট চাউল ৯৩৮৭৷৷, মোট টাকা ৫৯০৷৴১০

(১) দাতাগণের নাম কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ৭৷৷৩ সের চাউল বিনা টিকেটে বিতরণ করা হইয়াছে।

বিস্তৃত বিবরণ।

সপ্তাহ	গ্রামের সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	মোট
১ম সপ্তাহ	৬	৫৮	৭৫	৮৭	১৬৪	৩২৬
২য় সপ্তাহ	৯	১০০	১২৭	১৪০	২৭৬	৫৪৩
৩য় সপ্তাহ	১২	১১৮	১৪৪	১৬২	৩২২	৬২৮
৪র্থ সপ্তাহ	১২	১১৮	১৪৪	১৬২	৩২২	৬২৮
৫ম সপ্তাহ	১২	১১৯	১৪৫	১৬৩	৩২৫	৬৩৩

গ্রামের নাম—খাটোয়ালগাও, কামারগাও, ডুলিয়াগাও, মরিয়াগাও, মুসলমানগাও, সোণারিগাও, কুকুরাচুয়াগাও, বনগাও, খারীগাও, কুমারগাও, (জাজীমুখ) করঙ্গিয়ালগাও, কাহারগাও।

শ্রীকুলধর চলিহা।
সেক্রেটরী।

স্বামী স্বরূপানন্দ,
শ্রীরাসরাম ভূঞা।
পরিদর্শক ও বিতরণকারী।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বতমালা মধ্যদেশে নিম্ন ভূমি দিয়া ক্ষীণকায়া গরুড়গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া অলকনন্দায় মিলিত হইয়াছে। সেই গরুড়গঙ্গার পার্শ্বে উচ্চে ও নীচে ২।৩ খানি মাত্র দোকান। আমরা গরুড়গঙ্গায় স্নান ও তর্পণাদি সমাধা করিয়া গরুড় মহারাজের পূজা দিয়া রওনা হইলাম। বেলা ১২টার সময় কুমারচটীতে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্ন আহারাদি সমাধা করিয়া বিশ্রাম করিলাম। আবার কুমারচটী হইতে রওনা হইয়া ৪ মাইল দূরে পাতালগঙ্গা ও আরও দুই মাইল দূরে গোলাপচটী পাইলাম। এই চটীর নিকটে এক মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে নারায়ণ আছেন। ইহার পর ক্রমেই চড়াই। একস্থানে চড়াই এত উচ্চ যে, সেস্থান দিয়া গমনকালে নিম্নের দিকে তাকাইলে মস্তক বিঘুর্ণিত হয়, আর হৃদ্‌কম্প হইতে থাকে। কুমারচটী হইতে একটী রাস্তা বাঁ দিক দিয়া গিয়া অলকনন্দার তীরে পঁহুছিয়াছে। এই স্থানে অলকনন্দা পার হইবার জন্য এক ঝোলা আছে। অলকনন্দা পার হইয়া অন্য পাহাড়ে উঠিতে হয়; তথায় নিবিড় দেবদারু বন মধ্যে পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর মহাদেব আছেন। আবার কুমারচটী হইতে ২ মাইল রাস্তা গমন করিলে পেনী বা গণোটী চটী পাওয়া যায়, তাহার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাস্তা দিয়া গমন করিলে পঞ্চবদরীর অন্যতম বদরীতে উপস্থিত হওয়া যায়। পঞ্চ কেদারের ন্যায় বদরীনাথও পাঁচটী আছেন। ১ম স্বয়ং বদরীনাথ বা শুদ্ধ বদরী; ২য় পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরী; ৩য়, যোশীমঠে নৃসিংহ বদরী; ৪র্থ বদরী কুমারচটীর নিকট দিয়া যাইতে হয়, তাহা এই মাত্র উক্ত হইল। ৫ম আদি বদরী; কেহ বলেন ভবিষ্য বদরী। আদি বদরী

মোহন চৌরীর পথে, কর্ণপ্রয়াগ হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ভবিষ্যবদরী যোশীমঠ হইতে নীতিপাশের পথে ৮ মাইল যাইতে হয়। কলির প্রভাবে ও পাপের প্রাবল্যে যখন নর ও নারায়ণ নামক অলকনন্দার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতদ্বয় সংলগ্ন হইবে ও বর্ত্তমান বদরীনারায়ণের পথ রুদ্ধ হইবে, তখন ঐ ভবিষ্য বদরীতেই বদরীনারায়ণের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইবে।

আমরা কুমারচটী হইতে বৈকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম। নৃসিংহদেবের মন্দিরের নিকটেই একটী দোতালা দোকানঘরে আশ্রয় লইলাম। সন্ধ্যার পর আমরা নৃসিংহদেব ও অন্যান্য দেবতা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। পরে বাসায় পঁহুছিয়া রাত্রির মত, বিশ্রাম করিলাম।

যোশী মঠ।

যোশীমঠ ভারতের প্রসিদ্ধ মঠ সমূহের অন্যতম। এ স্থান বদরীনারায়ণের মোহান্ত রাউল সাহেবের বাসস্থান। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মারম্ভে এখান হইতে তিনি উক্ত নরায়ণক্ষেত্রে গমন করেন। আবার শীতের পরাক্রমসহ তুষার পাতের প্রারম্ভে যখন উক্ত পুণ্যক্ষেত্র মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া উঠে, নারায়ণ মন্দির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন রাওল সাহেব নারায়ণের পূজক, পরিচারক ও কর্ম্মচারিবর্গসহ এই যোশীমঠে আগমন করিয়া থাকেন। শীতের ঐ কয়েকমাস তাঁহাদেরই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় এই যোশীমঠে অধিষ্ঠিত ৺ নৃসিংহদেবের নিকটই বদরীনারায়ণের পূজা যথারীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ততঃ ক্রোশদ্বয়ে পুণ্যং জ্যোতি ধাম শুভপ্রদং।
নৃসিংহরূপী ভগবান যত্রাস্তি মুক্তিদায়ক॥

টিহরী-নরপতির নিয়োগানুসারে রাওল সাহেবের উপর এই সমস্ত পূজা ভোগাদির ব্যবস্থার ও দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আছে। এই নৃসিংহ বদরী পঞ্চবদরীর অন্যতম; সুতরাং ইহা দর্শনার্থ সকল যাত্রীরই এখানে সমাগম হইয়া থাকে।

বদরিকাশ্রমে সমস্ত যাত্রীর গমনাগমন নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দোকানদার প্রভৃতি তথা হইতে নামিয়া আসে ও যে সকল পাহাড়ী, ভুটিয়া কি নেপালী লোক ব্যবসায় উপলক্ষে বদরীর পথে থাকে, তাহারাও এই সময়ে নামিয়া আসিয়া যোশীমঠে আশ্রয় লয়। হিমালয় প্রদেশে কেদারের পথে উখী মঠের ন্যায় ও বদরীর পথে যোশীমঠের ন্যায় প্রবল শীতে আশ্রয় লইবার আর দ্বিতীয় স্থান নাই। এইরূপে এখানে সর্ব্বদা লোকসমাগম থাকায় স্থানটি একটু সহরের মত দেখায়। দোকান পাট গুলজার, সকল দ্রব্যই মিলে। রাস্তা ভাল, কয়েকটী ঝরণা আছে। থানা, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস ও হাঁসপতাল আছে। এসকল কারণে স্থানটী প্রসিদ্ধ বটে; কিন্তু এখানকার প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেবের মঠ প্রতিষ্ঠা। ধার্ম্মিক হিন্দু মহাত্মাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এই দুর্গমস্থান দর্শন নিমিত্ত আসিয়া থাকেন। না আসিলেও অনেকেই জানেন যে, ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ৪টী প্রধান মঠের মধ্যে এই যোশীমঠ হিমালয় ক্রোড়ে অবস্থিত। এই উপলক্ষে আচার্য্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা

এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই মহাপুরুষ দক্ষিণাপথের দ্রাবিড় দেশে অনুমান দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে ভারতবর্ষে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম নাস্তিকগণের ব্যাখ্যাদোষে, লোকের মনে সংশয় আনয়ন করিয়াছিল,—যে সময়ে বেদ-নিন্দুকগণের অবৈধ নিন্দাবাদে—ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—যে সময়ে বহু দুর্লভ শাস্ত্রগ্রন্থ বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিলুপ্ত ও ভস্মীভূত হইতেছিল,—যে সময়ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে বৈদিক সনাতনধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে পরম দয়ালু আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান "যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি...সম্ভবামি যুগে যুগে," এই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য-রূপে আবির্ভূত হইলেন।

ভারতের যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থানে তাঁহার পদার্পণ ঘটিলেও, তাঁহার প্রকৃত জীবন-চরিতের অভাবে আমরা সেই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হই না। যাহা হউক, এপর্য্যন্ত তাঁহার যে কয়েকখানি জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরি কৃত "শঙ্করদিগ্বিজয়," মাধবাচার্য্য কৃত "সংক্ষেপ শঙ্করজয়" ও চিদ্বিলাসকৃত "শঙ্কর বিজয়" নামক গ্রন্থ ত্রয়ই প্রধান ও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশান্তর্গত কালটীগ্রামবাসী পশ্চিমদ্রাবিড় শ্রেণীর তাম্বুলী বিভাগীয় শ্রীশিবগুরু নামক ব্রাহ্মণের অংশে ও সতী-দেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার উপনয়ণ সংস্কার হয়; এবং অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি শ্রীমৎ গোবিন্দপাদাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎপরে উত্তরাখণ্ডস্থ বদরিকাশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করিয়া গীতা, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি ১৬ খানি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। তথায় শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য, শ্রীসুরেশ্বরাচার্য্য, শ্রীহস্তামলকাচার্য্য, ও শ্রীতোটকাচার্য্য নামক চারিজন পণ্ডিত শিষ্যকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ১৫। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বদরীকাশ্রমের নিকট তদ্দেশীয় বিজয় স্তম্ভ স্বরূপ জ্যোতিঃ মঠ (যোশী মঠ) স্থাপন করেন।

যোশী মঠ স্থাপনের দুই বৎসর পরে দ্বারকাধামে সারদামঠ ও উহার এক বৎসর পরে মহীশূর দেশে শ্রীরামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন করেন। এই সময়ে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্লাবিত হওয়ায় তিনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ধর্ম্ম বিজয়ে গমন করেন। যে সময়ে বৌদ্ধগণ তথাকার সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি-গণকে কৌশলে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে সম্পূর্ণ বৌদ্ধমতানুযায়ী অর্চ্চনা করাইতে ছিলেন, সেই সময়ে জগদ্-গুরু শঙ্করাচার্য্য সেই নাস্তিগণকে শাস্ত্রার্থ দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন। ১০৮ শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থস্বামীজি মহারাজ এক্ষণে ঐ মঠের অধিপতি।

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের চারি প্রান্তের চারিটী মঠে তাঁহার উপরি উক্ত শিষ্য চতুষ্টয়কে অভিষিক্ত করেন। অদ্যাপি ঐ সকল মঠের অধিশ্বরগণ ভগবান

শঙ্করাচার্য্য নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। কেবল যোশী মঠ কালপ্রভাবে আচার্য্যবিহীন হইয়াছে। অন্যান্য তিনটী মঠে আচার্য্যগণ বিদ্যমান আছেন। পরমপূজ্যপাদ আদি শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় দার্শনিক, সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক এবং বেদান্ত ও উপনিষদ ভাষ্যকার। তিনি ষোড়শ ভাষ্য, শতাধিক বেদান্তপ্রকরণ ও নানা স্তোত্রাবলী সমন্বিত অপূর্ব্ব গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়া জগৎ আলোকিত করিয়াছেন। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণাদির সারভূত বেদান্ত-দর্শনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান স্বরূপ প্রখ্যাত করাইয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্বিধ আশ্রমধর্ম্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করেন। তাঁহার কৃপায় অদ্যাপিও ঐ সমস্ত বিষয় ভারতভূমি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই এবং কখনও হইবে না। এখনও ভারতভূমির চারি দিকে চারিটী ধর্ম্ম-রাজধানী বিরাজ করিতেছে। এখনও সেই মহাত্মা শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যদেবের গ্রন্থাবলী সভ্য দেশদেশান্তরে সাদরে আলোচিত হইতেছে এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবাসী অনুশাসন ব্যবস্থা প্রণালীর রহস্য বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। এরূপ ধারণা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেব ভারতবর্ষকে এক অর্গানিজসনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশাল কর্ম্ম ভূমিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উপরোক্ত চারিজন পীঠাধিপতি ধর্ম্মাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ চারিজন ধর্ম্মাচার্য্য বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজ রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতের হিন্দুরাজন্যবর্গ ও সাধারণপ্রজাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিয়া আর্য্যধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কালচক্রের আবর্ত্তনে এক্ষণে ঐ ৪টী মঠের অন্যতম যোশীমঠ শ্বাপদের আবাসভূমি হইয়াছে। তজ্জন্যই আমাদের ভাগ্যে তাহার দর্শন লাভ হইল না। আমরা দূর হইতে এই মঠের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

নৃসিংহদেবের মন্দিরে উক্ত দেব ভিন্ন, সীতারাম, উদ্ধব, কুবের প্রভৃতি অন্যান্য দেবমূর্ত্তি আছে। পিত্তলের একটী সুন্দর গরুড় মূর্ত্তি আছে। তদ্ভিন্ন বাসুদেবের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। উহার অঙ্গনের চারিধারে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। এখানকার দুর্গাদেবী সমধিক প্রসিদ্ধ। জ্যোতিশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরটী কিছু দূরে অবস্থিত। বোধহয় তাঁহার নামেই জ্যোতিমঠ নামকরণ হইয়া থাকিবে। একটী বাঁধান কুণ্ড আছে; তথায় গোমুখ দিয়া প্রস্রবণের ধারা পড়িতেছে, উহাকে দণ্ডধারা কহে। ঐ ধারার জল আমরা স্পর্শ করিলাম। এখান হইতে আমরা যে পথে বদরীনারায়ণ যাইব, তাহা ২০ মাইল হইবে। যদি কেহ মানসসরোবর গমনার্থী থাকেন, তাঁহাকে এই যোশীমঠ হইতেই অন্যপথে যাইতে হইবে। এখান হইতে একটী রাস্তা নীতিপাশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ রাস্তা এখন হইতে ৪৫ মাইল দীর্ঘ; ঐ পথে ৮।১০ মাইল অগ্রসর হইলেই ভবিষ্যবদরী দর্শন হয়। ঐ নীতিপাশের পরেই ভারতের শেষ সীমা ও তিব্বত আরম্ভ। ঐ স্থান হইতে কৈলাস গণনা করা হয়। কৈলাস অন্যাংশে যতই সুন্দর হউক না কেন, উহার পথ বড় ভয়ঙ্কর। আষাঢ়ের কিছুদিন থাকিতে অশ্বিনের কিছুদিন

পর্য্যন্ত—এই অল্পকাল কোনরূপে এই পথে মনুষ্যের যাতায়াত চলে। আবার এই পথে চলিবার কালে কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী, জ্বালানিকাষ্ঠ বা আশ্রয়ের স্থান চটী নাই। ফলতঃ সাধারণের গমনাগমন একেবারে অসম্ভব। তবে সাধুসন্ন্যাসিগণ কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই পথে চলিয়া থাকেন।

১৩ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। — আমরা ভোর ৬ টার সময় যোশীমঠ হইতে রওনা হইলাম। ঐ সময় দেখি যে একজন সানাইবাদক আমাদের অনুসরণ করিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহাকে কিছু দিয়া বিদায় করিলাম। এখান হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রায় ১॥ মাইল রাস্তা হইবে। এই পথ কেবল খাড়া উতরাই। পথ সমতল নহে, উচ্চনীচ প্রস্তর খণ্ডে আকীর্ণ। অতিকষ্টে ও সতর্কতার সহিত ঐ রাস্তা অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবলগঙ্গা-তীরে উপনীত হইলাম। তীর হইতে নিম্নবর্ত্তী পুলে যাইবার রাস্তা টুকু আরও ভীষণ। উহা পথের চিহ্ন বিবর্জ্জিত খাড়া গড়ান। সর্ব্ব নিম্ন ভাগটী আবার ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। কোনরূপে সেই স্থান দিয়া প্রাণ হাতে করিয়া পুলে উঠিতে হয়। দুইটী কাষ্ঠনির্ম্মিত পুল আছে, তাহার মধ্যে একটী ভগ্ন ও অপরটী অসম্পূর্ণ, দুইটী মোটা কাষ্ঠখণ্ড মাত্র আছে। সেই পুলের নিম্নদেশদিয়া উন্মত্ত বিষ্ণুগঙ্গা নৃত্য করিতে করিতে অলকনন্দায় মিশিতেছে। এই সঙ্গমস্থানকেই বিষ্ণুপ্রয়াগ বলে। বিষ্ণুগঙ্গার প্রবাহবেগ অতীব প্রখর। উপলখণ্ডে তরঙ্গ-তাড়নায় বারিকণা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। আমরা অতি সন্তর্পণে ঐ পুল অতিক্রম করিয়া উন্নত তীর-ভূমিতে দাঁড়াইয়া ভয়চকিতনেত্রে ঐ তরঙ্গভঙ্গি দেখিতে লাগিলাম। কি ভীষণ বেগেই প্রবাহের প্রধাবিত জলরাশি এখানে ঢালিয়া পড়িতেছে। আর নিম্নমুখে যেন পাতালে প্রবেশ করিতেছে। আবার কোথাও বা মণ্ডলাকারে, বেগে মস্তকউত্তোলন করতঃ ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান পাষাণ খণ্ডের পার্শ্বদিয়া ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। কোথাও বা নদীগর্ভস্থিত প্রস্তরখণ্ডকে উঠাইবার জন্য তাহার সহিত প্রাণপণে যুঝিয়া ক্রোধপ্রকাশছলে যেন ফেণরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। তালে বেতালে কত নৃত্য, কত উল্লম্ফন, কত বিলুণ্ঠন আর তাহার সহিত গভীর তর্জ্জন গর্জ্জন! এ-দৃশ্য কে বর্ণনা করিবে? দুই পার্শ্বে—দুইটী অম্বরচুম্বী পর্ব্বত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই দুইটী নদী মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মিলিত হইতেছে, এই নিসর্গ-নির্জ্জনশোভা কি রমণীয় ও মধুর, তাহা বাক্যে প্রকাশকরা যায় না, উপভোগের সামগ্রী। আবার এই দৃশ্য কি ভীষণ তাহাও অবর্ণনীয়।

ঠিক সঙ্গমস্থলের খাড়া উর্দ্ধতীর প্রান্তেই বিষ্ণুর মন্দির। মন্দিরের সম্মুখস্থ চাতালের একপার্শ্ব দিয়া সঙ্গমস্থানে অবতীর্ণ হইবার সোপান। পাহাড়ের গাত্র খুদিয়া ঐ সোপানাবলী বহু প্রয়াসে প্রস্তুত করা হইয়াছে। নিম্নবর্ত্তী সোপানের দুইপাশে পাহাড়ের গায়ে লোহার শিকল লাগাইয়া প্রবাহ-পর্য্যন্ত উহা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাত্রীরা ঐ

স্রোতকম্পিত শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া কোনক্রমে স্নান করিয়া থাকে। কোনক্রমে ঐ শৃঙ্খল হস্ত-স্খলিত হইলে প্রাণনাশের একান্ত সম্ভাবনা। অনেক সময় এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শুনা গেল। সেইজন্য অধিকাংশ যাত্রীই লোটা ডুবাইয়া মস্তকে জলদিয়া থাকেন। আমরাও ঐরূপে স্নান সমাধা করিয়াছিলাম। আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী তখন ঐরূপে স্নান সমাধা করিয়া তীরে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছিলাম, হটাৎ মা গঙ্গা আমাদের উপর দিয়া বেগে এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন যে আমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র ভীত হইলাম না। অধিকন্তু আমাদিগের প্রতি মায়ের অশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম।

মন্দির হইতে একটু উপরে উঠিয়াই চটী। চটী অতি ক্ষুদ্র। এখানে ৩।৪ খানা মাত্র দোকান আছে; ধর্ম্মশালা যাহা আছে, তাহা দোকানদারের অধিকারে। তাহা ব্যবহারে যাত্রীদিগের স্বাধীনতা নাই। অথচ যাতায়াতের পথে চটী, যাত্রীসমাগমের বিরাম নাই।

আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া বাজার হইতে কিছু মোহনভোগ ইত্যাদি আনাইয়া আহার করিয়া পাণ্ডুকেশ্বর চটী রওয়ানা হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া বাজারে বাসা লইয়া আহারের বন্দোবস্ত করিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বর।

পাণ্ডুকেশ্বর অতি উত্তম স্থান। অনেকটা উগ্রমূর্ত্তি চড়াই ভাঙ্গার পর এই নিম্ন ও সমতল স্থানটুকু বেশ মনোরম বলিয়া বোধ হইল। বাজার হইতে একটু নিম্ন সমতলে শস্যক্ষেত্র অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছে। বসতি একরূপ মন্দ নহে। বাজারে অনেকগুলি দোকান আছে। প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের অভাব নাই। কিন্তু মাছির অত্যন্ত উপদ্রব। অন্নব্যঞ্জন বা দুগ্ধমিষ্টান্নাদি উদরস্থ করাই দুর্ঘট। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই যদিও এই একটী অসাধারণ উপদ্রব আছে, তথাপি এস্থানে ঐ উপদ্রবটী বেশী বলিয়া বোধ হইল।

রাস্তার অপর পার্শ্বে একটু নামিয়া গিয়া দেখিলাম, দুইটী প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। মন্দির দুইটী পাশাপাশি অবস্থিত। দুইটীই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের নিম্নভাগ অনেকটা মাটির মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। একটীতে ভগবান বিষ্ণুর যোগবদরী নামে ধাতুময় নারায়ণ মূর্ত্তি ও অপরটীতে ধাতু নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তি বর্ত্তমান। বিষ্ণুমন্দির শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মন্দির মধ্যেও ৪খানি তাম্রফলক রক্ষিত আছে। পংক্তিবদ্ধ দেবনাগর অক্ষরে উহার আদ্যন্ত পূর্ণ; প্রচলিত দেবনাগর অক্ষর অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। সহসা দেখিলে উহার কিছুই পড়া যায় না। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, মহারাজ পাণ্ডু ও তদ্বংশীয় রাজগণের রাজত্ব কালের ঘটনাবলী লিখিত আছে। বৃষচিহ্নিত ফলকখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চ × ১৮ ইঞ্চ হইবে। উহাতে প্রায় ৪০টী পংক্তি আছে। প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৭০টী অক্ষর। অন্য ৩ খানি ইহার অপেক্ষা কিছু ছোট লেখাও তত ঘন নহে।

মন্দিরের সংলগ্নবাটীতে মন্দিরের আশে-পাশে ৪।৫ টা ছোট ছোট প্রস্তরময় জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় কুটুরী আছে। তাহার নিম্নবর্ত্তিনী অলকনন্দার অপর পারে তটবর্ত্তী উচ্চ-পর্ব্বতশিখরে একখানি প্রশস্ত সমতল শিলাখণ্ড আছে। ঐ খানেই কুরুক্ষেত্রের মহাযোদ্ধা পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হয় বলিয়া অদ্যাপিও লোকে দেখাইয়া থাকে। এ জনশ্রুতির সহিত শাস্ত্রেরও সবিশেষ ঐক্যমত আছে। কেদারখণ্ডে লিখিত আছে;—

পাণ্ডুনাচ তপস্তপ্তং সপ্তেন মৃগরূপিনা,
মুনিনা পরকোপেন পাণ্ডুস্থানং ততঃ স্মৃতং।
প্রপন্নো ভগবানাহ পাণ্ডুং পরমসুন্দরং
ভো ভোঃ পাণ্ডো তব ক্ষেত্রে ধর্ম্মাদিনাং সুতা কিল।
ভবিষ্যন্তি সুতাত্মানঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ।

ইহাতে পাণ্ডুস্থান বলিয়া এ স্থানের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে এই স্থানে সঙ্ঘটিত ঐ সকল ব্যাপার আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। সেই প্রসঙ্গের শ্লোকগুলির মর্ম্ম এইরূপ,—মহারাজ পাণ্ডু মৃগয়া-ব্যসনে আসক্ত হইয়া একদা-মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মৃগীর সহিত সঙ্গত একটী মৃগকে তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করেন। মৃগ তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাঁহাকে অভিশাপ দেয়,—মহারাজ, আমি মৃগ নহি, মৃগবেশধারী মুনি-পুত্র; বন্য ফলমূল ভক্ষণে জীবন ধারণ করি, কাহারও কোন অনিষ্ট সম্পর্কে থাকি না। তথাপি তুমি আমায় যেমন নিরপরাধে এই অবস্থায় নিহত করিলে, তুমিও এই প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া নিহত হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে সেই মৃগ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মহারাজ পাণ্ডু অতর্কিত দুর্ঘটনায় এইরূপ দারুণ শাপগ্রস্থ হইয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। মহর্ষি বেদব্যাস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে এইরূপ পাপ ব্যসনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অতঃপর পিতৃবৃত্তিই অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ নানাস্থান ভ্রমন করিয়া অবশেষে হিমালয়-প্রস্থ আশ্রয় করিলেন। ধর্ম্মপত্নীদ্বয় তাঁহার সহিত বনবাসে নিতান্ত ইচ্ছুক হওয়ায়, তাঁহাদিগকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন।

ক্রমে তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমন করতঃ হংসকূট উল্লঙ্ঘন করিয়া শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে বহুকাল তপস্যা করেন। একদা তত্রত্য তপঃসিদ্ধ তাপসগণ ব্রহ্মলোক গমনে উদ্যত হইলে, মহারাজ পাণ্ডু অপুত্রতা নিবন্ধন নিজের স্বর্গগতি নিরুদ্ধ জানিয়া ঐ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট বহু অনুতাপ করেন। তাহা শুনিয়া তাপসেরা কহিলেন,-মহারাজ, এ নিমিত্ত আপনার অনুতাপের কোন কারণ নাই। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমরা দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, আপনার দৈব প্রসন্ন — আপনি কার্য্যদ্বারা সেই দৈব প্রসাদের [illegible] করুন অর্থাৎ দেবোপম সৎপুত্র-ধনে ধনী হউন, পরে স্বর্গে-গমন করিবেন। ঋষিবাক্যে মহারাজ পাণ্ডু দুঃখ দুশ্চিন্তাদি দূর করিলেন এবং প্রণিধানপূর্ব্বক—কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং অনুমতি দানে নিজ-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনীকুমার যুগল হইতে পঞ্চ পুত্ররত্ন লাভ করিলেন।

এই বৃত্তান্তও লোকমুখে এখানে যেমন চলিয়া আসিতেছে, স্থাননির্দ্দেশও তদ্রূপ ব্যক্তি পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই পাণ্ডুকেশ্বরই যে, সে কালের সে পাণ্ডুস্থান তাহাতে সন্দেহর কারণ আর কি হইতে পারে?

ঐ স্থান হইতে প্রায় একমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে শেষধারা নামক প্রস্রবণ আছে। তথায় শেষনাগের একটী ক্ষুদ্র মন্দিরও আছে। তাহাও দর্শন করিতে হয়, যথা;—

শেষতীর্থে-মহাপুণ্য গঙ্গায়াং স্নাতি যো নরঃ।
ইহলোকে বরান্ ভোগান্ পরত্র পরমাং গতিং॥

১৪ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।—অদ্য রজনী প্রভাতে আমরা পাণ্ডুকেশ্বর চটী হইতে রওনা হইয়া ক্রমান্বয়ে লামবগড় চটী ও হনুমান চটী হইয়া বেলা ১১ টার সময় বদরীনারায়ণ পঁহুছিলাম। তথায় পাণ্ডার কথামত মন্দিরের নিকটেই একটী দোতালা ঘরে বাসা লইলাম।

হনুমান চটী।

আমরা যতই আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই পথিপার্শ্বে অলকনন্দার তীরে তীরে নানা জাতীয় পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। আমরা ঐ সকল স্বচ্ছন্দ-বনজাত কুসুমের সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়াই কি এখানে এত অপরিমেয় নানা রং বিরংয়ের পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে!

এদিকের রাস্তা অতি কদর্য্য, বে-মেরামত। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ চড়াই। অধিকন্তু ভারবাহী ছাগলের দলবদ্ধশ্রেণী ভেদ করিয়া যাত্রীগণের অগ্রসর হওয়া একান্ত অসম্ভব। আমরা ঐ সমস্ত পথ অতিকষ্টে অতিক্রম হনুমানচটীতে উপনীত হইলাম। এই চটীর সম্মুখেই এক প্রবল পার্ব্বত্যধারা আসিয়া অলকনন্দায় মিলিত হইয়াছে। ঐ ধারার নাম "ঘৃতগঙ্গা"। এই চটীতে একটী ছোট মন্দিরাভ্যন্তরে মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়, তবে তাহা দোকানে প্রস্তুত—লুচি, মিঠাই ইত্যাদি। কথিত আছে যে, এই স্থানে বৈখানস মুনির আশ্রম ছিল এবং মরুত্ত রাজার বিখ্যাত যজ্ঞক্রিয়া সমাধা হয়। দেবগুরু বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্বর্ত্ত এই যজ্ঞের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে যে পাত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল তৎসমস্তই সুবর্ণনির্ম্মিত। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান খনন করিলে অদ্যাপিও হোমকুণ্ডের অঙ্গাররাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ততঃক্রোশদ্বয়ে দেবি! বৈখানস মুনিস্থানং।
যজ্ঞভূমি স্তথা তত্র তেষাং মুনিবরাত্মনাং।
নদীনাং প্রবরা সাবৈ মহাপাতকনাশিনি।
হোতৃস্থানে মুনিনাস্তু শৃণু প্রত্যয় লক্ষণং॥
অদ্যাপি তৎ প্রদেশেবৈ যবাদগ্ধাস্তথাকিল।
অঙ্গারাশ্চাপি দৃশ্যন্তে হোতৃস্থানে মহাত্মনং॥

বদরী নারায়ণের পথে।

অলকনন্দার উভয় পার্শ্বস্থ অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা যদিও বীরের ন্যায় সদর্পে দণ্ডায়মান আছেন, তবুও এই নদীর প্রচণ্ড প্রবাহে তাহাদের অঙ্গ বিধ্বস্ত হইতেছে। তাহাদের অঙ্গ ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পতিত হইতেছে। তাই এই সকল নদীগর্ভে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড বর্ত্তমান। অপর পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের

কতক অংশও এইরূপে ধ্বস খাইয়া হয়তঃ সমধিক বিস্তৃতভাবে পড়িয়া যায়। কালে সেই ধ্বস্ত অংশের উপরেই চটী, বসতি, ক্ষেত্র ইত্যাদি বিনির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান বসতি, চটী প্রভৃতি বোধহয় ঐরূপেই হইয়াছে। এই সকল পরিণতি কত যুগযুগান্তর হইতে হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? ক্রমশঃ আমরা গন্তব্য পথের মধ্যে বরফরাশি দেখিতে লাগিলাম। নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, অলকনন্দার তটবর্ত্তী অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অলকনন্দার প্রবাহও অনেক স্থানে বরফরাশিতে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। গবাদি পশু এবং মনুষ্য তাহার উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু আমাদের সম্মুখে যখন ঐরূপ বরফের জমাট থাকিত, সেই সময় তাহার উপর দিয়া চলিতে আমাদের মনে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হইত; কারণ কোন কোন স্থান এত পিছল যে, সেখানে পদনিক্ষেপ করিলে বহুদূর পিছলাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, এমনকি বরফরাশির ভিতর ডুবিয়া যাইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঐরূপ তুষারাচ্ছন্ন অংশের স্থানে স্থানে নিমগ্ন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের অগ্রভাগ বহিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রস্তরখণ্ডে অলকনন্দার বাধাপ্রাপ্ত প্রবাহবেগ ঊর্দ্ধগামী হইয়া উপরিস্থিত তুষার অপসৃত করতঃ প্রবলবেগে সেই পথরোধী-প্রস্তর খণ্ডের উপর ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে, যেন বরফরাজ্যের মধ্যে হটাৎ উৎসের সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি সূর্য্যকরসন্তাপে গলিয়া পড়িতেছে, আর পর্ব্বতগাত্রস্থ সুনীল বৃক্ষাবলী নয়নপথে পতিত হইতেছে; তাহাতে বোধহইতেছে যেন কোন শুক্লবসনা সুন্দরী তাহার গাত্রস্থবস্ত্রাঞ্চল অপসৃত করিয়া ঈষৎ নগ্নভাব ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে বিগলিত তুষাররাশি ঝরণার আকারে প্রবাহিত হইতে দেখিয়া মনে হইল, যেন কোন বিভবশালী তাহার স্বোপার্জ্জিত বিত্তনাশে অধীর হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। এইরূপ কবিত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্য মাধুর্য্য উপভোগকরতঃ আমরা আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দ্রবীভূত বরফ স্পর্শে তীক্ষ্ণশীতল বায়ুপ্রবাহ আমাদের পথশ্রম অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে লাগিল। জ্বালানী কাষ্ঠের ভারবাহী পাহাড়িয়াগণ আমাদের সহযাত্রী হইল। দেবদর্শনান্তে প্রতিগমনোন্মুখ, প্রফুল্লচিত্ত যাত্রিগণের ঘন ঘন আনন্দোচ্চারিত বদরীনাথের জয়ধ্বনি আমাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে লাগিল; আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা যতই বদরীনারায়ণের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই পথের কুটীলতা দূর হইতে লাগিল। সুন্দর সমতল ক্ষেত্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। হঠাৎ পুরোবর্ত্তী যাত্রিরা চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া দেখা যাইতেছে"। আমাদের সকল শ্রম, সকল কষ্ট সার্থক বলিয়া মনে হইল, সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া অলকনন্দার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গড়ান পথদিয়া নামিয়া একটা কাঠের পুল অতিক্রম করিয়া কুবেরশিলার নিকট আসিলাম, কুবেরশিলা অবশ্য দর্শনীয়—

কুবেরস্ত শিলাং দৃষ্ট্বা দারিদ্র্যং নোপোজায়তে।

বদরিকাশ্রম।

বদরীনাথের প্রশস্ত পুরী, বিস্তৃত বাজার; বাজারে প্রবেশ করিতেই ঋষিগঙ্গা পাওয়া যায়। আরও একটু অগ্রসর হইলে কূর্ম্মধারা; তাহার পর রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ঘনসন্নিবিষ্ট অনেক দোকান। একটু উপরে পাণ্ডাদের বাসস্থান ও ধর্ম্মশালা আছে। আমরা যে সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছি, তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। ১১ টার পরে মন্দিরের দরজা বন্ধকরা হয়; কাজেই বাধ্য হইয়া বাসায় থাকিতে হইল। প্রাণে শান্তি নাই, কখন বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিব, এই চিন্তায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। পাণ্ডামহাশয় বলিলেন যে, ভোগ-আরতির সময় দরজা খোলে, সেই সময় আপনাদিগকে দর্শন করাইব। আমরা এই আশায় উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় ভোগ-আরতির মঙ্গল-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, কিয়ৎকাল পরে পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে চলিলেন। আমাদের বাসা ছাড়িয়া পথ হইতে উচ্চ ১৫।১৬টী সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলাম। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখি সমগ্র দেবালয়টী যাত্রীতে পরিপূর্ণ।

এই যাত্রিগণের ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর না হইয়া আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম; পরে ভিড় কমিলে আমরা শ্রীবিগ্রহ সন্নিকটে উপনীত হইলাম। মসৃন, শ্যামবর্ণ, পাষাণময় অতি রমণীয় চতুর্ভুজ নারায়ণ মুর্ত্তি, পুষ্প, মাল্য ও বহুমূল্য বসন ভূষণে ভূষিত, মস্তকোপরি রত্নময় কিরীট মুকুটাদি, তাহার উপর সুবর্ণ নির্ম্মিত ছত্র শোভা পাইতেছে। বিগ্রহের বামদিকে ও দক্ষিণে লক্ষ্মীমায়ি, কুবের, নরনারায়ণ ও উদ্ধবনারদাদি ভক্তচূড়ামণিগণ রহিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্ত্যাদি দর্শন করিয়া জীবন ধন্য বলিয়া মনে হইল। সকল শ্রম, সকল কষ্ট সার্থক জ্ঞান হইল।

আমাদের ন্যায় শত শত যাত্রী আজ দর্শনভিখারী হইয়া ভগবানের দ্বারে উপস্থিত; দ্বাররক্ষকগণ যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী প্রবেশ করাইতেছে ও বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রিগণকে তাহাদের স্থলে লইতেছে। আমরা এরূপ একদলকে স্থান দিয়া ভিড় ঠেলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাহির মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের নিকট লক্ষ্মী দেবীর মন্দির। মন্দিরমধ্যে পাষাণময়ী লক্ষ্মীমায়ী বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। লক্ষ্মীমায়ীর মন্দিরটী ছোট। উহার সমীপেই নারায়ণের ভোগ মন্দির। ঐস্থানে নিত্য ভোগের জন্য ৩/০ মণ চাউল এবং সেই পরিমাণ ডাল তরকারি পাক হইয়া থাকে। প্রাঙ্গনে দরজার দিকে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত গরুড় মূর্ত্তি। মন্দিরের অপর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি দোকান। অদ্য আমাদের অন্যান্য তীর্থকৃত্য বা নারায়ণের পূজা ভোগ দেওয়া বা ব্রাহ্মণভোজন করান হইল না। পরদিন ঐ সমস্ত কার্য্য করার ব্যবস্থা হইল। পরে আমরা পাণ্ডার সহিত বাসায় ফিরিলাম এবং পাণ্ডাপ্রদত্ত নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। রাত্রে তথায় বিশ্রাম করা গেল।

নারায়ণের জন্য নিত্য প্রচুর অন্নভোগ হইয়া থাকে। ভোগ নিবেদনের পর উক্ত মহাপ্রসাদ মন্দিরের সমস্ত কর্ম্মচারী, ভৃত্যবর্গ ও পাণ্ডাগণ মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। পাণ্ডাগণের কল্যাণে যাত্রীরাও ঐ মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের ন্যায় এখানেও পুরীর ভিতর স্পর্শদোষ নাই। প্রভেদের মধ্যে এ প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয় না। শাস্ত্রে আছে,—

বদরীনাথনৈবেদ্যং ভুক্তং যৈ র্ভক্তিতৎপরৈঃ।
অভোজ্যাশন দোষাদ্যৈ র্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রসাদং হরিনৈবেদ্যং ভুঞ্জীয়াদ ভক্তি তৎপরঃ।

অর্থাৎ বদরীনাথের উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে, অভক্ষ্য ভোজনজনিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া ভগবানের প্রসাদ ও নৈবেদ্য ভোজন করিবে।

লক্ষ্মী পচতি নৈবেদ্যং ভুঙক্তে নারায়ণ স্বয়ং।
চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং নদোষায় ভবেং কচিৎ॥
বদরীনাথনৈবেদ্যং যো মোহাত্ত পরিত্যজেৎ।
চাণ্ডালাদধমো-জ্ঞেয়ং সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

অর্থাৎ নৈবেদ্য লক্ষ্মী স্বয়ং পাককরেন ও স্বয়ং নারায়ণ ভক্ষণ করেন। এ নিমিত্ত চণ্ডালে স্পর্শকরিলেও সে নৈবেদ্য কোনরূপ দোষাবহ হয় না। বরং যে ব্যক্তি মোহ-বশতঃ উক্ত নৈবেদ্য পরিত্যাগ করে, সেব্যক্তি চণ্ডালাধম ও সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হয়।

বদরী-নারায়ণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রপ্রাপ্তি নিমিত্ত একদিন উপবাস করিতে হয়। প্রভাতে গঙ্গাস্নান ও নারদ কুণ্ডে স্নানকরিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। স্নানে অশক্তের পক্ষে মার্জ্জনাদি স্নান করা কর্ত্তব্য। পরে যথাশক্তি পূজোপহার লইয়া ভগবানের পাদপদ্ম হইতে কিরীট পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিবে। দর্শনের পর প্রদক্ষিন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ব্রাহ্মণোদ্দেশে গো, ভূমি, অন্ন, স্বর্ণাদি ধাতু, অশ্বগজাদি বাহন যথাশক্তি প্রদান করিবে। এখানে একটী গাভীর অবয়বের তুল্য ভূমিদান করিলে তাহা বেদপারগ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সমগ্র পৃথিবী দান করার তুল্য হয়। গঙ্গাতটে ও নারায়ণ মন্দিরে দীপদানেরও বহু ফল লিখিত আছে।

বদরীকাশ্রমে আগমন করিয়া নিম্নলিখিত পঞ্চতীর্থে স্নানতর্পণাদি ও পঞ্চ শিলাদর্শন পূজনাদি এবং কেদারনাথ নামক শিবলিঙ্গের পূজন অবশ্য কর্ত্তব্য। পঞ্চতীর্থ যথা—(১) ঋষিগঙ্গা, ইহা বাজারের নিকটেই দক্ষিণ ধারে। (২) কূর্ম্মধারা, ইহা বাজারের মধ্যে। (৩) প্রহ্লাদ ধারা। (৪) তপ্তকুণ্ড। (৫) নারদকুণ্ড, ইহা তপ্তকুণ্ডের নীচে—অলক-নন্দার ধারে।

প্রবাদ এই যে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, এই নারদীয় হ্রদে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জননীর স্তন্য পান করিতে হয় না, অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। উক্ত হ্রদে ভগবান্ নারা-য়ণের বহু মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। যুগে যুগে নারায়ণের অংশাবতার স্বরূপ মুনীশ্বর-গণ আবির্ভূত হইবেন ও বদরীনাথ নামে ঐ সকল মূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপিত করিবেন। পঞ্চশিলা,—(১) নারদ-শিলা, (২) বরাহশিলা,

(৩) নরসিংহ শিলা, (৪) গরুড় শিলা, (৫) মার্কণ্ডেয় শিলা। তপ্তকুণ্ডের প্রস্রবণ যে স্থানে নির্গত হইয়াছে, তথায় গরুড়শিলা আছে। এই পঞ্চশিলার মধ্যে বদরী-নারায়ণের আসন অবস্থিত। তপ্তকুণ্ডের কিছু উপরেই শিবলিঙ্গ আছেন।

ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে পিণ্ডদান যাত্রী-দিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহার এইরূপ ফলশ্রুতি আছে যে, পিতৃপুরুষগণ যতই পাপকারী হউন, বা যতই দুর্গতি প্রাপ্ত হউন, ব্রহ্মকপালে তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে তাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত পিণ্ডদান ভক্তিপূর্ব্বক হউক বা না হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই জন্য পিতৃলোক উৎসুকচিত্তে কামনা করেন যে, তাঁহাদের বংশের কেহ যেন এই তীর্থে আগমন করতঃ এই কুণ্ডে পিণ্ডদান করেন। ব্রহ্মকপালে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে, গয়া বা অন্য তীর্থে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদির আবশ্যক করে না।

১৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।—অদ্য প্রাতে পাণ্ডার সহিত রওনা হইয়া তপ্তকুণ্ডে পৌঁছি-লাম ও তথায় স্নান তর্পণাদি সমাধা করিয়া অন্যান্য কুণ্ড ও দেবতা দর্শন করিলাম। তৎপরে নারায়ণের পূজা ও ভোগ দেওয়া ও যথাসাধ্য তীর্থকৃত্য সমাপন করা হইল। পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণভোজন যথারীতি সমাধান্তে আমরা স্বয়ং ভোজন করিলাম। উক্ত প্রকার ভোজন ব্যাপারের জন্য পুরী ও মিষ্টান্নাদি দোকান হইতেই সংগ্রহ করা হইল। এই সকল তীর্থে পাণ্ডাজাতীয় কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা যাত্রীদিগকে তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা যাত্রীদিগের নিকট কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে এরূপ বদরী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করা গেল। "বদরী মাহাত্ম্য" পুস্তকও এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলাবাহুল্য যে এখানে শীত বিলক্ষণ প্রবল, তবে কেদার অপেক্ষা কম। শীত নিবারণের নিমিত্ত এখানেও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইয়াছিল।

আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

আব্দার।

তোমায় আমি বাস্‌ব ভাল
কোনই বাধা মানব না,
মুখটী যদি ফিরাও তুমি
তোমার পিছু ছাড়ব না॥
যতই তুমি কঠিন হবে
ততই আমি হব দৃঢ়।

কথার কথা সবাই জানে
"বজ্র আটুনী ফস্কা গেরো"॥
হাওয়ার আগে যাবে তুমি
আমি যাব তড়িত বেগে,
বলবে দুটো কর্কশ বাণী?
এর বেশী কি কর্ব্বে রেগে?

তোমার স্থান তোমার স্থিতি
আছে কোথায় আমি ভিন্ন ?
নইলে কেন ধরিছ বঁধু
বক্ষে ভক্ত-চরণ-চিহ্ন ?
ভকত ছাড়া অস্তিত্ব তোমার
জানত না গো জীবে আর।
দিব্য বৈকুণ্ঠ হ'ত আকণ্ঠ
দধিচী নাহি দিলে হাড় ॥

তুমি গো বন্দী ভক্তের দ্বারে
ভকত থাকে না তোমা ছাড়ি;
তোমার মহিমা থাকুক তোমারি
তুলি দুটী বাহু, উচ্চ কণ্ঠে বঁধু
আমি বলি "হরি বোল হরি" ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

:0:

শ্রীচৈতন্য।

ওগো চৈতন্য স্বর্গের দূত মানব-মঙ্গল-কামি !
নন্দন বারতা ধরার বক্ষে আনিলে ভক্ত তুমি।
শুনালে তুমি অবোধ মানবে বিশ্ব প্রেমের বাণী,
হে জিতেন্দ্রিয় ! মহাসাধক বৈষ্ণব চূড়ামণি !
বিশ্ব প্রেমের রুদ্ধ দুয়ার নিমিষে করিয়া ভগ্ন।
একদা সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ নাদে করিলে বঙ্গ মগ্ন।
নদীয়া বক্ষ করিয়া সিক্ত ছুটালে প্রেমর ধারা।
অজ্ঞান পঙ্ক করিয়া ধৌত ভেদিয় আঁধারকারা।
সাম্য মন্ত্রে তুমি দিলেহে দীক্ষা চূর্ণ করি ভেদ-
জ্ঞান।
শত্রুকে তুমি করিলে মিত্র প্রেমকণা করি দান।
হে মহান ! তুমি নির্ব্বিকারে চণ্ডালে দিলে কোল
জগাই মাধাই পাপীরে তরালে শুনায়ে হরিবোল,
কোথা তুমি আজ নবদ্বীপ-ইন্দু বিশ্ব প্রেমের
সিন্ধু !
কোথায় তোমার করুণা বিন্দু, কোথা হে দীনের
বন্ধু।
মুগ্ধ অযুত শিষ্য যেথায় শুনেছে নিত্য মুক্তিগাথা।
শূন্য আজি সে পূণ্য ভবন নীরব তত্ত্বকথা ॥

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদ।

:0:

আত্মোপদেশ।

(২)

ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি জগন্মাতা।

আমরা অষ্ট প্রহর, আমাদের মানুসক্ষেত্রে কত শত শত ইচ্ছাকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা কেহই সেই আদ্যা প্রকৃতি নহে। সেই আদ্য শক্তি বা মূল প্রকৃতি চৈতন্য প্রার্থিনী, চৈতন্য ভক্তা, চৈতন্য প্রেমিকা, ভক্তি, প্রেম, একাগ্রতাই তিন, চিৎস্বরূপ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, চৈতন্যই তাঁহার সর্ব্বস্ব ; চৈতন্যকে হারাইলে তাঁহার সব হারাইয়া যায়। যে ইচ্ছায় চৈতন্যের বা অনুভবের ঘনতা

নাই, যাহা চেতনাভাসের ন্যায় ক্ষীণ ও চঞ্চল, উহা আদ্যাশক্তি নহে। আদ্যাশক্তির বা মূল প্রকৃতির, বা ভগবদিচ্ছার স্বরূপ তুমি প্রেমের মধ্যে, ভক্তির মধ্যে, একাগ্রতার মধ্যে দেখিতে পাইবে; অর্থাৎ যেখানে চৈতন্য এত প্রবল ও প্রকট এবং ইচ্ছাও এত প্রবল ও প্রকট যে, সেখানে এই উভয় শক্তির তেজে উভয়ের ভেদ লক্ষ্য হয় না। অর্থাৎ ইচ্ছাই যেন চৈতন্য বলিয়া এবং চৈতন্য ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয়। তুমি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিও যাহারা ভক্ত, প্রেমিক বা একাগ্রচিত্ত তাহারা সদাই চিদানন্দে উল্লসিত এবং তাহাদের নিদ্রা, তন্দ্রাদি স্বল্প। কারণ নিদ্রা তন্দ্রার সময় ইচ্ছাশক্তির ও চিচ্ছক্তির বিচ্ছেদ হয়। যে প্রকৃতি এ বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না, সে চির জাগ্রত। কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমই দৃষ্টান্তস্থল।

চৈতন্য ও দৃশ্যজগৎ।

দৃশ্য পদার্থ মাত্রেই যেমন জাতিগত বা বস্তুগত পার্থক্য আছে—যথা ধাতু, উদ্ভিদ, জীব, জন্তু ইত্যাদি। তদ্রূপ অদৃশ্য লোকে বা সূক্ষ্মচিৎক্ষেত্রে চৈতন্যাবয়ব দেখা যায়।—যথা ভয়, সাহস, ভক্তি, তাচ্ছিল্য, ঔদাস্য, প্রেম, বৈরাগ্য, সন্তোষ ইত্যাদি। যাহারা সঞ্চয়ী পুরুষ তাহারা দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়বিধ জগৎ হইতে ভাল ভাল মাল সঞ্চয় করেন। নিকৃষ্ট পদার্থগুলি গ্রহণ করেন না।

জন্ম ও মৃত্যু।

মরণ বা বাঁচন, একবারই ভাল—অর্থাৎ বাঁচিতে হয় নিত্য ভাবে বাঁচিয়া থাক, আর মরিতে হয়ত বরাবরের জন্য মর। ছিড়িক্ ছিড়িক্ করিয়া ক্ষণিক স্মৃতি ও ক্ষণিক বিস্মৃতি ক্ষীণ প্রকৃতির লক্ষণ। যে ইচ্ছা শক্তি (আকাশ মধ্য হইতে সৌদামিনীর ন্যায়) চিদাকাশ হইতে আবির্ভূত হয়, সে পাছে আপনার স্বরূপ পলকে হারায়, নিজ মূর্ত্তিকে ধ্যানযোগে, শিরানাড়ী ইত্যাদি ভাবে, একটু একটু ঘন সংস্কারের মত করিয়া রাখে। এই রকম করিলেই ইচ্ছার ও চৈতন্যের বা জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য কিছুদিন বজায় থাকে।

প্রেমোচ্ছাস।

প্রভো! আমি আমাকে ভুলিয়া তোমাকে স্মরণ করি, কি আমাকে স্মরণ করিয়া তোমাকে ভুলি। আমার সব যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে, কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আমি তোমাকে স্মরণ কর্‌ছি, এবং তোমাকে ভুল্‌ছি, কিন্তু দেখ তুমিও যেন আমায় ভুলে মেরে দিও না। আমি দুর্গা বলে সব ভুলে তোমায় দেখতে দেখতে ঝুলে পড়্‌ছি, তুমি আমার ঝুঁটা ধরে রেখ।

জগন্মাতার গর্ভাধান—স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংযোগ, জগন্মাতার সংস্কার-বীজে চৈতন্যের অনুপ্রবেশ, বীজের জীবনসঞ্চার ও অঙ্কুর।

যে সময় পরম পুরুষের সহিত মূল প্রকৃতির সঙ্গম হয়, সে অবস্থাটি, মুহূর্ত্তটি অত্যন্ত পবিত্র—সে তীর্থে ইন্দ্রিয়, বায়ু, বরুণ কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—উহা অত্যন্ত গোপনীয় সঙ্গম। তখন চরাচরে কেহই থাকে না। থাকেন কেবল নিরাকার পুরুষ, নিরাকারা প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির ব্যবধানে যে মোহময়

কালযবনিকা থাকে, উহাও তৎকালে বিলীন হইয়া যায়। এই কালরাত্রির অবসানেই পুরুষ প্রকৃতির মিলন হয়। তখন কালরাত্রির সংযমে ও উপবাসে ক্ষুব্ধা প্রকৃতি চিরবিরহে ও পিপাসায় অধীর হইয়া চৈতন্যকে সুধাবৎ আকর্ষণ বা পান করিতে থাকেন। ক্রমে চেতনা-লোকে একে একে চতুর্বিংশতি তত্ত্বাদি, যাবতীয় সংস্কার, সজীব, সপ্রাণ, সানন্দ হইয়া, আপন আপন দেহ লইয়া অঙ্কুরের ন্যায় ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। প্রকৃতি সর্ব্ব বীজের মাতৃ-যোনি। পরন্তু পুরুষ ফলদাতা বীর্য্য। প্রকৃতিই বিশ্বযোনি—অর্থাৎ বিশ্বে যত বস্তু আছে, সকলেরই ছাঁচ তাহার গর্ভে থাকে; পরন্তু চৈতন্য রূপ বীর্য্য ঐ ছাঁচে না পড়িলে কোন বস্তুরই অঙ্কুরণ বা দেহাকার গঠন হয় না।

সঞ্জীবনী ও মৃত্যুমন্ত্র।

অনুরাগই সঞ্জীবনী ও বিরাগই মৃত্যু-মন্ত্র। অনুরাগ স্পন্দন সংগ্রাহক, বিকাশক ও ধারক, বিরাগ স্পন্দন ত্যাগাত্মক ও সঙ্কোচক। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে যাবৎ কোন শরীরে অনুরাগ বা আসক্তি থাকে, তাবৎ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ত্যাগ হয় না, এবং কোন না কোন দেহ বিদ্যমান থাকে; এবং ত্রিবিধ শরীরের আকর্ষণ ত্যাগ হইলেই নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিশ্চেষ্ট পদ লাভ হয়। পরন্তু কালরাত্রির অবসানে মহাপ্রলয়ের পর আবার নব দেহা-ঙ্কুর উৎপন্ন হয়। চিৎশক্তি অথবা বিশ্ব প্রসবিনী (বীজ) শক্তি এই উভয়ের কোন-টিই একেবারে ধ্বংস হয় না। তবে ক্রিয়া-শক্তির সংযম ও বিকাশ যথাক্রমে চির-দিন হয়। ক্রিয়াশক্তিই চিৎশক্তির প্রকাশক। যখন ক্রিয়াশক্তি সংযম হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভাবে জ্ঞেয় বস্তুও অব্যক্ত ও অপ্রকাশক হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি নাই সুতরাং দর্শন-ক্রিয়াও নাই। জাগ্রত হইবার চেষ্টায় চেতন সেই চেষ্টায় প্রবেশ করিয়া চেষ্টাকে সচেতন ও জীবিত করিয়া রাখে।

মানস-যাগ।

সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক এই তিন প্রকারের যজ্ঞ হয়। মন কখন সাত্ত্বিক, কখন রাজসিক এবং কখন তামসিক ক্রিয়া করে, কর্ম্মের উদ্দেশ্য অবশ্য নিজের ইষ্টসিদ্ধি বা প্রাপ্তি।

যজ্ঞমণ্ডপে সাত্ত্বিক যজ্ঞ করিলে যজ্ঞের পরদিবস ঐ মণ্ডপে একটা সাত্ত্বিক উপকরণা-দির আভাস, গন্ধাদি স্বতঃই উদিত হইতে থাকে।

এই প্রকার রাজস বা তামস যজ্ঞেও হয়।

শব্দ-পরিচয়।

মনুষ্যেরা যত প্রকার শব্দাদি ব্যবহার বা চিন্তা করে, তাহার প্রত্যেকটিই অন্তরো-দিত ভাবের ব্যঞ্জক। মানস মধ্যে সদাচর তিন শ্রেণীর ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক। যে সময় মনে উপরোক্ত ত্রিশ্রেণীর অন্তর্গত কোন শ্রেণীর তরঙ্গ না থাকে, তখন শব্দো-দয় হয় না।

সাত্ত্বিক ভাবতরঙ্গ হইতে যে শব্দাদি উৎপন্ন হয়, তাহারা শ্রুতিপ্রিয় ও চিত্তপ্রসাদক হয়।

অবিদ্যোচ্ছিত ভাব হইতে যে শব্দাদি নির্গত হয়, উহারা অহংকার, দ্বেষ, কামাদি পূর্ণ হয়, সুতরাং উগ্র, কটু, অপ্রিয় হয়।

নীরোগ, নির্দ্দোষ প্রকৃতি হইতে যখন শব্দ নিঃসৃত হইবে, শব্দ সর্ব্বাঙ্গদোষ শূন্য হইবে।

নিজ চিন্তার মধ্যেই Parts of speech খুঁজিলেই গুণ ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

শাস্ত্র-দেহধারণ ও পরিচ্ছদরূপে শাস্ত্র পরিধান।

কেহ বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নির্দ্দোষ অঙ্গ হন অর্থাৎ স্বয়ং শাস্ত্রদেহ ধারণ করেন এবং কেহ বা নিজ দূষিতাঙ্গকে শাস্ত্ররূপ পরিচ্ছদের দ্বারা আবৃত মাত্র করেন। তাঁহারা নিজবলে বলীয়ান বা স্বাধীন বোধ করেন না; সদাই শাস্ত্র স্মরণের জন্য লালায়িত।

প্রেমযজ্ঞ ও ভক্তিযজ্ঞ।

যাহারা মানস-বেদীতে প্রেমযজ্ঞ ও ভক্তিযজ্ঞ করেন, তাঁহাদের সম্মুখে মহামায়া ভগবতী অত্যন্ত শুভরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হন এবং যাজ্ঞিক পুরুষকে অলৌকিক বিভূতি ও ইষ্ট প্রদান করিয়া [illegible] অন্তর্হিত হন।

তখন সর্ব্বেন্দ্রিয়াদির জড়তা দূর হইয়া অদ্ভুত আত্মৈশ্বর্য্য উদয় হয়।

মানসক্ষেত্রে ভক্তিবীজ, প্রেমবীজ ও অপরাপর বীজ।

ভক্তিবীজ ও প্রেমবীজ রোপিত হইলে, উহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় উহা অমৃতত্ব প্রদান করে অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যভেদী অভেদত্ব প্রদান করে।

ফলোৎপাদনই বীজের ধর্ম্ম। ফলোৎপাদন করা হইলেই বীজের কর্ম্ম শেষ হয়।

ভক্তি ও প্রেমবীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরাদি দেহ ধারণ করিতে করিতে অবশেষে পূজ্য ও পূজকের মধ্যে যে ব্যবধান, বা ভক্ত ও ইষ্ট বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান উহা তিরোহিত করে।

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, মধ্যাবস্থা ও অন্তাবস্থা।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ডিতভাবে বিদ্যমান থাকেন। অর্থাৎ সে সময় চিৎশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, পূর্ণাবস্থায় এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবে বিরাজ করেন।

সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-দেহ চৈতন্যে ভাসিতে আরম্ভ হয়। প্রত্যেক দেহেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব রূপরস ভেদে জন্মাইতে থাকে, এবং অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভাদি রস চৈতন্যকে আন্দোলিত করিতে থাকে।

যখন চৈতন্যে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি ও পুরুষের ভক্তি বা প্রেম সূত্র, ক্রমে কোন কখন স্মৃতপথে ক্ষীণভাবে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই অস্পষ্ট ক্ষীণ সূত্র যাহারা ধরিতে পারে, তাহারা ক্রমযোগে তত্ত্বাদিকে লয় করতঃ এবং ঐ সূত্রকে পুষ্ট করতঃ সূত্রের পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যে বা পথে ক্রমশঃই দুঃখ ক্ষীণ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এবং স[illegible] পূর্ণানন্দে উপনীত [illegible] সূত্র লয় হয়। তখন দেহ [illegible] সর্ব্ববিকাররহিত পূর্ণানন্দ পুনরুদ্ভাসিত হয়।

আকর্ষণ।

আকর্ষণক্রিয়া দ্বিবিধ—একটি প্রেমাকর্ষণ বা সম্মিলনী ও আর একটি ভেদাকর্ষণ বা বিচ্ছেদক।

যেমন স্বপ্নকালে, স্বপ্নদ্রষ্টা আপনাকে বহুভাবে বিভক্ত করিয়া, দ্রষ্টা পশ্বাদি রূপ বিবিধ ভেদবিশিষ্ট ক্ষেত্র উৎপাদন করে, তদ্রূপ ভেদাকর্ষণ এক আত্মাকে বহুভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়; এবং তখন পূর্ণ-ভাব খণ্ডিত হইয়া যায় এবং নিজের পূর্ণ ভাবকে পুনঃ সংগ্রহকরা তখন দুরূহ হইয়া উঠে।

অবিদ্যার অধ্যাসবশতঃ ধ্যান হইতে প্রত্যক্ষ জগতের প্রকৃত মর্ম্মলোপ এবং দুঃখানুভবের বৃদ্ধি।

যে চৈতন্য ও ক্রিয়াশক্তিরূপ সূত্রে, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষসমন্বিত এই অনাদি, অনন্ত, অত্যদ্ভুত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-গ্রথিত, সেই নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বকারণ, অক্ষয় বস্তুতে অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আকৃষ্ট হওয়াই প্রেম ও ভক্তি।

মহতের মহত্ত্ব অনুভব—প্রথমে অনুরাগ ও ভক্তি—তৎপরে প্রাপ্তি।

যতক্ষণ মন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জড়িত হইয়া থাকে, ততক্ষণ এই যে অতীব মহান কারণপ্রসূত অসীম ব্রহ্মাণ্ড অষ্ট প্রহর নয়নগোচরে বিরাজিত, ইহাকে লক্ষ্যও করে না এবং ইহার মর্ম্ম সাক্ষাৎকার করে না; সুতরাং সদাই ক্ষুদ্রভাবের দ্বারা প্রপীড়িত হয়।

ব্রহ্মদর্শন।

যিনি ব্রহ্মদর্শন করেন, তিনি প্রভেদে অভেদ দর্শন করেন; তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি সর্ব্বত্র সম-দর্শন করিতে পান। তাঁহার অন্তঃকরণ সদাই কারণে লীন থাকে।

অনুরাগ বৰ্দ্ধন।

তুমি চৈতন্য ও শক্তিতে অনুরাগ বর্দ্ধন কর। প্রপঞ্চাতীত পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিকে আপনার হৃদয় মধ্যে লক্ষ্য কর।

তোমার হৃদয়ে যেন প্রেম ভিন্ন কোন কারণে অন্য তরঙ্গ উদিত না হয়।

জ্ঞান ও অনুরাগ বা প্রেম।

যে বস্তুতে প্রকৃত অনুরাগ না হয়, সে বস্তুর প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয় না এবং যে বস্তুর জ্ঞান না হয়, সে বস্তুতে প্রকৃষ্ট অনুরাগও হয় না।

সুতরাং জ্ঞানবৃত্তি ও অনুরাগবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গেই বৰ্দ্ধিত হয়; এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ প্রেম এক অভিন্ন দেহ ধারণ করে।

চৈতন্য ও শক্তি সূত্র।

তোমার দেহাভ্যন্তরে যে চৈতন্য ও শক্তি-সূত্র আছে, তুমি সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মপদে আরোহণ কর।

পরমাত্মস্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি।

সেই পরমাত্মস্বরূপ, পুরুষ ও প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভবগোচর। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-গোচর নহেন।

চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ী।

চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ীর, হস্ত পদাদি কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ই নাই; পরন্তু এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, স্বয়ং ইচ্ছাবলেই সম্পাদন করিয়া থাকেন।

সেই পরম পবিত্রা, মঙ্গলময়ী ইচ্ছাদেবী আত্মচৈতন্য মধ্যে যে ইচ্ছা আবির্ভাব করেন, চৈতন্যের মধ্যে ও বাহিরে সেইরূপ প্রকট হয়।

পুরুষ-প্রকৃতির প্রেম।

যতক্ষণ ইচ্ছাময়ী আপনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে না পান, ততক্ষণ তিনি নির্জীব, জড়বৎ হইয়া থাকেন।

চিৎস্বরূপ পুরুষ ভিন্ন তাঁহাকে, তাঁহার স্বরূপ দেখাইবার আর কাহারও সাধ্য নাই।

রাধা সেই কারণেই ক্ষণকালের জন্য কৃষ্ণবিরহিনী জীব হইয়া পড়িতেন। যে ইচ্ছায় চৈতন্য নাই, সে ইচ্ছার কোন মূল্যই নাই সে ইচ্ছার রূপ, প্রাণশক্তি কিছুই নাই। সেই কারণেই ইচ্ছাময়ী প্রকৃতি পুরুষকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ও সতত তাঁহার মঙ্গলরূপ ধ্যান করেন।

শুভাশুভ (সত্ত্ব রজ ও তম) যতগুলি ইচ্ছা, সব ইচ্ছাময়ীর নিজের ধন। চৈতন্যাংশ কেবল পুরুষের।

ভাবোদয়ের অর্থ বা স্বরূপ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পর এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ চিদাকাশই থাকেন, তাহার পর সেই সর্ব্বোপদ্রববিহীন চিদাকাশে দৈবাৎ যেন সৌদামিনীর আকাশে প্রকাশের ন্যায় ক্রিয়া বা মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়।

এই ক্রিয়া বা মূর্ত্তি, অব্যক্ত কারণগর্ত্ত হইতে নিঃসৃত হয়।

এই ক্রিয়া বা মূর্ত্তি সংস্কার রূপে আপন কারণ-যোনিতে লুকাইয়া চুপচাপ বিশ্রাম করে এবং সৃষ্টির কাল ও ঈশ্বরেচ্ছা উপস্থিত হইলেই কারণগর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসে।

শক্তি যখনই অব্যক্ত কারণগর্ত্তের বাহিরে আসিবে, তখনই একটী না একটি ছন্দ বা মূর্ত্তি ধরিয়া শব্দ করিবে।

আমরা যখনই যে কর্ম্ম করি না কেন, উহা শক্তিক্রিয়া ভিন্ন অপর কিছুই নহে; অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব ধর্ম্মশীলা শক্তির কার্য্য।

কারণ-গর্ত্তই শক্তির বিশ্রাম স্থল—ইহা অত্যন্ত তমোময় ও গোপনীয়।

মহামায়া তাঁহার গর্ত্তের অভ্যন্তর কাহাকেও দেখিতে দেন না। তিনি বলেন গর্ত্তে যাহা আছে, তাহা যখন বাহির হইবে, তখনই দেখিবার সময়; সুতরাং তখনই দেখিও।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:0:—

আমি তোমার হলেম কই ?

আমারি লাগিয়ে ধরায় এসেছ,
আমারি লাগিয়ে বিষয়ী সেজেছ,
আমারি লাগিয়ে শান্তি হারায়েছ,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তোমার পরাণে পরাণ ঢালিয়ে,
তোমার ভাবেতে ভাব মিশাইয়ে,
তোমারি করমে মন প্রাণ দিয়ে,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তোমার মূরতি হৃদয়ে স্থাপিয়ে,
ভক্তি-পুষ্প দিয়ে তোমারে পূজিয়ে
তোমারি চরণে স্বার্থবলি দিয়ে,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তুমিই ত সব একথা জানিয়ে,
পুত্র পরিজন সকল লইয়ে,
চরণে তোমার আত্মসমর্পিয়ে,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তুমি ত আমায় নিতেছ টানিয়ে,
অহংজ্ঞানে মেতে অবিশ্বাসী হ'য়ে,
প্রতি পদে পদে যেতেছি সরিয়ে,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তুমি আস কাছে আমি যাই দূরে,
তুমি দেও ধরা আমি দেই ছেড়ে
তুমি মোরে ডাক আমি চাহি না ফিরে
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তুমি ডাক আয় আমি বলি যাই,
তুমি দেও দেখে আমি ত না চাই
তুমি নেও কোলে আমি নেমে যাই,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

তোমার আদেশ করিয়ে পালন,
অনাথের দুঃখ করিতে মোচন
সেবকের ব্রত করিয়ে গ্রহণ,
আমি তোমার হ'লেম কই ?

দীন—উমেশচন্দ্র ।

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধু-মহাসম্মিলনী ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রারম্ভিকা সাধু-ধর্ম্ম-মহাসভা :—১৩১৯ সনের মাঘমাসে সর্ব্ব প্রথম এই মহাসভা স্থাপিত হয়। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি সাধনকরা,—বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত হইয়া আপন আপন সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানকরা, যাহাতে কোন প্রকারে ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা, অসাধু এবং ভণ্ড

লোকদিগকে সম্প্রদায় হইতে বাদদিয়া যাহারা প্রকৃত সাধু তাহাদিগের নাম এই মহাসভায় তালিকাভুক্ত করতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গৌরব রক্ষা করা, সৎগৃহস্থগণকে যথাবিধি উপদেশ প্রদানে তাহাদের উন্নতি বিধান করা ইত্যাদি। এই সভার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন ঋষিকেশে হইয়াছিল; তৎপর চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশন কণখলে এবং ষষ্ঠ অধিবেশন ৺কাশীধামে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কণখলে এই মহাসভার সপ্তম অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কুম্ভ উপলক্ষে এই সভার পক্ষে কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও এই অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হয় এবং উক্ত মহাসভার একটী স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় যথা:— সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দজী-(কণখল)। সহকারী সভাপতিগণ (১) মোহন্ত লছমনদাসজী—(দেহরাদুন,) (২) মোহন্ত গোপাল গিরিজী—(নির্ব্বাণী-আখড়া,) (৩) মোহন্ত পূর্ণানন্দ গিরিজী (কৈলাস, হৃষিকেশ,) (৪) মোহন্ত রামসিংজী—(নির্ম্মলা আখড়া,) (৫) মোহন্ত মতিরামজী (উদাসীন বড় আখড়া,) (৬) মোহন্ত ব্রহ্ম নারায়ণজী—(উদাসীন নয়া আখড়া), (৭) মোহন্ত মহাদেব গিরিজী (নিরঞ্জনী আখড়া), (৮) মোহন্ত হরিনাথ সিংজী— (গুরু দুয়ারা,) মন্ত্রী—শ্রীমৎস্বামী শিবদয়াল গিরিজী—(হরিদ্বার) ও স্বামী দয়ানন্দজী— (ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল)। সহকারী মন্ত্রী— শ্রীমৎস্বামী জগদীশ্বরানন্দজী-ভারতীজী ও সন্ত মানসিংজী—(কণখল)। কোষাধ্যক্ষ—মোহন্ত লছমন দাসজী—(দেহরাদুন)। এই মহাসভার বিশেষ অধিবেশনে যে সকল নিয়ম সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল।

(১) সকলের হিত-চিন্তা করার জন্য এবং আপন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, সর্ব্ব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাত্মাগণকে লইয়া এই মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(২) এই সভা সর্ব্বগান্য পরম পবিত্র সাধুগণকে ধার্ম্মিক লোকের নিকট প্রচার করিবে।

(৩) ভারতবর্ষের লোকগণ যাহাতে সৎধর্ম্ম, সদ্বিচার এবং সদাচারে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহাতে ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তি ঈশ্বরসত্বা ঈশ্বরজ্ঞান প্রভৃতি সদ্বিদ্যা ও সদুপদেশ লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে এই সভা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবে।

(৪) দশনামী সন্ন্যাসিগণ, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ, উদাসীন, নির্ম্মলা, গরীবদাসী, নিরাকারী, যোগী, চরণদাসী, কবিরপন্থী, দাদুপন্থী সাধুগণ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ প্রত্যেকে আপন আপন সম্প্রদায়ের কোন একটী বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিবে এবং যাহাতে সেই বিশেষ চিহ্ন দেখিলেই এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে সহজে চিনিয়া লইতে পারে এরূপ করিতে হইবে। গৈরিক বসন, জটা, ভস্ম, মুদ্রা, কণ্ঠী তিলক, পাত্র কিম্বা অন্য কোন প্রকার বিশেষ চিহ্ন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরিচায়ক চিহ্ন করিতে হইবে।

(৫) এইসভা ধর্ম্মানুরাগী সাধুগণের এবং সদ্‌গৃহস্থের আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে অনুরোধ করিবে।

(৬) কোন সম্প্রদায়ের ভিতর অনিষ্টকারী মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে এই সভা তাহা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

(৭) আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য যে সব ভণ্ড লোক সাধুবেশ ধারণ করতঃ সাধুধর্ম্মে কলঙ্ক অর্পণ করিতে প্রয়াসী, সেই সব লোককে দমন করিতে এই সভা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং আবশ্যক হইলে এবিষয়ে পুস্তিকা ছাপাইয়া কিম্বা খবরের কাগজে লিখিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

(৮) সাধু মহাত্মাদের নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে, তাহারা বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক যেন শিষ্য নির্ব্বাচন করেন—যাহাতে সেই শিষ্য সুশিক্ষিত হইয়া আপনার এবং জগতের উপকার করিতে পারে।

(৯) জীব মাত্রকেই রক্ষা করিতে এই সভা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তন্মধ্যে গোরক্ষা একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) এই সভা মদ্য, মাংস, গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করিবে।

(১১) সংসারত্যাগী, আত্মনিষ্ঠ, সাধুধর্ম্ম-চরিতার্থকারী, বিরক্ত কিম্বা বৃদ্ধ সাধু মহাত্মাগণ যাঁহারা হৃষিকেশ প্রভৃতি পবিত্র স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করার জন্য এই মহাসভা সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে।

(১২) সময় উপযোগী কোন বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক হইলে, এই মহাসভা এক বিশেষ সভা আহ্বানকরতঃ সে বিষয়ের মিমাংসা করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান মঠ ও আগড়াধারী সাধু মহাত্মাগণ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, পঞ্জাবের জজ রায় বাহাদুর লালা ভগবানদাসজীপ্রমুখ বহু শিক্ষিত সজ্জনগণ উপরোক্ত মহাসভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

কুম্ভ উপলক্ষে এই মহাসভার একটী বিশেষ অধিবেশনে সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, আগামী ১৯১৮ সনে প্রয়াগধামের কুম্ভমেলাতে এই মহাসভা, প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহাতে রীতিমত কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে উদ্যোগী হইবেন।

এই মহাসভার মূল লক্ষ্য যথাঃ—

"সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ" ॥

অর্থাৎ সকলেই সুখী হউক, সকলেই নিরোগ হউক, সকলেই জগতের যাবতীয় দৃশ্য মঙ্গলের চক্ষে দর্শন করুক, কেহই যেন দুঃখ না পায়।

কয়েকটী অদ্ভুত সাধুঃ—

(১) উদাসীবাবা—ইনি একজন নানকপন্থী বৃদ্ধ সাধু, চুলদাড়ি সমস্তই পক্ক হইয়াছে। ইনি বহুরূপীর ন্যায় এক এক দিন এক এক রকম অদ্ভুত বেশভূষা পরিয়া হরিদ্বার সহরে এবং অধিকাংশ সময়ে গঙ্গার বাঁধান চত্বরে ভ্রমণ করিতেন, কোন দিন বহুমূল্য রেশমের রঙ্গিন আলখেল্লা গায়ে দিয়া, জুতা মোজা পরিয়া, হাতে পায়ে ঘুঙুর, মাথায় ময়ূরপাখানির্ম্মিত দেড়হাত দীর্ঘ অপূর্ব্ব উষ্ণীষ প্রভৃতি ধারণ করিতেন,

কোন দিন বা কাল রঙ্গের অদ্ভুত পোষাক পরিতেন। বৃদ্ধ সাধুর এই অপূর্ব্ব বেশ দর্শনে বহুলোক আকৃষ্ট হইত এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। লজ্জার অতীত না হইলে এরূপ অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়া রাজপথে বাহির হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবেনা। ইনি সর্ব্বদাই হাস্যমুখে অবস্থান করিতেন এবং ইহাঁর মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব তেজ পরিলক্ষিত হইত। বহু সাধু সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণ ইহাঁকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং একজন বড় সাধু বলিয়া গণ্য করিতেন; কেহ পয়সাকড়ি দিলে ইনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। একদিন একটী ভদ্রলোক ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা আপনি এরূপ অদ্ভুত বেশ ধারণ করেন কেন ?" ইনি উত্তর দিলেন "এত ভিড়ের মধ্যে প্রকৃত সাধু দর্শন সাধারণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, সাধুকে চিনিয়া লওয়াও বড়ই কঠিন, তাই আমি এরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি; আমার অদ্ভুত বেশে সর্ব্ব সাধারণ আকৃষ্ট হইবে এবং অদ্ভুত সাধু-দর্শনজনিত পুণ্য লাভ করিবে"।

(২)পাগল বাবা —ইনি উন্মাদের ন্যায় গঙ্গার বাধান চত্বরে এবং ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে অবস্থান করিতেন। ইনি কাহারও সহিত কথা বলিতেন না, কখন গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা শরীরেই বসিয়া থাকিতেন, কখনও বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন। একখানা ছিন্ন নেংটী মাত্র ইহাঁর পরিধানে ছিল, একটী সুবৃহৎ রজ্জুতে কতকগুলি গ্রন্থিদিয়া মুণ্ডমালার ন্যায় ইহাঁর গলায় ঝুলান ছিল। কোন লোকে প্রথমে এই রজ্জুতে ২টী বড় বড় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিয়াছিল; ইনি চলিবার সময় অদ্ভুত ঘণ্টাধ্বনি হইত, ক্রমশঃ লোকে কৌতূহল-পরবশ হইয়া প্রায় ৮।১০ টা বড় বড় ঘণ্টা ঐ রজ্জুতে বাঁধিয়া দিয়াছিল, ইনি কাহারও কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না—যেন সুখদুঃখের অতীত হইয়া গিয়াছেন। ইহার মুখমণ্ডল বড়ই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল এবং দেখিলেই বোধ হইত যেন তাঁহার মন বাহ্য-জগত হইতে অপসারিত হইয়া গভীরতম অন্তর্জ্জগতে নিবিষ্ট হইয়াছে। শুনিলাম ইনি নানকপন্থী উদাসী সাধু; নানকপন্থীগণ গঙ্গার চত্বরে যখন ভজন গান করিতেন, তখন মধ্যে মধ্যে ইহাকে তাঁহাদের সন্নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত, কেহ কোন খাবার দিলে তাহা মাটিতে ফেলিয়াদিয়া, ধূলা-কাঁদামাখা সেই খাদ্যদ্রব্যগুলি কুড়াইয়া খাইতেন।

(৩) বৈষ্ণব বাবা —ইনি একজন রামাইত বৈষ্ণব। ঘাগড়ার ন্যায় কোচান, গেরুয়া রঙ্গের আলখেল্লা গায়ে দিয়া, মুখে চন্দন অনুলিপ্ত করিয়া এবং মস্তকে ময়ুর পাখার অপূর্ব্ব উষ্ণীষ ধারণ করিয়া ইনি গঙ্গার চত্বরে এবং নানাস্থানে ভ্রমন করিতেন। ইহাঁর হাতে ময়ুরের পাখা নির্ম্মিত একখানা পাখা সর্ব্বদাই থাকিত। ইনি সেই পাখা দ্বারা সম্মুখে যাহাকে পাইতেন, তাহাকেই "মেরে রাম," "মেরে রাম" বলিয়া কয়েক বার বাতাস করিতেন, আবার নাচিতে নাচিতে গান করিয়া চলিতে থাকিতেন; কখনও বা অপূর্ব্ব নৃত্য সহকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করুণস্বরে এমন মর্ম্মস্পর্শী গান ধরিতেন যে, সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিত,—ইহারও

মনপ্রাণ যেন সেই গানে লীন হইয়া যাইত। হিন্দু সভার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে ইনি সভায় গিয়া উপস্থিত হন এবং সভাপতির নিকটেই একখানি চেয়ারে বসেন। সভার কার্য্যাবলী বোধহয় তাঁহার মত ভাবুকের নিকট ভাল লাগিল না, তাই কিছুক্ষণ পরেই তিনি হঠাৎ উঠিয়া একটী গান ধরিলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে কখন মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যাক্তিগণকে, কখনও বা নিম্নে আসিয়া দর্শকগণকে বাতাস করিতে লাগিলেন; সভাসমেত একটী আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল; এইরূপে ৮।১০ মিনিট কাল আনন্দ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সভা পরিত্যাগ করিলেন। অন্য একদিন ব্রহ্ম-কুণ্ডের মঞ্চের নিকটে কয়েকটী শ্বেতাঙ্গ রাজ-পুরুষআসিয়া দাঁড়াইলে ইনি "মেরে রাম", "মেরে রাম" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগকে বাতাস করিতে লাগিলেন—সাহেব-গণ হাস্য করিতে লাগিলেন, কতক সময় এইরূপ করিয়া ইনি আবার নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চত্বরে আসিয়া গান ধরিলেন। ইনি সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বঘটে তাঁহার "রামকে" দর্শন করিতেন,—এরূপ আনন্দময় মহাত্মাকে দর্শন করিতেও আনন্দ !!

(৪) নেংটা বাবা—ইনি নানকপন্থী ধুনিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত সাধু। ভৈরবের মত ইহাঁর সুদীর্ঘ ও বৃহদাকার শরীর বিভূতি-মণ্ডিত থাকিত; ইনি নেংটা হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন এবং অনেক সময় কণখলের ছোট উদাসীগণের আখড়াতে থাকিতেন। ইনি সাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না, বহুলোক ইহাকে একজন বিশিষ্ট সাধু বলিয়া মান্য করিত। একদিন ছোট উদাসী আখ-ড়াতে দেখিলাম জনৈক ব্যক্তি কুপ হইতে জল তুলিয়া ইহার মস্তকে ঢালিয়া দিতেছে, ইনি দিগম্বর বালকের মত দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছেন, অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। তিনি ঐ অবস্থায় থাকিয়াই মূত্র-ত্যাগ করিলেন, কোন প্রকার সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করিলেন না, আমাদের বোধ হইল বাহ্য জগতে যেন তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না।

(৫) বালক সাধু—কণখলের উদাসী ছোট আখড়াতে একটী ২।৩ বৎসর বয়স্ক বালক সাধুর ব্যবহারে আমরা বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই বালকের শরীর বিভূতিমণ্ডিত ছিল এবং চুলগুলি শিখদের মত মাথার উপরে চূড়া বাঁধা ছিল। এই বালকটী হঠাৎ আমাদের দলে আসিয়া প্রত্যেকের পা জড়াইয়া ধরিয়া টিপিয়া দিতে লাগিল—প্রথমে ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমার বোধ হইল, পয়সার জন্য ঐরূপ করিতেছে; তৎপর সেখান-কার একটী সাধু আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই বালকটীকে "সাধু সেবা" শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাই সে আপনা-দিগকে ঐভাবে সেবা করিতেছে। আমরা শুনিয়া ত অবাক, বালকটীর উপর স্নেহ-পরবশ হইয়া তাহার আহারের জন্য কিছু পয়সা দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বালকটী তাহা গ্রহণ করিল না এবং অন্য সাধুটীও গ্রহণ করিলেন না—তিনি বলিলেন পয়সা গ্রহণকরা তাঁহাদের নিয়মবিরুদ্ধ। আমাদের সঙ্গীয় একজনের নিকট কুল ছিল,

তাহারই দুইটা ঐ বালকের হস্তে দিয়া আমরা বিদায় হইলাম। বিভূতিমণ্ডিত এই বালক সাধুটীকে দেখিয়া এবং তাহার ব্যবহারে আমরা যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত।

(৬) ধ্যানী বাবা—ইনি ভীমগড়ার নিকটে একটী বাগানে তাবুর ভিতর আসন করিয়াছিলেন; একটী খাটিয়ার উপর বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, কখনও হাত দুইটী অভয় দেওয়ার মত কিছু উঁচু করিয়া এক-ভাবে কয়েক ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতেন, সমস্ত শরীর যেন আড়ষ্ট হইয়া যাইত; আবার কখনও বা বাহজগতে পলকহীন দৃষ্টি দেখা যাইত, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে বাহ্য কোন বস্তু দর্শন হইতেছে বলিয়া বোধ হইত না। একদিন তাঁহার ঐরূপ বাহ্যদৃষ্টি দেখিয়া আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন একটী পাঞ্জাবী লোক আমাকে বলিল "কে আপনার কথার উত্তর দিবে, বাবা কি ইহজগতে আছে ?" বহু পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য লোক সেখানে বসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিত, কেহ বা জলখাবার রাখিয়া দিত। কোন সময়ে তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হইলেও ভাবাবেশ থাকিত এবং কেহ কেহ হাতে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিত—সেই অবস্থায় কখন কখন খাবার জিনিস মুখেই থাকিয়া যাইত, তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হইয়া যাইতেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিত।

(৭) পঞ্চধুনী বাবা—ইনি ভীমগড়াতে গঙ্গাতীরে আসন স্থাপনা করিয়াছিলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আসনের অদূরে চারি কোণে চারিটী বৃহৎ এবং সম্মুখে একটী ছোট এই পাঁচটী প্রজ্জ্বলিত ধুনির মধ্যস্থলে ইনি দিবাভাগে বসিয়া তপস্যা করিতেন এবং রাত্রিকালে এই উন্মুক্ত স্থানেই পড়িয়া থাকিতেন। এই বড় চারটী ধুনি প্রতিদিন প্রাতে গোবরের ঘুটে সাজাইয়া ছোট গম্বুজের মত করা হইত, তৎপর বেলা নয়টার সময় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইত; প্রজ্জ্বলিত চিতার ন্যায় ধূ ধূ করিয়া ধুনিগুলি জ্বলিতে থাকিত! একে চৈত্র মাস, তারপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর তেজ, তাহার উপর এই প্রকার ৫টী অগ্নিকুণ্ড। ইহা যে কিরূপ কঠোর সাধন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, এই ধুনির ৫।৬ হাতের মধ্যে কেহ যাইতে পারে না—অগ্নির উত্তাপে দম্ আটকাইয়া যায়; আর এই প্রকার পাঁচটী ধুনির মধ্যে সমস্ত দিন কৌপিনমাত্র পরিহিত অবস্থায় বসিয়া থাকা যে কি ব্যাপার তাহা ধারণাতীত! ধুনিগুলি ইঁহার আসন হইতে দুই হস্তের অধিক দূরে হইবে না, অগ্নি-শিখা অনেক সময় বাতাসে পরিচালিত হইয়া যেন ইঁহার গাত্র স্পর্শ করিত! ইঁহার মস্তকে প্রকাণ্ড জটাভার ছিল, জটাগুলি অগ্নি শিখায় পুড়িয়া যাইবে বলিয়া একটী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সবগুলিকে জড়াইয়া বাধিয়া রাখিতেন; সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধুনিগুলি নির্ব্বাপিত হইত। ধূম্র এবং অগ্নিতাপে ইঁহার শরীরের চর্ম্ম একেবারে কাল হইয়া গিয়াছিল। এরূপ কঠোর তপস্যাকারী সচরাচর কম দৃষ্ট হয়। ইঁহার সঙ্গে দুই

তিনটী চেলা ছিলেন, তাঁহারাই ধুনির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ঃ—কুম্ভ-উপলক্ষে সরকার পক্ষ হইতে ভীমগড়ার নিকটে মাননীয় সুখবীর সিংহের বাগান বাটীতে, গঙ্গার অপর পারে এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে কয়েকটী অস্থায়ী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছিল। মোহিনী আশ্রমে ৺কালী কম্বলীবাবার দাতব্য ঔষধালয় অস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার "মাড়ওয়ারী সহায়ক-সমিতির" পক্ষ হইতেও কয়েকটী দাতব্য অস্থায়ী ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছিল। "ভোলানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়" নামক একটী ঔষধালয় ভোলানন্দ গিরির ভক্ত ও শিষ্যগণকর্ত্তৃক তাঁহারই ধর্ম্মশালাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কণখলের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য! এই আশ্রমে স্থায়ীভাবে ঔষধালয়, হাসপাতাল, সেবাবিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কুম্ভ উপলক্ষে কলেরা রোগীর জন্য একটী নূতন হাসপাতাল খোলা হইয়াছিল। এই আশ্রমের সেবকগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া রোগীর সন্ধান করিতেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য সেবার ব্যবস্থা করিতেন; ইহাদের কার্য্যাবলী অতীব প্রশংসনীয়। এই আশ্রম বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ।

সেবাসমিতিঃ—কুম্ভ উপলক্ষে সেবাকার্য্যের জন্য কলিকাতার মাড়ওয়ারীগণ "মাড়ওয়াড়ী সহায়কসমিতি" নামক একদল বিভিন্নদেশীয় যুবককে স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতেও "প্রয়াগ-সেবাসমিতি" নামক একদল হিন্দুস্থানী স্বেচ্ছাসেবক সেবাকার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ পুলিশের সহায়করূপে শান্তিরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; কেহ বা পথভ্রষ্ট যাত্রীগণকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অপর কেহ বা আহত কিম্বা রোগীদিগকে যথাযোগ্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া উপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সকল সেবকগণের মধ্যে দু'চার জন, অভিজ্ঞতা অভাবে যদিও পবিত্র সেবাব্রতের উচ্চ ভাব ভুলিয়া গিয়া, আপনার উদ্ধত স্বভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তথাপি মোটের উপর ইহারা অতীব প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

নৃপতি বর্গঃ—কুম্ভ উপলক্ষে কাশ্মীর জম্মুর মহারাজা ও মহারাণী, নাভার মহারাজা দ্বারবঙ্গের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা, কাশীমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও মহারাণী (কাশীমবাজার) প্রভৃতি শুভাগমন করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা কুম্ভযোগে লক্ষাধিক টাকা নানা ভাবে দান করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজাও বহুলোককে আশ্রয়দান এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মশালাঃ—কাশ্মীর মহারাজের ধর্ম্মশালা, পাতিয়ালার মহারাজের ধর্ম্মশালা, রায়বাহাদুর সুরজমলের ধর্ম্মশালা কুম্ভ উপলক্ষে যাত্রীগণে পরিপূর্ণ থাকিত। এই সম্পর্কে কণখলে গিরিশচন্দ্র বসুর ধর্ম্মশালা সম্পর্কে দু'একটী কথা উল্লেখ করিতে হইল কোন

কোন যাত্রী এই ধর্ম্মশালাতে যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও সেখানে স্থান না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন; তাহারা অবগত হইয়াছেন যে, ধর্ম্মশালার পরিচালকপক্ষের আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবের জন্য বহু স্থান রক্ষিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ধর্ম্মশালাটীর এরূপ পক্ষপাতিত্ব ভাব শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম; অপ্রীতিকর হইলেও একমাত্র সত্যের খাতিরে এবিষয় উল্লেখ করিলাম। আশাকরি ধর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতের জন্য যথাবিহিত সুব্যবস্থা করতঃ সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

সরকারী ও মিউনিসিপ্যালিটীর বন্দোবস্ত ঃ—কুম্ভ উপলক্ষে শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, মেলাস্থানে আলো দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সরকার বাহাদুর এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী নানা প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হরিদ্বার, গঙ্গার অপর তীরে রোড়ীদ্বীপ প্রভৃতি মেলাস্থানে বৈদ্যুতিক আলো প্রদানের জন্য হরিদ্বার বাজারের নিকট গঙ্গাতীরে একটী অস্থায়ীভাবে সুবৃহৎ বাষ্পপরিচালিত ইঞ্জিন বসান হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে বহু সংখ্যক সাধারণ আলোকস্তম্ভ অস্থায়ী রূপে স্থাপিত হইয়াছিল। মেলার অনেক স্থানে পুলিশের "ছাউনী" এবং অস্থায়ী থানা বসিয়াছিল। শেষ স্নানের কিছুদিন পূর্ব্বে অত্যধিক সংখ্যক সৈন্য এবং পুলিশের আগমন হইয়াছিল; বহু অশ্বারোহী দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। স্নানের আট, দশদিন পূর্ব্ব হইতেই এত লোক-সমাগম হইতেছিল যে, মেলা স্থানের রাস্তাগুলিদিয়া যাতায়াত করা একরূপ কঠিন হইল। এই অসুবিধা দূর করণার্থ প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির মধ্যস্থলে ৩০।৪০ হাত অন্তরে এক একজন করিয়া পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক রাস্তার অর্দ্ধভাগ যাত্রীদিগের গমনের জন্য এবং অপরার্দ্ধ আগমনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; প্রহরীগণ গমনশীল যাত্রীদিগকে রাস্তার বামভাগে এবং আগমনশীল যাত্রীদিগকে দক্ষিণভাগে পরিচালিত করিত। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটেও এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেখানে আরও অধিক সংখ্যক পুলিশ নিযুক্ত হইয়াছিল; তাহারা হাতে হাতে দড়ি কিম্বা জড়ান কাপড় ধরিয়া যাতায়াতের পথ বিভাগ করিয়া দিত।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। এত ভিড় সত্ত্বেও রাস্তাঘাট, নর্দ্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল—কি গঙ্গার ঘাট, কি বাধান চত্বর কোথাও একটু আবর্জ্জনা জমিতে পারিত না, সর্ব্বত্রই ঝাড়ুদারগণ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। বহু অস্থায়ী পায়খানা এবং মূত্রত্যাগের স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল; কোথাও ময়লা জমিতে পারিত না—মেথরগণ সর্ব্বদাই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত এবং কিছুকাল পরে পরেই ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফিনাইল প্রভৃতি প্রতিষেধক দ্রব্য ঢালিয়া দিত, এজন্য এত ভিড় সত্ত্বেও মলমূত্র ত্যাগের স্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত এই সব বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করার জন্যও বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। আবর্জ্জনার গাড়ীগুলি আলকাতারা মাখান ভিজান চট দ্বারা ঢাকিয়া নেওয়া হইত। পাণ্ডাগণ

যাহাতে এক কোঠাতে বহু সংখ্যক যাত্রী পুরিয়া স্বাস্থ্যের হানি না করিতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক কোঠা এবং ঘরের দরজাতে টিকেট বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; অর্থাৎ সেই ঘরে কিম্বা কোঠাতে কতজন যাত্রী রাখিতে পারিবে, তাহা সেই টিকিটে লিখা ছিল। এই নিয়মের অন্যথা করিলে বিশেষ শাস্তির বিধান ছিল; কয়েক জন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী রাত্রি নয়টা দশটার সময় মধ্যে মধ্যে ঐ সব স্থানের যাত্রি গণনা করিয়া যাইতেন। মোটকথা স্বাস্থ্যের জন্য মানুষের পক্ষে যতদূর করা সম্ভবপর, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। এত ভিড়ের মধ্যেও এরূপ সুশৃঙ্খলা এবং সুব্যবস্থা থাকায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হয় নাই। ইহা অতীব প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

সরকারী ইস্তাহারঃ—কুম্ভের শেষ স্নানের দিন শান্তিরক্ষা এবং সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য সরকার পক্ষ হইতে হিন্দি, উর্দ্দু ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত একখণ্ড বৃহৎ ইস্তাহার স্নানের কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রচারিত এবং বিতরিত হইয়াছিল; তাহার সারমর্ম্ম এখানে বিবৃত করা হইল। এই ইস্তাহারটী চারিভাগে বিভক্ত ছিল; যথা (১) গাড়ী, বোঝাই মাল, নূতন যাত্রী প্রভৃতির বন্দোবস্ত। (২) ব্রহ্মকুণ্ডস্নানে সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের নিয়ম। (৩) সাধুদিগের শোভা-যাত্রা। (৪) সাধারণ উপদেশ। মেলাস্থানের যে কোন রাস্তাতেই স্নানের পূর্ব্ব রাত্রি হইতে স্নান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার শকট, কি বোঝাই মালের গাড়ী, কি অন্য কোন প্রকার বাহনাদি যাতায়াত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সকল রাস্তার কোন স্থানেই কোন প্রকার মালামাল, কি প্রতি-বন্ধককারী কোন জিনিষ রাখিতে দেওয়া হইবে না; স্নানযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কোন প্রকার বোঝা কিম্বা অপরের অসুবিধা-উৎপাদনকারক কোন দ্রব্য বহন করিতে পারিবে না। কেহ জুতা লইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে যাইতে পারিবে না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে জুতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; এরূপ অবস্থায় জুতা হারাইয়া যাওয়াই সম্ভাবনা অধিক। যে সকল নূতন যাত্রী স্নানের দিন আসিবে এবং যাহাদের বাসস্থান পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে এবং বেলওয়ালা দ্বীপে সরকারী রক্ষিত স্থানে সেই দিন যাইতে পারিবে।

স্নানের দিন সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমগ্র মেলাস্থানকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের লোকদিগের যাতায়াতের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। (১) মায়াপুর, কণখল, জ্বালাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আগত লোকগণ হরিদ্বারের সড়ক রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইবে; তৎপর ১।২।৩ নং ফটক পার হইয়া ব্রহ্ম-কুণ্ডে পৌছিলে তথায় স্নানাদি শেষ করতঃ গঙ্গার বাঁধান চত্বর হইয়া ৪ নং পুলে গঙ্গা পার হইবে, তৎপর ৭ নং পুলে পুনরায় গঙ্গাপার হইয়া সহরে প্রবেশকরতঃ আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাইবে। (২) ভীমগড়ার এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকগণ ভীমগড়ার রাস্তায় অগ্রসর হইবে এবং ৭।৬।৪ নং ফটক পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌছিলে তথায় স্নানাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত

মতে গঙ্গা পার হইবে ও তথা হইতে ১২।১১২ নং পুলে পার হইয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাইবে। (৩) হরিদ্বার বাজার "লালতারাও" ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকগণ বাজারের রাস্তায় আসিয়া ৮।৯ নং ফটক পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌছিবে, তথায় স্নানাদি করিয়া উপরোক্ত ১ নম্বরের অনুরূপ গন্তব্যস্থানে যাইবে; তবে মেলার টিকিট * দেখাইতে পারিলে কুশাবর্ত্ত ঘাটের দক্ষিনের গলি দিয়া তাহাদিগকে সহরে ঢুকিতে দেওয়া হইবে। (৪) "রোড়ি" দ্বীপ, বেলওয়ালা দ্বীপ, বিজনোর, গাড়ওয়াল প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত জনসমূহ ১১।৩ নং পুলে গঙ্গা পার হইবে; তৎপর ৫।৪ নং ফটক পার হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌছিলে তথায় স্নানাদি সমাপনকরতঃ ৪ নং পুলে পুনরায় গঙ্গা পার হইয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাইবে। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে নিরাপদে যতগুলি লোক স্নান করিতে পারে, তাহার অধিক লোক একসঙ্গে গ্রহণ করা হইবে না, তবে স্নান হওয়া মাত্র তাহাদিগকে গঙ্গীর বাঁধান চত্বর পার করিয়া দিয়া নুতন যাত্রী গ্রহণ করা হইবে। সাধুদিগের শোভাযাত্রা অপর পারে পৌছামাত্র ব্রহ্মকুণ্ড এবং বাঁধান চত্বর জনশূন্য করা হইবে। নিম্ন নির্দ্ধারিত সময়ে সাধুগণের শোভাযাত্রা আপন আপন আগড়া পরিত্যাগ করার আদেশ হইয়াছিল* যথাঃ—

(১) নিরঞ্জনী ও জুনা (নাগা)—মায়াপুর হইতে প্রাতে সাড়ে দশ ঘটিকার সময়।

(২) নির্ব্বাণী—কণখল হইতে প্রাতে সাড়ে এগার ঘটিকার সময়।

(৩) বৈরাগী—বৈরাগী লস্কর হইতে এক ঘটিকার সময়।

(৪) বড় উদাসী—কণখল নিজ আগড়া হইতে অপরাহ্ণ ১২টা ৪৫ মিনিটের সময়।

(৫) ছোট উদাসী—কণখল হইতে অপরাহ্ণ ২টা ৪৫ মিনিটের সময়।

(৬) নির্ম্মলা—মায়াপুর হইতে অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময়।

ভিন্ন দুইটী শোভাযাত্রা একত্রে মিলিত হইতে দেওয়া হইবে না এবং আগড়া সম্পর্কিত লোক ব্যতীত অপর লোককে শোভাযাত্রার সহিত চলিতে দেওয়া হইবে না। ২৯শে চৈত্র রাত্রি ৩টা হইতে ৩০শে চৈত্র বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল; তৎপর শোভাযাত্রার সাধুগণের স্নান হইবে; এবং অপরাহ্ণ ৫ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্নান চলিবে; প্রাতে এগারটার পূর্ব্বে যে সকল যাত্রীর স্নান শেষ না হইবে, তাহাদিগকে বিশেষ

* কুম্ভে সমাগত প্রত্যেক যাত্রীকে মেলাখরচ বাবত এক আনা প্রদান করিয়া এই মিউনিসিপাল টিকিট গ্রহণ করিতে হইত; অবশ্য কপর্দ্দকশূন্য কৌপীনমাত্রৈক-সম্বল সাধুগণ এই নিয়মের বাধ্য ছিলেন না।

*এই ব্যবস্থা অনুসারে সর্ব্বাগ্রে সন্ন্যাসীগণ, তৎপর বৈষ্ণবগণ, পরিশেষে নানকপন্থীগণের স্নানের পর্য্যায় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্ম-কুণ্ডের ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে কতক কতক যাত্রীগণকে স্নান করার সুযোগ প্রদান করিতে পারিলেও অধিকাংশকেই শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সাধুগণের স্নান শেষ হইলে যাত্রীগণের পুনরায় স্নান আরম্ভ হইবে। স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা এবং বৃদ্ধগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে; ফটক খোলা হইলে ধীরে ধীরে গমন করিতে হইবে, কারণ দৌড়াইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। সময় থাকিতে মেলাটিকিট সংগ্রহ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কাহারও ছেলেমেয়ে, কি আত্মীয় কিম্বা কোন দ্রব্য হারাইলে নিকটবর্ত্তী পাহাড়াওয়ালাকে সর্ব্বাগ্রে জানাইবে। শান্তিরক্ষক পুলিশগণের কথা এবং উপদেশ মত সকলেরই চলা বাঞ্ছনীয়।

জনতা ঃ—শেষ স্নানের তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই মেলাস্থানে এত অধিক সংখ্যক লোকসমাগম হইয়াছিল যে, কোথাও তিল ধারণের স্থানছিল না—কি বিস্তৃত গঙ্গার চড়া-ভূমি, কি ভীমগড়ার নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃত স্থান সমূহ, কি কণখল, কি জ্বালাপুর, কি মায়াপুর, সর্ব্বত্র যাত্রীগণের ভীড় হইয়াছিল—যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইত, মানুষের মস্তক ভিন্ন অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হইত না। রাজপথে দিন রাত্রির মধ্যে জনতা কমিত না—রাস্তা চলা দুষ্কর হইয়াছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মালগাড়ী বোঝাই হইয়া যাত্রী আসিতে লাগিল, পরিশেষে এরূপ হইল যে, কোথাও স্থান-সঙ্কুলন না হওয়ায় রাস্তার নর্দ্দামার পার্শ্বে পার্শ্বে বসিয়াই যাত্রীগণ সময় কাটাইতে লাগিল। এরূপ সুবৃহৎ জনতা প্রত্যক্ষদর্শন ব্যতীত ভাষায় বর্ণনা সম্ভবপর নহে। শুনিলাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুম্ভ অপেক্ষা এবারের কুম্ভে অত্যধিক লোক সমাগম হইয়াছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)।

জনৈক দর্শক।

———:0:———

যোগানন্দ-লহরী।

ভৈরবী (১৩) একতালা।

নমি বীণাপাণি, বাণী, নারায়ণী, শ্বেতশতদল নিবাসিনী।
জয় মা ভারতী, জয় ভগবতী কৃপাপরায়ণী অজ্ঞাননাশিনী॥
তরুণ অরুণ রঞ্জিত শ্রীকরে,
বীণা পুস্তকেতে কত শোভা করে,
সুমধুর হাসি খেলিছে অধরে, মোহবিনাশিনী আনন্দদায়িনী॥
অমল ধবল উজল বরণা,
শ্বেতাম্বুজ পরে শ্বেতবসনা,

রতনখচিত শ্বেত-আভরণা, শোভিছে তরুণী ভুবনমোহিনী ;—
কোটী ইন্দু জিনি ও বিধুবদন,
প্রেমানন্দভরে ভাতিছে কেমন,
অমিয় করুণা বিতরে নয়ন, জয় সরস্বতী জ্ঞানপ্রদায়িনী ॥
আগম নিগম তুমি গো মা তন্ত্র,
তন্ত্রসারে মাগো তুমি সার মন্ত্র,
রাগ রাগিণীতে তুমি মূলযন্ত্র, তুমি নৃত্যগীত-বাদ্য-বিনোদিনী ;—
তুমি বিদ্যাবুদ্ধি, বিবেকদায়িনী,
তুমি ঋদ্ধি সিদ্ধি, অবিদ্যানাশিনী,
বেদমাতা তুমি গায়ত্রীরূপিনী, শুদ্ধ জ্ঞানময়ী সত্য সনাতনী ॥
অলক্তরঞ্জিত অভয় চরণ,
শ্বেত হংসোপরে শোভিছে কেমন,
প্রেমের বিজলী খেলে অনুক্ষণ, জয় জ্যোতির্ম্ময়া জগতকল্যাণী ;—
ব্যাস বাল্মীকাদি অন্ত না পায় ধ্যানে,
কি জানিব মা গো আমি মূঢ় জনে,
তুমি জানাও যারে শুধু সেই জানে, যোগেনেরে কৃপা করগো জননী ॥

—:০:—

পাগল মানুষের কথা ।*

১প্রশ্ন। ঈশ্বর অবতার হইয়া কি করেন ?

উত্তর। দুর্ব্বল জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় আদর্শ আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।

২প্রশ্ন। কলিযুগের যুগ অবতার কে ? কেন তাহারই উপদেশ অনুসারে চলা কর্ত্তব্য ?

উত্তর। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ; এখন তাঁহারই উপদেশ অনুসারে সকলের চলা উচিত, কারণ সমুদয় পৃথিবীর শেষ অবতার ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় জাতির উদ্ধারের সহজ ধর্ম্ম জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই লীলা অদ্যাপি বর্ত্তমান; কল্পিত বা অনুমান নহে।

৩প্রশ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কি সহজ উপদেশ দিয়াছেন ?

উত্তর। পতিত ও শরণাগত হইয়া

*আমাদের পাগল মানুষের নাম শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, মানকর পোঃ (ই, আই, আর, কর্ডলাইন) বর্দ্ধমান।

হরিনাম সংকীর্ত্তন কর, জাতিকুলের গৌরব ত্যাগ করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ কর, গর্ভে সকল মনুষ্য এক; এক ক্ষেত্র হইতে উৎপত্তি এবং মৃত্যুর পর এক স্থানেই গতি, মধ্যে কয়েক বৎসর চুল কাটিয়া ও পাটা কাটিয়া আপনাকে শুদ্ধ ও বড় জাতি বোধ করা এবং মনুষ্যের মস্তকে পদাঘাত ও ঘৃণা করা মহাপাপ; মনুষ্য মাত্রেরই এক্ জাতি ও এক প্রকার ধর্ম্ম, কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের ভালবাসা পাওয়া যায় না।

৪। প্রশ্ন। পুণ্যবানের কি শ্রীগৌরাঙ্গসেবার অধিকার নাই? কেন?

উত্তর। না, পুণ্যবানগণ অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী; এই সংসারকেই সুখের ধাম বোধে পুনর্জ্জন্মের জন্য উপাসনা করেন; মুক্তি বা প্রেম চাহেন না, ধন, পুত্র ও ঐহিক সুখের জন্য বণিকের ন্যায় অর্থক্ষয় ও ঢাকঢোল বাজাইয়া দম্ভ ও আড়ম্বর করিয়া ঘোর অপরাধ করেন, ইঁহারা শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে ব্যঙ্গ করা হয়।

৫ প্রশ্ন। তিলকমালা ধারণ সম্বন্ধে কি বলেন?

উত্তর। আত্মতত্ত্ব না জানিয়া ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণ মহাপাপ কার্য্য, উহা পুরুষার্থ; ব্রজভাব গ্রহণ ভিন্ন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিবার উপায় নাই।

৬ প্রশ্ন। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আপনার মত কি; শৌচাশৌচ কিরূপ?

উত্তর। বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান নিষিদ্ধ, তিথি-আরাধনা ও স্মরণ, মনন, গুণকীর্ত্তন, বৈষ্ণব-সেবা, কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব সর্ব্বদা শুচি, কখনও অশুচি হন্ না, বৈষ্ণব দর্শন, স্পর্শনে মহাপাপী পবিত্র হয়, বৈষ্ণবের অশৌচ বা প্রেতক্রীড়া করিলে মহাপাপ হয়।

৭ প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে পৃথক্ কি?

উত্তর। পৃথক্ নাই, সগুণ ও নির্গুণ; নির্গুণ, নিষ্কাম ব্রাহ্মণই, ভক্ত-বৈষ্ণব। ঈশ্বর-ভজন দ্বারাই মনুষ্য, মনুষ্যনামের যোগ্য হয়, নতুবা পশু। মানবজীবনের উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিলে, মানব, ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবপদবাচ্য হন্। মায়াতীত ভিন্ন অনুমান হয় না, সেইজন্য কেহ চিনিতে পারে না।

৮ প্রশ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গভজন পুরোহিত বা প্রতিনিধি দ্বারা করান হয় কিনা?

উত্তর। না, তাহা হয় না, ঈশ্বর-ভজন সকলকে স্বয়ং করিতে হয়, যে প্রকার মুসলমানগণ নমাজ করে অর্থাৎ ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, স্ত্রী, শূদ্র, বালক, সকলকে নিজে করিতে হয়;

৯ প্রশ্ন। ভারত ভিন্ন অন্য কোনদেশে প্রতিনিধি দ্বারা ভজনবিধি আছে কি?

উত্তর। না, আমি যে সকল ইতিহাস ও সংহিতা দেখিয়াছি, তাহাতে কর্ম্মচারী দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চন্ বা কুলিমজুর দ্বারা শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করান কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই নাই, বাঙ্গালীগণ অন্ধপরম্পরাক্রমে এই উপধর্ম্ম ও নাম-অপরাধ সৃষ্টি করায় ভারতে ধর্ম্মের দুর্গতি ঘটিয়াছে।

প্রশ্ন। শ্রীযুগলসেবা প্রকাশ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উত্তর। বিধি ঐশ্বর্য্য মার্গে এ সেবার প্রকাশ নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনে, গোস্বামীগণ, কখনও যুগলসেবা প্রকাশ করেন নাই; বৃন্দাবনে শ্রীমতীর মূর্ত্তি ছিল না; শ্রীগোবিন্দজির শ্রীবিগ্রহ জয়পুরের রাজা লইয়া গেলে পর অনুমান অনুসারে যুগল লীলা প্রকাশিত হয়।

গুপ্ত নিকুঞ্জলীলা জগতে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই, তিনি বাঞ্ছা-অভিলাষী স্বয়ং ভগবান, "রাধাভাব দ্যুতি" স্বীকার করিয়া এবং সখিগণ নিজ নিজ ভাব গোপন-পূর্ব্বক ভূতলে পুরুষ দেহে অবতীর্ণ হইয়া রাসলীলার নিগূঢ় ভাব জগতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনুরাগী ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত এ ভাব উপলব্ধি হয় না।

প্রশ্ন। শ্রীমহাপ্রভুর গম্ভীরালীলাটী কিরূপ ?

উত্তর। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় শক্তি ও শক্তিমানে মিলিত; চির নিত্য, চির নবীন, নিত্য যুগলমিলন। মৃগনাভি ও উহার সৌরভ, কর্পূর ও উহার গন্ধ যেরূপ, ইহাও তদ্রূপ। কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য বা নৈবেদ্য, ঢাকঢোলে এই মাধুর্য্যময় রূপের পূজা হয় না; আত্ম-নৈবেদ্য দিলেই হৃদয়ে দর্শন হয়। আত্ম সমর্পণকারী, অনুরাগী ভক্তের গৌরববর্দ্ধনই এ লীলার উদ্দেশ্য।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।
ও
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভক্ত-সমাগম—এবার বড়দিনের উপলক্ষে বগুড়া, রংপুর ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে অত্রমঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজের শ্রীচরণদর্শনোৎসুখ শিষ্য ও ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল। এই আনন্দ-মিলন বড়ই সুখের হইয়াছিল, এই কয়দিন কেবল ভগবৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মানুশীলন ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ-সংবাদ—স্থানীয় অবস্থা একটু স্বচ্ছল বোধ হওয়ায় আমাদের দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের কার্য্য বন্ধ করা হইল।

সতী—বর্দ্ধমান গোপালপুর নিবাসী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় জ্বররোগে বহুদিন ভুগিবার পর মৃত্যু হয়। তিনি যখন মরণাপন্ন, তখন তাহার স্ত্রীও পীড়িতা ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শব যখন বাটী হইতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—"আপনি চলুন, আমি আপনার সংঙ্গেই আসিতেছি"। সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে সতীও ইহধাম ত্যাগ করেন। একই চিতায় উভয়ের দেহ সংকার করা হয়।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

ভক্তের প্রার্থনা।

অতীতের গৌরব, বর্ত্তমানের দুঃখ, ভবিষ্যতের আশা—কথা কহিতে গেলেই এই তিন কথার এক কথা আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, অতীতের অনুকরণ করি, বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করি, ভবিষ্যৎকে নিকটে লইয়া আসি। নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ পাইয়া আত্মগৌরব মনে করি; কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এমন অবশ যে, যাহা করিতেছি, তাহা ছাড়া অন্য পথ ধরিতে পারি না। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া পুস্তকে পড়ি, শুনি, বা বিশ্বাস করি, তাহার অনুষ্ঠান করি, এমন শক্তি তো দেখিতে পাই না। অন্যকে যাহা করিতে উপদেশ দেই, প্রতি-মুহূর্ত্তে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি—এমন মিথ্যাচারী আমার কথা কি তুমি শুনিবে প্রভো?

আমি যে পরিমাণে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর প্রতি আসক্ত, সেই পরিমাণে সত্যভ্রষ্ট, সেই পরিমাণে দুঃখী, সেই পরিমাণে পাপী, সেই পরিমাণে দুর্ব্বল, ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াও আত্মাভিমুখ হইতে পারি না। সংস্কার, অভ্যাস আমাকে এমন করায়ত্ত করিয়াছে যে, নিরন্তর দুঃখ পাইয়াও আমি তাহাদের হাত এড়াইতে পারি না। আমি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহাজন! আমাকে শক্তি দেও, আমাকে আকর্ষণ কর। আমি যে ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে স্থিতিশীল না করিয়া দিলে আমি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছি না। নানাভাবসঙ্ঘাতে আমি কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছি, আত্মসংস্থিতি, সুখ শান্তির আশা করিলেও আমি তাহার কোনও উপায় খুজিয়া পাইতেছি না। বর্ত্তমানে এমন কোনও ভাবে বা বস্তুতে আমি প্রবল বেগে আকৃষ্ট হই না, যাহাতে আমি অন্য সকল বিরুদ্ধভাবযুক্ত শক্তিকে পরাভব করিতে পারি। সেই রূপ দেখাও,

সেই নাম শুনাও,—সেই ভাবে ভাবুক করিয়া দেও, যাহাতে আমার এই ব্যভিচার-বিভ্রাট ঘুচিয়া যায়।

জগতে সকলেই একটা না একটা কিছু অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠে, জ্ঞান ও ভক্তির সাধনা করে; কিন্তু আমার সেই এক কিছুই নাই। যাহাকে "এক" বলিয়া ধরিতে যাই, লক্ষ বাধা আসিয়া তাহা হইতে আমাকে দূরে রাখে। যদি কোন চৈতন্য শক্তি আমার এই রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাও, যদি কোন অবাঙ্‌মনস-গোচর পদার্থ আমার এই অবসাদ ও নৈরাশ্যের ক্রন্দনে ব্যথিত হও, তবে আমাকে সত্যস্বপ্ন দেখাও, কোন মহিমাময় আদর্শকে নামরূপে জীবন্ত করিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া দাও। আমি স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়াছি ও হইতে চলিয়াছি। মুখে বলি বটে, আমি আত্মা,—আমি ব্রহ্ম,—কিন্তু যাহা দৃশ্য জড়, যাহা বিষয়, যাহা প্রকৃতি, আমি প্রতিক্ষণ কেবল তাহারই শাসন মানিয়া চলি। যদি উচ্চ কিছু থাক, যদি সূক্ষ্ম কিছু থাক,—যদি অতীন্দ্রিয় কিছু থাক,—দেহ,—নাম,—রূপ লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হও। কেবল ইঙ্গিতে, কেবল আভাসে, কেবল অস্পষ্ট আহ্বানে আমার ন্যায় জড়ের চৈতন্য সাধিত হইবে না। তুমি আমার গগন, তুমি আমার পবন আপন সত্তায় ভরিয়া ফেল, তুমি স্বয়ং আসিয়া আমার মন, বুদ্ধি অধিকার কর। তুমি আমাকে সাধনার ভার দিও না,—তপস্যার ভার দিও না,—সংযমের ভার দিও না; তুমি আসিয়া আমার সকল ভার-গ্রহণ কর। আমি সেই ত্রেতাযুগের ভার-ক্লিষ্টের ন্যায় কেবল বলিতে পারি—

১। "চল যাই তার নূয়ে যাই, অযোধ্যায়
রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে আর,
পাপীদের ভার কে লবে?"

২। "দিয়ে ভার লব শরণ, বল্‌ব ধরে
অভয় চরণ।
এবার দিলে যেমন ভার, আর ভার দিও
না ভবে।
পাপেতে হয়েছি ভারী, আর তো ভার
সইতে নারি, না হ'লে সে ভূ-ভারহারী
পাপীদের ভার আর কে লবে?"

আমি কেবল তোমাকে আমার ভার লইতে বলিতে পারি, তোমাকে না দেখিলে, তোমাকে না বুঝিলে, তোমার প্রতি আমার প্রত্যয় হইতেছে না। তুমি আমার শতমুখী প্রবৃত্তির স্রোত আপনার দিকে টানিয়া না লইলে, আমি যে একের সন্ধান, একের লক্ষ্য পাইতেছি না। তুমি আমার কর্ম্ম-বিভ্রাট, ভাববিভ্রাট, বাসনাবিভ্রাট ঘুচাও, তোমার অনাথশরণ, অগতির গতি, পতিত-পাবন নামের যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা হইলে আমার এই সর্ব্ববিধ পাতিত্য দূর কর। আমি ইতিহাস পড়িলাম, পুরাণ শুনিলাম, দৃষ্টান্ত দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার কিছু হইল না। শুনিতে পাই, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, তুমি আপনাকে সৃষ্ট করিয়া থাক; কিন্তু আমাকে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপ নিমিত্ত করিয়াও তুমি আমা হ'তে এত দূরে রহিয়াছ কেন? আমি

কেবল কু-রসের রসিক ; তুমি আমাকে শিখাইয়াছ, তুমি আমায় বলিয়াছ, তোমার দেখা না পাইলে এ রস মরিবে না । তুমি এই সেদিন একবার আমার সূর্য্য, আমার বনস্পতি, আমার ওষধি, আমার গঙ্গা, আমার সিন্ধু, আমার ধূলিকণায় মধুসেচন করিয়া আমাকে কতকটা স্বার্থ এবং বাসনার বিষ হইতে মুক্ত করিয়াছিলে ।

এইবার তুমি পূর্ণভাবে ব্যক্ত হও, আমাকে কেবল চোখঠারার কার্য্য নহে ; দূরাগত বংশীধ্বনিতে আমার সাড়া পাইবে না । আমাকে দেখা দাও, আমার সহিত আলাপ কর,—আমার হাত ধরিয়া উঠাও, আমি যে একবারে আপনহারা হইয়া তোমায় ডাকিয়া উত্তর চাহিতেছি ।

দীন—নীলরতন ।

—————:0:—————

আহ্বান ।

আমি শিখেছি মা তোমায় ডাকিতে;
আর কি পারিস্ মা তুই আমার
লুকায়ে থাকিতে ?
আমি শিখেছি যে 'মা', 'মা' বলে
কেঁদে ডাকিতে ।
লালচুষী-বিষয় দিয়ে আর কি পারিস্
ভুলায়ে রাখিতে ?
আমি জেনেছি হয় যেমন করে
তোমায় ডাকিতে ।
আমি কাচের তরে কাঞ্চন ছেড়ে
ছিনু মায়াতে ।
আমি জেনেছি হয় যেমন করে
মায়া কাটাতে ।
চিন্ময়ী স্বরূপ তোর আর কি পারিস্
ঢাকিয়া রাখিতে ?
এখন আমি ভিতর বাহির পূর্ণ দেখি
তোমার জ্যোতিতে ।
আগে বিশ্বাস চক্ষু ঢাকা ছিল
মোহ ধূলিতে,
এখন সে সব ধুলা ধুয়ে গেছে মা তোর
কৃপাবারিতে ।
যখন আমি তোমায় হারাই
সংসার বনেতে,
তখন দেখায়ে দেয় বনের ফুলে,
বনের পাখীতে ।
আর কি পারিস্ মা তুই আমায়
লুকায়ে থাকিতে, ?
আমি শিখেছি যে "মা" "মা" বলে
কেঁদে ডাকিতে ।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

শ্রীমোহিনীমোহন বসু ।

—————:0:—————

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—অদ্য প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পাণ্ডামহাশয়ের সঙ্গে তপ্তকুণ্ডে স্নানের জন্য রওনা হইলাম। কুণ্ডের নিকট যাইয়া দেখি, তথায় বহুযাত্রী স্নানার্থ সমাগত হইয়াছেন। আমরাও সঙ্কল্প-পুর্ব্বক স্নান ও তর্পণাদি সমাধা করিয়া ব্রহ্ম-কপালিতে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের জন্য রওনা হইলাম। তখন অন্তঃকরণে যে কি এক প্রকার আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী পাণ্ডা স্থির করিয়া তাঁহাকে ১৲ সিকা দক্ষিনা দিয়া যথাসাধ্য পৈত্রিক ক্রিয়া সমাধা করিলাম। পিণ্ডদানাদি করিয়া ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে রওনা হইলাম। এই সময়ে তথাকার এক-জন কর্ম্মচারী আমাদের নামধাম লিখিয়া লইলেন ও বলিলেন, আপনাদিগকে আর অন্যত্র পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিতে হইবে না; বিশ্বাস করুন, "আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণ নিশ্চয় গোলকে গমন করিলেন"। আমরা তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করতঃ বিদায় লই-লাম। ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দেওয়া হইলে পিতৃ-পুরুষগণ যে গোলকে গমন করিলেন, তাহার একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন না করিতে পারে, সুতরাং তাহার বর্ণনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

আমরা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভগবান বদরীনারায়ণ ও লক্ষ্মীমাতাকে দর্শন প্রণাম-করতঃ চরণামৃত গ্রহণ করিলাম। লক্ষ্মী-দেবীর নামে আটকিয়া বাঁধার প্রথা আছে, আমরা যথাসাধ্য আটকিয়ার মূল্য দিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। বাসায় পহুছিয়া নারা-য়ণের জলপানি প্রসাদ গ্রহণ করিলাম; বেলা ১২ টার সময় মহাপ্রসাদ আসিলে তাহাতেই মধ্যাহ্নের ভোজন শেষ করিলাম। বৈকালে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিলাম, অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিলাম।

এই বদরীনারায়ণপুরী অতি রমণীয় স্থান। কৈলাস ও গন্ধমাদন পর্ব্বতদ্বয়ের সানুদেশে ও অলকনন্দার অত্যুচ্চ তটে এই পুরী অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গসকল তুষারে আবৃত। অলকনন্দার খর প্রবাহ এখনও অনেকস্থানে তুষারে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে এই বিস্তৃত উপত্যকাভূমি কত শত ধর্ম্মার্থী গৃহী, যোগী, সাধু, সন্ন্যাসীকে ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছে; কত পবিত্র প্রস্রবণ এখানে গিরিগাত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া লোকের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। তপ্তকুণ্ডের বারি মার্জ্জন, অবগাহনে কতই তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে, ঘনসন্নিবিষ্ট দোকান; অগণ্য জনসমাগম আর তাহাদের মুখে কেবল আনন্দ-ধ্বনি! সকলের হৃদয় ভক্তিতে সরস হইয়াছে, সংসারের আবিলতা আজ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে! কি স্থান মাহাত্ম্য! তাই হিন্দুর নিকট তীর্থ

এত পবিত্র! এখানে কত মহাত্মা কত ধ্যানধ্যানে রত; কত রাজা, শ্রেষ্ঠী, কত সমৃদ্ধিশালী লোক দীনদুঃখী, অনাথ, আতুর, সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন! কত ভোজ্যবস্তু নিয়ত বিক্রীত হইতেছে। যাত্রিগণের মুখে কেবল দেবতার জয়ধ্বনি, স্তুতিগীত উদ্গীত হইতেছে, দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বস্তুতঃ অদ্যাপিও এই স্থান তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়া আছে। এখানে আসিলে আপনা আপনিই সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। এখানে প্রাণি-হিংসা একেবারেই নাই। মৎস্য, মাংস, মদ্য কেহ স্পর্শ করে না। অব্যবহার্য্য, অনাচরণীয় বিলাস দ্রব্যের প্রবেশ নাই। অধিক কি, দেব-দ্বিজ ও সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি ঘোষণায় মুক্ত-কণ্ঠ মিশনারী মহাত্মাগণের কোন প্রকার উপদ্রব নাই। জীবন ধারণের নিতান্ত উপযোগী দ্রব্যাদিই এখানে পাওয়া যায়। এখানে উপদ্রব নিবারণার্থ ও শান্তিবিধানের জন্য পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত আছে। সামরিক ডাকের ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে।

বদরীনাথ ক্ষেত্রের পরিমাণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দেড়ক্রোশ, উত্তর দক্ষিণে অর্দ্ধ পরিমিত হইবে। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্র-তল হইতে প্রায় দশ হাজার চারিশত ফিট। আরও উর্দ্ধে প্রায় ২৩ হাজার ফিট উচ্চে হিম প্রবাহ, এই স্থানে গঙ্গার উৎপত্তি। তীর্থক্ষেত্রের কেন্দ্রবর্ত্তী দেবালয় শঙ্করাচার্য্যের সময়ে নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে এই দেবালয় ২০০০ দুই হাজার বৎসর এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ১২০০ বার শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী শ্বেত প্রস্তরবিনির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগ তাম্র-মণ্ডিত। ঘণ্টাগৃহ ও অন্যান্য গৃহ-সমূহ মন্দির নির্ম্মাণের বহু পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবসেবার জন্য বহুসংখ্যক পুরোহিত, পাঠক ও ভৃত্য নিযুক্ত আছে। গাড়োয়াল ও তিহরীর রাজা দেবালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কাশী-নরেশের হস্তে মন্দির সংক্রান্ত তত্ত্বাবধানের ভার ছিল; কিন্তু দূরত্ব নিবন্ধন মন্দিরের কার্য্যপরিচালনে বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি এই কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রী-দত্ত-অর্থে মন্দিরের বার্ষিক আয় ৪০০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা। এই উপস্বত্বের মধ্যে ২৮০০০৲ আটাইশ হাজার টাকা দেবসেবা প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হয়। উপস্বত্বের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে এখন প্রায় ৪০০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। রাওল উপাধিধারী প্রধান পুরোহিত দাক্ষিণাপথের কেরল দেশীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিতের পদ উত্তরাধিকারীমূলক নহে। কেরল হইতে প্রধান পুরোহিত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। পুরোহিতের মাসিক বেতন ১০০৲ একশত টাকা। প্রতি বৎসর এই তীর্থক্ষেত্রে ৬০।৭০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বেলা ৯টার সময় বিগ্রহের স্নান হয়। ভাগ্যবান ব্যক্তির অদৃষ্টেই "নির্ব্বাণ-দর্শন" বা রত্নভূষণ ও বেশ-বিমুক্ত সমাধিমগ্ন দেব মূর্ত্তির দর্শনলাভ ঘটে। পিতা মাতা ও শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমরা একদিন

প্রপাত অভিউচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে বরফ গলিয়া পতিত হইতেছে। এই ধারা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পরে গণেশ-গুহা। ব্যাসপুস্তক অর্থাৎ স্তরে স্তরে একটী পাহাড় উঠিয়াছে। এই স্থান হইতে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। কোনস্থানে কে পড়িয়া-ছিলেন, তাহা নির্ণয়করা এক্ষণে অসম্ভব, এবং ঐ স্থানগুলি একেবারে অগম্য। দূরে একটী পাহাড় সেতুর মত পতিত রহিয়াছে; প্রবাদ যে, ভীমসেন কর্ত্তৃক পাহাড়টীর ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। এই সেতুর নিকট সরস্বতীর জল অতি প্রবলবেগে পর্ব্বত ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেছে। ঐ জল ভুটান হইতে আসিতেছে, ঐ প্রবাহটী দেখিতে যে কি সুন্দর, তাহা বর্ণনা করা যায় না

যাত্রীদিগকে এই পথ অতিক্রম করিতে অতীব কষ্টভোগ করিতে হয়। কিছুদূর 'এক পা' 'এক পা' করিয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতে হয়। ঐ স্থানে যষ্টির সাহায্য গ্রহণ করাও যায় না, কারণ তাহা রাখিবার স্থান কোথায়? ধরিবারও উপায় নাই, নীচে গঙ্গা; ধীরে ধীরে তথায় নামিয়া বরফের উপর উঠিতে হয়। পা দিবামাত্র কোন কোন স্থানের বরফ ধসিয়া পড়ে। এইরূপে বহুকষ্টে বসুধারায় পঁহুছান যায়। পাহাড়ের উচ্চ শিখর হইতে দুইটী ধারা পড়িতেছে। ঐ ধারার জলের ছিটা বহু উচ্চ হইতে গায়ে লাগে। উহার নিকট পাপপুণ্যের পরীক্ষা হয়। এই স্থানে মাতৃ মূর্ত্তি আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়।

সহস্রধারা ও সত্য পথ।

মানাগ্রাম বা মনিভদ্রপুরীর সমীপে অলকনন্দার যে পুল আছে, তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মাতৃদেবীর মন্দির। পুলের বাম দিক দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তার মধ্যে সহস্রধারা, চক্রতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ আছে। আরও কিছু দূর অগ্রে অর্থাৎ মাতাদেবীর মন্দির হইতে ১২মাইল দূরে সত্যপথ নামে তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে যাইবার পথ একেবারে তুষারাবৃত। কিন্তু স্থানটী অতি রমণীয়, যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনই ভুলিতে পারিবে না। উক্ত সত্যপথে একটী ত্রিকোণ সরোবর আছে। উহার কোণত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নামে খ্যাত। ঐ সরোবরে স্নান করিলে জীবের আর জঠর-যন্ত্রণা ভোগ হয় না। ইহার পরেই বিচিত্র বর্ণের তুষারস্তূপ ও মন্দির দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ অগম্য অথচ অতি রম্য পথ স্বর্গারোহণ পথ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অষ্টাদশ ব্রহ্মহত্যা-জনিত ভীষণ মহাপাপে লিপ্ত রাজা জন্মেজয় উল্লিখিত ব্যাস পুস্তক স্পর্শ করিয়া প্রায়ো-পবেশ পূর্ব্বক পঞ্চরাত্র নিরাহার করিয়া ব্যাসদেবের দর্শন প্রাপ্ত হ'ন ও পাপক্ষয়-মানসে কৃপাপরায়ণ মহর্ষির মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন। ভারত শ্রবণ ও বদরী ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বশতঃ রাজার উক্ত প্রকার পাপ নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।—

তত্র গত্বা মহাভাগে চক্রে প্রায়োপবেশনং।
ব্যাস পুস্তক পার্শ্বেতু পঞ্চরাত্রং মহীপতিঃ।
নিরাহারো নিরানন্দো মরণে কৃতনিশ্চয়।
ব্যাসং দদর্শ নৃপতি জটামণ্ডল ধারিণং।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত্যাসৌ পরিক্রম্য পুনঃ পুনঃ।
উবাচ বচনং এতো রক্ষরক্ষেতি চাসকৃৎ।

কেদারখণ্ড।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার

উদ্বোধন।

হিমাচলে কাঞ্চন শিখরে দাঁড়াইয়া
যোগী এক,—ধবল-বরণ কায় জিনিয়া
তুষার, আজানুলম্বিত বাহু, পরিধানে
বাঘাম্বর, শিরে জটাভার, দীপ্তিমান
দেহ, মলিন করিছে রবিকরে;
বাম করে শোভিছে পতাকা, লেখা তাহে
"ত্যাগের মহিমা।"
যোগী হাকিছে জীমূত মন্দ্রে, "জাগ, জাগ
গো ভারতবাসি! কতকাল আর, বল,
বিলাসলালসে সবে রহিবে ডুবিয়া?
জেগে উঠ ত্যাগের মোহন মন্ত্রে, যাহা
জন্ম প্রাপ্তধন তোমা সবাকার।
কেন ভুলে যাও, কাহার মোহন তানে
শাক্যসিংহ ছাড়ে রাজধানী, রাজভোগ,
রাণী, নবীন কুমার, বৃদ্ধ পিতা? কা'র
টানে ছুটি ছুটি ধায় বন বনান্তরে,
পরিধানে ছিন্ন কন্থা? কার লাগি কাঁদে,
প্রাণ তা'র? দেখ, দেখ, ভাবি একবার,
কার তরে আনিতে নির্ব্বাণ, দেহ করে
পাত, বোধিবৃক্ষ মূলে? কেন কাঁদে প্রাণ
তাঁর, রোগ, মৃত্যু, জরা, করিবারে দূর,
বিতরিয়া দুস্থ জীবে নির্ব্বাণের সুধা?
কেন ভুলে যাও?
কার তরে হইয়ে পাগল; বৃদ্ধা মাতা
ত্যজিয়া শঙ্কর; কৈশোরে সন্ন্যাসী;
বিলাইল ঘরে ঘরে অ-মৃতের জ্ঞান;
বেদান্তের জ্ঞানগাথা করিয়া প্রচার,
মিটাইল সাধ জ্ঞান পিপাসার? ঐ যে
সেদিন, কা'র প্রেম বক্ষে ধরি পাগল
চৈতন্য, কাঁদি ফিরে ভারতের পথে,
ত্যজিয়া গৃহিনী, মাতা অশীতি বর্ষীয়া?
এ সবি যে তোমা সবাকার তরে শুধু;—
দেখাতে ত্যাগের শক্তি, ত্যাগের মহিমা,
করেছেন ভগবান্ লীলা অভিনয়,
শিখায়েছেন ত্যাগের কৌশল, আদর্শ
মানব রূপে। লভি জন্ম সেই দেশে,
ধরি দেহ সে দেশ-ধুলীর, ভুলে গেছ,
ত্যাগের মহিমা? ভুলে গেছ, ভোগে
দুঃখ, ত্যাগে তৃপ্তি, অনন্ত অপার। জাগো
জাগো সবে ভারতসন্তান,
ত্যাগের মহিমা গাঁথা করহে কীর্ত্তন।
ভারত-গগনে পুনঃ উঠুক যজ্ঞের
ধূম, শস্যশালী হোক বসুন্ধরা; রোগ,
শোক, দারিদ্র, যন্ত্রনা, সরে যাক দূরে;
বনস্থলী মুখরিত হোক সামগানে;
মুগ্ধ হোক ভূলোক, দ্যুলোক, শান্তি, সুখ,
স্বাস্থ্য সদা বিরাজিত হোক ঘরে ঘরে;
জাগি জীবগণ মোহ নিদ্রা হ'তে,
লভুক শান্তির বারি, 'ত্যাগ-মহিমায়'।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন।

৪১

হরিদ্বারে কুম্ভ-যোগ ও সাধু-মহাসম্মিলনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুম্ভযোগে—শেষ স্নান।

প্রথম স্নানের ন্যায় এই স্নানেও স্নানের পূর্ব্ব রাত্রি হইতেই পুলিশের কুচকাওয়াজ চলিতে লাগিল, ফটক এবং সাঙ্কেতিক পাথা-গুলিতে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ও শান্তিরক্ষক পুলিশ নিয়োজিত হইল, রাত্রি দুই ঘটিকার সময় হইতেই লক্ষ লক্ষ লোক ব্রহ্মকুণ্ড অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় হইতেই স্নান আরম্ভ হইল। "গঙ্গা মায়ীকি জয়", "গঙ্গা মহারাণীকি জয়" প্রভৃতি আনন্দধ্বনিতে জল স্থল ব্যোম মুখরিত হইতে লাগিল! কি যে একটা আনন্দের তরঙ্গ জনস্রোতের সহিত মিশিয়া সকলকে এক প্রাণে, এক উদ্দেশ্যে মাতাইয়া তুলিতেছিল তাহা কে বুঝাইবে? সাগর-সঙ্গমে বিহ্বল তরঙ্গিনীর ন্যায় বিরাট জন-সমুদ্র হরিদ্বারের তিনটী মূল রাস্তা দিয়া এত প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল যে, পুলিশ প্রহরীর বাধাপ্রদান স্রোতমুখে বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল! ফটকের নিকট ভীড় ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল, প্রত্যুষে চারি ঘটিকার সময় অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইল। লক্ষ লক্ষ লোক সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সমবেত চেষ্টায় এক মহাশক্তির উদ্ভব হইল,—সকলেই সম্মুখ দিকে চাপ দিতে লাগিল, ফটকসংলগ্ন অগ্রগামী যাত্রিগণের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাপ পড়িতে লাগিল, কেহ কেহ চাপে কতকটা শূন্যে উত্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদ শুনা যাইতে লাগিল! মহাসমুদ্রের তরঙ্গা-ঘাতের ন্যায় বিরাট জনপ্রবাহ হইতে এক একটী ধাক্কা আসিয়া ফটকে আঘাত দিতে লাগিল, পরিশেষে ফটকরক্ষী পুলিশগণ আর ফটক রক্ষা করিতে পারিল না। অগ্রগামী যাত্রিগণ পশ্চাৎ হইতে ধাক্কার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পুলিশের কশাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া ফটক ভেদ করতঃ পার হইয়া পড়িল; প্রবল তরঙ্গের ন্যায় জনপ্রবাহ ছুটিল, পুলিস নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কতক সময় পর্য্যন্ত সেই প্রবাহকে কিছুতেই আটকাইতে পারিল না, শেষে অগ্রগামী ভিড় কতকটা অগ্রসর হইলে মারধর করিয়া পশ্চাৎগামী যাত্রিগণকে আবার ফটকে আটকান হইল। এইরূপ দুর্ঘটনার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাই ঘটিল, কতকগুলি যাত্রী পদদলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, আর অনেকগুলি আহত হইল। আমরা ব্রহ্ম-কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি ত্রিতল অট্টালিকার ছাদ হইতে এই ভীষণ ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম—আমাদের সম্মুখেই কয়েকটী যাত্রী মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল!

স্বেচ্ছাসেবক এবং পুলিসগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না; কারণ যে কেহ পদস্খলিত হইয়া একবার আছাড় পড়িবে, হাজার হাজার লোক তাহাকে পদদলিত ও নিষ্পেষণ করিয়া চলিয়া যাইবে—তাহারা ইচ্ছাকরিয়াও কাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কেননা পশ্চাৎ দিক হইতে অনবরত তরঙ্গের ন্যায় ধক্কা আসিতেছে, সেই বেগে অপরকে রক্ষা করা ত দূরের কথা, নিজেকেই রক্ষা করা কঠিন। একটি সমৃদ্ধিশালী মাড়য়াড়ী রমণী হঠাৎ পড়িয়া গেল, তাহাকে উঠাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক এবং পুলিসগণ জনতা সরাইতে লাগিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সে অনন্তধামের যাত্রী হইয়া গিয়াছিল। সেই রমণীর হাতে সোণার চুড়ী এবং পরিধানে ও বগলে মূল্যবান কাপড় ছিল। এইরূপে একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, কয়েকটী যুবক ও রমণী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; এই সব দুর্ঘটনার পরেই প্রত্যেক ফটকে কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী শান্তিরক্ষার্থ আসিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরই আবার জনতা অদম্য হইয়া উঠিল, আবার ফটকভেদ করিয়া ছুটিল—ইংরেজ রাজপুরুষগণ বহু চেষ্টা এবং মারধর করিয়াও ফটক রক্ষা করিতে পারিলেন না; এবারেও কতক দুর্ঘটনা ঘটিল। ইহার পর রাজপুরুষগণ এই অভিজ্ঞতাফলে ফটক রক্ষার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন—তাহারা ভাবিলেন যে, প্রায় এক মাইল ব্যাপী জনতার তরঙ্গকে শুধু অগ্রগামী ব্যক্তিগণের নির্য্যাতন দ্বারা কিছুতেই বাধা দেওয়া যাইবে না, যদি এই সমবেত সুদীর্ঘ জনতাকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলা যায়, তবেই সমবেত শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সহজেই ফটকগুলি রক্ষা ও তৎসঙ্গে যাত্রিগণের প্রাণরক্ষা হইবে। ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া যেন তাহাদিগকে এই সুবুদ্ধি প্রদান করিলেন; এইযুক্তি প্রথম হইতে গ্রহণ করিলে এতগুলি জীবহত্যা হইত কিনা সন্দেহ। যাহাহউক এই উপায় কার্য্যে পরিণত করার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু অশ্বারোহী শিখ সৈন্য আনয়ন করা হইল—সুদীর্ঘ জনতার ৪০।৫০ হস্ত অন্তরেই ৮।১০ টী অশ্বারোহী সৈন্য পরপর সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল, এইরূপে জনতাকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল—ফটকগুলিতেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; আর দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও রহিল না। এই সকল দুর্ঘটনায় পূর্ব্বকথিত তিনটী রাস্তাতে এবং ব্রহ্মকুণ্ডসংলগ্ন রাস্তার চৌমাথাতে সর্ব্বশুদ্ধ সাঁইত্রিশ জন হত হয়, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জন ভিড়চাপা পড়িয়া ও পদদলিত হইয়া এবং দুইজন ব্রহ্মকুণ্ডে জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল। কয়েকজন আহতও হইয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে খাটিয়াতে তুলিয়া নিজেরাই বহন করতঃ তাহাদের যথাযোগ্য সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সাধারণের স্নান হইল, তৎপর গঙ্গার অপর পারে জগদ্‌গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত নিরঞ্জনী এবং নাগা সন্ন্যাসিগণের শোভাযাত্রা আসিয়া পৌছিল। প্রথম স্নানের ন্যায় এই শোভাযাত্রাটীও অতীব সুন্দর এবং প্রিয়দর্শন হইয়াছিল; বাহুল্য ও দ্বিরুক্তি হইবে বলিয়া ইহার বিশেষ বিবরণ এস্থানে প্রদান করা আবশ্যক মনে করিলাম না। কেননা

শোভাযাত্রার গতিপথ এবং বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, তবে এই বারে শোভাযাত্রার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাধু-মহাত্মার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল এবং হস্তী, উষ্ট্র ও অন্যান্য সাজ-সজ্জারও অতিরিক্ত সমাবেশ ছিল। সাড়ে বার ঘটিকার মধ্যে সন্ন্যাসি, নাগা ও ভৈরবী-গণের স্নান শেষ হইল। শোভাযাত্রা ব্রহ্ম-কুণ্ডে পৌছার পূর্ব্বেই কুণ্ড জনশূন্য করা হইয়াছিল; সুতরাং কুণ্ডস্থলে, ঘাটে এবং গঙ্গার বাঁধান চত্বরে সহস্র সহস্র নেংটা সাধু, ভৈরবী ও সন্ন্যাসিগণের সম্মিলনে সেই স্থান অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল——সেই মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিল—সর্ব্বত্র আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। এই শোভা-যাত্রার ভৈরবিগণের মধ্যে একজন শ্বেতকায় ভৈরবী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—ইনি একজন বিশিষ্ট ইংরেজ রমণী! বিগত ১২।১৩ বৎসর যাবত লছমনঝোলা হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে একটী কুটিয়াতে বাস করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভিক্ষার্থে নামিয়া আসেন। আমরা তাঁহার কুটিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। আজ শোভা-যাত্রা দর্শন করার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক নিকটবর্ত্তী অট্টালিকার ছাদে, পর্ব্বতশীর্ষে, গঙ্গার চরাভূমিতে এবং বৃক্ষাদিতে আরো-হন করতঃ সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়াছিল।

নাগা সন্ন্যাসিগণের শোভাযাত্রা চলিয়া যাওয়ার পরই ১৫।১৬টী সুসজ্জিত হস্তী, বহু উষ্ট্র এবং নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যসম্বলিত জুলুসের "নির্ব্বাণী" সন্ন্যাসিগণের শোভাযাত্রা গঙ্গার অপর তীরে দৃষ্ট হইল—অপূর্ব্ব বাদ্য-ভাণ্ডে এবং জয়ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হইতে লাগিল! ক্রমশঃ শোভাযাত্রার কত-কাংশ ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া পৌছিল—সকলেই সতৃষ্ণনয়নে বিভিন্ন বেশধারী অপূর্ব্ব সাধু মহাত্মাগণকে দর্শন করিতে লাগিল। প্রথম স্নান অপেক্ষা এই বারের শোভাযাত্রার বিশেষ সাজসজ্জা ছিল এবং লোকসংখ্যাও অত্যধিক ছিল। বাহুল্য ভয়ে শোভাযাত্রার বিশেষ বিবরণ এখানেও আর পুনরুক্তি করা হইল না। স্নান শেষ হইলে এই শোভাযাত্রা গঙ্গার বাঁধান চত্বর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল,—নিকটবর্ত্তী ছাদ হইতে যাত্রিগণ কাপড়ের টুকরা, পয়সা, দোঁআনি বা সিকি, দুয়ানী সাধুগণকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু দেখিলাম, সন্ন্যাসিগণ তাহা পদদলিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসিগণের স্নান শেষ হওয়ার পর কতক যাত্রী ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া লইল; তৎপর চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সমবেত বিরাট শোভাযাত্রা গঙ্গার অপর তীরে দৃষ্টি-গোচর হইল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড এবং গঙ্গার চত্বর আবার জনশূন্য করা হইল। এই সুবৃহৎ শোভাযাত্রাটীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক সাধুর সমাবেশ দেখা গিয়াছিল—অনূ্যন ৪০।৫০ হাজার বৈষ্ণব সাধু মহাত্মা এই শোভাযাত্রায় যোগদানকরতঃ ইহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বহু হস্তী, উষ্ট্র, মূল্যবান দোলা, ছত্র, চামড়, "আসাসোটা" ঢাল, তরও-য়াল, প্রভৃতি দ্বারা মিছিল সুসজ্জিত ছিল, এতদ্ব্যতীত চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ৬০।৭০টী বহুমূল্য সুবৃহৎ নিশান

পৃথকভাবে পর পর সজ্জিত করতঃ সুশৃঙ্খলার সহিত সাধুগণ তাহা বহন করিয়া চলিতেছিলেন। এই শোভাযাত্রার কতকাংশ ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলে, কুণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল— বৈষ্ণব সাধুগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন; কুণ্ডঘাটে এবং কুণ্ডে অসংখ্য বৈষ্ণব সাধু আনন্দে জয়োল্লাস করতঃ স্নান করিতে লাগিলেন; এই স্নানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের অপূর্ব্ব মিলনের ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। যে কোন সাধু অপর সাধুর পৃষ্ঠে দুই একবার হাত বুলাইয়া তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন, তাঁহারাও আবার প্রত্যেক গাত্রমার্জ্জনকারী সাধুর পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া সাধুসেবার প্রত্যর্পণ করিতেছেন; সে যে এক কি অভিনব ভালবাসা এবং মিলনের ভাব তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না! এইরূপে প্রত্যেক সাধু যত অধিকসংখ্যক সাধুর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন! এই সময়ে আমরাও কয়েকজন ব্রহ্মকুণ্ডে নামিয়াছিলাম এবং এই অভিনব আনন্দে যোগ দিয়াছিলাম—বহু সাধু আমাদের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিলেন, আমরাও তাঁহাদের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিলাম।

তৎপর স্নানের শেষে বহু সাধু গঙ্গার বাধান চত্বর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ঢাল, তরওয়ালের খেলা, কেহ বা অপূর্ব্ব লাঠি খেলা দেখাইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে করিতে চলিলেন; বহু দর্শক সাধুগণকে খাবার দিতে লাগিল, কেহ বা কাপড়, পয়সা ফেলিয়া দিতে লাগিল! নিম্ন অধিকারী কোন সাধু পয়সা কুড়াইতে চেষ্টা করিলে, উচ্চ অধিকারী মহাত্মাগণ ধমক দিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন! মিছিলের বহু সহস্র বৈষ্ণব সাধু স্নানান্তে গঙ্গা পার হইয়া গেলেও তখনও সেই বিরাট মিছিলের সহস্র সহস্র সাধু গঙ্গার অপর তীর দিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০ শত অপূর্ব্ব নিশান মিছিলের শোভাবর্দ্ধন করায়, এক অভিনব মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল! এই সুবৃহৎ নিশানগুলি মখমল কিম্বা রেশমি কাপড় দ্বারা নির্ম্মিত, তদুপরি সুদৃশ্য জরির কাজ করা, প্রায় নিশানেই মণিমুক্তাখচিত কোন কোন দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল! বৈষ্ণব সাধুদের স্নান শেষ হইতে বেলা তিনটা বাজিয়াছিল।

অতঃপর কণথলের নানকপন্থী "বড় উদাসী"-গণের শোভাযাত্রা আসিয়া গঙ্গার অপর তীরে পৌঁছিল; ইহাতে অনেকগুলি হস্তী, উষ্ট্র এবং অপূর্ব্ব সাজসজ্জা ছিল—লোকসংখ্যাও প্রথম স্নান অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। বিশেষ বিবরণ প্রথম স্নানেই দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

"বড় উদাসী"গণের স্নান শেষ হইলে প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকার সময় কণখলের নানকপন্থী "ছোট উদাসী"গণের শোভাযাত্রা আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছিল। ইহাদের সাজসজ্জা এবং লোকসংখ্যাও প্রথম স্নান অপেক্ষা অধিক ছিল। বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

পরিশেষে সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মায়াপুরের নানকপন্থী "নির্ম্মলা" সাধুগণের শোভাযাত্রা ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিল।

এই মিছিলে সুবৃহৎ স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত হাওদা-সম্বলিত ষোলটী সুসজ্জিত হস্তী পৃষ্ঠে বহু সাধু মহাত্মা গমন করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত নানা-প্রকার সুমধুর বাদ্য, বহুমূল্য দোলা, পাল্কী, আসাসোটা প্রভৃতি সাজসজ্জার অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল; প্রথম স্নান অপেক্ষা অনেক অধিক-সংখ্যক "নির্ম্মলা" সাধু এই মিছিলে যোগদান করিয়াছিলেন; বিশেষ বিবরণ প্রথম স্নানেই দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই-রূপে অপরাহ্ণ প্রায় সাত ঘটিকার সময়—সাধু সন্ন্যাসিগণের স্নান শেষ হইল।

এদিকে যাত্রিগণ সেই এগারটা হইতে অপরাহ্ণ সাতটা পর্য্যন্ত বসিয়া আছে—তাহাদের দুঃখের কথা আর কি জানাইব? তবে এত কষ্টের ভিতরেও তাহাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, যে, সময়েই হউক, তাহারা একবার মাত্র ত্রিতাপ-হারিণী, কলুষ-নাশিনী গঙ্গা মায়ের সুশীতল জলে স্নান করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবে! এই আশায় বুক বাঁধিয়া সকলেই যেন বসিয়া আছে। সুদীর্ঘ জনতা অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা বহুভাগে বিভক্ত হওয়ায় তাহাতে আর পূর্ব্বের ন্যায় উশৃঙ্খলভাব নাই; সকলেই শান্তভাবে বসিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। ভগবৎ কৃপায় যাত্রিগণের আর একটী বিশেষ সুবিধা এই হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে অদ্য চৈত্রমাসের মধ্যাহ্ণ সূর্য্যের নিদারুণ উত্তাপ সহ্য করিতে হয় নাই—প্রখর সূর্য্যকিরণ সমস্ত দিন মেঘে আবৃত ছিল! এই সকল স্থানে পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রবাদ এইরূপ যে, দেবতাগণ এই অপূর্ব্ব কুম্ভযোগে মেঘের আড়াল হইতে সাধু মহাত্মাগণের অপূর্ব্ব স্নান দর্শন করিয়া থাকেন! এই প্রবাদের সত্যতা বিচার করিতে ইচ্ছা করি না, তবে এই কথা সত্য যে, করুণাময় ভগবানের অপার করুণা আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রতি বর্ষিত হইয়াছিল! তাই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল—নতুবা অনাহার-ক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আর কষ্টের সীমা থাকিত না। সাধু মহাত্মাগণের স্নান শেষ হওয়া মাত্রই সর্ব্ব সাধারণের স্নান আবার আরম্ভ হইল,—ফটকগুলি খোলা হইলেই আবার যাত্রিগণ হাসিমুখে ছুটিতে লাগিল; এই হাসি বড়ই মধুর, ইহা যে প্রাণের অন্তঃস্থলের অভিব্যক্তি,—ইহা যে গভীর ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক! তাই বুঝি এত মিষ্ট, এত সুন্দর! আনন্দ কোলাহলের সহিত যাত্রিগণের স্নান চলিতে লাগিল, এই সময় একটী ফটকে শান্তিরক্ষক কোন পুলিশের হটকারিতায় এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল; জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সস্ত্রীক সেই ফটকের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন, পশ্চাৎ-দিক হইতে ধাক্কা আসিতেছিল, তাই তিনি তাঁহার স্ত্রী সহ ফটকের নিকটবর্ত্তী নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য চেষ্টা করেন, এই লইয়া একটী পুলিশের সঙ্গে তাঁহার বচসা হয়, অমনি সেই পুলিস হস্তস্থিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত "বেটন" দ্বারা ঐ ভদ্রলোকের কপালে সজোরে আঘাত করে, সেই আঘাতে তাঁহার কপালদেশ প্রায় দুই ইঞ্চি কাটিয়া ফোয়ারার ন্যায় রক্ত ছুটিতে থাকে; তিনি ভীরু কিম্বা কাপুরুষ নহেন, তাই সেই অবস্থায়ও পুলিশটীকে আক্রমন করিয়া তাহার হস্তস্থিত "বেটন" কাড়িয়া লন! এদিকে পুলিসের সাহায্যার্থে আরও পুলিশ আসিয়া পড়ে, কিন্তু সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী

ক্রোধোদ্দীপ্তা ফণিনীর ন্যায় পুলিসের বিরুদ্ধে স্বামীকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হন ! সেই রমণীতে যেন মহাশক্তির আবির্ভাব হইল; তাই বহু পুলিসের বিরুদ্ধে একাই স্বামীর সহায়তায় দণ্ডায়মানা হইলেন ! ধন্য পাঞ্জাবী জননী, তুমি যথার্থই সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছ ! অতঃপর বহুলোক আসিয়া অনুরোধকরতঃ পুলিসকে নিরস্ত করিল, তখন আহত ভদ্রলোকটীর সর্ব্বাঙ্গ রক্তধারায় প্লাবিত হইতেছিল, তাঁহার অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া "প্রয়াগ-স্বেচ্ছাসেবক সমিতির" কয়েকটী যুবক তাঁহাকে একটী বিছানায় শোয়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক বাঁধিয়া দিল; সেই বীর রমণী নিকটে বসিয়া স্বামীসেবায় নিযুক্ত হইলেন। আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়াও সেই বীর যুবক "বেটনটী" পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি কিছু সুস্থ হইলে কয়েকটী পুলিস সেই "বেটনটী" গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু স্বামীস্ত্রী উভয়েই এবিষয়ে প্রতিবাদ করেন এবং "বেটনটীও" পুলিশের হস্তে প্রদান না করিয়া কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে পুলিশের ব্যবহার সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন, তাহার ফলাফল আমরা অবগত নহি। রাত্রিকালে যাত্রিগণের ভীড় ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, রাত্রি বার ঘটিকা পর্য্যন্ত স্নান চলিল। ইতিমধ্যে ভিড় কমিয়া যাওয়ায় ফটকগুলি স্থায়ীভাবে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সকলেই সানন্দে স্নান করিয়া লইল, কাহারও আশা অপূর্ণ রহিল না। ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী চৌমাথায় একটী ছোট রকমের "জুতার পাহাড়" সৃষ্ট হইয়াছিল ! কারণ ব্রহ্মকুণ্ডে জুতা লইয়া যাওয়া নিষেধ, আবার যে পথে কুণ্ডে যাইতে হয়, স্নানান্তে সেইপথে আর কাহাকেও আসিতে দেওয়া হয় না; অন্য পথে যাইতে হয়। সরকারী ইস্তাহারে সতর্ক করা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ জুতা এরূপে স্তূপীকৃত হইয়াছিল। যদিও কোন কোন স্থানে পুলীশ হটকারিতা দেখাইয়াছে, তথাপি মোটের উপর তাহাদের ধৈর্য্য এবং কার্য্য প্রশংসনীয়। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ সমস্ত দিনব্যাপী কষ্ট স্বীকার করিয়াও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। কাশ্মীর জম্বুর মহারাজের কতক দেশীয় সৈন্য পুলিসের সহিত একযোগে ব্রহ্মকুণ্ডে শান্তিরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহারাও প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য।

এই স্নানের দিন মোটের উপর প্রায় পাঁচ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী এবং কুড়ি লক্ষ যাত্রী ও দর্শকের সমাগম হইয়াছিল; অর্থাৎ সমষ্টি প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক কুম্ভমেলায় যোগদান করিয়াছিল। বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলির মতে অদ্য বেলা ১১টা হইতে স্নানের প্রশস্ত যোগ বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়ায়, সাধু মহাত্মাগণ সেই যোগের সময়েই স্নান করিয়াছিলেন;—কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রকৃত যোগের সময়ে স্নান করিতে সক্ষম হইলেও, সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এই স্নানে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা প্রথম স্নানাপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছিল। এইখানে আমরা কুম্ভযোগে শেষ স্নানের বিবরণ শেষ করিলাম।

সংক্রামক ব্যাধি ঃ—কুম্ভযোগে এত অধিকসংখ্যক লোক সমাগম হওয়া সত্ত্বেও সরকারী এবং মিউনিসিপালিটীর সুবন্দোবস্তে সংক্রামক ব্যাধির অধিক প্রকোপ হয় নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুম্ভের শেষ স্নানের পর দিন হইতেই ভীষণ মড়ক আরম্ভ হইয়াছিল। নীলধারার তীরে এবং কণখলের এক পার্শ্বে মৃতদাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এই স্থানগুলিতে এত অধিক সংখ্যক মৃত দেহ সংকারের জন্য আসিতে লাগিল যে, দিবারাত্রি ভীষণ চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিতে ছিল! এই চিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, ১৫।২০টী মৃতদেহ একত্র করিয়া অগ্নিযোগ করা হইত এবং যাত্রিগণ-পরিত্যক্ত অসংখ্য খড়ের কুটিয়া (কুড়ে ঘর) আনিয়া চিতাতে নিক্ষেপ করা হইত! এইরূপে প্রবলাকারে ভীষণ অগ্নির লোলহান জিহ্বা উত্থিত হইয়া অসংখ্য নরনারীর শবদেহ করাল উদরে মুহূর্ত্তমধ্যে যেন নিঃশেষ করিয়া ফেলিত! একদিন আমরা নীলধারার শ্মশানে গিয়া দেখিলাম যে,—প্রত্যেক চিতাতে ১৫।২০টী করিয়া মৃতদেহ জ্বলিতেছে, আর [illegible] [illegible] প্রায় শতাধিক মৃতদেহ নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে! তাহাদের অধিকাংশই উলঙ্গ এবং বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত; কোন কোন সাধুর শব আসনবদ্ধ দেখিলাম! অনুসন্ধানে জানিলাম, সেই শ্মশানে তিন দিনে এগার শতের উপর মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে। আমরা কিয়ৎকাল সেই স্থানে অবস্থান করার মধ্যেই আরও ৩০।৪০টী মৃতদেহ ডোমেরা বহন করিয়া লইয়া আসিল, ইহার মধ্যেও বিশেষত্ব দেখিলাম! অধিকাংশ শবই উলঙ্গ, একটী মাত্র দীর্ঘ বাঁশের সহিত ২।৩টী দড়ি দ্বারা শবটীকে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছে! কোনটীর হাত দুইটী ঝুলিতেছে—কোন শবের মস্তকটী দুলিতেছে—কোনটীর বা পাগুলি ছড়াইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে! মোটের উপর শুনিলাম পাঁচ ছয় হাজার লোক এই কয়েক দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যদিও এই প্রকার মৃত্যুর কথা সাধারণের মনে ভয় ও বিভীষিকা উৎপাদন করিতে পারে, তথাপি ইহা ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে, যেস্থানে পঁচিশ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল, সেই স্থানে পাঁচ ছয় হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক কিম্বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! আর যাহারা সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের আত্মীয়বান্ধব অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে পরিত্যাগকরতঃ পলায়ন করে; সে বিষয় কাহারও অবিদিত নাই; বিশেষতঃ সাধুসন্ন্যাসীর মৃতদেহ যেখানে সেখানেই পড়িয়া থাকে—তাহাদের আর কে সৎকার করিবে? এরূপ অবস্থায় সরকারী বন্দোবস্ত অনুসারে স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার্থে, সরকার পক্ষ হইতে নিযুক্ত ডোমগণ সেই সকল মৃতদেহ আনিয়া একত্রে সৎকার করিয়া থাকে—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

যাত্রী বিদায়—স্নানের পরই নানা-প্রকার সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সরকার পক্ষ অস্থায়ী কুটিয়া হইতে যাত্রি-গণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—যাত্রিগণ কুটিয়া ত্যাগ করার পরই অগ্নি সংযোগে তাহা দগ্ধ করা হইত। "রোড়ি দ্বীপ" এবং

"বেল ওয়ালা দ্বীপ" হইতে সমস্ত যাত্রী অপসারিত করিয়া সমস্ত কুটিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহাতে গঙ্গার অপরতীরে কেহ যাতায়াত করিতে না পারে, তজ্জন্য অস্থায়ী পুলগুলিও আংশিকভাবে ভগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল স্থানে অস্থায়ী খড়ের ঘর ছিল, সমস্তই পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আউদ এবং রোহিলখণ্ড-রেলওয়ে কোম্পানী পূর্ব্ব হইতেই মেলা স্থানের বহু জায়গায় অস্থায়ী টিকিট ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তারিখ শূন্য টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ষ্টেশনেও ৮।১০টী নূতন পৃথক টিকিট ঘর এবং কয়েকটী অস্থায়ী প্লাট্‌ফরম (Platform) নির্ম্মাণ করিয়া যাত্রিগণের যাওয়ার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মালগাড়ী বোঝাই করিয়া যাত্রী বিদায় করা হইতেছিল, তথাপি ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত ষ্টেশনে লোকের ভিড় কিছু মাত্র কমে নাই।

উপসংহার।

বিরাট কুম্ভমেলার বিবরণ যথাসাধ্য প্রদত্ত হইল, এই প্রকার বিপুল অনুষ্ঠান লোকলোচনের গোচরীভূত করিতে যেরূপ লিপিকুশলতা থাকা আবশ্যক, ইহাতে তাহার নিতান্তই অভাব; তবে কতকগুলি আবশ্যকীয় নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদ্দারা পাঠকগণ যৎকিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। বিভিন্ন অবস্থায় নানাপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে, পাঠকগণের মধ্যে কেহ এসম্বন্ধে কিছু জানাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

এক্ষণে কুম্ভযোগে এই সাধুসম্মিলনী দর্শনে কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ মঠধারী সাধুগণের ঐশ্বর্য্যের বিষয় ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—এই যে প্রায় পাঁচ লক্ষ সাধু মেলাতে সমবেত হইয়াছিলেন, কিরূপে ইহাদের আহারের ব্যবস্থা হইল? অনেকে হয়তঃ বলিয়া উঠিবেন, গৃহস্থগণই বোধহয় তাহাদের আহার্য্য প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে। সাধু মহাত্মাগণই এই বিরাট ব্যাপারে সর্ব্বশ্রেণীর সাধুগণের আহার্য্য যোগাইয়াছিলেন। মঠ-আখরাধারী মোহন্তগণ এই বাবতে অজস্র অর্থব্যয় এবং সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! তাঁহাদের বিনয় নম্র ব্যবহার দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়! রাজার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু সকলই পরার্থে নিয়োজিত! আপনার বলিতে কিছুই নাই—সর্ব্বসাধারণের সহিত একত্রে বসিয়া জীবনধারণযোগ্য সাধারণ ভোগ্য বস্তুতেই পরিতৃপ্তি! ধন্য ত্যাগ—এই ত্যাগই ভারতের মুগম এবং চির গৌরবের বিষয়! তাই সাধারণ লোক ত দূরের কথা, অতুল বৈভবযুক্ত প্রতাপান্বিত রাজামহারাজাগণও এই সকল সাধুর পদরজ পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন! এই ত্যাগের বলেই ছাইমাখা ন্যাংটা সাধুর চরণে মণিময় রাজমুকুট লুণ্ঠিত! যাহারা সাধু মহাত্মাকে এক মুষ্টি ভিক্ষা প্রদান করিতেও অপব্যয় কি কুণ্ঠা বোধ করেন, কিম্বা তাহাদের হিতকাঙ্ক্ষী হইয়া পাচক ব্রাহ্মণ কি শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান

করতঃ আপনাদের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন,-সেই সকল গর্ব্বিত লোকের পক্ষে এই প্রকার সাধুসম্মিলনী দর্শন করা নিতান্তই কর্ত্তব্য! তাহা হইলে তাহাদের অহংকার অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহারা তখন বুঝিতে পারিবেন যে, সাধু সন্ন্যাসিগণ তাহাদের মত কখনই ক্ষুদ্রচেতা লোকের মুখাপেক্ষী নহেন! আরও বুঝিতে পারিবেন যে, আজও ভারতবর্ষে এমন সব-মঠধারী সাধু বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে রাজার রাজত্বও ক্রয় করিয়া লইতে পারেন; অথচ তাঁহারা আত্মসুখে বিভোর নহেন। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই জগতের মঙ্গলের জন্য,—তাঁহাদের সকল চিন্তাই জগচ্চিন্তায়। আখড়া এবং ছত্রাদির বিবরণ সম্পর্কে এ বিষয়ে পাঠকগণকে কতকটা আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এইপ্রকার সাধু সম্মিলনীর সার্থকতা কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জগদ্‌গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যই এই সম্মিলনীর মূল প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং ইহা যে জগতের কল্যাণের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইপ্রকার সম্মিলনী দ্বারা সনাতনধর্ম্মের উন্নতিসাধন হয়, ভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয়, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কিম্বা ভেদভাব দূরীভূত হয়; ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া আপন আপন ভাব বিনিময় দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতঃ আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবন গঠিত হয়, বিশিষ্ট মহাত্মাগণের আলোচনা ফলে সাধনপন্থা সুগম হয়, সকলেই একমাত্র জগত পিতার সন্তান এরূপ জ্ঞানে আপনাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃ ও প্রেমভাব প্রতিষ্ঠা করার সুবিধা হয়, পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় ও সমপ্রাণতায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং সৎপ্রসঙ্গে ও সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সাধারণেরও অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই জগতের প্রাণ—সার্ব্বভৌমিক ভাবে ধর্ম্মালোচনা করা, দেশকালভেদে সময় সময় বিশেষ আবশ্যক। একে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিভূষিত, তপোভূমি হরিদ্বার, তাহাতে করুণারূপিনী গঙ্গামায়ের অপূর্ব্ব সংযোগ, তাহাতে আবার অমৃত কুম্ভযোগ, তাহার উপর আবার লক্ষলক্ষ সাধু মহাত্মার অদ্ভুত সমাবেশ এহেন অপূর্ব্ব সম্মিলন জগতে বস্তুতঃই অতুলনীয়! এই প্রকার ধর্ম্মসংঘ দ্বারা জগতের যে কত প্রকার মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান কুম্ভে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা, প্রারম্ভিক সাধু-ধর্ম্ম মহাসভা, সনাতন ধর্ম্মসভা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা জাগরণের ভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মের নবীন আলোক জগতে নবযুগ আনয়ন করিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

তৃতীয়তঃ, কুম্ভে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? এসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। কি পঞ্জাবী, কি হিন্দুস্থানী, কি মাড়ওয়ারী, কি গুজরাটী, কি সিন্ধু, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি মান্দ্রাজী, কুম্ভে সকল প্রদেশের লোকেরই বিশেষ উৎসাহ এবং কার্য্যতৎপরতা দৃষ্ট হইল, কিন্তু বঙ্গদেশ এবিষয়ে যেন সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ বোধ হইল! অবশ্য কাশ্মীরাধিরাজের মহারাজা এবং ত্রিপুরার মহারাজা কুম্ভে যোগ দিয়াছিলেন, তথাপি বঙ্গদেশের

অসংখ্য রাজা-মহারাজা এবং ধনকুবেরগণ এই মহা-সম্মিলন দর্শন করা কি নিতান্তই অযোগ্য মনে করিলেন ? তাঁহাদের এবিষয়ে কি কিছুমাত্র কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল না ? কূপ-মণ্ডুকের মত আপন আপন স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে চাটুকার পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগবিলাসে মত্ত থাকাই কি শ্রেয় মনে করিলেন ? ইহাই কি জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ !'

অন্যান্য প্রদেশ হইতে নানা শ্রেণীর বহুলোক কুম্ভে আগমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা তেমন আশাপ্রদ নহে। এই বিরাট অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশের যেন বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ! কিছুদিন পূর্ব্বে ৺বৃন্দাবন-ধামে একটী সুবৃহৎ সাধু সম্মিলনী হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের কার্য্যতৎপরতা অন্যান্য প্রদেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ; কিন্তু হরিদ্বার কুম্ভের ন্যায় বিরাট-যজ্ঞে বাঙ্গালী এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাব দেখাইল কেন ? কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি দেশসেবা, কি সাহিত্যসেবা, কি বিজ্ঞানচর্চ্চা সকল বিষয়েই বাঙ্গালী পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ! সকল বিষয়েই বাঙ্গালী অগ্রণী ! সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় মুগ্ধ !—সমগ্র বাঙ্গালীজাতি তাহাতে গৌরবান্বিত। আর ভারতের গৌরবমণ্ডিত অপূর্ব্ব কোহিনুর, সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ জগতের অশেষ কল্যাণপ্রদ কুম্ভমেলাতে বাঙ্গালী যেন উদাসীন—বাঙ্গালী যেন তাহা হইতে সরিয়া থাকিতেই ভালবাসে ! ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ? বাঙ্গালার ধনকুবেরগণ কতরূপে কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকেন, একমাসের জন্য কোন একটী অস্থায়ী ছত্র কিম্বা সদাব্রত স্থাপন করিয়া অর্থের সৎব্যয় করতঃ কি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিতে পারিলেন না ? বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল, যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও তেমন নহে যে, অন্যান্য প্রদেশের সাধুগণের ন্যায় ছত্র খুলিয়া আদর্শ স্থাপনা করিবেন ! ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ! আগামী কুম্ভ-মেলা ৺প্রয়াগধামে সুসম্পন্ন হইবে, ইহাই বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কুম্ভের স্থান ; ভরসাকরি উক্ত কুম্ভে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কার্য্যতৎপরতা এবং জাগরণের ভাব দেখিতে পাইব।

কুম্ভে সমাগত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধুমণ্ডলীর উদ্দেশে প্রণিপাতকরতঃ প্রার্থনা যে, ভারতে কুম্ভযোগে সাধুমহাসম্মিলনী স্থাপনের মহান্ ও মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করুক। ভগবান সকলকে সুমতি প্রদান করুন ! আমরা আগামী প্রয়াগ কুম্ভে আবার সাধু-মণ্ডলী দর্শনে উদ্গ্রীব রহিলাম। এক্ষণে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অতুল রাতুল চরণযুগল স্মরণকরতঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"ভবপাশ বিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে,
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ;
নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপায়াজ্ঞানহারিণে,
আত্মজ্ঞানপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"
ওঁ শান্তি শান্তিরেব শান্তি ওঁ।

জনৈক দর্শক।

:0:

আকিঞ্চন।

আমি আধার হৃদয়ে নীরব নিশীথে সাজায়ে
রাখিব আশার বাতি।
তুমি নিভৃতে আসিয়া অজ্ঞাতে আমার দিয়ো
গো জ্বালায়ে তড়িত ভাতি।
আমি তুলিয়া যতনে অশোক-স্তবক রাখিব
পুলকে শয়ন পাতি।
তুমি কমলার সনে হৃদয়দেবতা করিও বিহার
দিবস রাতি।
আমি অনিমিষ নেত্রে মহিমা তোমার গাহিব
চাহিয়া তোমারি পানে।
তুমি করো না ভ্রূকুটী শুনিয়া আমার মাধুর্য্য-
বিহীন কর্কশ তানে।

দিব রাতুল চরণে ভকতি-তুলসী করিয়া
সিঞ্চিত নয়ন নীরে।
তুমি দিয়ো গো প্রাণেশ! এগিয়ে তোমার
ত্রিলোকবাঞ্ছিত চরণ ধীরে।
আমি সম্পদে বিপদে শয়নে স্বপনে যেন
গো নাহি হই তোমা হারা।
তুমি মুরলীর তানে দিবস শর্ব্বরী দিও গো
আমার হৃদয়ে সাড়া।
আমি হ'য়ে তোমা হারা পারি না রাখিতে
ক্ষুদ্র এই তৃষিত জীবন।
তুমি আছ সদা কাছে, থাকিও সতত
তাপিতের এই "আকিঞ্চন"।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

———:০:———

কে আছ আমার?

অনন্ত আধারে, পথহারা হয়ে
ভ্রমিতেছি ঘুরে, দেও দেখাইয়ে,
কে আছ আমার?

অকুল সাগরে ঘূর্ণিপাকে পড়ে,
ডুবে বুঝি তরী রক্ষ ত্বরা করে
কে আছ আমার?

ত্রিতাপ জ্বালায় আমি জ্বলে মরি
কর জ্বালা দূর ঢেলে শান্তি-বারি
কে আছ আমার?

অমৃত খাইতে হলাহল পিয়ে
যাহিয়ার প্রাণ বাচাও আমায়
কে আছ আমার?

হয়েছি মলিন পাপ-কালিমায়
ধুয়ে নেও কোলে কৃপা-বরিষায়
কে আছ আমার?

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনন্তের স্রোতে
যেতেছি ভাসিয়ে টেনে লও কাছে
কে আছ আমার?

আর ত সহে না এ ঘোর যাতনা
নিজগুণে কর দুখ বিমোচন
কে আছ আমার?

দীন—উমেশচন্দ্র।

———:০:———

আত্মোপদেশ।

(৩)

সংস্কার ও কর্ম্মফল।

পূর্ব্বসংস্কার বিনা অর্থাৎ অকারণ কোনও কর্ম্ম কখনই উদিত হইতে পারে না। পূর্ব্ব সংস্কার কর্ম্মকে জন্ম দেয় বা আবির্ভাব করে; অর্থাৎ কর্ম্মের ফলে সংস্কার সঞ্চিত হয়।

সংস্কারের অর্থ বিশিষ্টভাব বা স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহা করিয়া ফেলে, সেই কর্ম্ম পুনর্ব্বার করিবার জন্য তাহার একটা স্বভাব সঞ্চিত হয়। সেই স্বভাবটা কারণ-শরীরে লুকাইয়া থাকে।

নির্ব্বাণ-মোক্ষ।

যখন সত্য বা তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, তখন উহার ফলে, ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধি নিশ্চেষ্টতাপ্রযুক্ত বিলয় হয়।

যাহার কারণ সঞ্চিত নাই, তাহার কোন সূক্ষ্মবিশিষ্ট শরীর হয় না এবং সূক্ষ্ম নাই বলিয়া স্থূল শরীরও হয় না। সে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়।

বুদ্বুদের বিলয়ে সমুদ্রের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। বায়ু সঞ্চারণ করুক বা নাই করুক, পবনের ভাণ্ডার সমান থাকে।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি।

তমোময় বিস্মৃতিই কারণগর্ভ এবং স্মৃতি-সঞ্চারই মূর্ত্তির বা শক্তিদেহের পুনরাবির্ভাব।

শুভ বা সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল।

পরমাত্ম-ভক্তি, প্রেম, পূজন অথবা জগতে নিস্বার্থতা, দয়া, ক্ষমা, অক্রোধ, পরোপকারাদি সাত্ত্বিক বা শুভকর্ম্মের দ্বারা শুভসংস্কার সঞ্চিত হয় এবং চিত্তপ্রসাদক ভাব বা শক্তি মূর্ত্তি নিজের অদৃষ্ট-ভাণ্ডারে জমা থাকে।

চিত্তপ্রসাদ লাভ বড় সামান্য লাভ নহে। চিত্তপ্রসাদ না হইলে তত্ত্ব বা সত্যদর্শন সংঘটন হইতেই পারে না। কারণগর্ভে বা অদৃষ্ট সংস্কারগর্ভে বা তমোময় প্রকৃতির গর্ভে যদি দুষ্কর্ম্মের সংস্কার সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে চিত্ত অদৃষ্ট কারণে অস্থির হয় এবং অস্থিরচিত্তে পরমানন্দময় মুক্তস্বভাব সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয় না।

ত্রিগুণময়ী মহামায়া।

মহামায়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া কেহ কখনই তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই, বা তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। যে তাঁহর তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সে তাহাকে ভক্তি ও আরাধনার দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদ, পুরাণ দেখ।

সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির না হইলে "সত্য" অনুভব হয় না, চাঞ্চল্যের দ্বারা সত্যানুভব হয় না!

মহর্ষিদিগের তপস্যার কি অদ্ভুত প্রভাব! তাঁহারা দিব্যচক্ষে স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, ভগবতীর "একান্ত শরণাপন্নতারূপ" সাত্ত্বিক ক্রিয়া না করিলে "তমোনাশ এবং জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষরূপ কর্ম্মফল" উদিত হয় না।

আত্মধর্ম্ম ও সাধন প্রকাশের প্রবৃত্তি।

যখন নিজ সাধন ও ধর্ম্ম প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিরূপ, বিক্ষেপ বা পাপ মনুষ্যের চিত্তকে অধিকার করে, তখন সেই পাপে তাহার অর্জ্জিত ধর্ম্ম বা শক্তি ক্ষীণ হইতে হইতে অতি শীঘ্র অতি শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া যায়। আকর্ষণ বিপরীতগামী হয়।

যশঃ-কামনা ও ভ্রান্তিযোনি।

পরমার্থ সাধন, নিরীহ হইয়া ও একান্তভাবে করিতে হয়;—যাহারা নিরীহ হইতে পারেন না, ইহলোকে যশঃ প্রতিষ্ঠাদি কামনা করেন, তাঁহারা ভ্রান্তিযোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাধনার্জ্জিত লোকচ্যুত হন। শাস্ত্রের অভিসম্পাত—"পুনর্ম্মূষিকোভব"।

মৃত্যুভয়।

সর্ব্বভয়ের মূল মৃত্যুভয়। এমন দেহধারী নাই, যাহার মৃত্যুভয় নাই। শিশুরাও যে তীব্র শব্দাদি অকস্মাৎ শ্রবণ করিলে চমকিয়া উঠে, মৃত্যুভয়রূপ পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারই তাহার কারণ।

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার দেহে, একটা মৃত্যুর আশঙ্কা সিদ্ধ হইয়া থাকে। নচেৎ উৎকট শব্দ শ্রবণে ভয়ের উদ্রেক না হইয়া উল্লাসের উদ্রেক ত হইতে পারিত।

নিষ্কাম ভক্তি ও নিরাকার সাধন।

নিষ্কাম ভক্তি দ্বারা কামনা সিদ্ধি এবং নিরাকার সাধন দ্বারারূপ দর্শন হয়।

দেহী।

যিনি দেহ ধারণ করিয়াছেন, দেহ ত্যাগের বিষয় মনে হইলে, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

উচ্চ অবস্থা।

চিত্ত যে পরিমাণে, পরমাত্মধ্যানপরায়ণ হয় এবং পরমাত্মভাব-প্রধান হয়, মনুষ্যের অবস্থা সেই পরিমাণে উচ্চ হয়।

নিষ্ঠা।

মন একনিষ্ঠ হইলেই, বুদ্ধি উপস্থিত হয়, বল উপস্থিত হয় এবং কার্য্যসিদ্ধি হয়। একনিষ্ঠ হইয়া, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, তাহার উদ্যম কখনই নিষ্ফল হয় না, বহুসঙ্গতাই ব্যভিচার, ব্যভিচার হইতেই সঙ্কোচোৎপন্ন হয়।

পরমাত্মদর্শন ও জগৎ দর্শন।

যেমন জগৎ দর্শন বিবিধ চিন্তা ও সংশয় উদিত হইবার কারণ, তদ্রূপ পরমাত্মদর্শন সর্ব্বচিন্তার ও সন্দেহের অবসান হইবার কারণ হয়।

দেহ।

দেহ পরিচ্ছদের ন্যায় ইহা ইচ্ছাতন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও ধৃত হয়। ইচ্ছাই মূল। যাহার যেমন ইচ্ছা, তাহার তেমনি দেহ।

বিপরীত সংস্কার উৎপত্তি।

জগৎ-দর্শনে বুদ্ধিতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, ভগবদ্দর্শনে উহার বিপরীত সংস্কার উৎপন্ন হয়। সংসারীর বুদ্ধি, সদাই ভবিষ্যৎ ভীরুতারূপ সংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে। জগৎকারণ পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হইলে, বুদ্ধিতে ভয়ের সংস্কার থাকিতেই পারে না। কারণ, তখন

জগতের কার্য্যকারণ ও শুভাশুভের উৎপত্তির মূল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়।

তীব্র রসযুক্ত খাদ্য।

তীব্র রসযুক্ত বস্তু আহার করিলে বায়ু বিকৃতি, দেহ দৌর্ব্বল্য ও চিত্তবিক্ষেপ হইতে দেখা যায়।

ভয়ের কারণ।

নিত্যবস্তুর ভয়ের কারণ নাই। অনিত্য বস্তুরই ভয়ের কারণ আছে; যাহা সতত রূপান্তর হয়, তাহারই পরিবর্ত্তনের ভয় আছে।

মন নিত্য ও অনিত্য উভয়াত্মক। মনে নিত্য আত্মার আভাসও আছে এবং পরিবর্ত্তনশীল জগতের আভাসও আছে।

পুরুষ-প্রকৃতি ও জীব।

পুরুষ ও প্রকৃতি, কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের কার্য্য নহেন। তাঁহাদের অগ্রেও কেহই নাই এবং পশ্চাতেও কেহই নাই।

জীবত্ব প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফল।

আমরা স্বপ্রতিষ্ঠিত নহি; আমরা অপরের, কর্ম্মফল, আমার অন্য বস্তু, আমাদের সত্তা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগপ্রসূত; আমাদের জীব হইয়া জন্মাইবার কারণ আছে। আমরা যে কারণের কার্য্য, সেই কারণের ধর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা, আমাদের জনক জননী হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে, তাহাদের ধর্ম্ম বা গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি; পরন্তু, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে একটু ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের অর্থাৎ কার্য্যের বা কর্ম্মফলের, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ত্রিবিধ "ঘনদেহরূপ" শক্তিপ্রাচীর উদ্ভূত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ প্রাচীর ভেদ না করিলে, আর আমরা আমাদের জনক ও জননীকে দেখিতে পাই না এবং তাহাদের ধর্ম্মও ধারণা করিতে পারি না, এবং নিজ ইচ্ছায় যাহা করি, তাহা করিয়া কষ্ট পাই ও অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াই। "জন্য" বস্তুর কি দুর্দ্দশা,—অপরের ধর্ম্ম সদাই নাকে দড়িদিয়া ঘুড়াইতেছে, কিছুতেই স্থির হইতে দিতেছে না—যতক্ষণ না সেই নিজ-কারণের বা জনক জননীর ধ্যান করিবে,—তাহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবে, ততক্ষণ কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। তুমি যাহা কিছুই কর না কেন, যথা—ভক্ষন, পান, ভ্রমন, উপবেশন, শয়ন, দর্শন, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি যে কর্ম্মটি, তোমার কারণরূপ জনক জননীর ধর্ম্মসম্মত না হয়, তাহা হইতেই দুঃখ, ভয়, কষ্ট, অস্থিরতা উদয় হইবে। সুতরাং তুমি ত্রিবিধ দেহাদিরূপ, কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বিমনা হইয়া সেই সর্ব্বদরূপ কারণে প্রবিষ্ট হইয়া সুস্থির হও।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---:0:---

যোগানন্দ-লহরী।

গৌরি (১৪) একতালা।

শিব শঙ্কর ভোলা— শোভে শশধর ভালে।
নয়নে অনল ধিকি ধিকি জ্বলে, জাহ্নবী জটাজালে॥
বববম্ রবে বাজিছে গাল,
নাচিছে রঙ্গে প্রমথপাল,
শিঙ্গা ডমরু গরজে ভাল, দৃমিকি দৃমিকি তালে॥
আপন বিভোলা ভোলা মহেশ্বর,
সদা প্রাণ খোলা হর দিগম্বর,
চিতাভস্ম অঙ্গে শোভিছে সুন্দর, হাড়মালা দোলে গলে;—
ভূতপ্রেতগণে সতত আদরে,
স্নেহে হৃদে ধরে কাল বিষধরে,
বিশ্বপতি হয়ে কেবা ভিক্ষা করে, অধরে ধরে গরলে॥
বিশ্ব প্রেমে সে যে সতত বিরাগী,
প্রেমে শ্মশানবাসী প্রেমে মহাযোগী,
জীবের লাগিয়ে হয়ে সর্ব্বত্যাগী, অমিয় করুণা ঢালে;—
ভুবন বিজয়ী ভজ সে মহেশে,
চিদানন্দরূপী সেই আশুতোষে,
জ্ঞানের আলোকে মোহতম নাশে, কে জানে সেই দয়ালে॥

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(১৭)

শ্রুতি-বাক্য বিলোমক—কি বিরোধক?

হিমাচলের উৎপাটন,—পূতবাহিনী জাহ্নবী স্রোতের সংরোধন,—"উত্তাল তরঙ্গাকুলিত বারিনিধির শোষণ," অথবা জলস্তানল ভক্ষন ইত্যাদি কর্ম্ম যদ্যপি কখন সম্ভাব্য বলিয়া গণ্য হয়, তথাপি বেদ বা শ্রুতিবাক্যের ব্যর্থাশঙ্কা বা বৃথাত্ব কস্মিনকালেও সম্ভবপর নহে। মানুষ ভ্রমপ্রমাদের দাস, অজ্ঞানান্ধকারের ঐশ্বর্য্যময়ী বিভূতি তাহার আত্ম-বিলোকন শক্তির অবরোধক। কাজেই মানুষের কথা হইলে

তাহা সত্য কি মিথ্যা, প্রামাণ্য কি অপ্রামাণ্য ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ বা আশঙ্কা উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আবার সন্দেহ বা আশঙ্কাই পরীক্ষা বুদ্ধির উদ্রেক, বা সন্দেহই পরীক্ষার অবয়ব স্বরূপ। এইজন্য কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই পরীক্ষা আরম্ভের কারণ হয়; সুতরাং পরীক্ষার কারণীভূত সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে, পরীক্ষার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য্য।

কিন্তু বেদ বা শ্রুতি ঈশ্বরবাক্য। ঈশ্বরবাক্য সন্দিহ্যমান বস্তু নহে,—বা তাহাতে সন্দেহের আরোপ করা যায় না;—যেহেতু ঈশ্বর বস্তুটীরও নির্দ্ধারণ আসিয়া পড়ে। কাজেই ঈশ্বরবাক্যে প্রামাণ্য-সন্দেহ না থাকায়, বেদ বা শ্রুতিবাক্যের পরীক্ষা প্রয়োজন হয় না। পরন্তু পৌনঃপুনিক [illegible] বা সারভাব গ্রহণকরতঃ বেদ বা শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া "বেদো" প্রামাণ অব্যাহত রাখিতে হয়। অতএব পূর্ব-কথিত "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" শ্রুতি-মন্ত্র দ্বারা সাংখ্যদর্শন পরিকল্পিত প্রকৃতি বা সৎপদার্থস্বরূপ পূর্ণ-পরব্রহ্মের ঈক্ষণত্ব ও বহুত্ব প্রতিপাদিত না হইলেও, বেদ বা শ্রুতিবাক্যের বিফলশঙ্কা আবশ্যম্ভাবী নহে, বা শ্রুতিবাক্য বিলোমক (বিপরীত অর্থাৎ— উলটাপালট জনিত প্রতিকূল) নহে। পরন্তু বিবোধক;—অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গক বা আনন্দায়ক। সে সকল "গভীর" বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন হইলেও, স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিলে— আলোচ্য চতুর্থ শ্রুতির তাৎপর্য্যই "প্রকারান্তরে" তাহার প্রমাণরূপে গণ্য হইয়া যায়।

চতুর্থ শ্রুতি—"পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা ইত্যাদি" মন্ত্রের সারভাব দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে,—পৃথ্ব্যাদি সূক্ষ্ম-স্থূল ভূতপঞ্চ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার ইত্যাদিতে চতুর্বিংশতি, পঞ্চবিংশতি, প্রভৃতি তত্ত্ব ও তদ্বিষয়ীভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি গুণ পদার্থ;—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন ইত্যাদি কর্ম্মপদার্থ; গন্তব্য, মন্তব্য, প্রষ্টব্য, প্রকাশ্য, ধারয়িতব্য ইত্যাদিতে সমস্ত অনন্ত সমুদায় পদার্থ;— "অর্থাৎ এক কথায় সমস্ত জগতই" পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম বিলীন হইয়া যায়।

তৎপর কথা। পদার্থগুলি বিলীন হইয়া তথন কিরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, জানা উচিত। এইজন্য ঐ শ্রুতিই পুনরায় বলিতেছেন যে,—"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে"। তাৎপর্য্য এই যে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি দেশের নদী সকল (যাহাকে লোকে বর্দ্ধমানের বড় নদী, মেদিনীপুরের শিলাবতী, বীরভূমের অজেয় নদী ইত্যাদি নামে অভিহিত করে) নানাবিধ আকারে সমুদ্রাভিমুখে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহারা বর্দ্ধমানের বড় নদী, মেদিনীপুরের শিলাবতী ইত্যাদি নাম ও আকার হারাইয়া,—অতলস্পর্শ বারিনিধির সহিত একীভাব ধারণকরতঃ বারিনিধি

বা সমুদ্র উপাধি লাভ করে। নিজের স্বভাব, ভাব লোপ হইয়া সমুদ্রের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। তদ্রূপ চতুর্বিংশতি, পঞ্চবিংশতি, ষড়বিংশতি, মতান্তরে সপ্তবিংশতি তত্ত্ব। অন্তর্ভূত উল্লিখিত তত্ত্ব বা পদার্থ সকল অর্থাৎ সমস্ত জগতই নানাবিধ নামে, অগণিত তত্ত্ব এবং বিভিন্ন গুণ-ক্রিয়া হারাইয়া,—"পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্মের সহিত" একীভাব ধারণকরতঃ অভিন্ন হইয়া যায়। পরন্তু পূর্ণ-পরব্রহ্ম নামেই প্রসিদ্ধ হয়। অতএব 'আলোচ্য' শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা গেল যে,—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ইত্যাদিতে সূক্ষ্ম, স্থূল, পাঞ্চভৌতিক জগৎ নিজের নাম, গুণ,—ক্রিয়া হারাইয়া এমন এক স্থানে বিলীন হইয়া যায়, যাহার নাম "পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম"। যাহা সনাতন, নিশ্চল, অচ্যুত।

উত্তম কথা। অতঃপর অনুকূল তর্কের সহিত বিচার করিয়া দেখুন। মধুমক্ষিকাসকল বেল, বকুল, জুঁই ইত্যাদি ফুলের রস সংগ্রহ করতঃ একত্রিত করে। রস একত্র পাইলে মধুরূপে পরিণত হয়। মধুরূপে পরিণত হইলে আর বলা যায় না যে, এই রস টুকুর নাম বেল ফুলের রস, এই রস টুকুর নাম বকুল ফুলের রস, এই রস টুকুর নাম জুঁই ফুলের রস। তখন তাহার "বেল ফুলের রস ইত্যাদি" নাম হারাইয়া এক অভিন্ন "মধু" নামে প্রসিদ্ধ হয়। তবেই দেখা গেল, মধুর প্রতিকারণ হইতেছে বেল, বকুল, জুঁই ইত্যাদি ফুলের রস। আবার রস থাকিলেই ফুল, ফুল থাকিলেই ফুল গাছ ইত্যাদির বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী। ফুল গাছ, ফুল ও ফুলের রস না থাকিলে "ফুলের" মধু হয়, এ কথা কেহ বলে না। অতএব এক মধুর প্রতি-কারণ হইতেছে ফুল গাছ, ফুল ও রস ইত্যাদি। তদ্রূপ মহত্তত্ত্ব ইত্যাদিতে সমস্ত জগৎ একী-ভাব ধারণকরতঃ যেখানে বিলীন হইয়া যায়, সেখানে আর এইটী মহত্তত্ত্ব, এই স্থানটী অহঙ্কার, এই অংশটি পঞ্চ তন্মাত্র কোন কিছু নির্ণয় হইতে পারে না। তখন তাহাদের নাম এক অভিন্ন "পূর্ণপরব্রহ্ম"। আর পাঞ্চভৌতিক জগৎ ঐ "পূর্ণপরব্রহ্মের প্রতিকারণ। যেমন ফুল ও ফুল গাছ মধুর প্রতিকারণ।

আচ্ছা,—শ্রুতি মতে না হয় সাব্যস্ত হইল, সে স্থানের নাম "পূর্ণপরব্রহ্ম"। যাহা অনন্ত প্রয়োজনবিশিষ্ট, অনুপম ও শাশ্বত। কিন্তু আলোচ্য প্রকৃতির সাম্যাবস্থার তুলনায়, সে স্থানের নাম প্রকৃতি, প্রধান, জগদ্যোনি ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অতএব যেখানে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়, সে স্থানের নাম "পূর্ণপরব্রহ্ম স্থলে" প্রকৃতি, প্রধান ইত্যাদি হইলে আপত্তি কি?—ভালকথা। এরূপ হইলে মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি পরিদৃশ্যমান জগৎ—প্রধানের প্রতিকারণ; (যেমন ফুলগাছ, ফুল, রস, ইত্যাদি মধুর প্রতিকারণ) অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে: অতএব দাঁড়াইল এই যে;—সমস্ত সূক্ষ্ম, স্থূল, পাঞ্চ-ভৌতিক জগৎ—প্রকৃতি বা প্রধানের প্রতি-কারণ।

উত্তম কথা। অতঃপর একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখুন। মধু বস্তুটী আর ত "পরিণাম পাইয়া" ফুল গাছ বা ফুল হইয়া যায় না। এরূপাবস্থায় প্রকৃতি বা প্রধান ইহারই বা জগৎ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

আবার ফুলের অবয়ব একরূপ, আর মধুর অবয়ব অন্যরূপ। তদ্রূপ জগতের অবয়ব একরূপ, আর জগতের বিলীনাবস্থা অন্যরূপ। এই বিলীনাবস্থার,—"যেখানে মন, বাক্য, কর্ম্ম যায় না, এবম্ভূত বিলীনাবস্থার" যদ্যপি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয়, তাহাহইলে মধুর পরিণাম ফুলগাছ,—চিনি বা শর্করার পরিণাম ইক্ষুগাছ, তৈলের পরিণাম তিলগাছ, ঘৃতের পরিণাম দুগ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইবে। অন্যথায় গাভী তৃণাদি ভক্ষণ করিলে দুগ্ধ হয়; সুতরাং তৃণাদির পরিণাম দুগ্ধ। আবার দুগ্ধের পরিণাম দধি; কেবল এইরূপ তুলনায় প্রধানের পরিণামত্ব প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে,—বলদ-গরুতে তৃণাদি ভক্ষণ করিলে দুগ্ধ হয় না, দধিও দুগ্ধ হইয়া যায় না, এইরূপ উদাহরণগুলিও নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া বিচারের ভিত্তি স্থায়ী রাখিতে হয়। অন্যথায় প্রয়োজনসিদ্ধি পরাহত উঠে; প্রমাজ্ঞান-লাভও অসম্ভব হয়। অতএব বর্ত্তমান আলোচনায় একরূপ দেখা গেল যে, "মধুর-তুলনায়" প্রকৃতি বা প্রধানের পরিণাম অবশ্যম্ভাবী নহে। এরূপ হইলে প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্ত বা স্বতঃপরিণাম অসিদ্ধ হইয়া যায়। সত্ব, রজঃ, তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার তাঁহার নাম প্রকৃতি, প্রধান ইত্যাদি শব্দ বাচ্য হয়। প্রধান অপরিণামী হইলে, আর গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রয়োজন করে না; অর্থাৎ গুণ-ত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব ত্যাগ হইয়া যে সমভাবে অবস্থান, তাহাও আর প্রয়োজন হয় না। কেননা অপরিণামী বস্তু সদামুক্ত, চিরসাম্য, সমত্ব। কাজেই তাঁহার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অপেক্ষা করিয়া যে, "প্রধান"—"জগদ্‌যোনি" ইত্যাদি উপাধি তাহাও লোপ পায়। আর ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান প্রকৃতির জগৎকারণত্বও পণ্ড হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে নিত্যবস্তুর কখন পরিণাম হয় না, বা আজ একভাবে এক নাম, কাল অন্য ভাবে ভিন্ন নাম, এইরূপ নাম ও ভাবের পরিবর্ত্তন আসে না। কারণ,—পরিণাম অপরিণাম, সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়, আলোক, অন্ধকার, আতপ,-ছায়া এবং গমন ও অবস্থিতি একাধারে অসম্ভব; পরন্তু গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী হওয়ায় তাহার ভিত্তি থাকে না। নিত্যত্ব ধ্বংস হইয়া যায়। ভিত্তি না থাকিলে বস্তুর আদরও কেহ করে না;—অর্থাৎ পরিণামি ন যদি তাদৃশম্"। আবার যে বস্তু পরিণাম থাকে, তাহা অক্ষর, অমর হয় না। উৎপত্তি, বিনাশ, পরিণাম,-অপরিণাম ইত্যাদিতে পদে পদে নশ্বরত্ব প্রকাশ পায়। নিত্যত্ব প্রতিপাদক যে সকল উপদেশ তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং বাধ্য হইয়া পরিণাম, অপরিণাম অনিত্য—নিত্য, বিদিত—অবিদিত, এসকলের অতীত যে বস্তু, সেই বস্তুই পরাৎপর পরম বস্তু স্বীকার করতঃ তাহাতেই রমমাণ থাকিতে হয়।

অতএব বর্ত্তমান প্রসঙ্গে জানা গেল, নদী ও সমুদ্রের তুলনায়, মহত্ত্বাদিতে পাঞ্চভৌতিক জগৎ নিজের নাম রূপ, হাব ভাব হারাইয়া কোন এক অজানিত স্থানে বিলীন হইয়া যায়। যে শ্রুতি, আলোচ্য চতুর্থ শ্রুতি মন্ত্রের প্রমাণক, সেই শ্রুতিবাক্য দ্বারাই ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। বর্ত্তমানে সে স্থানের নাম পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্মই বল, আর প্রকৃতিই বল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক জগৎ যখন নিজের নাম, রূপ, গুণ

হারাইতেছে, তখন তাহার ভিত্তি না থাকায় নিত্য বস্তু গণ্য হইতে পারে না। পরন্তু নশ্বরাপত্তিতে অনিত্য বস্তুরই নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। মহত্তত্ব ইত্যাদিতে পাঞ্চভৌতিক জগৎ অনিত্যোপাধিবিশিষ্ট হইলে, ইহাদের কারণীভূতা প্রকৃতি,— যিনি বিশ্ব সমস্তের মূল, জগতের কারণ নিত্যবস্তু—তিনও অবশ্য বচঃ হইবে, অর্থাৎ নিত্যত্ব হারাইয়া অনিত্যত্বে আসিবে। কেননা কার্য্যের গুণ কারণে। আর কারণের গুণ কার্য্যে,— ইহাই "কার্য্যও সৎ,—কারণও সৎ" মতের প্রধান প্রকৃতি উপাসনা বা পুরুষমিশ্রণে বিশ্ব সৃষ্টি উপাসকগণের মূল সাধনা। অভিপ্রায় এই যে,—আলোচ্য প্রকৃতি-তত্ত্বের মতে, মহত্তত্ব পদার্থটা জগৎ-কারণ মূল প্রকৃতির কার্য্য। সে কার্য্য অনিত্য উপাধি বিষয়ীভূত হইলে, কার্য্যের যে কারণ, তাহাও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অনিত্য,—অসৎ ইহাতে দ্বিধা বা অস্বীকারের উপায় নাই।

শ্রীগোপাল দেবশর্ম্মা।

সন্তোষপুর, হুগলী।

———:0:———

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবনতির মূল কারণ কি? কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি, ইহকাল-সর্ব্বস্ব জ্ঞান, ভোগকাঙ্ক্ষাই কি ইহার মূল কারণ নহে? প্রাচীনকাল হইতে মনুষ্যের জন্য দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; একটী প্রবৃত্তি পথ, অপরটী নিবৃত্তি পথ, কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ মানবকে স্ব স্ব কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত করিতে চায়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যখন মানব মন উহাদের দাসত্ব করে,—উহাদের আদেশে পরিচালিত হয়, তখন উহাকে প্রবৃত্তিপথগামী আর যখন উহাদের দাসত্ব-পাশ ছিন্ন করে বা করিবার চেষ্টা করে, তখন উহাকে নিবৃত্তিপথগামী, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকে প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্বপাশ ছিন্ন করাকে নিবৃত্তি বলে। প্রবৃত্তিপথ স্বাভাবিক ও আপাতঃমধুর; কিন্তু পরিণাম বিষময়। আর নিবৃত্তিপথ অস্বাভাবিক ও আপাতঃকঠোর; কিন্তু পরিণাম অমৃতময়।

প্রবৃত্তিচালিত পথে গমন করিলে মানব ক্রমে পশুত্ব, প্রেতত্ব ও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; আর নিবৃত্তিচালিত পথে গমন করিলে মানব ক্রমে দেবত্ব, সোঽহংত্ব অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। মানবমন স্বভাবতঃই এই দুটীর কোন একটী পথে পরিচালিত হয়; যে মানব যতদূর প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে, সে ততদূর অধঃপতিত, আর যে মানব যতদূর নিবৃত্তিমার্গগামী তিনি ততদূর উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। যখন যে সমাজে অধিকসংখ্যক লোক প্রবৃত্তিপথগামী হয়, তখন সেই সমাজ অধঃপতিত হইতেছে, আবার যখন যে সমাজের অধিকসংখ্যক লোক নিবৃত্তি পথে পরিচালিত হয়, তখন সেই সমাজ উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে বুঝিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুসমাজের কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ভোগী, কি ত্যাগী, প্রায় সকলেই নিবৃত্তি পথ ভালবাসিতেন, তাই

তাঁহারা শৌর্য্যেবীর্য্যে, মহত্বে-মনুষ্যত্বে,- জ্ঞানেগুণে, দয়াদাক্ষিণ্যে, ত্যাগ বৈরাগ্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং এখনও জগতের আদর্শ ও আরাধ্য স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদেরই ঔরসে এমন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রথিতযশা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও চরিত্রগাথা শ্রবণকরতঃ আজ বিংশ শতাব্দীর কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সভ্যসমাজকে অবনত মস্তকে তাঁহাদেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। যদি তাঁহারা নিবৃত্তিপথ অবলম্বন না করিতেন, তবে কখনই তাঁহারা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জগতে আদর্শ স্থানীয় হইতে পারিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজ স্বভাবের প্রেরণায় ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ প্রবৃত্তিপথে অগ্রসর হইয়াছে এবং আপাতঃ-মধুর রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদেরই অনুকরণ করিয়া আজ হিন্দুসমাজ চিরপ্রিয় নিবৃত্তি পথ পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্তির দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। এইজন্যই যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ উন্মার্গগামী ও উশৃঙ্খল এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে এই যে, সমাজে ঘোর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জড়তার লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; মনিষী ব্যক্তি মাত্রেই ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

:0:

সংবাদ ও মন্তব্য।

দুর্ভিক্ষ- ভাণ্ডারে দানপ্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা পশ্চাল্লিখিত অর্থও দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি—শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার (সইদপুর) কর্ত্তৃক পূর্ব সংগৃহীত অর্থের অবশিষ্ট ৵৽ আনা, শ্রীযুক্ত মহানন্দ সরকার ।৽ আনা, শ্রীযুক্ত বনবিহারী আচার্য্য ২।৽ আনা ও মেসার্স চৌধুরী এণ্ড কোং Steam launch owner, Hill Street Akyab,—১৫৲ টাকা।

ভুল সংশোধন—পৌষ সংখ্যায় যোরহাট সার্ব্বজনিক সভার পক্ষ হইতে প্রাপ্ত টাকা ৩২৪৵১০ স্থলে "৩২২৵১০" হইবে ও ঐ সংখ্যার কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত দাতাগণের তালিকামধ্যে "মংশীদ সাঁক ২৲ টাকা" ভ্রমবশতঃ স্বীকৃত হয় নাই।

বরঙ্গাইল হরিসভা (ঢাকা)— মহাদেবপুর ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত নৃসিংহনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "গত ৯ই পৌষ হইতে ১২ ই পৌষ পর্য্যন্ত এবৎসরও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় যথারীতি নগরকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা ভোগ, আরতি শ্রীশ্রীভাগবৎ পাঠ, বক্তৃতা,

ভগবৎলীলা কীর্ত্তন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা সহ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবারেও নানা স্থান হইতে বহু ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল; তন্মধ্যে কুমিল্লার "পাগলের দলই" সমধিক আনন্দ দান করিয়াছেন। উখলী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সন্ন্যাল মহাশয় শ্রীশ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি শাস্ত্র পুরাণের সঙ্গে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ এমন অভিনব ভাবে এবং [illegible] ও প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, উপস্থিত জনগণ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গীত কীর্ত্তনের ত তুলনাই নাই; কিন্তু এবার তাঁহার "সাধন তত্ত্বালোচনা" বক্তৃতাও অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এবার জনসংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, স্থান সঙ্কুলান হয় নাই।

সতী।—আমরা গতমাসে তিনটী সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে স্থানাভাব বশতঃ গত সংখ্যায় "একটী" মাত্র প্রকাশ করিয়াছি, এবার অন্য দুইটী "আর্য্য-দর্পণের" ধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিলাম:—

৺কালীচন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহ সহরে মোক্তারী ব্যবসা করিতেন; তাঁহার সাধ্বী পত্নীর দেহত্যাগের প্রায় দুইসপ্তাহ পূর্ব্বে আমাশয় রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই কয়দিন তাঁহার পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নী অনন্য-মনা হইয়া স্বামীচিন্তা, স্বামীধ্যানে কাটাইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা-ধৌত জল পান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই, এবং বেদ, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাঠ করতঃ দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। গত ১১ই পৌষ অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকার সময় কোন রোগাক্রান্তা না হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর ৫।৬ মিনিট পূর্ব্বে মাত্র একবার সামান্য পরিমাণ জল বমন হইয়াছিল। পতিশোকসন্তপ্তা হইয়া যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার বাহ্যিক অবস্থা মলিন হইলেও মৃত্যুর পরের চেহারায় এক অপূর্ব্ব শ্রী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হয় নাই।

(ঢাকা)— মুন্সীগঞ্জের অধীন বজ্রযোগিনী চুড়াইন নিবাসী রাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বহুদিন হইতে বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন, তৎসঙ্গে জ্বরও ছিল। গত ১লা পৌষ তারিখে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুর ১৫।২০ মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সতীলক্ষ্মী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। রাজেন্দ্রবাবুর একটী পুত্র ও তিনটী কন্যা; পুত্রটী কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। মোক্ষদাদেবী পরীক্ষার পর বিবাহ দিতে প্রস্তাব করেন। রাজেন্দ্রবাবু উত্তর না দিয়া ইঙ্গিতে অদৃষ্টের কথা বুঝাইয়া দেন। স্বামীর বাকশক্তি রোধ হইয়াছে বুঝিয়া, মোক্ষদাদেবী রন্ধনশালায় গমনকরতঃ শিশু কন্যাটীকে স্তন্যপান করাইয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার পরই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, সেই মূর্চ্ছাই অনন্ত নিদ্রায় পরিণত হয়। মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই তাঁহাকে দুইবার হাসিতে দেখা গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের মতে যদিও বিভিন্ন চিতায় সৎকার করা হইয়াছিল, কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় চিতার দাহকার্য্য ঠিক একই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল।

সতীভূমি ভারতে এখনও সতীর অভাব হয় নাই, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় বটে, অযত্নপ্রসূত বন্যকুসুমের ন্যায় এখনও কতশত সতী লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন আপন লীলা সম্বরণ করিতেছেন, কে তাঁহার খোঁজ রাখে?

গ্রাহকগণের প্রতি:—

"আর্য্য-দর্পণের" ৮ম বর্ষ শেষ হইতে চলিল, তাই সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাহকগণের সমীপে সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, যাহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহারা যেন চৈত্র মাস মধ্যে আমাদিগকে সংবাদ প্রদান করেন।

———:0:———

যোরহাট রিলিফ কমিটির কার্য্যবিবরণী।

আয়।

পৌষ মাসে প্রদর্শিত হিসাবে উদ্বৃত্ত—৩৷১০

আসাম-গবর্ণমেট প্রাপ্ত অর্থ প্রাপ্ত—মাং শ্রীযুত কুলধর চলিহা——১০৲

শ্রীযুত কনকচন্দ্র গগৈ——৫৲

শ্রীযুত রামনাথ ভূঞা—১৲

২০৯৲১০

খরচ—— ২০৯৲১০

ব্যয়।

প্রথম বার (১লা হইতে ১০ই ডিসেম্বর)

খাটোয়াল কেন্দ্রে বিতরিত ১৬ মণ চাউলের মূল্য ও গাড়ীভাড়া——৯৬৷৵১০

২৬শে অক্টোবর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দুইজন সেবকের খোরাকী খরচ—১০৲

২য় বার—(১০।১২।১৫ হইতে ২০।১২।১৫ পর্য্যন্ত)

উক্ত কেন্দ্রে বিতরিত—১৩৮২॥ সের চাউলের মূল্য ও গাড়ীভাড়া ৮২।৵০

৩য় বার—(২৫।১২।১৫ হইতে ৩১।১২।১৫ পর্য্যন্ত)

উক্ত কেন্দ্রে বিতরিত ৪/ মণ চাউলের মূল্য—২০৲

(১) মোট চাউল ৩৩৮২॥, মোট টাকা—২০৯৲১০

(১) উক্ত চাউল মধ্যে ৪৷৷ সের বিনা টিকেটে বিতরণ করা হইয়াছে।

বিস্তৃত বিবরণ।

	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যকৃত লোকসংখ্যা—	চাউলের পরিমাণ।
১ম বার—	৭ (১)	২০৯	১২।০৮ ছটাক।
২য় বার—	১৩ (২)	২১০	১২৮২॥ ছটাক।
৩য় বার—	৬ (৩)	৫৬	৪/ মণ
			২৯/৩। ছটাক
বিনা-টিকেট বিতরণ ...	...	...	৭।৯। ছটাক
			মোট—৩৩৮৮॥ সের

(১) গ্রামের নাম—ডুলিয়াগাও ১১ জন, ডোমগাও ৪১ জন, মুসলমানগাও ৪৫ জন, মরিয়াগাও ৩৫ জন, কুকরাচোয়াগাও ৩৮ জন, খাটোয়ালগাও ২২ জন, বনগাও ১১ জন,—২০৯ জন।

(২) ঐ— খাটোয়ালগাও ১০ জন, কুকরাচুয়াগাও ১৯ জন, কামারগাও ৬ জন, ডুলিয়াগাও ২৭ জন, কাহারগাও ২ জন, বনগাও ২৪ জন, ভগলোয়াগাও ৬ জন, কলঙ্কিয়ালগাও ৫ জন, মরিয়াগাও ৩২ জন, মুসলমানগাও ২৫ জন, তিনকুঁড়িয়াগাও ১৮ জন, ডোমগাও ১৮ জন, ঢেকিয়াপোওয়াগাও ১৬ জন,— মোট ২১০ জন।

(৩) ঐ— খাটোয়ালগাও ৬ জন, বনগাও ১২ জন, কুকরাচোয়াগাও ১০ জন, মরিয়াগাও ২০ জন, মুসলমানগাও ৪ জন, কলঙ্কিয়ালগাও ৪ জন,—মোট ৫৬ জন।

শ্রীকুলধর কলিতা।
সেক্রেটরী।

স্বামী বোধানন্দ সরস্বতী,
শ্রীরাসরাম ভূঞা।
পরিদর্শক ও বিতরণকারী।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৮ম বর্ষ, } চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

উত্তর-গীতা।

ভূমিকা।

[যৎকালে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের মহাসংগ্রাম সংঘটিত হয়, তখন মহাবল অর্জ্জুন আত্মীয়বর্গকে সমরার্থ সমবেত দেখিয়া মমতাবশে যারপরনাই শোক-মোহে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং সমরে অনিচ্ছুক হইয়া বিমুখ হন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় শোকবিদূরণার্থ পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমুখান্নির্গত সেই গীতামৃত পান করিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর হয় এবং তিনি সমরে লিপ্ত হন। পরে ধনঞ্জয় রাজ্যলাভ পূর্ব্বক সুখভোগে আসক্ত হওয়াতে সেই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া যান। যখন কাল সহকারে তাঁহার বয়াধিক্য হইল, তখন মন, ক্রমশঃ বিষয়বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পরমার্থ পথে ধাবমান হইলে, তিনি পুনরায় সেই জ্ঞান লাভার্থ বিনীত শিষ্যের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। ধনঞ্জয়কে তত্ত্বার্থ অবগত হইতে সমুৎসুক জানিয়া বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে যে সকল পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন তাহাই "উত্তর-গীতা।" আমরা "আর্য্যদর্পণের" পাঠকগণের জন্য "উত্তরগীতার" সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। শ্রীভগবানের শ্রীমুখকথিত উপদেশামৃত পানে মরজগতের মানব অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। সঃ আঃ।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! যিনি একমাত্র নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত, ব্যোমাতীত অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত, নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল, অপ্রতর্ক্য অর্থাৎ যাহা তর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ বাক্যমনের অগোচর, বিনাশ ও উৎপত্তিবর্জ্জিত অর্থাৎ সর্ব্বদা সমাবস্থায় স্থিত, কৈবল্য অর্থাৎ

স্ব স্বরূপে অবস্থিত, কেবল অর্থাৎ একমাত্র স্ব স্বত্বায় অবস্থিত, শান্ত অর্থাৎ বৈষম্যরহিত, শুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধগুণবিশিষ্ট, অত্যন্ত নির্ম্মল অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, কারণ অর্থাৎ যাহাতে সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, যোগনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ বিষয়ান্তরাপেক্ষারহিত, হেতুসাধন-বর্জ্জিত অর্থাৎ যাঁহার কোন কারণ বা সাধন নাই অর্থাৎ তিনিই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের এক-মাত্র কারণ ও হেতু, হৃদয়কমলস্থ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে চৈতন্ত রূপে বিরাজিত, এবং যিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনন্তজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় অর্থাৎ যাবতীয় ভ্রান্তি নিরাশ হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ আমাকে বলুন। ১-৩।

শ্রীভগবান কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি অত্যুত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি বুদ্ধিমান, তত্ত্বার্থ অবগত হইবার জন্য তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। ৪।

যোগের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একী-করণ করিতে পারিলে কামনা দূরীভূত হইয়া যিনি চিন্তার বিষয় হন, তিনিই ব্রহ্ম নামে কথিত হয়েন। ৫।

ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেই জীব পরম-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্ম ও জীব এতদুভয়ের সাক্ষীরূপে যিনি নিত্য বিরাজিত, তিনি কুটস্থ চৈতন্যরূপী অক্ষর পুরুষ। সেই অক্ষর পুরুষ লাভ হইলেই জন্মমৃত্যু আতক্রম করা যায়। ৬।

সৎস্বরূপ আনন্দময় পরমব্রহ্মের যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭।

কি গমন কালে, কি অবস্থান কালে, সকল সময়েই শরীর মধ্যে প্রাণবায়ু ধারণ করতঃ প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য, এইরূপ করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়। ৮

পরিদৃশ্যমান আকাশ সদৃশ নির্গুণ, নির্লিপ্ত ব্রহ্মকে অবধারণ করতঃ আকাশ মধ্যে আত্মাকে ও আত্মার মধ্যে আকাশকে চিন্তা করিবে, অন্য চিন্তা করিবে না। ৯।

ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করতঃ চিত্তের মূঢ়তা বিনাশ করিয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে, যথায় শ্বাস বায়ু লয় প্রাপ্ত হয় না, তথায় বহিরা-কাশস্থিত নিত্য, নিষ্কল ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইবে। ১০।

হে পার্থ! নাসাপুটদ্বয় হইতে নিশ্বাস বায়ু বহির্গত হইয়া যে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে মনকে সংস্থাপনে করতঃ ঈশ্বরের ধ্যান করিবে। ১১।

সেই ঈশ্বর কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুর অতিক্রান্ত, প্রভাশূন্য, মনঃ শূন্য, বুদ্ধিশূন্য এবং নিরাময়। যে ব্যক্তি সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বশূন্য, আভাবরহিত, সমাধিস্থভাবে, অবস্থা ত্রয়রহিত বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চিতই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১২।১৩।

সমাধি অবস্থায় দেহ বিচলিত হইলেও দেহী স্থিরভাবে সেই ঈশ্বরকে অবধারণ করিবে, ইহাই সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ। ১৪॥

যিনি পরমাত্মাকে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতাদি মাত্রা-রহিত, শব্দ রহিত, স্বরব্যঞ্জনাদি অক্ষররহিত, নাদ বিন্দু ও কলার অতীত বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বেদবিৎ। ১৫॥

যিনি জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে নিজ হৃদয়-পদ্মে অধিষ্ঠিত দেখিয়া পরা শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার আর যোগ ধারণার প্রয়োজন নাই ।১৬ ॥

যাহা বেদের আদিতে উক্ত, বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃতিলীন, সেই প্রণব হইতে যিনি প্রধান তিনিই মহেশ্বর। ১৭ ॥

যে পর্য্যন্ত না নদীপার হওয়া যায়, সে পর্য্যন্তই নৌকার প্রয়োজন হইয়া থাকে, নদীপার হইলে আর নৌকার প্রয়োজন কি ? যেমন ধান্যার্থী তৃণত্যাগ করিয়া ধান্যগ্রহণ করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর হইয়া অশেষ শাস্ত্র গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যেরূপ অন্ধকারে কোন দ্রব্য অন্বেষণ নিমিত্ত প্রদীপের প্রয়োজন হয় এবং সেই দ্রব্য পাইলেই যেমন প্রদীপ ত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু লাভ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞান ত্যাগ করিয়া থাকেন যেমন অমৃতের দ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির জলের প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ সেই পরমপদ জ্ঞাত হইলে আর বেদের প্রয়োজ থাকে না। জ্ঞানামৃত পানে পরিতৃপ্ত যোগীর কোনরূপ যোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, যদি থাকে, তবে তিনি প্রকৃত তত্ত্ববিৎ নহেন। ১৮—২২ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা ও দীর্ঘ ঘাণ্টনিনাদবৎ অবিচ্ছিন্ন, বাক্য ও মনের অগোচর এবং যিনি প্রণব দ্বারা সূচিত হয়েন, সেই পরমব্রহ্মকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ। ২৩

যিনি আত্মাকে ও প্রণবকে দুইখানি অরণি-কাষ্ঠবৎ লইয়া ধ্যানরূপ মন্থনাভ্যাস করিতে থাকেন, তিনিই নিগূঢ় ব্রহ্মাগ্নি দর্শন করেন ; অর্থাৎ দুইখানি অরণি কাষ্ঠ লইয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে, যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আত্মা ও প্রণব একত্র করতঃ ধ্যান করিলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ২৪ ॥

হে পার্থ ! যে পর্য্যন্ত ধূমহীন অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত নির্ম্মল সেই পরমব্রহ্মের রূপ দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত অনন্যমনা হইয়া তাঁহার ধ্যানে রত থাকিবে। ২৫ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইলেও দূরস্থ নহে। এই জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক শরীরে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত। ইহা বিমল, সর্ব্বব্যাপী ও নিরঞ্জন ।২৬।

এই জীবাত্মা শরীরস্থ হইয়াও শরীরস্থ নহে, শরীরস্থ হইলেও জন্মমৃত্যুরহিত। শরীরস্থ হইয়াও ভোগ করে না এবং কোনও প্রকারে বধ্য নহে। ২৭।

তিল মধ্যে তৈল, ক্ষীর মধ্যে ঘৃত, পুষ্প-মধ্যে গন্ধ এবং ফল মধ্যে রসের ন্যায় শরীর মধ্যে আত্মা বাস করেন। যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ দেহমধ্যে আত্মা প্রকাশিত হন। যেরূপ বায়ু আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ আত্মা দেহ মধ্যে বিচরণশীল। জীবগণের মনস্থ ঈশ্বর সাক্ষীরূপে মন মধ্যে অবস্থিত। ২৮-২৯।

যিনি মনে এবং মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও মনবর্জ্জিত, যোগিগণ সেই পরমাত্মাকে মন দ্বারা অবলোকন করিয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ৩০।

যিনি মনকে আকাশ সদৃশ নির্ম্মল করিয়াছেন, যিনি মনকে বিষয়-চিন্তা-পরিশূন্য করিয়া-

ছেন এবং যিনি সেই অচঞ্চল পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিই সমাধি-বান্। ৩১।

যিনি যোগামৃতরস পান করিয়া কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া আনন্দিত থাকেন, তিনিই জন্মমরণনাশক সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। ৩২

ঊর্দ্ধশূন্য, অধঃশূন্য, মধ্যশূন্য ও সর্ব্বশূন্য পরমাত্মাকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সমাধিস্থ। এইপ্রকার শূন্য-ভাবিত, ভাব-স্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তিনি পুণ্যপাপ হইতে মুক্তি-লাভ করেন। ৩৩-৩৪।

অর্জ্জুন কহিলেন,—অদৃশ্য বস্তু চিন্তা করা অসম্ভব, এবং যাবতীয় দৃশ্যপদার্থও বিনশ্বর; তবে কি প্রকারে এই নামরূপাদি বিবর্জ্জিত ঈশ্বরের ধ্যান করা যাইতে পারে? ৩৫।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমতঃ নিরালম্ব ধ্যানের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ভ্রান্তি-নিরাশন জন্য উপরোক্ত প্রকার প্রশ্ন করিলে, তিনি পুনর্ব্বার সাবলম্ব ধ্যানের কথা বলিতেছেন;—ঊর্দ্ধাধঃ ও মধ্যপূর্ণ এবং যিনি সর্ব্বপূর্ণ সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ। ৩৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—যাহা সাকার তাহা অনিত্য, যাহা নিরাকার তাহা শূন্য; অতএব যাহা বিনশ্বর এবং শূন্য এরূপ আত্মাকে কি প্রকারে যোগিরা ধ্যান করিয়া থাকেন? ৩৭ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—হৃদয়কে নির্ম্মল করিলে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি বিনষ্ট হইলে এবং সৎস্বরূপ সেই পরমাত্মার ধ্যান করিতে থাকিলে, "আমিই একমাত্র এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব" জ্ঞান হইবে, তখন সর্ব্বপ্রকার কামনাবাসনা বিদূরিত হইয়া পরম সুখ লাভ করিবে। আপনার ক্ষুদ্রত্বই যত অভাব সৃষ্টি করে, আর অভাবের অপূরণই যত দুঃখের কারণ, যিনি আপনাকে এই পরি-দৃশ্যমান বিশ্ব বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহার আর কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে? সুতরাং এইরূপ নির্ম্মল হৃদয়ে সত্য আপনিই ফুটিয়া উঠে। ৩৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—অক্ষর সকল মাত্রাবিশিষ্ট এবং বিন্দুসমন্বিত, বিন্দুভিন্ন হইলে নাদসম্পন্ন হয়, সেই নাদ ভিন্ন হইলে কাহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে? ৩৯ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—অনাহত শব্দের যে ধ্বনি সেই ধ্বনির মধ্যে জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; সেই জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে মন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই মন যেখানে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া অভিহিত। ৪০ ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া যে স্থানে প্রণব-ধ্বনিময় নাদের ও নিঃশ্বাস বায়ুর লয় হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ৪১।

অর্জ্জুন, কহিলেন,—এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিনষ্ট হইলে এবং প্রাণ বিমুক্ত হইলে, যখন পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায় গমন করে?

শ্রীভগবান কহিলেন,—যে পর্য্যন্ত জীব তত্ত্ববিৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার ভৌতিকত্ব বিনষ্ট হয় না। পঞ্চভূতাত্মক দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদিগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অভিমানবশে লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ করে না; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মও বিনষ্ট হয় না; কিন্তু যৎকালে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তখন পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও মন

ইন্দ্রিয়াদি কারণে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন ধর্ম্মাধর্ম্মও থাকে না। ৪৩।

অর্জ্জুন কহিলেন,—জীব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের অভিমান ত্যাগ করিতে পারে। কন্তু নিজের জীবত্বের অভিমান ত্যাগ করিতে কিরূপে সমর্থ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৪৪।

শ্রীভগবান কহিলেন,—মুখ ও নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু সর্ব্বদা বিচরণশীল, আকাশ সেই বায়ু হরণ করিতেছে; সুতরাং সেই প্রাণবায়ু বিগত হইলে জীব কি প্রকারে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয়? । ৪৫।

অর্জ্জুন কহিলেন,—আকাশ ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে; সুতরাং পৃথিবীও আকাশ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত; যখন জগতের কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর ব্যোমে আচ্ছন্ন, তখন পরমাত্মা কি প্রকারে কোথায় বাস করেন? । ৪৬।

শ্রীভগবান কহিলেন,—আকাশ শূন্যস্বভাব, যাহা আকাশ ব্যাপ্ত অথচ আকাশের গুণ যে শব্দ, সেই শব্দশূন্য তাহাই ব্রহ্ম। মানবগণ ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করতঃ সেই ব্রহ্ম দেহ মধ্যে অবলোকন করিয়া থাকেন। দেহ নষ্ট হইলে বুদ্ধি নষ্ট হয়, বুদ্ধি নষ্ট হইলে আর অজ্ঞতা কোথায় থাকিবে? সুতরাং অজ্ঞতা বিনষ্ট হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে? । ৪৭—৪৮।

অর্জ্জুন কহিলেন,—দন্ত, ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া অকারাদি অক্ষর সকল উৎপন্ন হয়। যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থই ধ্বংসশীল, সুতরাং বর্ণ সকলও বিনাশশীল, তাহাতে সংশয় নাই, তবে কি প্রকারের শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতে পারে? ৪৯॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জন বর্ণরহিত, স্বররহিত তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হন না, যিনি রেখা ও উষ্ম বর্ণরহিত, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ৫০॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—সর্ব্বগত, সকল ভূতে অধিষ্ঠিত যোগিগণ ইন্দ্রিয় নিরোধ করতঃ কি প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারে? ৫১॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—যোগিগণ ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করিয়া দেহাভ্যন্তরে তাহাকে অবলোকন করেন। দেহ নষ্ট হইলে বুদ্ধি নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি নষ্ট হইলে অজ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫২

যে পর্যান্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্তই ইন্দ্রিয়াদি নিরোধের প্রয়োজন। সেই পরমতত্ত্ব অবগত হইলে, কেবলমাত্র অখণ্ড, নিত্যানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই দর্শন করিয়া থাকে ॥৫৩

নবছিদ্রান্বিত দেহ হইতে দেহমল নিয়ত ক্ষরিত হইতেছে। যে পর্যান্ত মনুষ্য ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব না হয়, তাবৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। ৫৪

দেহ অত্যন্ত মলিন, আর দেহী নির্ম্মল, এতদুভয়ের অন্তর যিনি জানিতে পারিয়াছেন; অর্থাৎ যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাহার বাহ্য শৌচে প্রয়োজন কি? ৫৫।

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

:০:

সখা।

তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন
মানসমোহন সৌম্য।
তুমি নির্ম্মল নিখিলানন্দ
কুসুম-পরাগ রম্য॥
তুমি বিমল শান্ত শীতল
মলয় মারুত মন্দ।
তুমি চিন্ময় প্রীতি-পয়োধি
কেতকীকুসুমগন্ধ॥
তুমি ভীষণ ভীতিবিহ্বল
প্রলয়-প্লাবক সিন্ধু।
তুমি নির্ম্মল স্নিগ্ধ মধুর
প্রভাতি-নীহার-বিন্দু॥

তুমি উজ্জ্বল পুণ্য আলোক
প্রথম অরুণ-ছটা।
তুমি গো, সখা দগ্ধ হৃদয়ে
নবীন-নীরদ-ঘটা॥
তুমি প্রকৃতি পুরুষ তুমি
ফুটিতকুসুম-রাশি।
তুমি দূরিত বিঘোর হৃদে
বাসন্তী-চন্দ্রমা-হাসি।
তুমি ভূলোক তুমি দ্যুলোক
স্বর্গমর্ত্ত-রসাতল।
পরশে তোমার লভিছে বিশ্ব
চতুঃবর্গ মহাফল॥

দীন—দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—:0:—

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

(শেষাংশ)

সমাজের নেতা ও হিতৈষী ব্যক্তিগণ, এই অধঃপতিত হিন্দুসমাজ আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, এরূপ অনুমান করিতেছেন সত্য, কিন্তু যতদিন না বর্ত্তমান সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি আবার সেই প্রাচীন আদর্শে জীবন গঠন করিয়া নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করতঃ ভোগাকাঙ্ক্ষা, ইহকাল-সর্ব্বস্বভাব ও কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, ততদিন প্রকৃত উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। একে ত প্রবৃত্তিপথ স্বাভাবিক ও আপাতঃ মধুর, তাহাতে শিক্ষাও সংযমের অভাবে আমরা রূপ রসাদি ভোগ্য বস্তুতে এতই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের ভোগলালসাপরায়ণ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে আপাতঃকঠোর—কিন্তু পরিণামে অমৃত ফল প্রসবকারী নিবৃত্ত পথে পরিচালন করা বড়ই দুষ্কর, এমন কি একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যখন ইহা নিশ্চিত যে, সংযম অভ্যাস না করিলে—ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্বাধীন করিতে না পারিলে, প্রকৃত উন্নতির বিন্দুমাত্রও আশা নাই; তখন ইহা যতই কঠোর,—যতই অনভ্যস্ত,—যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন,

প্রাণ দিয়াও প্রত্যেক মানবকে এই নিবৃত্তি পথ অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্যাসবলে সবই সম্ভবপর হয়; কিছুদিন প্রাণপ্রণে চেষ্টাকরিলে মন ক্রমে ক্রমে উশৃঙ্খলতা পরিত্যাগকরতঃ আয়ত্ত্বাধীন হইয়া প্রকৃত বিষয় গ্রহণে অর্থাৎ নিবৃত্তি পথে গমন করিতে সমর্থ হইবে। প্রবৃত্তির দাসত্বপাশ ছিন্নকরতঃ নিবৃত্তিপথে পরিচালিত হইতে হইলে প্রকৃত বিষয় গ্রহণ ক্ষমতা, অসাধারণ সংযম শক্তি ও অধ্যবসায়ের একান্ত আবশ্যক। আর এইগুলি লাভ করিবার জন্য উচ্চ আদর্শ, সৎসংসর্গ, গুরূপদেশ এই তিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নিবৃত্তিপথ-গামী ব্যক্তিগণকে প্রবৃত্তিপথের অসারতা প্রণে প্রাণে উপলব্ধি করতঃ ইন্দ্রিয় ও রিপু-গণের দাসত্বপাশ ছিন্ন করিতে হইবে। মানবের এমন কতকগুলি বৃত্তি বা কার্য্য আছে, যে গুলিকে একবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না,--যেমন আহার, নিদ্রা ইত্যাদি; আর কতক-গুলি বৃত্তি আছে, যেগুলিকে সমূলে উন্মুলিত করিলে বিন্দুমাত্রও ক্ষতির কারণ নাই, যেমন কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি। নিবৃত্তিপথ-গামী হইতে হইলে আহার, নিদ্রাকেও প্রবৃত্তি পথে চলিতে দিলে চলিবে না; ইহা-দিগকেও সংযম ও অভ্যাসের বলে আয়ত্বধীনে আনিতে হইবে। যে সকল খাদ্য ও ভোগ্য-বস্তু সত্বগুণপ্রধান ও শরীরের পুষ্টিকর সেই সমস্ত সাত্বিক আহার গ্রহণকরতঃ শরীরকে নিবৃত্তপথ গমনোপযোগী করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অভ্যাস-বলে নিবৃত্তির পথে আনিতে হইবে--; ইন্দ্রিয়-গুলি একবার আয়ত্বাধীন হইলে তাহা-দিগদ্বারা আর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে না, সকল ইন্দ্রিয়ই যে একই উপায় অবলম্বনে আয়ত্বাধীন হইবে এরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতঃ একাগ্রচিত্তে যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমে নিবৃত্তিপথগামী সাধক বুঝিতে পারিবে যে, সে এখন ইন্দ্রিয়ের দাস নহে, ইন্দ্রিয়ই তাহার দাস হইয়াছে, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে প্রথমাবস্থায় যদিও তাহাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু সিদ্ধিলাভের পরে স্বতঃই তাহার প্রাণে বিমল সাত্বিক আনন্দের উদয় হইবে এবং সেও অন্য দশজনের চিত্ত ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে সমূলে উচ্ছেদ অর্থাৎ তাহাদের অনুশীলন একবারে না করিলেও যখন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তখন ঐ গুলিকে একবারে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালন সৎচিন্তা, সৎগ্রন্থপাঠ, সৎসংসর্গ ও সাত্বিক আহার প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত অনুকূল উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে, এই সকল রিপুজয় করা যাইতে পারে। এস্থলে হয়তঃ কোন কোন আত্ম-সুখপরা-য়ন ভোগপিপাসু বলিয়া উঠিবেন যে, যদি কামরিপুকে একবারে দমন করিয়া কামজয়ী হয়েন, তবে প্রজাসৃষ্টি কিরূপে হইবে? কিছুদিন পরে যে, পৃথিবীর বক্ষ হইতে মনুষ্য নাম একবারে মুছিয়া যাইবে। তাহার উত্তর এই যে, প্রবৃত্তির এমনই অপ্রতিহত প্রভাব যে, সমগ্র মনুষ্য সমাজ প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও অতি অল্প সংখ্যক লোকই পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন; আর অব-শিষ্ট সকলের মধ্যে কেহ কেহ আংশিক সফলতা লাভ করিবেন, ও বাকী অন্তান্তে একবারেই

অকৃতকার্য্য হইবেন। যাহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহারা প্রজাসৃষ্টি না করিলেও জগতের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। অনাদি কাল হইতেই ত সমাজের ক্রোড়ে এইরূপ এক সম্প্রদায় লোক সম্মানের সহিত স্থান পাইয়া আসিতেছেন, কৈ কোন কালেও তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের আদর্শে প্রজাসৃষ্টি লোপ পাইতে বসিয়াছে, এরূপ আপত্তি ত উত্থাপিত হয় নাই; তবে আজই বা হইবে কেন? সুতরাং সকলের এই সমবায় চেষ্টা প্রজাসৃষ্টির ব্যাঘাতের কারণ না হইয়া প্রকৃষ্ট সহায় হইবে। কারণ এই সকল আংশিক কামজয়ী মহাত্মাদের দ্বারা যে সকল বীর্য্যবান সন্তান উৎপাদিত হইবে, তাহারাই ভবিষ্যতে শৌর্য্যেবীর্য্যে, ত্যাগ বৈরাগ্যে, দয়া দাক্ষিণ্যে সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবে।

বর্ত্তমান সমাজের অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ প্রজাসৃষ্টির ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া অবাধে কামের দাসত্ব করিতেছেন, এবং সমাজকলঙ্ক, হীনবীর্য্য সন্তানসন্ততির জন্মপ্রদান করতঃ পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছেন; ইহা কি ভগবদাদেশ প্রতিপালন, না তাহার অবমাননা? প্রাচীনকালের প্রচলিত পদ্ধতি ও রীতি নীতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পুরাকালে প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকে জীবনের প্রথমভাগে ভবিষ্যজীবন গঠন করিবার জন্য,—আদর্শ গৃহীর মহান কর্ত্তব্য মস্তকে লইবার জন্য—কঠোর সংযম সহায়ে পূর্ণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতঃ ইন্দ্রিয় জয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য, গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। যখন গুরু বুঝিতে পারিতেন যে, শিষ্য শান্ত, দান্ত হইয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে, তখনই তিনি তাহাকে সংসারে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত পত্নী-গ্রহণ করতঃ আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করিতে উপদেশ দিতেন। পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীগ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুর বিবাহ ছাগছাগীর সম্মিলন নহে—ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যে গমনের একটী পন্থা মাত্র; শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে দাম্পত্যজীবনযাপন করিলেও চরমে পরমপদে বিলীন হইতে পারা যায়, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের আদেশ ও উপদেশ।

বর্ত্তমান প্রজাসৃষ্টি ব্যাপার দেখিয়া কোন প্রকৃত হিন্দুর প্রাণে ব্যথা না লাগে? আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—যদি কেহ সম্পূর্ণরূপে কামজয়ী হইতে পারেন, তবে তিনি প্রজাসৃষ্টি রূপ ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন না করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না; বরং তিনি উশৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী, যথেচ্ছাচারিকে সংযমের পথে টানিয়া আনিবার সহায়কস্বরূপ হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন যথেচ্ছাচারী বলিয়া থাকেন যে, গৃহস্থসন্তানের কামজয়ী হইবার প্রয়োজন নাই, ইহা সন্ন্যাসীর কার্য্য; যাহারা কামজয়ী হইয়া প্রজাসৃষ্টির সাহায্য না করে, তাহাদিগকে ভগবদাদেশ অবমাননারূপ মহাপাতক জন্য, অনন্ত নরকবাস প্রভৃতি অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি। হায়! কামজয়ী সর্ব্বত্যাগী, ভূতভবিষ্যৎবেত্তা আর্য্যঋষিগণ যে সমাজের গৃহস্থাশ্রম প্রবর্ত্তনকর্ত্তা এবং যে গৃহস্থাশ্রমই সংযমশিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ গৃহস্থকে কামজয়ী হইতে নাই বলিয়া

উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বর্ত্তমান সমাজের বালকবালিকাগণ অতি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা ও উপদেশের অভাবে এবং এই সকল উপদেষ্টাগণের হৃদয়গ্রাহী সদুপদেশ শ্রবণ-করতঃ ও কুসংপ্রভাবে কামশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে; সুতরাং ১২। ১৪ বৎসর বয়সেই তাহারা কামিনী কাঞ্চনের করায়ত্ব হইয়া পড়ে। ইহার যে কি বিষময় পরিণাম তাহা কি আর চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতে হইবে? যে সমাজে প্রাচীনকালে ২৫। ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, আজ সেই সমাজের যুবকগণ ২৫। ৩০ বৎসর বয়সে পিতা কি মাতামহের পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ সমাজে সং সাজিতেছেন,—তাহাতে সমাজের নেতাগণের আনন্দ বই দুঃখ নাই; এর চেয়ে আমাদের আর শোচনীয় অধঃপতন কি হইতে পারে?

যদি প্রাচীন পন্থানুযায়ী গৃহস্থগণ আদর্শ গৃহীয় জীবনযাপন করেন, তবে তাঁহাদের গৃহ কি তপোবনতুল্য হয় না? তাহারা কি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন? এইরূপ আদর্শই কি মানব মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত বা লোভনীয় হওয়া উচিত নহে? আর শাস্ত্রেও স্পষ্টই লিখিত আছে, বনে থাকিয়াও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নানারূপ দোষ ঘটিতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া গৃহে অবস্থান করিলেও তিনি তপসিদ্ধ হইতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবেই দেখা গেল যে, কেবল সন্ন্যাসীকেই নিবৃত্তি পথানুশীলন করিতে হইবে এরূপ নহে, প্রত্যেক গৃহীকেও এই পথের অনুশীলন করতঃ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

:0:

বাঁশরী-তান।

বাজিছে বাঁশরী যমুনা পুলিনে;
মোহন তানে;
গোপীজন মন করি উচাটন;
পরাণ টানে।
শুনিয়া সে ধ্বনি, পাগলিনী পারা;
গোপীকাদল।
ছাড়ি গৃহ কর্ম্ম পতি-পুত্রগণে;
ধায় সকল।
অর্দ্ধ অঙ্গে বাস, অর্দ্ধ বদ্ধ বেণী;
লজ্জা বিহীন;
ছুটে উভরায়, প্রাণকৃষ্ণ পানে;
সংজ্ঞা বিলীন।

যমুনার তটে; কুসুম কাননে;
চাঁদের আলো,
কুসুমে বেষ্টিত, বংশীবদন
শোভিছে ভাল।
আপনার মনে বাজায় বাঁশরী
মুগ্ধ হইয়া,
গোপনারীগণ, প্রেমেতে মগন;
আসে ছুটিয়া।
গুণাতীত ভক্তি যার প্রাণে জাগে
এমনি হয়;
ছাড়ি অসার সংসার, ভগবানে চায়
হইতে লয়।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

ভক্ত-কথামৃত।

[রানকরের প্রেম-পাগল রাধামাধবের উক্তি-সংগ্রহ]

(দান, সেবা, জীবে দয়া)

গীতায় তিন প্রকার দানের বিধি আছে; অসৎ পাত্রে দান দ্বারা নরক ভোগ আর সৎপাত্রে দানে পাপ ক্ষয় হয়। বৈষ্ণব-সেবায় প্রেম ও মুক্তি লাভ হয়। আত্ম-রক্ষা—জীবে দয়া; জীবকে অভয় দান ও প্রেম দান—জীবে দয়া; ভগবান, দয়ার সাগর। ভক্ত-রক্ষার জন্য তিন অসুর সংহার করে; জীবের প্রতি দয়া বশতঃ শ্রীভগবান, রামচন্দ্র অবতার হইয়া রাক্ষস কুল ধ্বংস করিয়াছেন। ইহাতে চতুর্দ্দশ ভুবনবাসী আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে, শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ আনন্দিত। শিশু বৃষভাসুর, ব্যোমাসুর, কংস, জরাসন্ধ, কুরু-পাণ্ডব পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এমন কি, সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত; ইহাতে পৃথিবীর ভার নাশ, সাধু রক্ষা ও জীবে দয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল; পরশুরাম অবতারে, ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংসেও জীবে দয়া প্রকাশিত; শ্রীচৈতন্য অবতারে ও পাষণ্ডদলন দ্বারা ... হইয়াছে; "পাষণ্ডদলন জন্য নিত্যানন্দ রায়। আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়।" ইহাও—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবের প্রতি অসীম করুণা। জীবাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ড (দেশ বা রাজ্য) বিপরীত; ... দেশ শাসন দণ্ড, প্রেমরাজ্য সদা আনন্দ।

পাগলের মুখে —দরবেশের কথা।

আমি যাহা কহিতেছি, তাহা দরবেশেরই কথা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও সমুদায় বৈষ্ণব-শাস্ত্রই দরবেশের কথা। "এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল। নদের মাঝে দেখে যে তোরা। * * * তিন পাগলে যুক্তি ক'রে রস আনিলে জাহাজ ভরা।" বাউল, দরবেশ বলিয়া কোন জাতি বিশেষ নাই; প্রেম ও দিব্যোন্মাদ হইলেই সত্য বাউল ও দরবেশ হয়। ইহার অনুকরণ হয় না; পাগল সাজা হয় না। দরবেশের অর্থ ছদ্ম বেশ, কোন আশ্রম চিহ্ন থাকিবে না। ত্রিগুণাতীত, কর্ম্মাতীত, প্রভু শ্রীরূপের স্বামী দরবেশী মূলে, সমুদায় বৈষ্ণবশাস্ত্র তাঁহার রচিত। যদি কেহ দরবেশের কথা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব" বলা চলে না। তিনি কখনও "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" বিশ্বাস করিবেন না। তিনি, কোটী জন্ম শাস্ত্র লইয়া তর্ক করিলেও, এভাব বুঝিতে পারিবেন না। গোপী-ভাব, পরকীয়া ভাব, ইহাতে তাঁহার অধিকার নাই; শ্রীমতী রাধা কামিনী, গুরুভিন্ন,—সাধুসঙ্গ ও প্রেমিক পাগলে বিশ্বাস ব্যতীত,—এ ভাব কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

শক্তি-ত্রয়-তত্ত্ব।

অনন্ত শক্তির মধ্যে ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞানশক্তি ও মায়া-শক্তিই প্রধান। মায়াশক্তির কখনও প্রেম বা মাধুর্য্য লীলা দর্শনে অধিকার নাই। শ্রীদ্বারকায় ও শ্রীবৈকুণ্ঠধামে, স্বকীয়া প্রেম; শ্রীগোলক ভিন্ন পরকীয়া মাধুর্য্য-প্রেম, সাধারণ জগতে নাই। পরাশক্তি স্বরূপ-হ্লাদিনী রাধিকা,

সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী; লক্ষ্মীগণ, স্বাংশ বিস্তার; মহর্ষিগণ, বিম্ব-প্রতি বিম্ব মায়াশক্তি বহিঃস্থা জগৎ-কারণ, ভগবানের দূরে, "কারণ" সমুদ্রের বাহিরে। তপস্যা দ্বারা দেহেন্দ্রিয় সুখ নাশ না হইলে, নিত্যলীলা হৃদয়ে অনুভব হয় না। বহির্জগতে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" ছাগল ও গর্দ্দভের ন্যায় বংশ বিস্তার উদ্দেশ্য। নিবৃত্তি মার্গে, তদ্বিপরীত, সেবা বুদ্ধিতে "ভজন পূজন।"

ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য—সম্বন্ধ।

যুক্ত বৈরাগ্যে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই থাকিবে। কেবল আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। মায়া মিথ্যা নহে, উপাসনার জন্যই মায়ার সৃষ্টি। "যোগমায়া চিৎশক্তি, বিশুদ্ধ সত্বে পরিণতি, তার শক্তি, লোকে দেখাইতে। এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈলেন নিত্যলীলা হৈতে॥"

নিত্য লীলা।

ঝুলনলীলা, রাসলীলা, দোললীলা নিত লীলা, সর্ব্বকাল বর্ত্তমান্; "যে দেখেছে মায়ের দোল, সেই পেয়েছে মায়ের কোল, রামপ্রসাদের এই গোল ঢোলমারা বাণী।" উহা সাধকের অন্তরে প্রকাশিত হয়, কোন শাস্ত্রে নাই।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে
সোনামুখী, গরীবভাণ্ডার।

:0:

যোগানন্দ-লহরী।

আলাইয়া (১৫) একতালা।

বিরাজে শঙ্করী অন্নপূর্ণেশ্বরী রতন-সিংহাসনে।
প্রেমের বিজলি খেলিছে বদনে ভাতিছে রতন ভূষণে॥
তরুণ বয়ানে কি শোভা উছলে,
কোটী ইন্দু যেন উদিত ভূতলে,
সুমধুর হাসি অধরে না ধরে, আনন্দ উথলে ভুবনে॥
রতন মুকুট ভাতিছে ভালে,
গজমতিহার দুলিছে গলে,
হাতে অন্নভাণ্ড পালিছে ব্রহ্মাণ্ড, খেলিছে করুণা নয়নে॥
ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে দাঁড়ায়ে শঙ্কর,
ললাটে ভাতিছে শশাঙ্ক সুন্দর,
যাচিছে করুণা হয়ে যুক্তকর, জগতজননী সদনে॥

বিতরিছে অন্ন ভবানী ভবেরে,
প্রফুল্ল বয়ান পুলকে শিহরে,
যোগেন্দ্র বিহ্বল প্রেমে ঢল ঢল, অপরূপ যুগ-মিলনে॥

—:0:—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

(শেষাংশ।)

প্রত্যাগমন পথে।

১৭ই—শনিবার অদ্য প্রাতে বেলা ৮টার মধ্যে স্নানাহ্নিক সম্পাদন করতঃ শ্রীশ্রীভগবান ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমায়িদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে পাণ্ডার নিকট-বিদায় লইয়া রওয়ানা হইলাম; বেলা ৫ টার সময় পাণ্ডুকেশ্বর চটীতে পহুছিয়া তথায় রাত্রি-বাস করিলাম।

বদরীনারায়ণ হইতে প্রত্যাগমনকালে পূর্ব্ব-কথিতমত হনুমান চটী, পাণ্ডুকেশ্বর, বিষ্ণুপ্রয়াগ, কুমারচটী, পিপুলকুঠী প্রভৃতি হইয়া ৪৪ মাইল অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত লালগঙ্গা বা চামোলি পহুছিতে হয়। তথা হইতে ২½ মাইল পরে মঠিয়ানা চটী। এখানে ঝরণা, দোকান ইত্যাদি আছে; তথা হইতে ৩ মাইল দূরে নন্দপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগে উত্তম বাজার, যথেষ্ট দোকান আছে। কন্বঋষির তপস্যা স্থান বলিয়া ইহাকে কন্বাশ্রমও বলে। নন্দা ও অলকনন্দার সঙ্গম স্থান বলিয়া ইহার নাম নন্দপ্রয়াগ।

এখান হইতে ৩ মাইল দূরে সোনলা চটী, ৬½ মাইল দূরে নালশু চটী, ৮মাইল দূরে জয়কান্তী এবং ১২½ মাইল দূরে কর্ণপ্রয়াগ॥ এখানে অলকনন্দার সহিত কর্ণগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে,—এখানে বহু দোকান, ধর্ম্মশালা ও ডাকঘর প্রভৃতি আছে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে এক রাস্তা অলকনন্দার ধারে ধারে রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, হরিদ্বার গিয়াছে। পঞ্জাবের যাত্রিরা এই পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, অন্য-দেশীয় যাত্রিরা অন্য রাস্তায় কর্ণ-গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া মেহেলচৌরী হইয়া কাঠগুদাম বা রামনগরের রাস্তা প্রাপ্ত হন।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে কর্ণগঙ্গার তীরে সেমলচটী ৩½ মাইল, এখানে চণ্ডিকাদেবীর মন্দির, কয়েকখানা দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। সেমলী হইতে দুই মাইল দূরে শিরোলী চটী, ৩½ মাইল দূরে ভটোলী; ৭½ মাইল দূরে আদি-বদরী। বৃহৎ মন্দির মধ্যে আদি-বদরীনাথজী প্রতিষ্ঠিত; উক্ত বিগ্রহের নিকটে আদিকেদার ভিন্ন আরও কয়েকটী দেব মূর্ত্তি আছেন। এখানে কয়েক খানা দোকান, ধর্ম্মশালা ও ডাকঘর আছে। স্নান ও পানের জন্য নদী ও ঝরণার সুবিধা আছে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে আদি-বদরী ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

আদি-বদরী হইতে ৪½ মাইল দূরে জোকাপাণি চটী; জোকাপাণি চটী হইতে চড়াই আরম্ভ হইয়া ৩ মাইল পর কালামাটী চটী, পথের ধারে নিবিড় অরণ্য; তথা হইতে ৩ মাইল দূরে গোয়াড় চটী এবং ৫½ মাইল দূরে ধুনার ঘাটা। ইহার নিকটেই রামগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে; এখানে একটী ঝরণাও আছে। দোকানপাট, ডাকঘর ও থানা আছে। এখান হইতে মেহেলচৌরী ৫ মাইল দূরে অবস্থিত; রাম গঙ্গার ধারে ধারে সুন্দর সড়ক রাস্তা। এখানেই গাড়োয়াল জেলা শেষ হওয়ায় কমাউন জেলা আরম্ভ হইয়াছে।

এইখানেই গাড়োয়াল জেলার কাণ্ডী. ঝাম্পান বা কুলী বিদায় দিয়া নূতন কুলী ইত্যাদি নিযুক্ত করিতে হয়; কারণ গাড়োয়াল জেলার লোক আলমোরা জেলায় যাইবে না। এখানে অন্য লোকও যথেষ্ট পাওয়া যায়। মালবহন বা সোয়ারির জন্য ভাড়াটিয়া ঘোড়াও পাওয়া যায়; তজ্জন্য সরকার পক্ষ হইতে একজন ঠিকাদারও নিযুক্ত আছে। এখান হইতে রামনগর (৬৮ মাইল) পর্য্যন্ত আরোহী ঘোড়ার ভাড়া দশ টাকা ও ভার-বাহী ঘোড়া অথবা কুলী মণ করা ৫৲ পাঁচ টাকা হারে পাওয়া যায়।

গণাই বা চৌখুটিয়া।

এখান হইতে পাণ্ডুয়া খাল পর্য্যন্ত ১ মাইল চড়াই, তৎপর কিছু উতরাই হইয়া সুন্দর সমান রাস্তা। মাঝে মাঝে আরও ২।১ টী চটী আছে। মেহেলচৌরী হইতে গণাই বা চৌখুটিয়া ৮ মাইল দূরে অবস্থিত; এখানে দোকান ও ডাকঘর আছে। এই স্থান হইতে দুইটী রাস্তা বাহির হইয়া একটী রামনগর ও অপরটী কাঠগুদামে গিয়াছে। কাঠগুদাম হইতে গণাই চটী ৪½ মাইল, মহাকাল চটী ১ মাইল, শাহপুর ৬½ মাইল, দ্বারাহাট প্রসিদ্ধ স্থান; তথা হইতে ৫ মাইল বগমালী, ১ মাইল বাগুলী-সেরা। ইহার নিকট হইতে দুই রাস্তা বাহির হইয়াছে; এক রাস্তার নাইনীতাল, আলমোরা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায় এবং অপর রাস্তায় কাঠগুদাম যাওয়া যায়। এখন মোরাদাবাদ হইতে রামনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন হওয়ায় লোকে কাঠগুদামের পথে না গিয়া রামনগর হইতে ট্রেনে যাতায়াত করে।

গণাই বা চৌখুটিয়া হইতে ৬ মাইল দূরে "মাসী" নামে উত্তম চটী পাওয়া যায়, এই ছয় মাইলের মধ্যে ৩।৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটী আছে; "মাসী" চটী হইতে ৪ মাইল দূরে বুড়া-কেদার। তথা হইতে ৪ মাইল দূরে নাগাচটী এবং ৭ মাইল দূরে ভিখিয়াসেন চটী। এখানে চন্দ্রভাগা ও রামগঙ্গা মিলিত হইয়াছে।

নদীপার হইয়া সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বতের চড়াই পথ; দুই মাইল দূরে শিরকোট, ৫ মাইল দূরে বাসোট, ৮ মাইল দূরে গোয়ালখানা বা লালা চটী ও ১১ মাইল দূরে গুজর ঘাটী চটী এখানে গো-গাড়ী পাওয়া যায় এবং গাড়ীর মাশুল আদায় হয়। এইস্থান হইতে প্রসিদ্ধ রাণীখেত ২৩ মাইল ও রামনগর ৩৩ মাইল দূরে।

গুজরঘাটী হইতে কাপড়নলী ২½ মাইল, দেওলগড় ৫ মাইল, গড়ি বা কালাপানি চটী ৭ মাইল। তথা হইতে গাড়ি পথ ধরিয়া ১½ মাইল উতরাই করিলে টৌটা-আম

চটী পাওয়া যায়, কিন্তু গাড়ীর রাস্তায় চলিলে ৬ মাইলে ঐ চটী পাওয়া যায়। আবার টেটা-আম হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাম ধারের ঝাঁড় পথ দিয়া নামিয়া গেলে দুই মাইল কুমার চটী পাওয়া যায়; কিন্তু গাড়ীর রাস্তায় ৬ মাইল পথে কুমারচটী পাওয়া যায় না।

কুমারিয়া হইতে কৌশলা-গঙ্গা বা কুশী নদী পার হইয়া ৬ মাইল দূরে গাঞ্জিয়া চটী; গাঞ্জিয়ার পূর্ব্বেও আর একবার কুশী নদী পার হইতে হয়। গাঞ্জিয়া হইতে রামনগর ৭ মাইল পথ। রামনগর কুশীনদীর তীরে অবস্থিত। এখানে বাজার ও ধর্ম্মশালা আছে; রেল ষ্টেশনেও বিশ্রাম ঘর আছে। পূর্ব্বে কেদার ও বদরী-নারায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থ-গুলির পথ অতি দুর্গম ও ভয়াবহ ছিল; বর্ত্তমান সময়ে সে সকল অসুবিধা অনেক দূর হইয়াছে। তবে চড়াই উৎরাই করিতে কিছু কষ্ট বোধ হয়। ঐ সকল পথে স্থানে স্থানে চটি ও দোকান থাকায়, আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়; কেদার ও বদরীর পথে খাঁটি ও গরম দুগ্ধের অভাব নাই। ঐ সকল শীতপ্রধান পথে যাতায়াত কালে অন্ততঃ দুই খানা মোটা কম্বল ও গাত্র সঙ্গে নেওয়া উচিত। পাহাড়ে অঞ্চলে হিম লাগিয়া সর্দ্দি, কাশি, জ্বর ও পেটের অসুখ হইতে পারে। সঙ্গে কিছু ঔষধ রাখিলে যাত্রিগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কেন না ঐ সকল দুর্গম পথে ঔষধ ও চিকিৎসকের একান্ত অভাব। বিষ্ণুপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি নদীসঙ্গম স্থানে ভয়ঙ্কর স্রোত; ঐসব স্থানে অতি সাবধানে স্নান করিতে হয়। অধিকাংশ স্থানে আলোর অভাব; সুতরাং আলোর বন্দোবস্তও রাখা কর্ত্তব্য। পার্ব্বত্য পথে চলিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই লাঠির সহায় নেওয়া কর্ত্তব্য।

১৮ই রবিবার— অদ্য ভোর ৬½ টায় পাণ্ডুকেশ্বর চটী হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ১০ টার সময় বিষ্ণুপ্রয়াগে মধ্যাহ্ণে পহুছিয়া আহারাদি সমাপন করতঃ ক্রমে পথ চলিতে চলিতে ৫½ টার সময় কুমারচটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিলাম।

১৯শে সোমবার—অদ্য ভোরে কুমারচটী হইতে রওয়ানা হইয়া ১০½ টায় পক্কড় গঙ্গা চটী পহুছিলাম ও আহারাদির পর তথায় হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যায় সিমুলিয়া চটী প্রাপ্ত হইলাম

২০শে মঙ্গলবার—অদ্য ভোরে সিমুলিয়া চটী হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ৯ টায় লাল-গঙ্গার পুল পার হইয়া সন্ধ্যায় নন্দপ্রয়াগ পহুছিলাম।

২১শে বুধবার—অদ্য ভোরে ৬ টায় নন্দপ্রয়াগ হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যায় কর্ণপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম।

২২শে, বৃহস্পতিবার—প্রাতে কর্ণ প্রয়াগ হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার সময় আদি-বদরী প্রাপ্ত হইলাম।

২৩শে, শুক্রবার—প্রাতে আদিবদরী হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যায় ধোনারঘাট পহুছিলাম।

২৪শে, শনিবার—ভোরে ৫½ টার সময় ধোনারঘাট হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ৯ টার সময় মেগচৌরী চটীতে

উপস্থিত হইলাম, তথায় আহারান্তে পুনরায় রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৮ টার সময় বোয়ারি চটীতে পহুছিলাম।

২৫শে রবিবার—অদ্য ভোরে ৬টায় বোয়ারি চটী হইতে রওয়ানা হইয়া মধ্যাহ্নে গণেশ চটীতে উপস্থিত হইলাম এবং আহারান্তে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার সময় বুড়াকেদারে উপস্থিত হইলাম।

২৬শে, সোমবার—ভোরে ৬টায় রওয়ানা হইয়া মধ্যাহ্নে ভেকা চটীতে পহুছিলাম এবং তথা হইতে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার ছিম চটীতে পহুছিলাম।

২৭শে, মঙ্গলবার—অদ্য ভোরে ছিম চটী হইতে রওয়ানা হইয়া মধ্যাহ্নে গোদ চটীতে উপনীত হইলাম এবং তথা হইতে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময় কামার চটীতে উপস্থিত হইয়া রাত্রি কাটাইলাম। এখানে একটী খর-স্রোতা পাহাড়ীয়া নদী আছে।

২৮শে, বুধবার—ভোরে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া উক্ত নদী পার হওয়তঃ বেলা ২½ টার সময় রামনগর পহুছিলাম।

২৯শে, বৃহস্পতিবার—অদ্য প্রাতে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাপন করতঃ বেলা ১০ টার ট্রেনে কাশী রওয়ানা হইয়া ৩০শে শুক্রবার রাত্রি ৮ টার সময় কাশীধাম পহুছিলাম। রামনগর হইতে কাশীর ভাড়া—৪।৴ আনা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত কাশীতেই অবস্থিতি।

৬ই আষাঢ় শুক্রবার বেলা ৭½ টার কাশী হইতে নৈহাটী রওয়ানা হইয়া পরদিন বেলা ৪-৪৫ মিনিটের সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পহুছিলাম এবং গঙ্গাপার হইয়া নৈহাটীতে পূর্ব্বপরিচিত শ্রীযুত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাস করিলাম। কাশী হইতে নৈহাটীর ভাড়া ৪।৴০ আনা।

৮ই রবিবার—অদ্য প্রাতে ৮½ টায় নৈহাটী হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন ভোরে গোয়ালন্দ পহুছিয়া সিরাজগঞ্জের ষ্টীমারে আরোহন করিলাম। সন্ধ্যা ৭½ টায় সিরাজগঞ্জ পহুছিয়া কিছু জলযোগ করতঃ বাড়ী রওয়ানা হইলাম এবং রাত্রি ১২ টায় নিরাপদে ও সুস্থশরীরে বাটীতে পহুছিলাম।

এখানেই আমার এবারকার ভ্রমণকাহিনী শেষ হইল; অহৈতুক করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীগুরু-দেবের অতুল রাতুল চরণোদ্দেশে প্রণাম করতঃ আমিও পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার

—:0:—

ব্যথিতের কথা।

তোমার শুধু মুখের কথা
বল দিত যার অ-বশ প্রাণে,
তোমার চোখের ইঙ্গিত পেলে
—মানৃত না যে ঝড় তুফানে,
ছুট্‌ত যার হাসির ফোয়ারা
দেখ্‌লে হাসি তোমার মুখে,
(আবার) তোমার মুখই দেখ্‌লে মলিন,
চাপ্‌ত পাষাণ যাদেরই বুকে

তোমার কাজ করতে সেবা
পরাণ দিতে এসেছিল,
অযুত হাতীর বল যেথা
তোমার গুণে পেয়েছিল।
তোমার সেবে হবে সুখী
এ যে গো তার ছিল আশ,
কিন্তু হায়! কপাল দোষে
হ'ল আজ তার সর্ব্বনাশ।
থির সাগরে ঢেউ উঠিয়ে
তার ভরা তরী ডুবে গেছে'
(তাই) বড় ব্যথা পেয়ে সে,
মরমে আজ মরিয়ে আছে।
নাই কো তার সে হাসি খুসি,
ভেঙ্গে গেছে হৃদয় মম,
জড় দেহে শূন্য প্রাণে
কচ্ছে আজ সে দিন যাপন।
নাই কো তার সে উদাম, আশা,
নাই কো তার সে প্রাণের বল,
যা ছিল সব হারিয়ে এবে
হয়েছে সে স্থির, অচল।
সে, তোমার হ'ল নাকো
শুধু তোমার দিল দুখ,
তারি জ্বালায় জ্বলে তুমি,
দেখলে না গো সুখের মুখ।
বড় জ্বালা দিয়েছে গো,
ভুলে যেও সে সব কথা,
পুরাণ কথা মনে করে,
পেয়ো না কো হৃদয়ব্যথা:
আর ত তার নাই কো সাহস
যে'তে তোমার পায়ের কাছে;
তোমার বিশ্বাস হারা হয়ে
সে যে গো হায়! দমিয়ে গেছে।
জড় দেহে, শূন্য প্রাণে সে,
ভাবছে এখন মনে মনে;
বিশ্বাসহারা হ'লেম যখন,
কাজ কি তবে "ছার জীবনে"?

দীন—হরিদাস।

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(১৮)

মতান্তরে শব্দসকল গুণ সমবেত জাতি অভিহিত করে। গুণে তাহার (শব্দের) সম্বন্ধ থাকায় নাম বা সংজ্ঞা সুসম্পন্ন হয়। যেমন "লোহিত বর্ণ" এই শব্দটী দ্বারা, লোহিত গুণযুক্ত বা রক্তবর্ণ বস্তুই বুঝায়। কালবর্ণ বস্তু বুঝায় না। লোহিত শব্দ আর তদ্বোধক জ্ঞান—"অর্থাৎ লালবর্ণ,"—উভয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অভিপ্রায় এই যে, লোহিত শব্দ উচ্চারণ মাত্র, লাল রংয়ের জ্ঞান আমাদের স্বতঃই উদিত হয়;—(যেমন রক্ত জবা" বলিলে, লাল বর্ণের জবা ফুলের কথা আমাদের মনে পড়ে) অতএব শব্দের সহিত গুণের সম্বন্ধ থাকায় নামের সংজ্ঞা সুসম্পন্ন হয়। লোহিত বর্ণের রূপ আছে। অতএব রূপ বা মূর্ত্তি বর্ণ বা গুণের বোধক। রূপ বা মূর্ত্তি না থাকিলে গুণের জ্ঞান-

অসম্ভব। যেমন রমলাল বাবুর মূর্ত্তি—অর্থাৎ আকার না থাকিলে তিনি সুন্দর, গৌরবর্ণ কিম্বা শ্যামবর্ণ নির্ণয় হওয়া অসম্ভব। অতএব গুণ থাকিলেই মূর্ত্তি বা রূপ—আর মূর্ত্তি বা রূপ থাকিলেই গুণের উপচয় অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, গুণে যাহা সমবেত আছে; তাহা না থাকিলে তত্তৎ বর্ণের প্রতিভা হয় না; এইজন্য গুণের রূপত্ব স্বীকার সর্ব্ব-সম্মত। এরূপ হইলে (লোহিত বর্ণের তুলনায়) শব্দ—গুণত্বাদি ও রূপত্বাদি জাতির লক্ষণ স্বীকার করিতে হয়। অন্যথায় শব্দের সহিত গুণের সম্বন্ধ নাই, আর গুণের সহিত রূপের সমানাধিকরণ্য নাই, এরূপ কথা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। অতএব জানা গেল যে, শব্দ সকল গুণত্বাদি ও রূপত্বাদি জাতির লক্ষণ হইয়া গুণসমবেত জাতি অভিহিত করে।

আবার গুণসমবেত জাতি মিশ্রপদার্থেরই নামান্তর মাত্র। যেহেতু সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ ব্যতীত সমবেত সত্তা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা ব্যাপ্ত আছে, তাহার নামই গুণ। আর দুইটী বস্তুর "গুণ সমীকতা বশতঃ"—মিলন বা সংযোগকে সমবেত বলা যায়। দুইটী বস্তুর পরস্পর সংযোগ ব্যতীত কদাচ "সমবেত" সিদ্ধ না হওয়ায়, "সমবেত" শব্দটীও মিশ্রপদার্থ বোধক এই মিশ্রপদার্থ বোধক সমবেত সত্তা দ্বারা যাহা ব্যাপ্ত, তাহারই নাম গুণ। এবম্বিধ গুণ পদার্থ যে, মিশ্র পদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়া নশ্বর হইবে এবং গুণের যে ধ্বংস প্রতিযোগিত্ব চিরদিনই থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে? অতএব শব্দসকল "গুণ সমবেত" জাতি অভিহিত করে, এই বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শব্দ দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা "উল্লিখিত মিশ্র পদার্থ বোধক" সমবেত সত্তাদ্বারা ব্যাপ্ত বিধায়ে বিনাশী নশ্বর, অনিত্য, বস্তু বিশেষ মাত্র।

অতঃপর এই প্রকৃতি-তত্ত্বের প্রধান মন্ত্র "কার্য্যের গুণ কারণে,"—"আর কারণের গুণ কার্য্যে" লইয়া বিচার করা উচিত। অথবা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অবয়বীর গুণ অবয়বে,—আর অবয়বের গুণ অবয়বীতে, এই বাক্য লইয়া বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাই হউক। কারণের গুণ আর অবয়বের গুণ প্রায় একই কথা। অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত ভাষার ভিন্ন ভেদে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। উভয় শব্দের ভাবার্থ ও লক্ষ্যার্থ প্রায় সমান, এক ঐক্য বিশেষ। শব্দ দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা নশ্বর—অনিত্য বস্তু বিশেষ মাত্র। অতএব নশ্বর বস্তুর উৎপাদক হইতেছে—শব্দ। তবেই হইল "শব্দ" নশ্বর বস্তুর কারণ বা অবয়ব। আর নশ্বর বস্তুর হইল সেই কারণের কার্য্য বা অবয়বী; সুতরাং কার্য্য বা অবয়বী নশ্বর অনিত্য হইলে, কার্য্যের যাহা কারণ (শব্দ) কিম্বা অবয়বীর যে অবয়ব (শব্দ) তাহারও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নশ্বর, অনিত্য বা অসত্য বস্তু বিশেষ। তবেই, দেখা গেল যে,—শব্দ অনিত্য বস্তু বিশেষ। সেই অনিত্যোপাধিবিশিষ্ট শব্দ দ্বারা যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়, তাহাও তদ্বৎঃ;—অর্থাৎ অনিত্য, নশ্বর বা অসত্য বস্তু বিশেষ। তাহাতে আর আপত্তি হইতে পারে [illegible]

এরূপ হইলে মন্ত্র, সংক[illegible], স্থূল, ভূতপঞ্চ ইত্যাদি প্র[illegible], পু[illegible] পূর্ণপরব্রহ্ম, কালী, কৃষ্ণ, রাম—অর্থাৎ [illegible] কথায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে শব্দসমষ্টি প্রভৃতি সমস্ত শব্দেরই অনিত্যত্ব ও নশ্বরত্ব অ[illegible]

ভাবী। এরূপ হইলে, শব্দাতীত পরম বস্তুর অস্তিত্ব যদ্যপি জগতে থাকে,—তাহা হইলে তিনি যাহা আছেন, চিরদিন তাহাই থাকেন। আজ এক ভাব, কাল ভিন্ন ভাব; আজ এক নাম, কাল ভিন্ন নাম, কদাচ হন না, সম্ভাবনাও নাই। শব্দ সকল সেই শব্দাতীত পরাৎপর পরম বস্তুর ঔপচারিক বা কাল্পনিক সংজ্ঞা-বৈচিত্র্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়,—সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পরম্পরাশ্রয় বাধ-ব্যাধির আশঙ্কা দূরে যায়।—আর সেই সঙ্গে প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব চিরদিনের মত লোপ পায়।

যদি বল,—উল্লিখিত বিচারে শব্দ সকল অনিত্য ও নশ্বর উপাধির বিষয়ীভূত হইলে, আলোচ্য চতুর্থ শ্রুতি—"পৃথিবী চ পৃথিবী মাত্রা ইত্যাদি" মন্ত্রে "শ্রুতি" যাহা বলিয়াছেন,—"অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ইত্যাদিতে পাঞ্চভৌতিক জগৎ পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়," এই বাক্যের "পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম," শব্দও অনিত্যত্বে আসুক;—ঈশ্বরত্ব লোপ হইয়া পড়ুক। কিন্তু "ন চ বাচ্যম্" এরূপ আপত্তি করিতে পার না। যেহেতু সারা জগৎ বিলীন হইয়া গেলে,—যে ভাব বা অবস্থা দাঁড়ায়, সেই ভাব বা অবস্থার কোনরূপ নামের সংজ্ঞা থাকিতে পারে না। তাহা নিরুক্ত—অনিরুক্ত,—বিদিত—অবিদিতের অতীত। নাম, রূপ, শব্দ, জগতের অন্তর্ভূত বস্তু। সেই নাম-সংজ্ঞা-বৈচিত্র্য জগতই যদ্যপি বিলীন হইয়া যায়, তবে আর নাম-রূপের খেলা থাকিবে কেন? পরন্তু সেখানে এইটুকু মহত্তত্ত্ব, এই পদার্থটী প্রকৃতি, ঐ বস্তুটী পুরুষ, ইহাও নির্ণয় হইতে পারে না—ঈক্ষণ, দর্শন, অবলোকনাদি বৃত্তিও থাকে না, তুমি, আমির,—আমিত্ব—মদীয়ত্ব বুদ্ধিও টিকে না। সে স্থান জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য,—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, বাক্যমনের অতীত। তাহা-অনন্ত প্রয়োজন বিশিষ্ট,—

অনন্য-পূর্ব্ব,—সনাতন। শ্রুতিমতে তাহা নির্ব্বিকল্পো, নিরাকাঙ্ক্ষঃ—নিষ্কলো, নিরঞ্জনো—নিরভিমানঃ।

অতএব "শ্রুতি মন্ত্রে" সে স্থানের নাম যে "পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম" প্রকাশ পাইতেছে, তাহা কেবল মাত্র অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অর্থবোধ করিতে হয়। অর্থাৎ শ্রুতি মন্ত্রের "পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম" এই পদব[illegible] শব্দাতীত, অনির্দ্দেশ্য স্থানেরই [illegible] লোপের কারণ নহে। সেই [illegible] স্থানই শব্দবাচ্যে পরমাত্মা, পূর্ণপরব্রহ্ম, [illegible], কৃষ্ণ, [illegible] কালী, তারা, মহাবিদ্যা ইত্যাদি "প্রবৃত্তি[illegible] অর্থভাবনা বাচ্য" বহু বহু নামে প্রকাশিত হয়। নাম ভিন্ন ভেদ হইলে, বস্তু ভিন্ন ভেদ হয় না। যেমন চিক, বালা, অনন্তে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব লোপ পায় না। অন্য পক্ষে যদ্যপি আমরা স্বর্ণকে বলি লৌহ, আর অগ্নিকে বলি শীতল, তথাপি তাহারা আমাদের কথামত লৌহত্বে বা শীতলত্বে আসে না। তবেই দেখা গেল, শব্দ বাচ্যে বস্তুর ভিন্ন ভেদ হয় না। বর্ত্তমান -সমস্ত জগতের লোক যদ্যপি বলে যে,—পরম প্রভু পরমেশ্বর নাই;—তাহাতে তিনি "নাই"—হইবেন না। আর আছেন বলিলেই—"আছেন" হইবেন না। তিনি যাহা আছেন, অনাদি, অনন্ত কাল তাহাই আছেন। অতএব শব্দ অনিত্য হইলে ঈশ্বরত্ব লোপ পায় না। পরন্তু আপত্তি নগণ্য হয়।

পক্ষান্তরে একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে, ঐ বাক্যের প্রামাণ্য নিশ্চয় সর্ব্বথা বিবাদশূন্য হয়;—অন্যথা সিদ্ধত্ব সম্ভাবনাও দূরে যায়। যথা :—

শ্রুতি বাক্যানুসারে জানা যাইতেছে যে, এমন কোন স্থান আছে,—যেখানে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়। ভাল কথা;—এরূপ হইলে যেখানে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়, সে স্থানকে হইতে হয় নাশক, আর সমস্ত জগৎকে হইতে হয় নাশ্য। নাশ্য—নাশকের সমানাধিকরণ্য নাই,—বা নাশ্য—নাশক একত্রে অবস্থান করে না। যেমন আলোক অন্ধকারের নাশক, আর অন্ধকার নাশ্য;—ইহারা একত্র অবস্থিতি করে না। সুখ,—দুঃখের নাশক; ইহাদের জাতি ও ধর্ম্ম এক নয়। এরূপ সত্য মিথ্যা, জ্ঞান, অজ্ঞান ইহাদের নাশ্য ও নাশকত্ব ভাব আছে;—কিন্তু জাতি ও ধর্ম্ম বিভিন্ন। অতএব যাহাদের নাশ্য—নাশক সম্পর্ক থাকে, তাহাদের একত্রে অবস্থান প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। অধিকন্তু নাশ্য-নাশক সম্পর্কে জাতি ও ধর্ম্ম বিভিন্ন হইতে হয়। কিন্তু "সারা জগৎ" ও "পূর্ণপরব্রহ্ম" শব্দ দ্বয় বিভিন্ন জাতি নহে। উহাদের বর্ণগত জাতি ও ধর্ম্ম এক—অভিন্ন; পরস্পর একত্রেও অবস্থান করে। এমতাবস্থায় উহাদের নাশ্য নাশকত্ব ভাবের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব "সারা-জগৎ" ও "পূর্ণ পর ব্রহ্ম-" শব্দ দ্বয়ের নাশ্য— নাশক সম্বন্ধ নাই। এরূপ হইলে পরমাত্মা—পূর্ণ পর ব্রহ্ম" শব্দ—"সারা জগৎ" শব্দের নাশক নহে।

অন্য পক্ষে যাহাদের সাজাত্য বন্ধন এক,—"অর্থাৎ জাতি ও ধর্ম্ম এক," কেবল মাত্র লৌকিক ও ব্যবহারিক কার্য্যার্থে যাহাদের সজাতীয় ভেদ প্রচলিত আছে,—তাহারা পরস্পর পরস্পরের নাশ্য বা নাশক হয় না। যেমন রামলাল বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ, উহাদের জাতি ও ধর্ম্ম এক, কিন্তু ব্যক্তি বিভিন্ন;—অর্থাৎ দুই ব্যক্তি। এরূপাবস্থায় রামলাল ও রাজেন্দ্র বাবুর যে ভেদ, তাহার নামই সজাতীয় ভেদ। এইরূপ দুইটী ফুল, দুইটী টাকা, দুইটী বৃক্ষ, দু-খানী "আর্য্যদর্পণ,"- ইহাদের যে লৌকিক ও ব্যবহারিক ভেদ তাহাকেও সজাতীয় ভেদ বলা যায়। কিন্তু রামলাল বাবু,—রাজেন্দ্র বাবুর নাশক নহে;—একটী ফুল—অন্য ফুলের নাশক নহে ইত্যাদি। তবেই দেখা গেল, সজাতীয় ভেদ স্থলে কেহ কাহার নাশক বা নাশ্য হয় না। "পূর্ণ পর ব্রহ্ম" ও "সারা জগৎ" শব্দ দ্বয়ও ঐরূপ। অর্থাৎ ইহাদের বর্ণগত জাতি ও ধর্ম্ম এক;—কেবল শব্দ দুই দুই মাত্র। এরূপাবস্থায় ইহাদের ভেদকে "ব্যবহারিকার্থে-" সজাতীয় ভেদ বলা যায়। সজাতীয় ভেদ স্থলে কেহ কাহার নাশক বা নাশ্য হয় না, উপরে দেখান হইয়াছে। অতএব "পূর্ণপরব্রহ্ম" শব্দ "সারা জগৎ" শব্দের নাশক নহে। তবেই দেখাগেল, উভয় মতে—ঠিক একরূপ অর্থই প্রকাশ পাইল। সুতরাং "সারা জগৎ যেখানে বিলীন হইয়া যায়,"—এই শব্দের নাশক শব্দ-বাচ্য নহে;—শব্দাতীত। এরূপ হইল "শ্রুতি যে বলিয়াছেন,"—সমস্ত জগৎ পরমাত্মা পূর্ণপর ব্রহ্ম বিলীন হইয়া যায়, শ্রুতি বাক্যের ঐ "পরমাত্মা পূর্ণপরব্রহ্ম" শব্দটী শব্দাতীত অনির্দ্দেশ্য

স্থানেরই বোধক হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ শ্রুতি মন্ত্রে সারভাব শব্দাতীত পরম স্থানেই বিবক্ষিত,—নাম সংজ্ঞা যুক্ত স্থানে অবিবক্ষিত হয়।

অতঃপর সহজেই বোধগম্য হইবে যে—সমস্ত জগৎ যেখানে বিলীন হইয়া যায়, সে স্থান শব্দাতীত। কাজেই অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অনুপলভ্যমান। বোধ সৌকর্য্যার্থ সেই শব্দাতীত, অনির্দ্দেশ্য স্থান উদ্দেশ্য, আর সমস্ত জগৎ বিধেয়; অনির্দ্দেশ্য স্থান সাধ্য আর সমস্ত জগৎ হেতু; অনির্দ্দেশ্য স্থান কারণ আর সমস্ত জগৎ কার্য্য, অনির্দ্দেশ্য স্থান জনক, সমস্ত জগৎ জন্য—এইরূপ শব্দবাচ্য হয়। অতএব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল-অবচ্ছেদে বিধেয় বস্তুর অন্বয় হইয়া যায়; এই সর্ব্ববাদিসম্মত ন্যায় বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, (পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে)—যে কালে,—যে সময়ে উল্লিখিত অনির্দ্দেশ্য, নাম-সংজ্ঞাশূন্য উদ্দেশ্য বস্তু—বিধেয় বস্তুর (জগতের) সহিত অন্বয় যুক্ত হইয়া নানাবিধ নামের "সংজ্ঞায়" শব্দ বাচ্যে নানাভাবে প্রকাশিত হয়,—ঠিক সেইকালে, সেই সময়ে তাহার নানাত্ব নামসংজ্ঞাশূন্য শব্দাতীত পরম স্থানের প্রতিপাদক হইয়া মিথ্যাত্ব মধ্যে গণ্য হয়। অন্যপক্ষে সাধ্য, হেতু, কারণ-কার্য্য, জনক-জন্য ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপনে,—বীজ ও বৃক্ষের তুলনায় (পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে;—অগ্রে বৃক্ষের উৎপত্তি, কি বীজের উৎপত্তি,—বৃক্ষ হইতে বীজ, কিম্বা বীজ হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি উদাহরণে) হেতু হইতে সাধ্য, কিম্বা সাধ্য হইতে হেতুর উৎপত্তি—কার্য্যের জন্য কারণ কিম্বা কারণের জন্য কার্য্য,—জন্য বস্তুর বিদ্যমানতায় জনক কিম্বা জনকের বিদ্যমানতায় জন্য নির্ণয়োপলক্ষে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমজনিত আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী হয়। কাজেই কে অগ্রে, আর কে পরে, নির্ণয় না হওয়ায় "বিরোধ স্থলে" উৎপত্তি অসিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের অতীত যে বস্তু,—অর্থাৎ যাহা হেতু সাধ্য,—কার্য্য,—কারণ জন্য,—জনকের অতীত, সে পরম বস্তুই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই পরম বস্তুই "উল্লিখিত" শব্দাতীত,—অনির্দ্দেশ্য, অনুপলভ্যমান। তাহাই অনাময়, অনাশ্রয়,—শাশ্বত।

অতঃপর বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে,—শব্দ-সকল "এক" শব্দাতীত, অনির্দ্দেশ্য, পরম বস্তুর ঔপচারিক বা কাল্পনিক সংজ্ঞাবৈচিত্র্য স্বরূপ;—অনিত্য বস্তু বিশেষ। আবার অনিত্য হইলেই অসত্য। সুতরাং অনিত্য বা অসত্যোপাধি বিশিষ্ট শব্দ সমূহ দ্বারা "সেই" "এক" অনির্দ্দেশ্য শব্দাতীত বস্তুই অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ "সেই" "এক" বাক্য মনের অতীত স্থান শব্দ বাচ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হয়। এরূপ হইলে প্রকৃতির নিত্যত্ব, জগৎ কারণত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-মিশ্রণে জগৎসৃষ্টিত্ব এবং মহত্ত্ব,—অহঙ্কার ইত্যাদিতে সূক্ষ্ম, স্থূল, পাঞ্চভৌতিক পদার্থ,—এক কথায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের শব্দসমষ্টিপ্রযুক্ত সমস্ত শব্দই 'সেই' অনির্দ্দেশ্য, শব্দাতীত এক স্থানের বোধক হইয়া তাঁহার অর্থাৎ "সেই" শব্দাতীত পরম স্থানের ঔপচারিক বা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই প্রকৃতির নিত্যত্ব, ইহার উপর পুরুষ নামক বস্তুর অকর্ম্মণ্যত্ব, প্রকৃতির জগদ্‌-যোনিত্ব বা জগৎকারণত্ব ইত্যাদি শব্দও তথৈবচঃ হইয়া সুব পণ্ড হইয়া যায়। পরন্তু শব্দ দ্বারা সেই 'এক' শব্দাতীত পরম স্থানই বিবক্ষিত হওয়ায়, "ব্রহ্মৈবসর্ব্বং", "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" ইত্যাকার অবস্থা দাঁড়াইয়া যায়।

শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে হইলে, উপক্রম, (প্রথম) উপসংহার, (শেষ) অভ্যাস, (প্রতিপাদ্য বিষয় পুনঃ পুনঃ কথন) অপূর্ব্বতা, (কথিত উপায় ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় নির্ণয় করা বা অপ্রাপ্য বিষয় প্রতিপাদন করা) ফল, (কথিত বহু বহু বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিষয়ে ফলোল্লেখ থাকা) অর্থবাদ, (বিধির প্রশংসা) এবং উপপত্তি, (অনুকূল যুক্তি) এই সমস্ত উপায়ে অর্থ-নিশ্চয় করিতে হয়। যদ্যপি কোন শ্রুতি-মন্ত্রের অর্থোপলব্ধি বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত, হয়,—অর্থাৎ এখানের অর্থ এরূপ নহে,--অন্যরূপ, তাহা হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে হয় যে,—সেই গ্রন্থের প্রথম ও শেষ কি অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু ঐ গ্রন্থে বারম্বার কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে,—কোন বিষয়টী উপায়ান্তর ও শাস্ত্রান্তরের দুর্লভ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে,—কোন বিষয়ের ফল সম্বন্ধীয় উল্লেখ আছে। এইরূপ কোন কোন বিষয়ের প্রশংসা, কোন বিষয়ের অনুকূল যুক্তি, কোন বিষয়ের প্রতিকূল ভাব, কিরূপ প্রণালীতে বর্ণিত আছে, ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতঃ মন্ত্রের সারভাব লইয়া শ্রুতি অর্থাৎ বেদের প্রমাণ অব্যাহত রাখিতে হয়। অন্যথায় কেবল উচ্চারণ বিদ্যায় পর্য্যবসিত হইলে স্বতঃ প্রমাণ বেদেরও অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে। পরন্তু শ্রুতি বাক্য "বিবোধক" না হইয়া "বিলোমক" হইয়া দাঁড়ায়। তাহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে,—আলোচ্য চতুর্থ শ্রুতি-প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎকারণত্ব সমর্থনের অনুকূল নহে। পূর্ব্বে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রুতির আলোচনায় ঐরূপ অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চম শ্রুতির আংশিক আলোচনায় (পূর্ব্বে প্রকারান্তরে হইয়াছে) ঐ একার্থ ভিন্ন দ্ব্যর্থ আসে না। কাজেই পুনরায় তাহার বিস্তৃতালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে দেখাগেল, প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রুতি—প্রকৃতির জগৎকারণত্ব ও নিত্যত্ব সমর্থনের অনুকূল নহে। অতঃপর "ভূমার" আলোচনায় প্রকৃতির সর্ব্বশক্তিমানত্ব ও জগৎকারণত্ব নির্ণীত হইয়া, আমাদের পরমাণু মিলন রূপ ইচ্ছার অবসান—পরন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য" জ্ঞান ও ভক্তির এক, একত্ব প্রদর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিষ্কণ্টক কিনা, বলা যায় না।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।
সন্তোষপুর-হুগলী।

হাসি।

তরুণ অরুণ-দীপ্ত প্রভাতি শিশির,
শারদ-কৌমুদীস্নাত কুমুদ নিশির,
মুঞ্জরিত শষ্পকুঞ্জ বন-বীথিকায়
ফুল্লাননা পঙ্কজিনী সরসীর গায়,

মলয় মারুত সনে তরঙ্গে বিভঙ্গে,
বাসন্তী চন্দ্রমা মিশি কালিন্দীর অঙ্গে,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শশধর তারকার রাশি,
বিকাশে সতত তাঁর মধুময় "হাসি"।

দীন—দেবেন্দ্রনাথ।

আত্মোপদেশ।

(৪)

ত্রিবিধ আবরণান্তর্গত কারণসূত্র।

তোমার এই সত্ত্ব, ও রজ ও তমোগুণ-ময় ত্রিবিধ আবরণ দেহান্তর্গত, সেই অতি সূক্ষ্ম কারণ সূত্র, (যাহা দেহোৎপত্তির আদি) সদাই অক্ষয়ভাবে বিরাজিত। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই। সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং যাহা নিরাকার, এবং যে বস্তুতে মহা প্রলয় কালে সর্ব্ববিধ সৃষ্ট বস্তুকে লয় হইতে হয়, যাহা বিভু তাহাই সেই "কারণ"—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি তোমাকে সতত মুগ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া, তুমি সেই সমস্ত পদার্থকে চিনিতে বা বুঝিতে পার না।

মহামায়ার দুর্জ্জন-দমন-বিধি।

জননি! তুমি যখন কোন দুষ্টমতিকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর, তখন তাহার মনও বুদ্ধিতে কুদৃষ্টি উদয় করিয়া দিয়া তাহার তেজ হরণ কর। তাহার পর সেই দুষ্ট আপন বুদ্ধিদোষে আপনি নষ্ট হয়।

জননি! তুমি অত্যন্ত "বিশুদ্ধভাব" স্বরূপা সুতরাং অন্তরে বিশুদ্ধভাব উদিত হইলেই তোমার সন্নিকর্ষরূপ শুভোদয় স্পষ্ট বোঝা যায়॥

স্থূল ও আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া পদ্ধতি

স্থূল শরীরে যেমন কোন প্রকার গুরুতর আঘাত লাগিলে, তৎস্থানে একটা ক্রিয়া বা পীড়া উপস্থিত হয়, এবং সেই অঙ্গ দুর্ব্বল হয়, সেইরূপ মনে যদি অকস্মাৎ কোন শুভ বা অশুভ আঘাত লাগে, তাহা হইলে তৎকারণ-মনের একটা অদৃষ্ট অসুস্থতা বা রোগ দাঁড়ায়।

পথিক ও পান্থশালা।

জগতে যে সকল পথিক সদাই অসতর্ক ও চিন্তাশূন্য, তাহারা যেমন গন্তব্য স্থলে না গিয়া অনির্দ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হয়—তদ্রূপ যে "মন" সদাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এ চিন্তা হইতে ও-চিন্তা এবং পুনরায় তৃতীয় চিন্তা, এইরূপ শত সহস্র পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে মন কোন কালে সত্যরূপ পান্থশালায় উপনীত হইতে পারে না। তাহার পথ শ্রান্তিই লাভ; সে বিশ্রাম-মন্দির দেখিতে পায় না।

জ্ঞেয় বিষয়—পুরুষ ও প্রকৃতি ত্রিগুণ ক্রিয়া, কর্ম্মসূত্র ইহ ও পরলোক।

পুরুষ বিদেহ শক্তির এক অবিচ্ছিন্ন দেহে চিরকাল চলে, তবে একবার সঙ্কোচ একবার বিকাশ রূপ বা ভাবের পরিবর্ত্তন মাত্র হয়। কর্ম্মসূত্র অবিচ্ছিন্ন। তুমি সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি বীজ স্মরণ করিয়া আরম্ভ কর, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট স্বর্গাদি সৃষ্ট হইবে। বীজের (শক্তি বীজের) ধ্যান বা স্মরণ ভাবিশক্তি। তদ্ভাবং ভাবিত বা প্রাপ্ত হইতে হইবে,—স্মরণ হওয়া বা ধ্যানসিদ্ধ হওয়ার অর্থ-তদ্রূপতা প্রাপ্ত হওয়া, বিকৃতিকে চেষ্টা দ্বারা প্রকৃতি স্মরণ করিতে হইবে। নিজের বীজ মূর্ত্তি

প্রত্যক্ষাধীন করিতে হইবে । ত্রিগুণের কার্য্য কারণ "রূপ"গুলি ধারাবাহিক রূপে আয়ত্ব করিতে হইবে ।

মহামায়ার স্তব ।

মা ! তুমি আমায় এইরূপ দয়া করিয়া যাইও । তুমি নিজের কোলে বসাইয়া এমন ভ্রম জন্মাইয়া দিও যে, আমার মনে হয়, আমি যেন একাকী নির্জ্জন বনে এসে পড়েছি ।

কেন সত্যদর্শন হয় না ?

বৃক্ষের ধ্যানে অভ্যস্ত বলিয়া বীজের ধ্যান হয় না । বিকৃতির গুণে অভ্যস্ত বলিয়া প্রকৃতির গুণোদয় মনে হয় না । কর্ম্মসূত্র অন্তস্বরূপই ঠেলে ঠেলে সম্মুখে এগিয়ে দেয় । বলে, ভাই কাল এসব স্মরণ করেছিলি, আজও ইহাই স্মরণ কর, ইহাই তোর প্রকৃতি ।

সৎ ও ভব ।

সত্যলোক নিরোগ—ভব গণ্ডেই রোগ ।

ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংসর্গ রোগোৎপত্তি ।

রোগ সঞ্চয় করিতে নাই, রোগকে যেমনই গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ সম্যকভাবে ত্যাগ করিবে ; যখন বৃক্ষ সম্মুখে আসিবে, তখন মাত্র দেখিবে, পরে ছ ধারও ধ্যান করিও না ।

ক্ষীরোদে অনন্ত-শয্যা ।

ক্ষীরোদও সমুদ্র বটে ; পরন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দিলে অনির্দ্দেশ্য দেশে ভাসিয়া যাইতে হয় । বুদ্ধিতে যত দিন ভ্রান্তি থাকে, ততদিন তর্কশূন্য, সাত্ত্বিক দেহ ধারণ হয় না ।

প্রকৃতি ও বিকৃতি—প্রকৃত রূপ ও বিকৃত রূপ ।

শক্তি দুইভাবে ক্রিয়া করে, প্রকৃত ভাবে ও বিকৃত ভাবে ; প্রকৃত ক্রিয়ার ফলে প্রকৃত দেহ বস্ত্রের ন্যায় ধারণ হয়, এবং বিকৃত ক্রিয়ার ফলে বিকৃত দেহ বিকাশ হয় ।

সংস্কার ও তাহার বিকাশ ।

বিকাশ দেহ দেখিলে সংস্কার দেহ টের পাওয়া যায় ।

গোপনেচ্ছা ও প্রকাশেচ্ছা ।

গোপনেচ্ছা ও প্রকাশেচ্ছা এই দুইটাই বিকার—তুমি আপনাকে "একক" বা কেবলাত্মা ভাবিয়া কর্ম্ম কর ।

সবই তো খোলা রয়েছে, কিন্তু কয়জন দেখতে পাচ্ছে ।

বিকার প্রভাব ।

তুমি বিকার প্রভাবেই তোমার ঐকান্তিকতা বা কৈবল্য দেখিতে পাও না,—তুমি যখন নিজেই "তুলা" তখন রং-বিরংএর কাপড় দেখিয়া চমকিত হও কেন ? তুমিই তো সর্ব্ব বস্ত্রের প্রাণ । ভেদ মনে করিলেই ভেদ হয়ে পড়ে ; ভুলিলে ভেদের ত কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হয় না ।

সংসারী ।

সংসারী সকলেই তৈয়ারি কাপড় মাত্র চেনে, কিন্তু তুলা চেনে এমন লোক তো আজ পর্য্যন্ত আমার চক্ষে পড়ে নাই ।

দেহ ও প্রাণ।

সকলই দেহ লইয়া স্তম্ভিতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান, একটু প্রাণজামি করবার কাহার সাধ্য হয় না।

সৃষ্টির চুলের মুঠি।

সৃষ্টির চুলের মুঠি যার হাতে তার কাছে পর ত কেহই নয়, সবই যে তাহারই।

লক্ষ্যকের বস্ত্র দর্শনে নিজের মনে ভ্রমোদয়।

বস্ত্র লক্ষ্য করিলেই বা বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্তুকে বিস্মৃত হইলেই, প্রমাদোৎপন্ন হয় বা ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

নির্ম্মল আদর্শ।

আপনার আর্শি খানা সদা নির্ম্মল রাখিতে হয়। যে সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, তাহার ছায়ার দাগ আর্শিতে যেন জমে না যায়।

কেজো জিনিষে ময়লা, দাগ ইত্যাদি ধরলে কাজ চলবে কি করে? ব্রহ্মদর্পণের আর্শি বাজে কাজে বিগড়ান উচিত নয়।

বিস্মৃতির কারণ-যোনি।

চিত্ত চাঞ্চল্যের দারুণ অনুভবের যে বিচ্ছিন্নতা বা খণ্ড খণ্ড ভাব ধারণ হয়, বা রস পরিবর্ত্তন হয় তাহারই ফলে প্রতিক্রিয়া বা বিশ্রাম-ভাবে নিদ্রা বা খণ্ড নিদ্রা উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে বা তুরীয়-অবস্থায় এক সত্ত্ব রস স্থিরভাবে থাকে। রজ বা তমো রস উদয় হইতে পায় না। একবার ক্ষীর করে ফেলতে পারিলে আর দুধ ছিড়ে যাবার ভয় থাকে না।

প্রার্থনা।

মা! তুমি আমার মনে রাজসিক ও তামসিক শব্দ ও দৃশ্যতরঙ্গ প্রেরণ করিও না। তুমি সর্ব্বদাই তোমার অতি বিশুদ্ধ জ্ঞানময় দেহ আমার অন্তরে উদিত করিয়া রাখিও, আমার জ্ঞানচক্ষুর যেন নিমেষ না হয়।

মা! আমি বুঝিয়াছি যে, তুমি যাহাদের হৃদয়ে রাজসিক ও তামসিক তরঙ্গ প্রবাহিত কর তাহাদের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বিস্মৃতি ও চিত্তবিক্ষেপ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তাহারা কিছুতেই আপনাকে স্মরণ রাখিতে পারে না এবং অমরত্ব পদও আয়ত্ব করিতে পারে না।

জননি! আমার মন ও বুদ্ধি যেন সততই সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকর্ম্ম করার সময়ে তোমার স্বরূপ স্মরণে রত থাকে।

জননি! জীবের দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে।

(১) তোমার স্বরূপ বা আদ্যরূপ জ্ঞাত হওয়া এবং

(২) সর্ব্বকালে তোমাকে স্মরণ রাখা।

জননি! যাহার কর্ম্মশেষ হইয়া আসে, সেই মনুষ্যই তোমার স্বরূপ দেখিতে পায়। এবং মুক্ত পুরুষ ভিন্ন অপর কাহার সাধ্য নাই যে, তোমাকে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি দ্বারা ধরিয়া রাখে। কারণ যাহার বুদ্ধি কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ, সে কর্ম্ম ফেলিয়া তোমার ধ্যান কি করিয়া ধরিয়া থাকিবে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

:0:

ভক্ত শঙ্কর।

হিন্দু সমাজের কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদী সন্ন্যাসী, নাস্তিক, অভক্ত এবং শুষ্ক জ্ঞানী। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মপন্থা সর্ব্বথা ভক্তের অগ্রাহ্য এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারী সন্ন্যাসিগণ ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী। তাই বৈষ্ণবগুরু উপদেশ করিয়াছেন—"যোগীঋষি, কর্ম্মি, জ্ঞানী, দূরে পরিহরি।"

ইহার ফল এই হইল যে,—শঙ্করমঠের সন্ন্যাসীর নাম শুনিলেই,—যোগীর নাম শুনিলেই বৈষ্ণবগণ নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এবং অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া "তৃণাদপি সুনীচের" চরম আদর্শকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য শুষ্ক জ্ঞানী, অভক্ত বা অপ্রেমিক ছিলেন না: মায়াবাদী, নাস্তিক বলিয়া তাঁহাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখা কখনও কর্ত্তব্য নহে। আরও দেখা যায় যে, মূলে উভয় ধর্ম্মমতে কোন ভেদ নাই, মতবাদ ধর্ম্মলাভেরই সোপান মাত্র। আমাদের এই দুর্দ্দশার দিনে,—জাতীয় ঘোর অধঃপতনের দিনে, ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে ভাইয়ে ভাইয়ে বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষা বা হিংসা দ্বেষের ভাব পোষণ করা সমিচীন নহে। এদিকে আবার শঙ্করমঠের এক শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণও বৈষ্ণবগণের প্রতি ভ্রূকুটী-কুটীল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মজগতে স্থিত হইয়া, সামান্য মতবাদ আশ্রয় করতঃ হৃদয়ে হিংসা বা ঘৃণাকে স্থান দেওয়া নিতান্ত গর্হিত, সন্দেহ নাই।

ভজ্ ধাতু অর্থাৎ ভজনা করা হইতে ভক্তি ও ভক্ত পদ সাধিত হয়; অতএব যিনি শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার ভক্ত এবং যে মহিয়সী শক্তি প্রণোদিত হইয়া এই ভজনা আরম্ভ হয়, তাহাই ভক্তি। ভক্ত বলিলেই জ্ঞানী এবং প্রেমিক বুঝিতে হইবে; কারণ ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞানই জ্ঞান এবং ভগবানকে ভালবাসাই প্রেম। যাঁহার জ্ঞান বা প্রেম নাই, অর্থাৎ যিনি ভগবান্ কিরূপ তাহা আদৌ অবগত নহেন এবং তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা প্রদান করেন না, তিনি ভক্তনামের যোগ্য নহেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহার ভক্তগণকে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ইহাঁদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকেই আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; যথা।—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।

গীতা, ৭ম অধ্যায় ১৬।১৭।

ভগবান্ বলিতেছেন,—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিমান্ মানব আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। (অর্থাৎ ভগবানের

* শ্রীশ্রীভগবদ্বাক্যানুসারে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত; সুতরাং জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যও যে ভক্ত, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বিশেষতঃ মহাজনগণ বলেন, ভক্তি, ভক্ত, ভগবান ও গুরু এই চারিজনের নাম ও দেহ ভেদ হইলেও বস্তুতঃ ইহারা একই পদার্থ জানিবে। যথা:—ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত গুরু, চতুর্নাম বপু এক। সঃ আঃ দঃ।

এই চতুর্ব্বিধ ভক্ত বর্ত্তমান আছে।) ইহাঁদের মধ্যে জ্ঞানী সদা মদগত-প্রাণ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং সেও আমার অতীব প্রিয়।" ইহাতে দেখা যাইতেছে, ভক্তই জ্ঞানী এবং জ্ঞানীই ভক্ত। অতএব জ্ঞানাবতার শঙ্কর ভক্তশ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্ব-প্রেমিক। বিশ্বের পরতে পরতে সংমিশ্রিত অনন্ত সত্ত্বায় আপন সত্ত্বা নিমজ্জিত করিয়া প্রেমময়ের প্রেমসাগরে তিনি ভাসিতেছিলেন। তাঁহার "আমার" বলিতে কেহ ছিল না, কিছু ছিল না। তিনি জগন্ময় প্রভুকে দেখিতে দেখিতে আপনা হারাইয়াছিলেন, নিজ অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন;—দেখিয়াছিলেন—কেবল অনাদি, অনন্ত, প্রেম-স্বরূপ এক ভূমা পুরুষ—অবাঙ্মনসোগোচর-রূপে অনন্ত কাল হইতে অংশে এই দৃশ্যমান জগদ্রূপে বিস্তার লাভ করিয়া বিরাজিত আছেন। তাই দেখিয়া তিনি ব্যবহারিক জ্ঞানে যে, "আমি তুমি" জ্ঞান, "আপন পর" জ্ঞান, "ধরিত্রী-অনল-অনিল" জ্ঞান,—ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া,—মায়ার বিজৃম্ভন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জগতে একমাত্র নিত্য, সত্য, সনাতন বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য কিছু না দেখিয়া, তিনি দেহাত্মবুদ্ধি মানবগণের চির-মঙ্গলসাধন জন্য বৌদ্ধযুগের অবসানে এই মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া লুপ্ত হিন্দুধর্ম্ম ভারতে পুনঃ প্রচারিত করেন। যত দুঃখের মূল, ঘাত প্রতিঘাতের কারণ, বন্ধনের হেতু, এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া। ইহারই বশীভূত হইয়া মানব শত শত জনের মৃত্যু দেখিয়াও—প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণসম পুত্রকন্যাগণকে অকস্মাৎ ইহলীলা সম্বরণ করিতে দেখিয়াও, আপনাকে অজর, অমর মনে করে, শত শত মহারাজাধিরাজের পতন দেখিয়াও, নিজে বিষয় সুখে চিরসুখী হইয়া কালাতিপাত করিতে লালায়িত হয়। কিন্তু এ সুখ বা দুঃখের স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী? যতক্ষণ কামনাবাসনার উৎপীড়ন, ততক্ষণই এ স্বপ্ন স্থায়ী; অনন্ত পথের পথিক, অনন্ত শক্তিশালী মানবের অনন্তজীবনের তুলনায় দু'দশ দিন সুখ বা দুঃখভোগ মুহূর্ত্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই ক্ষণস্থায়ী আপাতমধুর সুখলালসায় মানব জানিয়া শুনিয়া ভুক্তভোগী হইয়াও কেন উন্মাদবৎ দিশেহারা হইয়া বিচরণ করে? কেন আপন অনন্ত প্রেমময়, সুখময় স্বরূপ ভুলিয়া "কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি,, বলিয়া হাহাকার করে? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াই দৃষ্ট হন। মায়াই ভ্রান্তির কারণ; মায়াই অলীক, ক্ষণস্থায়ী, সদ্যসুখপ্রদ, পশ্চাত্তাপদায়ক বিষয়ভোগ-পিপাসার জননী। বিবেকসিংহের গভীরগর্জ্জনে. ত্যাগের হুঙ্কারে ও বৈরাগ্যের কঠোরতায় মায়া ক্রমে ধীরে দূরে অপসারিত হন; আর তখনই কেবল মাত্র জীব আপন হৃদয়ে প্রাণারাম চিরবাঞ্ছিতের সৌন্দর্য্য অভিব্যক্তি দর্শন করিয়া প্রাণের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবৃত্তি উপভোগ করে। তাই শঙ্কর বজ্রগম্ভীর স্বরে যে বলিয়াছিলেন, "মানুষ যে "আমির" সুখের জন্য পাগল হইয়া যাইতেছে, সেই "আমিই" নিত্য, সত্য, সনাতন বস্তু সুখস্বরূপ আত্মা; "আমি" মনবুদ্ধি. অহংকার, চিত্তাদি কিছুই নহে"; এবং জীবকে অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, মায়াপ্রসূত সুখ দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ধ্রুবত্বে—

নিত্য সুখস্বরূপে, সদানন্দময়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময় জীব "শিব" ভুলিয়া দেহসর্ব্বস্ব হইয়াছিল।

বৌদ্ধগণের নৃশংসতা চরম উঠিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আচরণ জীবের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিল, 'ঈশ্বর নাই, কর্ম্মই সর্ব্বফলপ্রসূ। কর্ম্ম দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সাধনই পরম পুরুষার্থ।' এই ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে শঙ্করাবতার শঙ্কর দাক্ষিনাত্যে উদিত হইয়া ব্রহ্মাত্ম-বাদের বিজয় দুন্দুভি-নিনাদ করিলেন; তাঁহার সে নির্ঘোষে জীবের প্রাণে প্রাণে ভগবদ্ভাব জাগিতে লাগিল, নাস্তিকতা ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল এবং কর্ম্ম-কাণ্ডের কঠিন নিগড় মুক্ত হইয়া জীবগণ আবার অনন্তের পথে, বিশ্বপ্রেমের পথে পূর্ণপ্রাণে ধাবিত হইতে লাগিল। জ্ঞান ও প্রেমের মধুর হিল্লোলে কর্ম্মনিরত জীবগণের শুষ্ক প্রাণে অমৃতের প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতাবৎ যে আলোচনা করা গেল, তাহাতে দেখা যায়, ভগবান শঙ্কর জ্ঞানী ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন এবং ভক্ত ছিলেন। তিনি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক ছিলেন না; তাঁহার মতবাদ নাস্তিকতা নহে; বরং ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা। তিনি নিরীশ্বর-কর্ম্মনিরত বৌদ্ধ ভারতবাসীকে ঈশ্বরবিশ্বাসী ও কর্ম্মপাশ মুক্ত করিয়া প্রেমিক করিয়াছিলেন।

শঙ্কর, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরের তটস্থা লক্ষণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং স্বরূপলক্ষণতত্ত্ব প্রচার করিয়া ধর্ম্মের স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাই পর যুগে হিন্দুসমাজের জনগণের জ্ঞানকর্ষিত হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তটস্থা লক্ষণে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ববীজ বপন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এক্ষণে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তটস্থা লক্ষণ কি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ যথা,—

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষমবাঙ্মনসো গোচরম্
অসত্রিলোকী সত্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস।

যিনি সত্তামাত্র অর্থাৎ কেবল পরমার্থ স্বরূপ, যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগতভেদ-শূন্য ও বাক্যমনের অগোচর এবং যাঁহার সত্তায় মিথ্যাভূত ত্রিলোকের সত্যত্ব প্রতীতি হয়। এইগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। আর

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, জাতবিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে, এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে এই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়—তিনি তটস্থা লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হন।

স্বরূপ এবং তটস্থা লক্ষণ দ্বারা যাঁহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাতে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। ভগবান্ কেমন, তাহা যে দেখিয়াছে; সেই জানে—অন্যে জানে না। আমি ভগবানকে দেখিতে চাই। আমি প্রার্থনা করিতেছি, "হে প্রভো, তুমি আমায় দেখা দাও, তুমি কেমন তা ত জানি না, তুমি যেমন, ঠিক সেইরূপে আমাকে দর্শন দাও"। অথবা

আমি প্রার্থনা করিতেছি "হে প্রভো, তুমি নবনীরদবরণ বংশীধারীরূপে আমায় দেখা দাও।" ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু উভয় রূপেই অর্থাৎ স্বস্বরূপে বা বংশীধারী রূপে দেখা দিতে পারেন এবং তখন আমিও দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, উভয়ই এক। যদিও তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার প্রণালী ভিন্ন, তবু তিনিই উভয়ভাবেই উদয় হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে প্রথমটী স্বরূপ-লক্ষণের দৃষ্টান্ত এবং দ্বিতীয়টী তটস্থ লক্ষণের দৃষ্টান্ত। কিন্তু ফলে একই বস্তু জ্ঞান লাভ হয়। যথা—

স্বরূপ বুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

দেবাদিদেব মহাদেব বলিতেছেন, "শিবে! স্বরূপ এবং তটস্থ উভয় লক্ষণ দ্বারা একই ব্রহ্মবস্তু জ্ঞাত হওয়া যায়।"

অতএব এরূপ লক্ষণবাদ দ্বারা ধর্ম্মের মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তনই সাধিত হয় না, কেবল সংস্কার অনুযায়ী চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্র।

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে কাম্যকর্ম্মনিরত মানবের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রচারিত ধর্ম্মভাব লাভ করিবার উপযোগী হৃদয়ই ছিল না। মরুভূমিতে শস্য রোপন করিলে যেরূপ অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ মরুভূমিতুল্য প্রেমহীন শুষ্ক হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ববীজ উপ্তই হয় না। মরুভূমিতে শস্য জন্মাইতে হইলে, বহু পূর্ব্ব হইতে তাহাতে চেষ্টা দ্বারা সার প্রদান করিয়া উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। তাই শঙ্কর অনুর্ব্বর শুষ্ক ভারতবাসীর প্রাণে আত্মতত্ত্বের প্রেম পীযূষধারা ঢালিয়া দিয়া উর্ব্বরতা শক্তি আনয়ন করিলেন। নিরীশ্বর হৃদয়ে ঈশ্বরের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া মলিনতা দূর করিয়া দিলেন; তাই জীবগণও পরবর্ত্তী যুগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাধুরী সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইল।

বৌদ্ধযুগে অহর্নিশি কাম্যকর্ম্মের সাধন করিয়া, সিদ্ধাইয়ের সেবা করিয়া মানব "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মহদুপদেশ তুচ্ছ করিয়া হিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল। সাধনের নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তন্ত্র লইয়া লোকে উন্মাদবৎ সাধন রত থাকিয়া ব্যভিচারের স্রোতে ভারতভূমি কলঙ্কিত করিতেছিল। ঈশ্বরের নাম তখন কাহারও মনে উদিত হইত না। এমত সময়েই ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। তটস্থ লক্ষণে যুগল-তত্ত্ব,——পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক বুঝিতে হইলেই স্বরূপ লক্ষণে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর জ্ঞান গ্রহণ করিতে হয়। এই অদ্বৈত জ্ঞানের সাকার অভিব্যক্তি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং। একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি—রাধাকৃষ্ণযুগলতত্ত্ব একদেহে বর্ত্তমান। যথাঃ——

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতি র্হ্লাদিনী—শক্তিরাস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকৃত কড়চা।

শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের বিলাস-রূপিনী হ্লাদিনী শক্তি, সুতরাং রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে বিলাস বাসনায় জগতীতলে দেহভেদ স্বীকার করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এইজন্যই রাধাভাব ও রাধকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাই॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদিলীলা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমতঃ অদ্বৈততত্ত্ব শ্রীগুরু গৌরাঙ্গকে হৃদয়ে পরিস্ফুট করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ অদ্বৈততত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ দ্বৈততত্ত্ব,—পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বের সাধনা হয় না। অতএব গৌরাঙ্গসেবা করিয়া তাঁহার কৃপালাভ না করিলে, যুগল-সেবার অধিকারী হওয়া যায় না;—শ্রীরাধা-কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানও লাভ হয় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কোন নিরীশ্বরবাদীকে গৌরাঙ্গদেবপ্রচারিত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের রহস্য উদ্ধার করিতে হইলে, তাহাকে প্রথমতঃ নিরীশ্বর বৌদ্ধভাব হইতে শঙ্করের অদ্বৈত পথে আসিতে হইবে। অন্যথায় সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবে। গৌরতত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে না। উপরোক্তরূপ আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শঙ্কর প্রচারিত ধর্ম্মের প্রভাবেই চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিবার শক্তি জীব-হৃদয়ে জন্মিয়াছিল। অতএব শঙ্কর যোগী বা জ্ঞানী বলিয়া ভক্তিবিরোধী বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিকট "নাস্তিক" নামের যোগ্য নহেন। তাঁহার ধর্ম্মমত জগতের সকল ধর্ম্মমতের ভিত্তিস্বরূপ। সর্ব্ব প্রকার মতবাদ তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের ক্রোড়ে স্থান পাইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতে বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধগণের ঘোরতর দৌরাত্ম্যের সময় তাঁহার আবির্ভাব। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া তিনিই লুপ্তপ্রায় ঈশ্বরপরতন্ত্র আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই দেশকাল পাত্র বিচার করতঃ ধর্ম্মের অনুশাসনাদি প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানিগণের উপযোগী অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন এবং মায়াবাদ * প্রতিষ্ঠা করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ" শ্রুতির সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভক্তগণের জন্য তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমন করিয়া তীর্থমহিমা প্রচার করিয়াছেন; সর্ব্বদা কীর্ত্তনের উপযোগী স্তোত্রাদি রচনা করিয়া ভগবদ্ভাব প্রাণে সদা বহমান রাখিবার উপায় করিয়াছেন। শালগ্রাম শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন শ্রীমূর্ত্তিই তিনি দেবের বা পূজার অযোগ্য বলিয়া কখনও প্রচার করেন নাই। কিন্তু তবু কোথা হইতে শ্রীশঙ্করের "শুষ্কজ্ঞানী, নাস্তিক" ইত্যাদি বিশেষণের সমাবেশ হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। তাঁহার প্রাণে ভগবৎ বিষয়ে যেসকল ভাবলহরী ক্রীড়া করিত, এবং যাহা তিনি ভাবমুগ্ধ হইয়া দুস্থ জীবগণের জন্য স্তোত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। বিপদের ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি অচ্যুতকে স্তব করিতেছেন, যথাঃ—

---

*গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনের মূল এই মায়াবাদ। দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে কখনও জীব কামনাশূন্য হইতে পারে না। তাই মায়াবাদ প্রচার করিতেছে "তোমার দেহ নাই, জগতও নাই, সর্ব্বব মিথ্যা, মায়া বিজৃম্ভন মাত্র; একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই সত্য।" অতএব ইহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে জীবকে কর্ম্মবন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিতেছে।

অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রামকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো
বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্।

হে অচ্যুত, তুমি অব্যয়; হে হরে! তুমি পরমাত্মা; তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। হে বাসুদেব, হে অনিরুদ্ধ, হে শ্রীপতে, তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তি বিধান কর।

দেবকীতনয় দুঃখদাবাগ্নে রাধিকারমণ রম্য সুমূর্ত্তে,
দুঃখমোচন দয়ার্ণবনাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্।

হে দেব, তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখকাননের অগ্নি-স্বরূপ। হে রাধিকারমণ, তোমার মূর্ত্তি অতি মনোহর। হে নাথ! তুমি সকলের দুঃখ মোচন কর; তুমি কৃপাসাগর। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি বিধান কর।

গোপিকা-বদন চন্দ্রচকোর, নিত্য নির্গুণ
নিরঞ্জন জিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ব্ব, শ্রীপতে শময়
দুঃখমশেষম্।

হে দেব, তুমি গোপিকাগণের বদন চন্দ্রের চকোর স্বরূপ অর্থাৎ তুমি গোপিকা-বদন দর্শনে পরম পুলকিত হও। তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নিরঞ্জন, তুমি জয়শীল, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, তুমি সকলের কল্যাণ বিধান কর। তুমি-সকলের উৎকর্ষবান, হে শর্ব্ব, হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি বিধান কর।

গোকুলেশ গিরিধারণ ধীর
যমুনাচ্ছতট খেলন বীর
নারদাদি মুনি বন্দিত পাদ,
শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্।

হেদেব, তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবৰ্দ্ধন ধারণ করিয়াও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে। যমুনার নির্ম্মল তটভূমি তোমার ক্রীড়াস্থল। নারদাদি মুনিগণ তোমার বন্দনা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শঙ্কর যে সুধু জ্ঞানী বা ভক্ত ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাতে বৈষ্ণবগণ-পরিসেবিত শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্বও সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অন্যথায় শঙ্কর "রাধারমণ," "গোপিকা-বদনচন্দ্রচকোর" "গোবৰ্দ্ধন ধারণ-ধীর" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কখনই শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন না। প্রিয় পাঠক, আরও দেখুন, ভগবান শঙ্কর কি ভাবে নারায়ণের স্তব করিতেছেন :—

করুণাপারাবারা বরুণালয় গম্ভীরা।
নারায়ণ, নারায়ণ, জয় গোবিন্দ হরে,
নারায়ণ, নারায়ণ, জয় গোপাল হরে।

হে নারায়ণ, তোমার করুণা বরুণালয়; অর্থাৎ বরুণ রাজার বাসস্থান সাগরবৎ অতীব গভীর; কেহই তোমার করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরে, হে গোপাল, তুমি জয়যুক্ত হও।

নীরদ সঙ্কাশা ধৃত কলিকল্ম নাশষা,
নারায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

হে নারায়ণ! তোমার দেহকান্তি ঘনতর মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তুমি কলিকালের সকল পাপ নাশ কর। হে নারায়ণ ইত্যাদি।

যমুনতীর বিহারা ধৃত কৌস্তভমণি হারা,
নারায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

হে নারায়ণ! তুমি যমুনতীর বিহারী এবং তুমি কৌস্তভমণির হার গলে পরিধান করিয়াছ। হে নারায়ণ ইত্যাদি।

পীতাম্বর পরিধানা, সুর কল্যাণনিধানা।
নারায়ণ নারায়ণ ইত্যাদি!

হে নারায়ণ, তুমি পীতাম্বর পরিধান করিয়াছ এবং তুমি দেবগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাক। হে নারায়ণ ইত্যাদি।

মঞ্জুল গুঞ্জাভূষা, মায়ামানুষ বেশা।
নারায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

হে নারায়ণ, তুমি মনোহর গুঞ্জা দ্বারা অঙ্গভূষণ ধারণ কর এবং আপন মায়া বশীভূত করিয়া মানুষ বেশ ধারণ করিয়াছ। হে নারায়ণ ইত্যাদি।

রাধাধর মধুরসিকা, রজনীকর কুলতিলকা,
নারায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

হে নারায়ণ, তুমি রাধিকার অধর-মধুর রসজ্ঞ এবং তুমি চন্দ্রবংশের তিলক। হে নারায়ণ ইত্যাদি।

মুরলীগান-বিনোদা বেদস্তুত-ভূপাদা
নারায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

হে নারায়ণ, তুমি মুরলীতানে গান করিয়া আনন্দ করিয়া থাক। বেদ সকল তোমারই চরণের স্তব করিয়াছে। হে নারায়ণ ইত্যাদি।

এস্থলে বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু যে মুরলীবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ তাহাও অন্যান্য বর্ণনার সহিত শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন। আরও দেখুন, জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্কর শ্রীভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন—

নমস্কার অষ্টাঙ্গ সকল দুরিত ধ্বংসন পটুঃ
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপিরমাকান্ত ইদম্।
তব প্রীত্যৈ, ভূয়াদহমপি দাসাস্তব বিভো
কৃতংছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তোস্তু ভগবান।

হে রমাকান্ত, আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতেছি, আমার সকল দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। হে বিভো, আমি তোমার দাস হইয়া থাকি, আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর; হে ভগবান, তোমাকে নমস্কার করি। (ক্রমশঃ)

দীন—সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

:0:

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-গম্ভীরা—গত ২০শে ফাল্গুণ মহা শিবরাত্রি তিথিতে "কাশীধাম ৪৮নং পিলখানা" স্থিত শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-গম্ভীরার ২য় বার্ষিক উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

সাত্বিক-দান—ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই সাহা শঙ্খনিধি তত্রস্থ মিটফোর্ড হাসপাতালে ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা বেলগেছিয়ার আলবার্টভিক্টর হাসপাতালে ১৪নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট নিবাসিনী রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী নগদ ২৫০৲ টাকা, ৬২নং হেরিসনরোড নিবাসী

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস ১০ খানা কম্বল এবং টাপার ৭নং গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোডের শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এণ্ড ব্রাদার্স ৮খানি কম্বল দান করিয়াছেন।

অর্থের সদ্ব্যবহার— ফরিদপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ময়মনসিংহ মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত উজানির জমিদার সতীশচন্দ্র রায় মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন; সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৩২০০০ টাকা। তন্মধ্যে ৪০০০ টাকা দাতার ঋণপরিশোধ কল্পে ব্যয় হইবে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা না হইলে, ঐ টাকায় দাতার স্বগ্রামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তিনি উইলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যদি তাহাও না হয়, তবে ঐ অর্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তেলিহাটী পরগণায় নিম্নশিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইবে। ইহারই নাম সাত্ত্বিক দান—ইহাই অর্থের সদ্ব্যবহার!!

সৎকার্য্যে আত্মত্যাগ—বরিশাল—পিরোজপুরের "হিতৈষী" প্রকাশ "গৌরনদী ফুল-শ্রীর চৌরাস্তার পার্শ্বে আগেলঝাড়ার হাটখোলার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ হালদার নামক এক সদাশয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক হরিমন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, একটী অবৈতনিক উচ্চ প্রাইমেরী স্কুল এবং একটী পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এই সৎকার্য্যে যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এযাবৎ প্রায় ১৬৬ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। হালদার মহাশয়ের এই সাধু-প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, ভগবৎ প্রসাদে তিনি সিদ্ধকাম হউন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রাপ্তি স্বীকার—আমরা সানন্দে কৃতজ্ঞতার সহিত রায় শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত বাচস্পতি বাহাদুর মহাশয়ের কৃত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি—(১) সাংখ্যকারিকা, (২) ঋগ্বেদ ভাষ্যে পরাৎ প্রকরণ (সায়নাচার্য্য প্রণীত) (৩) Religion of Love (শাণ্ডিল্য সূত্র) (৪। ৫) আমিষের প্রসার (১। ২ খণ্ড।) ৬। পরিব্রাজক সূক্তমালা ৭। ব্রহ্মসূত্র ৮। উপবাস।

———:0:———

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে "আর্য্য-দর্পণের" ৯ম বর্ষ আরম্ভ হইবে, যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা যেন চৈত্র মাসের মধ্যে আমাদিগকে সংবাদ প্রেরণ করেন। কোন সংবাদ না পাইলে "বৈশাখ" সংখ্যা ভিঃ পিতে প্রেরিত হইবে। ভিঃ পি ফেরত দিয়া কেহ যেন পরোক্ষ-ভাবে দরিদ্রনারায়ণসেবার বিরোধী না হন, "আর্য্য-দর্পণের" ধর্ম্মপ্রাণ, সহৃদয় গ্রাহকগণ সমীপে ইহাই সানুনয় প্রার্থনা।